শ্রীগুরুবাণী

(ক্রিয়াযোগ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব ও তথ্য)

যোগাচার্য শ্রীআদ্যনাথ রায়

প্রকাশক ঃ

শ্রীশ্রী আদ্যনাথ ট্রাষ্ট।
২৬/এ, কবি কিরণধন চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী — ৭১২২৫৮

প্রথম প্রকাশ ঃ
শিবচতুর্দ্দশী
২০শে ফাল্গুন, ১৩৬৫ সাল।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য
শ্রীশ্রী আদ্যনাথ ট্রাষ্ট।
২৬/এ, কবি কিরণধন চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী — ৭১২২৫৮

মুদ্রাকর ঃ

অভিনব মুদ্রনী
৭৭/১, সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০০০৬

ভূমিকা

শ্রীশ্রীগুরুবাবা বলতেন যে -

যাঁর কাছ থেকে কিছু শিখা যায় তিনিই গুরু পদ বাচ্য তাই এই বইখানির নাম 'গুরুবাণী' দেওয়া হল।

বহুখ্যাতিমান পুরুষের লেখা হতে গুরুবাবা কিছু কিছু কথা আহরণ করে রাখেন বিভিন্ন বই থেকে এবং একখানা পুস্তক আকারে প্রকাশ করার ইচ্ছাও আমাদের নিকট প্রকাশ করে ছিলেন। তারপর হতেই বাবার শরীর ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে তাই ছাপানো আর হ'য়ে উঠে নাই। পরবর্ত্তী কালে তাঁর লেখাগুলি নকল করিয়ে কাউকে কাউকে দেন, আমাকেও দেন। তার মধ্যে কয়েকখানা খাতায় তাঁর হাতের সইও রয়েছে। একটা কথা বলে রাখা ভাল যে তাঁর নিজের লেখাও ঐ খাতায় আছে। উনি এ কথাও বলে ছিলেন যে - এমন কিছু কথা লিখে রাখলাম, যাতে তোমাদের আর কোন ধর্ম্ম পুস্তক পড়তে না হয়। বর্ত্তমানে গুরুবাবার অপূর্ণ ইচ্ছাটাই আমরা পূরণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। আশারাখি যে কোন পাঠক পাঠিকা এই পুস্তকখানি পাঠে প্রভূত উপকৃত হবেন।

নিবেদক

প্রকাশক - শ্রীশ্রী আদ্যনাথ ট্রাষ্ট

সূচীপত্র

প্রথম সঞ্চয়ন

দ্বিতীয় সঞ্চয়ন

তৃতীয় সঞ্চয়ন

<u>চতুর্থ সঞ্চয়ন</u>

<u>পঞ্চম সঞ্চয়ন</u>

ষষ্ঠ সঞ্চয়ন

সপ্তম সঞ্চয়ন

অষ্টম সঞ্চয়ন

****

যোগাচার্য শ্রী শ্রী আদ্যনাথ রায়

ওঁ শ্রীশ্রী গুরবে নমঃ

প্রথম সঞ্চয়ন

মণিরত্ন মালা

শিষ্য ঃ দয়াময় গুরুদেব অপার সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছি, আমার আশ্রয় কি বলিয়া দিন।

গুরু ঃ বিশ্বনাথের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয়।

আবদ্ধ কে? যে বিষয়ানুরাগী।
মুক্তি কি? বিষয়ে বিরাগই মুক্তি।
ভয়ানক নরক কি? নিজদেহ।
স্বর্গ কি? বাসনাক্ষয়।
কিসে সংসার বন্ধন ঘুচে? শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান দ্বারা।
মুক্তির হেতু কি? পূর্বোক্ত শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান।
কিসে স্বর্গলাভ হয়? জীবের প্রতি অহিংসায়।
সুখে থাকে কে? সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি।
জাগরিত কে? যাঁহার সদ্ অসদ্ জ্ঞান আছে।
কাহারা শত্রু? আপনার ইন্দ্রিয়গণই শত্রু।
দরিদ্র কে? যাহার বলবতী আশা আছে।
ধনী কে? যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট চিত্ত।
কোন ব্যক্তি জীবন্মৃত? যে উৎসাহহীন।
অমৃত কি? সুখদায়িনী নিরাশা।
সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি? মমতা ও অভিমান।
মোহান্ধ কে? যে অধিক কামাতুর।
মৃত্যু কি? নিজের অপযশ।
গুরু কে? যিনি হিতোপদেশ দেন।
শিষ্য কে? যে গুরুভক্ত।

শ্রীগুরুবাণী

দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ কি ?	পুনঃ পুনঃ ভব যন্ত্রণা।
তাহা নিবারণের উপায় কি ?	সদ্ অসদ্ বিচার।
অলঙ্কার অপেক্ষা উত্তম ভূষণ কি ?	নিজের বিশুদ্ধ মন।
সর্বদা কি শ্রবণ করা উচিত ?	গুরুর উপদেশ এবং বেদবাক্য।
ব্রহ্মলাভের উপায় কি কি ?	সৎসঙ্গ, উপযুক্তদান, সদ্ অসদ্ বিচার এবং সন্তোষ।
কাহারা সাধু ?	সমস্ত বিষয়ে যাঁহারা বীতরাগ হইয়াছেন। যাঁহারা মোহশূন্য এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন।
প্রাণীগণের জ্বর কি ?	চিন্তা।
মূর্খ কে ?	যে অবিবেকী।
সংসারে কাহাকে প্রিয় করিতে হইবে ?	শিব ও বিষ্ণুভক্তি।
প্রকৃত জীবন কিরূপ ?	যাহা দোষ বিবর্জিত।
প্রকৃত বিদ্যা কি ?	যে বিদ্যা ব্রহ্মগতিপ্রদ।
জ্ঞান কাহাকে বলে ?	যাহা তত্ত্বজ্ঞান।
কে জগৎ জয় করিয়াছে ?	যে মন জয় করিয়াছে।
বিষ অপেক্ষা বিষ কি ?	সকল প্রকার বিষয়।
সর্বদা দুঃখী কে ?	বিষয়ানুরাগী।
ধন্য কে ?	যে পরোপকারী।
পূজনীয় কে ?	যাহার শিবতত্ত্বনিষ্ঠা আছে।
সংসারে মূল কি ?	চিন্তা।
কাহার সঙ্গ করা ও কাহার সহিত বাস করা অবিধেয় ?	মূর্খ ও পাপী ও খলব্যক্তির সহিত।
মুমুক্ষুদিগের আশু কর্ত্তব্য কি ?	সৎসঙ্গ, নির্মলতা এবং ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি করা।
কাহার জন্ম সফল ?	যাহার পুনরায় জন্ম হইবে না।
প্রকৃত মৃত কে ?	যাঁহার আর মৃত্যু হইবে না।
একমাত্র তত্ত্ব কি ?	অদ্বিতীয় শিবতত্ত্ব।
উত্তম কি ?	সাধুচরিত্র,

দিবার উপযুক্ত কি ?	অভয়প্রদান।
শত্রুগণের মধ্যে মহাশত্রু কে ?	কাম, ক্রোধ, লোভ, অসত্য ও তৃষ্ণা।
তৃপ্ত হয় না কি ?	আশা।
দুঃখের কারণ কি ?	মমতা।
কাহারা দস্যু ?	নিজ কুবাসনানিচয়।
সভাস্থলে শোভা পায় কে ?	সুবিদ্বান।
জননীর ন্যায় সুখদায়িনী কে ?	সুবিদ্যা।
সতত কাহা হইতে ভীত হইবে ?	লোকনিন্দা ও সংসারারণ্য।
পরম সুহৃদ কে ?	বিপদ কালে যে সাহায্য দাতা।
পিতা কাহারা ?	প্রতিপালকগণ।
দুর্ল্লভ কি ?	সদ্‌গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচারণা।
সকলের পক্ষে দুর্জ্জয় কি ?	কামরূপ মহাবীর।
পশু অপেক্ষা মহাপশু কে ?	যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান নাই, অথচ যে প্রাচীন শাস্ত্র মতে ধর্মানুষ্ঠানও করে না।
কোন বিষয় অমৃত তুল্য বোধ হয় ?	রমণী।
মিত্রবৎ শত্রু কে ?	পুত্র, কন্যা, জায়াদি।
চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী কি ?	ধন, যৌবন এবং জীবন।
সকল প্রকার দান অপেক্ষা কোন দান উৎকৃষ্ট ?	সুপাত্রে দান।
কন্ঠাগত প্রাণ হইলেও অকর্ত্তব্য কি ?	যাহাতে অধর্ম হয়।
পাপী ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি ?	পতিতপাবন বিশ্বনাথের আরাধনা।
অহর্নিশ ধ্যেয় কি ?	সংসার অসত্য ও শিবজ্ঞান সত্য।
উত্তম কর্ম কি ?	যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন।
কিসের প্রতি সর্বদা অনাস্থা হইলে মঙ্গল ?	অনিত্য সংসারে।

আত্মপূজা

আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নাই। কিন্তু এই আত্মা আনন্দ স্বরূপ, সন্মাত্র চিদানন্দরূপী, নির্বিকল্প ও একরূপ পদার্থ। সুতরাং কিরূপে তাঁহার পূজা করিব?

আত্মা পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার আবাহন সম্ভবে না, আত্মাই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার সুতরাং তাঁহার আসন প্রদান অসম্ভব এবং যিনি স্বচ্ছ পদার্থ, তাঁহার পাদ্য বা অর্ঘ্যেই বা কি প্রয়োজন? আত্মা নিত্য বিশুদ্ধ, সুতরাং আচমনীয়েরও কোন প্রয়োজন নাই। যে আত্মার উদরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত, তাঁহার আবরক ও লজ্জা নিবারক বস্ত্রও সম্ভবে না। আত্মা নিত্য বিশুদ্ধ সুতরাং তাঁহার যজ্ঞোপবীতের বা প্রয়োজন কি? আত্মা নিত্য মনোরম, সুতরাং তাঁহার অলঙ্কারেরও কোন প্রয়োজন নাই।

আত্মা নির্লিপ্ত, তাঁহার গন্ধলেপ সম্ভবে না। আত্মা বাসনারহিত, অতএব তাঁহার পুষ্পের প্রয়োজন নাই। যিনি ঘ্রাণশক্তিহীন তাঁহার ধূপের প্রয়োজন কোথায়? আর যিনি স্বয়ং প্রকাশমান, প্রদীপ তাঁহার কি করিবে? যিনি নিত্য তৃপ্ত, তাঁহার নৈবেদ্যের আবশ্যকতা কোথায়? যিনি নিষ্কাম পুরুষ, তাঁহার ফলই বা কি হইবে? সর্বব্যাপকের তাম্বুল কি হইবে? নিত্যানন্দ বস্তুর দক্ষিণারই বা কি আবশ্যক? যিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ তাঁহার আরত্রিকের প্রয়োজন কোথায়? যিনি অনন্ত পুরুষ, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করা অসম্ভব। যিনি অদ্বিতীয় বস্তু তাঁহাকে কে নমস্কার করিবে? যিনি অন্তঃ, বহিঃ সর্বত্র পূর্ণরূপে শোভমান তাঁহার সম্বন্ধে মুদ্রা বন্ধনও সম্ভবে না। অতএব সর্বব্যাপক পরমাত্মাকে বক্ষ্যমানরূপে সাত্ত্বিক পূজা করিবে।

এই দেহই দেবালয় এবং দেবালয়ে যে জীব বাস করেন, তিনি সদাশিব দেব পরমাত্মা, অতএব অজ্ঞানরূপ নির্মাল্য বিসর্জ্জন পূর্বক 'সোহহং' ভাবে পূজা করিবে।

ইহারই নাম আত্মপূজা।

পঞ্চমুন্ডির আসন

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চমুন্ড হইল পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চমুন্ডই হল আত্মার আসন। এই অবিনশ্বর আত্মায় মন স্থাপন করাই হল পঞ্চমুন্ডির আসনে উপবেশন।

১. ক্ষিতি : মূলাধার চক্র।
২. অপ : স্বাধিষ্ঠান চক্র।
৩. তেজ : মণিপুর চক্র।
৪. মরুৎ : অনাহত চক্র।
৫. ব্যোম : বিশুদ্ধাখ্য চক্র।

এই পঞ্চ চক্রের উপর আজ্ঞা চক্র। উপরোক্ত পঞ্চভূতময় ভাবকে অতিক্রম করিয়া আজ্ঞাচক্রে আত্মার অচল আসন স্থাপন করিতে হইবে।

ইহা বহু প্রাণায়াম ও স্থির বায়ব ক্রিয়ার দ্বারা সম্ভব। ইহাকেই আধ্যাত্মিক মতে শ্মশানে কালী সাধন বলা হয়, অর্থাৎ সাধকের চিদাকাশে স্থিতি।

দশ মহাবিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সৎ এ অবস্থিত তাই তিনি সতী। তিনি সমর্থবতী তাই তিনি ভগবতী। জীবের দুর্গতি নাশ করেন তাই তিনি দুর্গা। বড় দুঃখে তাঁকে জানা যায় তাই তিনি দুর্গা। কাল ভয় হইতে জীবকে রক্ষা করেন তাই তিনি কালী। আকাশ বর্ণ বা কালরূপিনী তাই তিনি কালী। ত্রিতাপ নাশ করেন তাই তিনি তারা। বিশ্বভুবনকে রাত্রিতে ঘুম পাড়ান, তাই তিনি ভুবনেশ্বরী। ষোড়শ কলায় শ্রী দান করেন তাই

তিনি ষোড়শী। কান্তি ও শান্তি দান করেন, তাই তিনি কমলা। মদ নাশ করেন তাই তিনি মাতঙ্গী। বিশ্বকে নিজ বশে রেখেছেন তাই তিনি বগলা। মোহ নাশ করেন তাই তিনি ধূমাবতী। মায়া ছিন্ন ক'রে জীবকে মুক্ত করেন তাই তিনি ছিন্নমস্তা। ভবের কারণ তাই তিনি ভৈরবী। বিদ্যা ও সুবুদ্ধি দান করেন তাই তিনি সরস্বতী। সর্ব বিদ্যা তাঁহাতেই বিদ্যমান তাই তিনি সরস্বতী। বিশ্ব প্রেমে বিগলিতা তাই তিনি বৈষ্ণবী। বিশ্বকে শ্রী মন্ডিত করেন তাই তিনি লক্ষ্মী। পরমাত্মাকে জীবভাবে সংবদ্ধ করেন, তাই তিনি পরমা। মোহ মায়া হইতে জীবকে উদ্ধার করেন তাই তিনি মহামায়া।

অপর পক্ষে কৃষ্ণস্তু কালিকা দেবী, রামরূপা চ তারিণী, জামদগ্ন্য সুন্দরীস্যাৎ, বামন ভুবনেশ্বরী, বরাহ ভৈরবী রূপাচ, ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা, মীন ধূমাবতী, বগলা কুর্মমূর্ত্তিকা, বুদ্ধরূপেন মাতঙ্গী, কমলা কল্কিরূপিনী। ইতি দশবতার। ইহাতে স্বয়ং ভগবতীই ভগবান। (নীলতন্ত্র মতে)
(১) কৃষ্ণ-কালী; (২) তারা-রাম; (৩) ষোড়শী জামদগ্ন্য; (৪) ভুবনেশ্বরী-বামন; (৫) ভৈরবী-বরাহ; (৬) ছিন্নমস্তা-নরসিংহ; (৭) মীন-ধূমাবতী; (৮) বগলা-কুর্ম; (৯) মাতঙ্গী-বুদ্ধ; (১০) কমলা-কল্কি।

"বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ"

আর্য্য ঋষিগণ অশ্বত্থবৃক্ষে নারায়ণকে দেখতে পেয়েছিলেন। আমার চক্ষুতো একদিনও দেখতে পেলো না। "অশ্বত্থ সর্ববৃক্ষাণাং" আমার মন তো মানলো না। আর্য্য ঋষিগণ চন্দ্রে, সূর্য্যে ভগবানকে দেখেছিলেন। "সবিতৃমন্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" "নক্ষত্রাণামহং শশীঃ" সে কথা আমি বুঝতে পারি না। ব্রজগোপীগণ যমুনার জলে ভগবানকে দেখেছিলেন, কদম্ব বৃক্ষে দেখেছিলেন। ব্রাহ্মণগণ গঙ্গাজলে নারায়ণ

কে দেখেছিলেন। তাই বলেছিলেন, "আপো নারায়ণঃ ব্রহ্ম।" হায়! হায়! আমার একি দশা, ভ্রান্ত মন ক্ষান্ত হও; গুরুপথ ধর, সাধন করলেই ভগবানের দর্শন পাবে; সর্বসুখে সুখী হবে।

হে গোবিন্দ, আমি বেঁচে আছি কেবল তোমার জন্য। হে হরি! তুমি আমাকে দর্শন দাও। ঊর্দ্ধে, নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে যেদিকে চাই তুমিই রয়েছ দেখতে পাই, আমার মনোদৃষ্টি, হে পদ্ম পলাশ লোচন হরি, তোমার মুখের দিকে যেন থাকে। আমার শ্রবণ যেন তোমার বিশ্বময় গান শুনতে পায়। হে হরি, আমার পঞ্চইন্দ্রিয়ের পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে যেন আমি তোমার বিশ্ব মন্দিরে আরতি করিতে পারি। প্রভাত সূর্য্যের প্রথম কিরণেই যেন আমি তোমাকে দেখতে পেয়ে প্রাণভরে প্রণাম করতে পারি। মধ্যাহ্নের সূর্য্য তাপের মধ্যে যেন আমি তোমাকে স্পর্শ করতে পারি। সায়াহ্নের শীতল বায়ুতে তুমি এসে আমাকে সুশীতল করে দিও। মলয় পবনে, চন্দ্র কিরণে তুমি ভেসে ভেসে, হেসে হেসে, এসে এসে আমাকে চুম্বন করো। আমি জগতে যত জড় বস্তু দেখেছিলাম তুমি এসে সে সকলের জড়ত্ব ঘুচিয়ে দিলে, আমি আর জড় দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি সকল জড়ের মধ্যে লাল তপ্ত লৌহ দণ্ডের মধ্যস্থ অগ্নির ন্যায় কেবল তুমিই বিরাজ করছ। সর্ব বস্তুতে তোমাকে দেখতে পেয়ে আমি কৃতার্থ হলাম। ধন্য হলাম; ধন্যঃ ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ।

এই অখণ্ড আত্মা, এক অখণ্ড প্রাণ সর্বজীবে বিরাজ করছেন। এই একাত্মবোধই প্রেম। আমরা সকলে পৃথক পৃথক রয়েছি, দেখতে পাচ্ছি, সে বাহিরে বাহিরে। অন্তরে অন্তরে আমরা সকলে এক হয়ে আছি, এই জ্ঞানই জীবন্মুক্ত সাধুগণের হয়ে থাকে। সে কেমন? যেমন সমুদ্রের জল এক অখণ্ড হলেও উপরে উপরে ভাসা ভাসা; লক্ষ লক্ষ ঢেউ উঠছে, পড়ছে, জন্মাচ্ছে—মরছে। এই উঠাপড়া কেবল বাইরে বাইরে, উপরে উপরে ভাসা ভাসা মাত্র, অন্তরে কিন্তু এক অখণ্ড জলরাশি বিরাজিত আছে। কত ঢেউ জানে যে তারা সব পৃথক পৃথক। আবার কত ঢেউ জানে যে তারা একহাত জলের

নীচেয় সব এক অখন্ড হয়ে আছে। অখন্ডই খন্ড খন্ড, খন্ডে খন্ডে সে অখন্ড। এই অখন্ড বোধ নিয়েই উপরে উপরে খন্ড বোধ, উত্থান পতন ক্রীড়া, ইহা প্রেমের লীলা খেলা। খন্ডবোধ নিয়ে পরস্পর একান্ত ভাবে ভালবাসার টান। আমরা সব এক, এই বোধেই প্রেমের উদয় হয়; ইহাতে কৃষ্ণ লীলা, সর্বজীবে অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রেমলীলা প্রকাশ পায়।

কুমীর শৃগালের গল্প

একদিন এক কুমীর এক শিয়ালকে বলছিল, "ওহে বন্ধু একটি কথা শোন, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা। আমার সঙ্গে এসো।" কুমীরের কথা মত শিয়ালটি নদীর ধারে ধীরে ধীরে গিয়ে একটা বটের শিকড়ের উপরে দাঁড়াল; কুমীর ডুবে এসে টক করে তার পা ধরে ফেলল। তখন ধূর্ত শৃগাল বলল, "ওরে নির্বোধ, ওরে আহাম্মক, ধরবি আমার পা, তা না ধরে ধরলি বটের শিকড়?" শৃগালের কথামত কুমীর তার পা ছেড়ে দিয়ে বটের শিকড়টি চেপে ধরল, আর ধূর্ত শৃগাল অমনি দে ছুট।

হে মা প্রকৃতি দেবী, হে মা আদ্যাশক্তি, তোমায় অনেক বলে - কয়ে ভব নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু তুমি এসে সংসার বটের শিকড় 'কামিনী কাঞ্চনের' উপর দাঁড়িয়েছিলে। আমি ধীরে ধীরে এসে টক করে তোমার অভয় পাদপদ্ম দুটি ধরতে গিয়ে বটের শিকড় রূপ 'কামিনী কাঞ্চনে' আসক্ত হয়ে পড়লাম। তুমিও অমনি ফট্ করে পা ছাড়িয়ে নিয়ে মারলে টানা দৌড়। হতভাগ্য আমি, মূঢ় আমি সেই বটের শিকড় রূপী 'কামিনী কাঞ্চনের' উপর আসক্ত হয়ে মরি। মা! দোহাই তোমার, তুমি এ অধমকে আর শৃগালেফাঁকি দিও না। মা লোকে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে, তাদের কি গতি হবে মা? সূর্য্যকে দেখতে গেলে সূর্য্য যেমন নিজগুণে আলোক দান করেন, হে মা বিশ্বময়ী, বিশ্বজননী তোমাকে দেখবার জন্য তুমিও তেমনি নিজগুণে আমাদের আলোকদান কর।

টাইটানিক জাহাজ

মা জগদ্ধাত্রী দুর্গে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাহাজ তো সাগরের অতল জলে ডুবল। তখন কত মহামতি মরণের জন্য প্রস্তুত হলেন, পরে বিশ্বজননীর ক্রোড়ে উপনীত হলেন। কত মহার্ঘ মুক্তা মোতি রত্নাকর জলধির অতল জলে মাতৃক্রোড়ে গিয়ে আবার স্থান পেল। মা! ঐ জাহাজে আমি যেন এখনো ডুবছি। কি আশ্চর্য্য! এ যেন ক্ষণ কালের অপূর্ব খেলা, প্রাণ বায়ু নাসা পথ ছাড়বামাত্রই দেহক্লেশ সম্পূর্ণ দূর হলো। অনন্ত তেজের মধ্যে অনন্ত আকাশে স্বাধীন গতি-বিধি হতে লাগল। টাইটানিক নামক যে জাহাজ কিছুতেই ডুবতে পারে না বলে সকলের ধারণা ছিল, সেই জাহাজ নূতন অবস্থাতেই ইংরাজী ১৯১২ সালে বহু ধনী, মানী, জ্ঞানীগণ মহিলাগণ ও রত্নরাজি সহ ডুবে যায়।

সুখের অসীম রাজ্য, জড় দেহের অতীত চিন্ময় দেশ, দেব লোক প্রকাশিত চিত্ত নির্মল। সেখানে ব্রহ্মজ্যোতি উদ্ভাসিত। রূপেগুণে মহাকাশ ঝক্‌ঝক্ করছে, আমার রূপ, গুণ ও শক্তি শত গুণ বৃদ্ধি পেলো। আমার শ্বাসত্যাগ ক্লেশ বিন্দুমাত্র সময়ের জন্য। পরক্ষণেই এত সুখ এত শান্তি, এত তেজ, এত বীর্য্য, এত জ্ঞান, এত ঐশ্বর্য্য, এত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য যে সে আনন্দে আমি বাহুতুলে নৃত্য করি, আর বলি, মা ভগবতি, এতকাল পরে আজ তোমার ক্রোড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। আজ মা, মা বলে প্রাণ জুড়ালাম। আজ আমার বন্ধু, প্রাণের চিরবন্ধু মৃত্যু এসে আমাকে মায়ের কোলে তুলে দিয়েছে ওহো বন্ধো! হে মৃত্যু! হে চির সুহৃদ, হে আমার ক্লেশহরণ দুঃখ-নিবারণ, আজ আমার সকল প্রাণ জুড়িয়ে দিলে। মা কালবারিণী তারিণী, এই ভব সিন্ধু আজ গোষ্পদবারির ন্যায় হল। এইটুকু পার করে নিতে তুমি মৃত্যুকে পাঠালে। জাহাজ ডুবা ছল করে আঁধারে লুকোচুরি খেলছ। মা ছেলেকে এত ভয় দেখাতে পার! ডুবে মলাম বলে একেবারে প্রাণটা হাঁকুপাকু করে উঠেছিল। একেবারে নিরাশা ও

ভয়ের অন্ধকার। পলকে প্রলয় অনুভব। তার পরেই দেখি, প্রাতঃ সূর্য্য উদয়ের ন্যায় নির্ম্মল আকাশে মন উপস্থিত। ঐ সে নির্ম্মল আকাশে আমার মা সুনির্ম্মলা। হা! হা! করে মা হেসে উঠেছে, আমিও হেসে উঠেছি। মা কোলে নিয়েছে, মা একি আনন্দ, একি হাসি, কি অমৃতের স্রোত। ধন্য তুমি! ধন্য আমি! ধন্য, ধন্য পুনঃ পুনঃ।

নবদ্বীপ ধাম

নদীয়া জেলায় নবদ্বীপস্থ শান্তিপুরে গৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাবের অর্থ এই যে নদীয়া জেলার অর্থ - না দেওয়া জেলা অর্থাৎ যে জেলা লোকের দেওয়া নয়। ঈশ্বর প্রদত্ত এই দেহ জেলা। সেই জেলার অর্থাৎ এই দেহ জেলার নয় স্থানে নয়টি দরজা আছে; যথা - গুহ্য, লিঙ্গ, মুখ, নাসারন্ধ্রদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, কর্ণদ্বয়। এই স্থানের নাম নবদ্বীপ। এই নবদ্বীপের মধ্যস্থানে হৃদয় যে একটি শান্তি পূর্ণ পুর (স্থান) আছে সেই স্থানটির নাম শান্তিপুর। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" ঈশ্বর ইচ্ছায় এই দেহরূপ নদীয়া জেলার মধ্যস্থানে শান্তিপুর নামক হৃদয়পুরে, সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা গৌরাঙ্গ রূপে অবস্থান করে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, প্রভৃতি নয়টি দ্বীপ রূপে নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে এই বলে আহ্বান করছেন যে, হে জীবগণ তোমরা একবার হরি বলে আমার কাছে এসে ত্রিতাপ জ্বালা হতে শান্তিলাভ কর। এটাই অন্তরস্থিত গুরুরূপে গৌরাঙ্গ প্রভুর আহ্বান বা অবতীর্ণের উদ্দেশ্য।

বিষ্ণুপদে পিন্ড

প্রাণ বিশ্বব্যাপক হলেই বিষ্ণু পদবাচ্য হয়। প্রাণ কখন বিশ্ব ব্যাপক হয়, যখন প্রাণকর্ম্মদ্বারা প্রাণ কন্ঠ হতে ভ্রূ পর্য্যন্ত স্থির হয়। এটা ব্রহ্ম পদবাচ্য। পদ অর্থে তদ্ (ব্রহ্ম) বস্তুতে এবং পিন্ড অর্থে

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ বা সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। বেদান্তের মায়া বা জ্ঞান ও অজ্ঞানাবৃত বস্তু, যা তৎ সমুদয়ই লয় করা অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত (মন কল্পিত) যা, তা বিষ্ণুপদরূপ পরব্রহ্মেই বিলীন করাই বিষ্ণু পদে পিন্ড দানের তাৎপর্য্য।

বৃন্দাবন লীলা

জীবাত্মা বহু আর পরমাত্মা এক। জীবাত্মা স্বরূপ গোপীগণ (ভক্তগণ) ও পরমাত্মা স্বরূপ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। জীবাত্মা ও পরমাত্মা, ভক্ত ও ভগবানের যে স্থানে মিলন হয় সেই সন্ধিস্থানকেই শ্রীবৃন্দাবন বলা হয়। এখানে বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম প্রেমানন্দের মেলা বা প্রাণে প্রাণে মেলা। অতএব হে জীবরূপী গোপীগণ (ভক্তগণ) তোমরা সদ্‌গুরুর কৃপায় চৈতন্যরূপ কৃষ্ণকে লাভ করে পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মানন্দে শ্রীবৃন্দাবন লীলা উপভোগ কর।

কুরুক্ষেত্র তীর্থে পিন্ডদান

প্রত্যেকের দেহ এক একটি দেহক্ষেত্র। এই দেহরূপ ক্ষেত্রে ধর্মরূপ পান্ডব ও অধর্ম রূপ কুরু নামে দুইটি পক্ষ আছে। স্বরাজ্য অর্থাৎ আত্মরাজ্য লাভ করাই ধর্ম পক্ষের লক্ষ্য। কিন্তু অধর্ম পক্ষের বিরোধিতা হেতু উভয় পক্ষের যুদ্ধ হওয়ার কারণ। এ যুদ্ধের পরিণাম অধর্ম পক্ষের বিনাশ এবং ধর্ম পক্ষের বিজয় লাভ। অতএব কাম ক্রোধাদি হিংসাত্মক রিপুগণের ক্ষেত্র (এই দেহ) হতে মুক্তিলাভ করতে হলে বেদব্যাস অর্থে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর উপদেশ অনুসারে দ্বৈপায়ন হ্রদ অর্থে ব্রহ্ম সরোবরে দেহ পিন্ড দান করলে তিনি তার সাত পুরুষ সহ মুক্ত হয়ে থাকেন। এটাই কুরুক্ষেত্র তীর্থে পিন্ড দানের তাৎপর্য্য।

কাশীধাম

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুন্না বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনের উপরে কাশী অবস্থিত। এই কাশীধামে অন্নপূর্ণাসহ মৃত্যুঞ্জয় শিব বাস করেন। গুরূপদিষ্ট যৌগিক ক্রিয়াদ্বারা মূলাধারস্থিত কুলকুন্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে কূটস্থে (আজ্ঞাচক্রে) স্থাপন করতঃ নিশ্চল ভাবে যিনি অবস্থান করতে পারেন, একমাত্র তিনিই কাশীবাসী হয়ে শিবত্ব প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।

প্রয়াগ

প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে ত্রিবেণীতে স্নানের অর্থ এই যে, প্রয়াগ অর্থে যে তীর্থে ত্রিবেণী আছে। ত্রিবেণী অর্থে ত্রিধারা - ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুন্না বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সেই ত্রিকূট বা আজ্ঞাচক্রে মাথা অর্থে মস্তিষ্ক (জ্ঞানবুদ্ধির আধার) অতি উচ্চ স্থান, মুড়িয়ে অর্থে পরিষ্কার করে অর্থাৎ অবিদ্যা চরণ ছেদন করা। ত্রিবেণী অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা সুষুন্না বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি মহানদীর মিলনস্থান বা সঙ্গম স্থান, স্নান অর্থে অবিদ্যামল ধৌত করা অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার নাশ হয়, সেই জ্ঞানের উপর যে অবিদ্যার আবরণ সেই আবরণ গুরূপদিষ্ট জ্ঞান খড়্গ দ্বারা ছেদন করবে। পরে প্রত্যেক অনুভূতির জন্য কূটস্থে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে তিনগুণের মিলন স্থানে ডুব দেবে, অর্থাৎ মনকে লয় করবে। এই সাধনা দ্বারা নিষ্কাম হয়ে জীব শিবত্ব লাভ করতঃ প্রয়াগ তীর্থে যথার্থ সুখ উপভোগ করতে পারবে।

‘‘অযোধ্যা’’

অযোধ্যা অর্থে যেখানে কোন যোদ্ধা অর্থাৎ দ্বৈতভাবরূপ শত্রুর অভাব হেতু যেখানে যোদ্ধার কোন প্রয়োজন হয় না। সেই স্থানেই রামের বাড়ী অর্থাৎ আরামের স্থান। প্রাণ বা আত্মার নাম রাম, তাই

শাস্ত্রে বলে 'প্রাণারাম' বা 'আত্মারাম।' পরমাত্মাই সত্য ও শান্তি স্বরূপ। গুরূপদিষ্ট সাধন প্রভাবে জীবাত্মা যখন পরমাত্মার সাথে মিলিত হয় তখন যে পরম আত্মসুখের আরাম পাওয়া যায়, সেই অবস্থাকেই আত্মার আরাম বা 'আত্মারাম' বলা হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় এই অদ্বৈতারাম লাভ করে অর্থাৎ পরমাত্ম সুখে সুখী হয়ে যে আরাম পাওয়া যায় তাকেই অযোধ্যায় রাম দর্শন বলা হয়।

হরিদ্বার

হরিদ্বারের কুম্ভে অর্থাৎ ব্রহ্ম কুন্ডে স্নান - ইহার অর্থ এই যে, হরিদ্বারের অর্থ যিনি পাপরাশি হরণ করেন তাঁহার নিকট পৌঁছাইবার দরজা, কুম্ভ অর্থে কলসী (অমৃতের)। ব্রহ্ম কুন্ড অর্থ (ব্রহ্মরন্ধ্র) ব্রহ্ম সরোবর। ইহার ভাবার্থ এই যে যাঁহাকে জানিলে জীবের জীবত্ব ভাব দূর হইয়া শিবত্ব ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের নিকট পৌঁছিবার যে দ্বার (কূটস্থ বা আজ্ঞাচক্র) সেই দরজাকে হরিদ্বার বলে। হরিদ্বারের ভিতরে ব্রহ্মরন্ধ্রে বা তালুমূলে একটি অমৃতপূর্ণ কুম্ভ (কলসী) আছে। খেচরী মুদ্রা দ্বারা জীবের জিহ্বা তালুমূলে প্রবেশ করাইয়া অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিলে অমরত্ব অর্থাৎ শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। সদ্‌গুরূপদিষ্ট নিয়মানুসারে এই অমৃত পূর্ণ ব্রহ্মকুন্ডে ডুব দিলে জীবত্ব বা অহংকার লয় হইয়া "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য যে তৎ (ব্রহ্ম) সেই সৎ (সত্য) বস্তুতে স্থিতি হওয়াই হরিপ্রাপ্তি বা হরিদ্বারে কুম্ভে ব্রহ্মকুন্ডে স্নানের তাৎপর্য্য।

গঙ্গাসাগর বা চন্দ্রনাথ

যে চন্দ্র (চন্দ্র মনকে কহা যায়) ধারণ করিলে জীব মৃত্যুঞ্জয় শিব হইয়া থাকেন, সেই সপ্ত ধাতুর সার বীর্য্যরূপ চন্দ্রধাতুর যিনি নাথ (স্বামী) অথবা শুক্ররূপ চন্দ্র যিনি পূর্ণভাবে মস্তিষ্কে (শিখরে)

ধারণ করিয়া আছেন তাঁহাকে চন্দ্রনাথ বা চন্দ্রশেখর মহাদেব বলা হয়, তিনি সর্বত্র থাকিলেও কূটস্থে চন্দ্রবিন্দুর মধ্যে তাঁহার দর্শন লাভ হইয়া থাকে। যিনি উদ্ধরেতা হইয়া গুরূপদিষ্ট নিয়মানুসারে ভ্রূযুগলের কূটস্থে স্থিত হইতে পারেন একমাত্র তিনিই চন্দ্রশিখর তীর্থে প্রকৃত চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়া নিত্যসুখে সুখী হইতে পারেন। যাঁহাতে শুভ লক্ষণ যুক্ত পূর্ণব্রহ্মের বিকাশ আছে, যাঁহার নিকট আত্মতত্ত্বরূপ অমূল্য ধন পাওয়া যায়, মানব লীলার শেষদিন অর্থাৎ অন্তিম কালের যিনি পথ প্রদর্শক, ভক্তের সমস্ত অবিদ্যামল স্খালন করিয়া পবিত্র করার জন্য যিনি ব্রহ্মলোক হইতে নরলোকে আগমন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ সদ্‌গুরুর তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া যে তৎসাধনে নিমগ্ন হইবে একমাত্র সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিই সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া যথার্থ গঙ্গা স্নানের ফল প্রাপ্ত হইবে। মহামুনি কপিলদেবের তত্ত্বোপদেশে ভক্ত সগর রাজা পুত্রগণ সহ মুক্ত হইয়া ছিলেন। সেই মহাত্মার জন্য এই স্থানের এত মাহাত্ম্য।

বৃহত্ত্বের আহ্বান

মানুষ! তুমি ভাগ্যবান, তোমার কাছে বৃহত্ত্বের আহ্বান এসেছে। শুধু আহ্বানই আসেনি, তুমি তা শুনতেও পাচ্ছ। তোমার সত্তার প্রতিটি অণু পরমাণু সেই আহ্বানে স্পন্দিত হচ্ছে। আর কি তুমি জড়ের মত ঘরের কোণে বসে থাকতে পার? আর কি তুমি পুরাতনের কঙ্কালকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে সময় নষ্ট করতে পার? পরম পুরুষ তোমায় ডাকছেন - ডাকছেন সমুদ্রের গর্জ্জনে, মেঘের হুঙ্কারে, বিদ্যুতের গতিতে, উল্কার অনল জ্বালায়। বসে থাকা ত তোমার চলবে না - জাগিয়ে তোল তোমার প্রসুপ্ত যৌবনের তমসাচ্ছন্ন পৌরুষকে। হয়তো এ পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, ক্ষুদ্রত্বের শৃঙ্খল হয়তো প্রতি পদবিক্ষেপে তোমায় জড়িয়ে ধরতে চাইবে, তবুও তোমায় যেতে হবে মহাতমিস্রার বক্ষ ভেদ করে পরমাস্থিতির পথে, তুমি ছুটে যাবে তোমার সৌরদ্যুতিময় দ্রুতগ রথে, সকল নৈরাশ্যের কালিমা ভেদ করে।

প্রকৃত সন্ন্যাসী

"ধ্যানং শৌচ তথা ভিক্ষা
নিত্য মে কান্তশীলতা"

ধ্যান, শরীর ও মনের শুদ্ধি, ভিক্ষান্ন ভোজন ও একান্ত বাস। চিত্তশুদ্ধ বা স্থির না হইলে বিষয় বৈরাগ্য আসে না। বিষয় বৈরাগ্য ব্যতীত যে সন্ন্যাস তাহা কেবল পন্ডশ্রম ও পাপজনক। উহার দ্বারা ইহকাল ও পরকাল দুইই নষ্ট হয়। সেইজন্য সন্ন্যাসী হইতে হইবে, সন্ন্যাসী সাজিলে চলিবে না। চিত্তশুদ্ধ নয় বলিয়াই জ্ঞান জন্মে না। সে জ্ঞান লাভার্থ সদ্‌গুরু প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগ দ্বারা সাধন অভ্যাস করিলে স্বতঃই মনকে সন্ন্যাসী করিয়া দিবে। প্রকৃত সন্ন্যাসীর ধ্যান ও একান্তশীলতা প্রয়োজন। ক্রিয়া অভ্যাস দ্বারা মনে ধ্যান নিষ্ঠা উৎপন্ন করিয়া তাহাকে একাকী করিয়া দিবে। সেখানে মনই থাকিবে না ত কোলাহল হইবে কোথা হইতে। মন হইতে বাসনার দাগ সম্পূর্ণ মিটাইতে হইলে ধৈর্য্যের সহিত সাধনাভ্যাস করিতে হইবে। সাধনাভ্যাসের ফলে প্রাণ স্পন্দন রহিত হইলেই চিত্তের স্পন্দন আর থাকিবে না। চিত্তস্পন্দন না থাকিলেও বাসনার সংস্কার বীজরূপে তখনও সুষুপ্ত থাকে। সে অবস্থায় সমস্ত বাসনাবীজ সুপ্ত থাকে মাথা তুলিতে পারেনা। তাহাই মহৎ আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধির অতি সূক্ষ্মভাব। বুদ্ধির এই অতিসূক্ষ্মাবস্থাতেই আত্মার স্পর্শ অনুভব হয়। তখনও সবিকল্প ভাব। পরে যখন সেই স্পর্শের আর বিরাম থাকে না, তখনই সংস্কারের বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। উহাই শান্ত আত্মা বা নির্বিকল্প সমাধিতে স্থিতি। "ধৃতি গৃহীতয়া" বুদ্ধির দ্বারা এই অবস্থাকে আয়ত্ব করিতে হইবে; অর্থাৎ সাধনের দ্বারা যখন মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থির বুদ্ধি বা একাগ্রতা দ্বারাই নিরোধ অবস্থা ধীরে ধীরে উপলব্ধি হইতে পারে। ইহাই অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতির শুদ্ধ চৈতন্যরূপ পরম পুরুষের মধ্যে আত্ম নিমজ্জন। এই "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।" এই পুরুষ অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই।

তাহাই কাষ্ঠা অর্থাৎ পরিশেষ এবং উহাই পরমাগতি। এই পরমা গতিকে প্রাপ্ত হইতে হইলে সাধন করা আবশ্যক। গুরূপদেশ মত সাধন করিয়া যাওয়াই ঈশ্বর শরণাগতি। এই শরণাগতি যাহার থাকে তিনিই ভগবৎকৃপা অর্থাৎ পরমাশান্তি লাভ করেন। ইহাই নিবৃত্তিরূপ মনের কৈবল্য পদ বা অভয় পরম পদ লাভ।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা

হে আমার প্রভু, ওগো আমার প্রাণের দেবতা, আমার জীবন মরণের সহচর, আমার জীবনের চিরসঙ্গী, ওগো আমার সুহৃদ, মঙ্গলাকাঙ্খী, ওগো আমার প্রিয়তম আত্মা -

"গগন হয়েছে তোমার আরতির থালা, রবি, চন্দ্র এই দুইদীপ জ্বলছে যেথায় নিরন্তর, তারকামন্ডল সুশোভিত রয়েছে মুক্তা খচিত চাঁদোয়ার মত, মলয়জ চন্দন তোমার ধূপ, তারই সৌগন্ধ বয়ে নিয়ে পবন করছে তোমার চামর ব্যজন। হে জ্যোতির্ম্ময় প্রভু, পুষ্প সম্ভার সাজিয়ে বনস্পতিরা নিবেদন করছে তোমার আরতির পুষ্পার্ঘ্য। হে ভবখন্ডন প্রভু, হে মুক্তিদাতা অনির্বচনীয় তোমার আরতি, এ আরতি বেজে উঠেছে অনাহত ধ্বনির মধ্য দিয়ে।

ভক্তের সন্দেহ

আমাদের মনে স্বতঃই একটা সন্দেহ আসে যে ঈশ্বর সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়া দ্বারা সংসারস্থ জীব সমূহকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণা দিয়া থাকেন, জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই, একথা শুনিলে ভয় হইবার কথা, কারণ তাহা হইলে মুক্তিলাভের চেষ্টা জীবের পক্ষে এক বিপুল ব্যর্থতা, এবং সমস্ত শাস্ত্র বাক্যের ও কোন মূল্য থাকে না। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, আত্মা স্বয়ং প্রকৃতি-পরবশ নহেন। তিনি মুক্ত ও সদা স্বাধীন। তিনি মুক্ত বলিয়াই চিতের

প্রতিবিম্ব যে জীব, তাহারও মুক্তির ইচ্ছা স্বাভাবিক। সেইজন্য প্রকৃতি যতই প্রবল হউক জীবকে আত্মানুসন্ধান হইতে বিরত করিতে পারে না। কারণ আত্মাই জীবাত্মার প্রাণ এবং আবার প্রকৃতির বশ্যতা বিচূর্ণ করিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রেরণাও জীব ঈশ্বর হইতে পাইয়া থাকে। এই নিজ প্রাণ হইতে জীব কখনও বিযুক্ত হইবার নহে। তবে মায়াবশ হইয়া দেহেন্দ্রিয়ের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি হওয়ায় জীব আপন স্বরূপকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। সে অবস্থাতেও জীব ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। জীব প্রকৃতিপরবশ সত্য কিন্তু জীবকে মুক্ত করিবার প্রেরণা, প্রকৃতিও যেন ঈশ্বর হইতে পাইয়া থাকে।

ঈশ্বরের একদিকটা যেমন জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে সদা স্পন্দিত ও বিভীষিকাময়ী, অন্যদিকটা আবার জন্ম মৃত্যু তরঙ্গহীন সদা অচ্যুত ও মুক্ত। জীব অজ্ঞানবশতঃ যতদিন বহিঃদৃষ্টি সম্পন্ন থাকে, ততদিন সে প্রকৃতি পরবশ থাকে, ততদিন কলের পুতুলের মত প্রকৃতির আদেশ মান্য করিতে বাধ্য হয়। ততদিন কিছুতেই সে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহাতে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

এইবার গীতা ৭ম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিব।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।।"

অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণ বিকারময়ী, আমার অলৌকিক মায়া নিশ্চয় দুস্তরা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ মায়া দুস্তরা হইলেও এই মায়া অতিক্রম করিতে পারেন। কারা পারেন?

যাঁরা আমার ভক্ত। আমায় ভজনা করেন।

কাশীর বাবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

"সূর্য্যের যে তেজ যাহা সূর্য্য হইতে আসিয়াছে - তদ্বারা সব প্রকাশিত - তদ্রূপ কূটস্থের তেজ এই শরীরে থাকায় শরীরে স্বপ্রকাশ হইতেছে। সেই তেজই রূপ, ব্রহ্মের হইতেছে - যাহা আকাশ হইতে আসিয়াছে। কিন্তু আকাশে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু সেই আকাশের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম স্বরূপ এক এক অণুর মধ্যে অনেক ব্রহ্ম স্বরূপ অণু। তাহার মধ্যে অনেক ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। সেই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তুমি একজন। তুমি কত ছোটলোক তাহা আপনা আপনি বিবেচনা করিতে পার না। তোমার আস্ফালনের আর সীমা নাই, তুমি কি, তাহা তুমি নিজে বলতে পার না। এই রূপ চন্দ্র অগ্নির তেজের অণুর মধ্যে আমারই রূপ। ইহা দৃষ্টি গোচর হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল। ক্রিয়া না করিলে এরূপ অবস্থার বোধ বল্লে হয় না - বোধ হইলেই বোধ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থা।

গীতা ১৫অঃ ১২ শ্লোক

অবিচল রাম

ভগবানের স্বধামে মায়া মোহ শোক তাপ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই নাই। এই পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীলা নিরন্তর কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া আছে, ক্রিয়ার পরাবস্থায় এই স্বকীয় ধাম। অতএব এই পথযাত্রীদের প্রতি অনুরোধ যে তাহারা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া না থাকে। যাহাতে এই কৈবল্যাবস্থা লাভ হইয়া থাকে তার জন্য এই প্রাণের খুঁটিটিকে সবলে যেন ধরিয়া থাকে। এই খুঁটি বা স্থিরভাব এবং শ্বাস বা গতি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। যে শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে, সেই সংসার গতি অতিক্রম করিতে পারে। নিরন্তর শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে এবং পলকে পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সাধারণ স্রোতে আপনাকে বহিয়া যাইতে না দিয়া সেই অচল লক্ষ্যে পৌঁছাইবার চেষ্টা করাই

কর্ত্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধরিতে পারা যায়। একবার সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পারিলেই "অবিচল রাম" কে প্রাপ্ত হইবে, যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন।

তত্ত্বতঃ সম্বন্ধে

অনেকেই "তত্ত্বতঃ" শব্দে রাম, কৃষ্ণাদি রূপে বা শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহা প্রকৃত তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানা নহে। এরূপ দর্শন তো অনেকেই পাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের ভ্রম যায় নাই বা বিষয়াভিলাষ নষ্ট হয় নাই। ইহা তাঁহার নিত্য স্বরূপ নহে, মায়াতনু বা বিগ্রহ মাত্র।

"মায়াতনু লোক বিমহনিয়াম্।
ধত্তে পরাণুগ্রহ এষ রামঃ।।"

তবে ইহা উচ্চ স্তরের সিদ্ধি সন্দেহ নাই। দেহাতীত কৈবল্যভাব ঐ রূপ সিদ্ধি সাধকদের মধ্যেও অতি অল্প লোকই ধরিতে পারেন।

"অব্যক্তা জায়তে প্রাণাঃ।"

এই প্রাণই জীবের আয়ু, "প্রাণোহি ভূতনামায়ু।।" এই প্রাণের তিনটি পদ - ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বা সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এই তিন পদ সুষুম্নায় থাকিয়া স্থির হইলেই এক হইয়া যায়, তখনই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা অক্ষর পদ বা পরমব্যোম। এই অবস্থাতেই "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" হয়।

এই মহেশ্বরই আত্মারূপে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। কূটস্থই কুলকুণ্ডলিনী রূপে জীব শক্তি।

সর্ব-স্বরূপ ভগবান

কাহারও কাহারও মনে এই আশঙ্কার উদয় হয় যে ভগবান শম, দম, জ্ঞান রূপ সাত্ত্বিক ভাবগুলি না হয় হইলেন, কিন্তু রাজস ও তামস ভাবও তিনি, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? যাঁহাকে সর্বকল্যাণের আকর বলা হয়, তিনি আবার সর্বদুঃখের নিলয় রাজসিক ও তামসিক ভাবের মধ্যে থাকিবেন কিরূপে? স্থূল দৃষ্টিতে কথাটা সত্যই মনে হয় এবং এত অসামঞ্জস্য ভগবানে থাকে কিরূপে তাহা বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা শক্ত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন নহে। আমাদের শাস্ত্রে তাঁহাকে 'সর্ব-স্বরূপ' বলা হইয়াছে, সুতরাং ধর্মাধর্ম পাপপুণ্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা সমস্তই তাঁহাতেই আছে। তাঁহাকে বাদ দিলে কোন বস্তু নাই, যাহা কিছু সে সবই তাঁহার অভিব্যক্তি। কিন্তু তিনি এ সকলে থাকিয়াও তাহার অতীত রূপে বর্তমান। এই জন্য তিনি ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্ত; মনরূপ হইয়াও অচিন্ত্য; ইন্দ্রিয় স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়াতীত। বুদ্ধিস্থ আবার বুদ্ধির অতীত।

ভূতশুদ্ধি

ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সূক্ষ্মদেহে যে সংস্কার লাগিয়া থাকে তাহা কিছুতেই মুছা যায় না। সূক্ষ্মদেহে পৃথিবীতত্ত্বে ভয় উৎপন্ন হয়। জলতত্ত্বে মোহ উৎপন্ন হয়। বায়ুতত্ত্বে কাম এবং আকাশ তত্ত্ব হইতে লোভ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূত দ্বারাই জীবচিত্তে বহু মনোবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে আবদ্ধ করে। যোগাভ্যাস দ্বারা শরীর ও প্রাণ শুদ্ধ হইলে মন ও বুদ্ধিও বিশুদ্ধ হইয়া যায়। বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। সেইজন্য প্রাচীন আচার্য্যেরা ও ঋষিরা যোগাভ্যাসের জন্য সকলকে উপদেশ করিয়াছেন।

"যস্মিন্ সর্বমিদং প্রোক্তং ব্রহ্ম স্থাবর জঙ্গমং।
তস্মিন্ এব লয়ং যান্তি বুদ্‌বুদ্ সাগরে যথা।।"

ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মাতেই এই স্থাবর জঙ্গম যেন সাগরের তরঙ্গের মত উত্থিত হইয়া তাহাতেই আবার লয় হইয়া যাইতেছে।

প্রথম জীবের উৎপত্তি

প্রথমে কিছুই ছিল না, তখন একমাত্র ব্রহ্মাই ছিলেন, কিন্তু অন্য জ্ঞাতার অভাবে ব্রহ্মও না থাকার মতই হইয়া রহিলেন। এই অগোচর অনির্দ্দেশ্য বস্তু হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন, ইনিই প্রথম পুরুষ নারায়ণ কারণার্ণবশায়ী। কূটস্থরূপ কারণ সলিলে প্রথম দৃষ্ট হয়। তাঁহাকে ওঁকার মধ্যস্থ বলা যায়। এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরই ওঁকার এবং তাহার অতীত বিদেহ পুরুষের প্রকৃতি। তখনও প্রকৃতি পুরুষ সমরস ভাবাপন্ন। পরে তাহা পৃথক হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু তখনও উভয়ের মধ্যে চেতনাত্মক শিব ও জড়াত্মক প্রকৃতি বর্ত্তমান রহিলেন। তাহাই বিভক্ত হইয়া দুইটি রূপ গ্রহণ করিল। একটি পুরুষ অপরটি কন্যা। তখন তাহাদের সঙ্কল্পাত্মক মন ও মনের কার্য্য নির্ব্বাহক ইন্দ্রিয় গুলি রচিত হইল। পরে মন চঞ্চল হইয়া অভিমানাত্মক বৃত্তি বশতঃ পুরুষ আপনাকে ও কন্যাকে পৃথক রূপে দেখিতে লাগিল। পরে পুরুষের মন কন্যার প্রতি আসক্ত হইল এবং মনের চাঞ্চল্য দ্বারা নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ পুরুষ কন্যার গর্ভে আপনিই জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে সকল জীবের উৎপত্তি হইল।

ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার ও প্রাণ এই সমস্তই চঞ্চল ভাব। গতিশীল হইলেই আত্মার ঐ সকল উপাধি হয়। এই উপাধি বা আবরণ জীবের জীবত্ব। উপরোক্ত আবরণ চতুষ্টয়ই বন্ধনের কারণ। এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই জীবত্ব নাশ হয়।

ভব পারের কান্ডারী

আমি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে ক্লান্ত দেহে যখন তটিনীর কূলে বসিয়া কাঁদিতেছি, তখন আমার ব্যথার ব্যথী, আমার দরদী, আমার ভবপারের কান্ডারী আমার শ্রীগুরুদেব আসিয়া হাত ধরিলেন। বলিলেন, "উঠ বৎস এই তরীখানিতে, এই পথ অনুসরণ করিয়া নিজেই বাহিয়া চল, তুমি নিজ নিকেতনে পৌছাইতে পারিবে। ডর নাহি কুছো ডহরা না পুছো বাঁশরী শুনত কবিরা বাঢ় যায়।" পথের কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না, কোন ভয় নাই, ঐ যে তিনি তোমার হৃদয়ে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছেন। ঐ বাঁশী শুন আর তরী বাহিয়া চল। তাঁহার স্নিগ্ধ শান্ত মুখমন্ডলে যে করুণার দীপ্তি ফুটিয়াছে তাহা দেখিয়া বুঝিলাম স্বগৃহে আবার ফিরিয়া যাইতে পারিব বোধ হয়। তিনি অভয় দান করিয়া পথের সমাচার বলিয়া দিলেন আরও বলিয়া দিলেন পথে যাইতে যাইতে সেইখানেই পৌঁছিবে। এ রাস্তা সেইখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। এই রাস্তা "চলতা চলতা তাঁহা চলা যাঁহা নিরঞ্জন রায়।" আমি কত আশা করিয়া ভবনদীর সেই পথ ধরিয়া মার্গ অতিক্রম করিলাম। কিন্তু যত সহজে যত অনায়াসে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছিলাম, এখন আর তত সহজে তত দ্রুত গৃহপানে যাইতে সমর্থ হইতেছি না। কাহারা যেন প্রতি পদক্ষেপে আমাকে কত বাধা দিতেছে। আর নদী তো কত আঁকিয়া বাঁকিয়া বন্ধুর পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নদীর মাঝে মাঝে কত বাঁক, কত আবর্ত্ত, যত কাছে আসিতেছি তত পথ যেন বিকট বলিয়া বোধ হইতেছে। নদী যেন বিকট পথ ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়াছে। আমি এখন কোন্ পথ ধরিব? একই পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া কতদিক ঘুরিয়া আবার সেই একই স্থানে আসিয়া মিলিতেছে। যতবার এই বাঁকটা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস করি, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই বাঁকের মুখেই আসিয়া পড়ি। আমাকে ভীত সন্দিগ্ধ দেখিয়া আবার গুরু আসিয়া বলিয়া গেলেন, "পথ দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ? সোজা পাড়ি দাও, সোজা পাড়ি দিতে দিতে তোমার তরী আপনা আপনিই বাঁক অতিক্রম করিয়া ঠিক পথ দিয়া চলিয়া যাইবে। দূর হইতে যত আঁকা বাঁকা

দেখিতেছ চলিতে চলিতে তাহার সে বক্র গতি আর থাকিবে না, মার্গ সরল হইয়া আসিবে।'' অতএব হে সাধক, হে অমৃতের সন্তান, প্রাণপণ যত্ন সহকারে সদ্‌গুরুর আদেশ ও উপদেশ মত আজীবন ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে সাধন সমরে লাগিয়া থাক। শত বিপদপাতেও কখনও সাধন সমরে শিথিল প্রযত্ন হইও না। ভব পারের কাণ্ডারী পরম দয়াল পরম মঙ্গলময় গুরুদেবের অকৃপণ করুণা তোমার মস্তকে ঝরিয়া পড়িবে। ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জানিও অতবড় দয়াল পৃথিবীতে তোমার আর কেহ নাই। তোমার বাবা, তোমার মা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও অন্যান্য আত্মীয় বর্গ, তোমার এমন করুণাময় মঙ্গলকাঙ্খী, জীবন মরণের সহচর ঐ গুরু অপেক্ষা কেহই নহে।

সেই পরাৎপর গুরুদেবকে আমি শত সহস্রবার প্রণাম জানাইয়া মুক্ত কণ্ঠে বলি, কি বলি?

শ্রীমৎ পরম ব্রহ্ম গুরুং বদামি।
শ্রীমৎ পরম ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।।
শ্রীমৎ পরম ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি।।
শ্রীমৎ পরম ব্রহ্ম গুরুং নমামি।।

আচার্য্যের বাণী

নিত্যানিত্য বিবেক কি? কি নিত্য আর কি অনিত্য তা বিশেষ রূপে বুঝে দেখতে হবে। অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই। নিত্য বস্তুর নাশ নাই। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ হলে যে ভোগাদি হয় তাহাতে দুঃখই উৎপন্ন হয়। সে সব হয়, যায়, থাকে না। এই জন্য সে সব সুখভোগে পণ্ডিতেরা সুখভোগ বলে মনে করে না। আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান, যাই বল তা অবিনাশী, আর এ জগতের সমস্তই সুখ, দুঃখ, আপদ, বিপদ, রোগ, শোক সকলই বিনাশশীল অস্থায়ী, আজ আছে, কাল নাই।

জ্ঞানীগণ নিঃসন্দেহে দেখেছেন জগতের সমস্তই অনিত্য, টাকা কড়ি, ঘরবাড়ি, স্ত্রী, পুত্র এমন কি নিজ দেহটি পর্য্যন্ত অনিত্য। নিত্য কেবল ভগবান। ইহা সত্য। হে ঈশ, যদৃচ্ছাক্রমে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম ও ইন্দ্রিয় পটুতা প্রাপ্ত হয়ে যে ব্যক্তি স্বার্থে প্রমত্ত হয়, তোমার মায়ায় আবৃত হয়ে তার বয়ঃক্রম গত হয়, এমন দুর্লভ জ্ঞানবুদ্ধিময় মানব জন্ম পেয়ে যে জন স্বার্থ লোভে মত্ত হয়ে থাকে, আমি আমি, আমার আমার, এই স্বার্থ বোধে উন্মত্তের ন্যায়, ক্ষিপ্তের ন্যায় শুধু স্বার্থ রক্ষার্থে ছুটে বেড়ায়, সেই ব্যক্তির সমস্ত জীবনটা তোমার মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে বৃথা গত হয়ে যায়। কেবল কামিনী কাঞ্চনে স্বাহা, আহুতি দিতে দিতে জীবন গত হয়। বৃথা সে জীবনে! সে জীবনে ধিক্। দেহে অহং বুদ্ধি, দেহ সম্বন্ধীয় পুত্রাদিতে মমতা, মম এই ভাব, আমার আমার এই বোধ জন্মিয়ে দিয়ে এইরূপ সমস্ত জগৎকে তুমি স্নেহপাশেই বন্ধন কর। এই যে স্নেহপাশ, মমতাপাশ, আমার আমার বোধ এই বন্ধন দিয়ে তুমি সকলকে মাটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছ। এই আমি-আমার জীবের মহাবন্ধন। "কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধেছে সংসার, দাসখত্ লিখে রেখেছে।" ক্ষণস্থায়ী তুচ্ছ ধনজন ঐশ্বর্য্যকে চিরস্থায়ী বলে মনে করে। যা আজ আছে কাল নেই, সেইটি ধরে থাকি। দেহটিকেই আমি বলে ধরে থাকি। আমি যে কে, কি বস্তু তা কখনও একবার ভেবে দেখিনা। সংসার মায়া, সংসারের আহার বিহার, অন্নপান, স্ত্রী-পুত্র তার চক্ষুকে অন্ধ করে রাখে। এমন সুন্দর যে পৃথিবী অতুল শোভার ভান্ডার, মধু বর্ষণ করছে, চারিদিকেই মধু, মধু, মধু! তার দিকে, সেই পরাপ্রকৃতির দিকে চোখ ফেরাতে পারে না। আমি যে কি বস্তু, আমাতে যে কি মহাবস্তু রয়েছে, এখনই আমার মধ্যে মহারত্ন রয়েছে, তা আমি দেখতে পেলাম না। হায়, হায়, আমি রত্ন ফেলে কাঁচখন্ড কুড়াতে, মাটি কুড়াতে ব্যস্ত হলাম। আমি কে, আমাতে কি মহাবস্তু রয়েছে, মনরে তাই দেখ।

"আমি আমি করি বুঝিতে না পারি,
কে আমি আমাতে আছে কি রতন।।
কোন শক্তি বলে বেড়ায় চলে বলে,

কার অভাবে হবে এ দেহ পতন।।
দেহ মাঝে আছে প্রাণেরই সঞ্চার,
তাহাতেই বলি আমি ও আমার।।
প্রাণ গেলে চলে, হবে শবাকার,
কেবাকার সব নিশার স্বপন।।"

প্রাণকে চেন, প্রাণকে জান, প্রাণকে মান। প্রাণই তুমি, প্রাণই আমি, প্রাণই তিনি, প্রাণই জগৎ। "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।" প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। গীতা পড়েছি, আত্মা আত্মা শুনেছি। কন্ঠস্থ করেছি, আত্মা যে কি বুঝি নাই। আত্মদর্শন করি নাই। ঐ আত্মাই প্রাণ। আমি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছি, কিন্তু ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ত করি নাই। মাটির ঠাকুর মাটিই আছেন। ঠাকুরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তবেই ঠাকুর জাগ্রত হবেন, কথা কবেন। আমি নিজেরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি নাই। কেবল মরব মরব নিশ্চয় মরব এই বলেই বেড়াই, মরার ভাবনাই ভাবি। প্রাণ যে কি বস্তু, অজর-অমর তা ত ভাবিনা। কেবল গীতাই পড়ি, প্রাণে দৃষ্টি পড়ে নাই। প্রাণকেও দেখি না, দেখি কেবল সম্মুখে মৃত্যু বাঘের মত মুখব্যাদান করে আছে। মনরে, দেহ দেহ করে মর কেন? প্রাণকে দেখ, প্রাণকে মান, আত্মাই প্রাণ, প্রাণ স্বরূপ ঈশ্বর, এক প্রাণেতেই আমার ও ঈশ্বরের মিলন হয়ে আছে। তাই পুরুষাকার ও ঈশ্বর একত্রেই মিলিত হয়ে আছে। পুরুষাকারের মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। প্রাণরূপে বিদ্যমান তিনি, সর্বত্র সমান। প্রাণই ঈশ্বর, প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই ব্রহ্মা, সমস্ত লোক প্রাণেতেই ধৃত আছে, সমস্ত জগৎই প্রাণময়। প্রাণ সমুদ্রে আমি ডুবে আছি, মরব কি রে? ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, নিজেরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর, তবে প্রাণে প্রাণে মিলন হবে। দেখ মাটির ঠাকুরে প্রাণ, পাথরের ঠাকুরে প্রাণ, নারায়ণ শিলায় প্রাণ, অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যে সবিতৃমন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ। তা না দেখতে পেলে পৌত্তলিকতাই সার হবে। "নুনের পুতুল গলে সিন্ধুজলে যথা, প্রাণ সিন্ধু মাঝে অহংবুদ্ধি গলে তথা।" সমুদ্র জল হইতে উৎপন্ন নুন তাতে পুতুল

গড়ে আবার সমুদ্র জলে ফেললেই যেমন সে গলে যায়, ঠিক সেইরূপ প্রাণসমুদ্র হইতে আভাসে উৎপন্ন যে অহংবুদ্ধি আমিত্ব তা আবার প্রাণ দর্শন করলেই, .প্রাণ সমুদ্রে অহংবুদ্ধিকে ফেললেই সে গলে যাবে। এই প্রতিষ্ঠা দ্বারা ঠাকুরে ও ভক্তে মিলন হবে। ঐ প্রাণের মিলনই যথার্থ প্রেম; যথার্থ ভালবাসা। যথার্থ প্রাণের টান।

"জড়েতে যা আকর্ষণ, প্রাণে তা মিলন আসা,
বিশ্বে বিশ্ব ধরি টানে, প্রাণে প্রাণে ভালবাসা।।"

জড়ের সহিত জড়ের আকর্ষণ হয়, প্রাণের সহিত প্রাণের আকর্ষণের নামই ভালবাসা।

"ভাল বাসা বড় খাসা, হলে বিদ্যমান
দেহে নয় মনে নয়, প্রাণে গাঁথা প্রাণ।।"

তুমি আমি এক প্রাণ, এই প্রাণদর্শনই প্রেমের মিলন। ওগো দম্পতি পরস্পরকে চেন, ইহকালে আনন্দ, পরকালে আনন্দ চিরানন্দ লাভ হবে। চির মিলন হবে।

"মরণের পরে যদি নাহি হয় দর্শন,
তবে কেন এত আশা, ভালবাসা কি কারণ।।"

এই ভালবাসার সকল নদী ভালবাসার মহাসাগরে গিয়ে মিশে যাচ্ছে।

"শুকাইত ভালবাসা সুধাস্রোতা নদী
অন্তরালে সুধাসিন্ধু না থাকিত যদি।।"

এই ভালবাসার সুধাসিন্ধুই ভগবান। ভালবাসার মূর্ত্তিই কৃষ্ণ, খৃষ্ট, ভগবান শ্রীচৈতন্য।

"ভালবাসার মূর্ত্তিখানি প্রেম দিয়ে তা গড়া।
ভক্তের ভাগ্যে হয়রে যেন অনলে পতঙ্গ পড়া।।"

দেহের মিলন তুচ্ছ, মনের মিলনও তুচ্ছ, যদি প্রাণের মিলন না হয়ে থাকে, যদি পরস্পর প্রাণ দর্শন না হয়ে থাকে। "প্রাণতত্ত্ব আগে, শেষে প্রেমতত্ত্ব জাগে।।" গীতাতে যে আত্মতত্ত্ব আছে, উহাই প্রাণতত্ত্ব। প্রাণায়ামের যথার্থ অর্থই প্রাণের বিস্তার প্রাণের প্রসার জীবে জীবে প্রাণ দর্শন, ভালবাসার বন্ধন।

"কিবা সে বন্ধন যার মুক্তিতেই দুখ্?
কৃষ্ণপ্রেমের বন্ধন সে মুক্তি চেয়ে সুখ্।।"

এই ভালবাসার নিত্য সত্য ভালবাসার চিরবন্ধনই ভব বন্ধন হতে মুক্তি দেয়।

"কত ভালবাসাবাসি আত্মার আত্মীয় তুমি
তুমি আমি অবিনাশী।
কুটুম্বিতে নয় ত সখী, নয় দুদিনের দেখাদেখি
চির সুখে আমরা সুখী অনন্ত আকাশ বাসী।"

চলচিত্র বায়স্কোপে চিত্র দেখেছি। প্রাণ যে কি বস্তু, তা তো দেখতে পেলাম না। হে ভগবান, আমার জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়ে দাও যেন আমি তোমায় দেখতে পাই। আমি যে তোমারই।

"তোমারই খেলনা আমি, তোমারই চরণ ধূলি
ধূলাতে পতিত আমি, স্নেহ কোলে লও তুলি।।
তোমারই হাতের গড়া তোমারই বসন পরা
তোমারই মুখেতে বলি তোমারই শেখান বুলি।।"

তোমার হাতের গড়া পুতুল ভিন্ন আমি কিছু নয়। ভেঙ্গে দিও, বুকে নিও যখনই বাসনা হয়। ভগবান তাঁর অংশ দিয়ে গড়েছেন, ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর অংশ তাঁর বুকে মিশিয়ে নেবেন। তখন সৈন্ধবের পুতুল সিন্ধুজলে মিশে যাবে। গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা জলের কলসী ভাঙ্গবে। ভালই হবে। গঙ্গাজল গঙ্গা পাবে সুখের সীমা থাকবে না। আপনার চির অস্তিত্বকে যে জানতে পেল না, ধরতে পারল না, তার কেবল আসা যাওয়াই সার হল। "কেন সে এল মরতে, মৃত্যু কীটের গর্তে।" জীবনে বুঝা চাই, ভাল করে বুঝা চাই যে মৃত্যুটা সত্য সত্যই কিছু নয়, কেবল জুজুর ভয়। সাধুগণ বলেন, "দেহ গেলে আমরা তুষ্ট, ফুল ঝরলে ফল পুষ্ট।" ফুল গেল, ফল বেরুল। আমাদের দেহ গেল অমনি প্রাণচৈতন্য ফল রূপ পুষ্ট হয়ে বের হবে। এই দেহের মধ্যেই প্রাণচৈতন্য রয়েছেন। সকলেই জানছে সেই প্রাণচৈতন্যই আমি। দেহ আমি নয়। "দেহ যাবে পুড়ে আমি যাব উড়ে।" নির্বোধ জীব প্রাণকে না জানতে পেরে দেহের গতি কি হবে? এই ভেবেই অস্থির। এ জন্য প্রাণ কি বস্তু তাই বুঝলেই সমস্ত পাপ দুঃখ দূর হয়ে যায়। আমরা কেবল চিনেছি দেহ, দেহ যে কেবল মাটির ঢিবি, মাটি হয়ে যাবে তা জানি না। রে জীব, আছে অমৃতের পথ, আছে অমৃতের দেশ। সর্বস্ব দিয়ে এই প্রাণের ভজনা কর। শ্রীকৃষ্ণ ভজন এই প্রাণের ভজন, আত্মার ভজন শিক্ষা দিয়াছেন। আত্মদর্শনই গীতা পাঠের ফল। গীতা পাঠ করে করে যদি প্রাণে দৃষ্টি না পড়ল তবে ভস্মে ঘি ঢালা হল।

"রে জীব কত আছে কর্মভোগ।
তাই তোমারে বলি।।
বারেক বিশ্রাম নাই এখন ভুগছি তাই,
আহা নিত্য আত্মসুখে দিয়া জলাঞ্জলি।।"

দশমহাবিদ্যা

১। **কালী** ঃ মহাশক্তি, মহাবিদ্যা, অবিনাশী সৎমূর্ত্তি, সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী ত্রিগুণময়ী, মহাকালের শক্তি, অনন্ত কাল-রূপিণী কালজ পদার্থ বিলীনকারিণী, সংহারিণী কার্য্য রূপা প্রকৃতি অনন্ত বিশ্বমূর্ত্তি (কার্য্য), আধার মহাকাল। অন্যান্য তত্ত্ব শিব-শক্তি তত্ত্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

২। **তারা** ঃ চিৎশক্তি, জ্ঞান-মূর্ত্তি তত্ত্বময়ী কারণরূপা প্রকৃতি, অনন্ত দেশমূর্ত্তি - দেশজ পদার্থ বিলীনকারিণী সংহারিণী অনন্ত ব্রহ্মান্ড মূর্ত্তি, গলে নর কপালের মুন্ডমালা (কারণ রূপী) অনন্ত ব্রহ্মান্ড নীলবর্ণা, ইঁহার একনাম নীল সরস্বতী, আধার মহেশ্বর। কালী ও তারাতে সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে। এই জন্য তাহাদের নাম মহাবিদ্যা। অবশিষ্ট আটটি বিদ্যা কালী ও তারার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বিশেষ অবস্থা।

৩। **ষোড়শী** ঃ আনন্দ শক্তি, কালী তারার আনন্দ ভাবটিই ষোড়শী মূর্ত্তি। ইঁহার আর এক নাম রাজ-রাজেশ্বরী। পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চ দেবতা এই আনন্দময়ীর ধ্যানে নিমগ্ন। তদুপরি গুণাতীত পুরুষের নাভি কমলে ইঁহার আসন। ষোড়শ বর্ষে রমণীর পূর্ণত্ব হয়, এ জন্য আনন্দময়ী মা ষোড়শী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মহা শক্তির কোন সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, এ জন্য ষোড়শী চির যৌবনা, ইহার অন্য আর এক নাম ত্রিপুরা সুন্দরী।

৪ **ভুবনেশ্বরীঃ** মায়ের শান্ত ভাবটিই ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি। ইঁহার আধার বিশ্বকমল, ইনি শক্তিরূপা শান্ত শক্তি।

৫। **ভৈরবী** ঃ চন্ডী শক্তি, ইঁহার ভাব প্রচন্ড বা উগ্র,

ইঁহার সহকারিণী প্রচন্ডতাময়ী আটটি নায়িকা আছেন। উঁহারাই তন্ত্রোক্তা অষ্ট নায়িকা বা অবিদ্যা।

৬। **ছিন্নমস্তা ঃ** ইনি মায়ের বিশেষ প্রচন্ড বা উগ্রশক্তি। ছিন্নমস্তা প্রচন্ডা বিশ্বপালিকা শক্তি। মায়ের অধিকাংশ মূর্ত্তিতেই প্রলয়ের ভাব বিদ্যমান থাকিলেও বিশেষভাবে পালিকা শক্তির বিকাশ হইয়াছে। জগতের প্রত্যেকেই জগৎব্যাপী বিরাট দেহ হইতেই আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। একটি জীব অপর একটি জীবকে আহার করিয়া পুষ্ট হয়। এই ভাবটিই জগতের সর্বত্র সতত ক্রিয়াশীল। ইহাই ছিন্নমস্তা তত্ত্ব। ইহাই আপনার মুন্ড কাটিয়া আপনিই রক্তপান করতঃ ভোগ করা। ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ তিনটিই জগৎ পালনের হেতু। একটির অভাব হইলেই অন্যগুলি বৃথা হয়। এই তিনটি ভাব ছিন্নমস্তার তিনটি রক্তের ধারা। এই জগতে ভোক্তার অভাব নাই, ভোগ্যেরও অভাব নাই, কিন্তু ভোগ না হইলে ভোক্তা বা ভোগ্যের কিছুই মূল্য নাই। এক ব্যক্তি ইচ্ছামত বহু ভোগ্য দ্রব্য আহার করিতে পারে, কিন্তু তাহা যদি সে পরিপাক করিতে না পারে, তবে তাহার আহারের মূল্য নাই। সুতরাং ভোগই জগৎ পালনের হেতু। এই জন্যই ভোগ ধারায় ছিন্নমস্তা নিজে পান করিতেছেন। আর তাঁহারই একাত্ম দুই শক্তি ভোগ্য ও ভোক্তা এই দুটি ধারা পান করিতেছেন। জগতের ভোগ শেষ হইলেই প্রলয় হয়।

৭। **ধূমাবতী ঃ** মায়ের মহা প্রলয় মূর্ত্তি। ভোগ শেষ হেতু জরাজীর্ণ বৃদ্ধ লম্বিত পয়োধরা, পক্ককেশ, যমের কাকধ্বজ প্রলয় রথে আরূঢ়া। ইতি বিশ্বোদরী 'কুলা' হস্তে বিশ্বের বীজ সংগ্রহ করতঃ আপনার বিরাট মুখ গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছেন। সমস্ত বিশ্ববীজই ইঁহার উদরে লীন হইতেছে।

৮। **বগলা ঃ** ইনি মায়ের আর একটি প্রচন্ড উগ্রচন্ডা

মূর্ত্তি, বগলা বেদ বিরোধী অসুর বিনাশিনী মূর্ত্তি। অধর্ম বা অজ্ঞান নাশে ধর্ম বা জ্ঞানের উৎপত্তি।

৯। **মাতঙ্গী ঃ** অজ্ঞান রূপা অবিদ্যানাশিনী জ্ঞানরূপিনী বিদ্যামূর্ত্তি। মায়ের করেতে বিবেক অসি এবং বৈরাগ্য দন্ড। যেখানে অজ্ঞানতা অধর্ম নাশ হইয়া ধর্ম ও জ্ঞানের বিকাশ হয়, সেইখানেই ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ হয়।

১০। **কমলা ঃ** অষ্ট ঐশ্বর্য্যশালিনী আনন্দদায়িনী মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি। সর্বত্রই মায়ের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ, তাই কমলা আধার কমল বাসিনী, বিশ্বব্যাপিনী। দশবিধা প্রকৃতি শক্তি দশমহাবিদ্যার সমষ্টি রূপই দশদিক ব্যাপী দশভূজা চন্ডিকা ইনিই সর্বদেবময়ী ও সর্বশক্তি স্বরূপিনী মহাদেবী দুর্গা।

শাস্ত্রবাক্য

প্রণব বা ওঁকার (অ.উ.ম) হইতে চতুর্দশ বিদ্যা, মন্ত্র, পূজা, তপস্যা, ধ্যান, কর্ম, অকর্ম এই সমুদয় সমুদ্ভূত হইয়াছে।

বেদাদি শাস্ত্রসমূহ ও পুরাণাদি গ্রন্থনিচয় সামান্য কুলটার ন্যায় সকল লোকের নিকটে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যাহা শাম্ভবী বিদ্যা তাহা কুলকামিনীর ন্যায় গোপনীয়।

সমুদয় বিদ্যা, সকল দেবতা ও সমুদয় তীর্থই দেহে সদা অবস্থিত রহিয়াছে। একমাত্র গুরুর উপদেশ দ্বারা ঐ সকল জ্ঞান লাভ হয়।

কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি, ফুলের মধ্যে গন্ধ, জলের মধ্যে যেমন অমৃত আছে, সেইরূপ দেহের মধ্যে পাপপূর্ণ শূন্যদেবতা

অবস্থিতি করেন।

ইড়া নাড়ী ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা নাড়ী যমুনা এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী বলিয়া কথিত হয়।

সমস্ত বিশ্বই এই দেহের মধ্যে আছে, তন্মধ্যে সাকার বস্তু লয় হইয়া থাকে; কিন্তু নিরাকার পদার্থের কিছুতেই বিনাশ নাই।

শক্তি পাতালে, শিব ব্রহ্মাণ্ডে, আর কাল (মৃত্যু) অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। সেইকারণ কাল হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে, সমুদয় বিদ্যাও লোকের মুখে মুখে রহিয়াছে কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান কখনও উচ্ছিষ্ট হইবার নহে।

বাহ্যিক ধ্যানকে ধ্যান বলা হয় না। মন শূন্যময় হইলে তবে প্রকৃত ধ্যান বলা হয়। সেই ধ্যান দ্বারা সুখ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

যে জ্ঞান দ্বারা বাক্য, কর্ম ও মন লয় প্রাপ্ত হয়, এবং স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রার ন্যায় বিনা অবলম্বনে যে জ্ঞান হইয়া থাকে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে।

যে জ্ঞানের সাহায্যে একাকী, নিস্পৃহ, শান্ত, চিন্তাশূন্য ও নিদ্রা-বিবর্জিত এবং বালকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হয় তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে।

আমি সৃষ্টি, আমি কাল, আমি ব্রহ্মা, আমি হরি, আমি রুদ্র, আমি শূন্য এবং সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন ব্রহ্ম।

আমি সর্বাত্মক, আমি নিষ্কাম এবং আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ স্বভাব, নির্মল মনুষ্যরূপ যে ব্রহ্ম তাহাও আমি, এতে সন্দেহ নাই।

যাঁহার প্রসাদে পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে সেই গুরুদেবের তুল্য মিত্র কেহই নাই। কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, কি বন্ধু, কি স্বামী, কেহই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না।

যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কি বিদ্যা, কি তীর্থ, কি দেবতা, কিছুই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না।

যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবীমধ্যে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা দ্বারা ঐ গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করতঃ তাঁহার ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

বিশেষরূপে গোপনীয় যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা একমাত্র ভক্তমাত্রকেই প্রদান করা যাইতে পারে; সদ্‌গুরু অপর কাহাকেও উহা প্রদান করিবেন্‌ না।

দয়াভাবে ব্রহ্মা, শুদ্ধভাবে বিষ্ণু, অগ্নিভাবে রুদ্র,, ইহারাই তিনগুণ, তিন দেবতা।

পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া থাকে।

বেদান্তাদি শাস্ত্রমতে একমাত্র জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর সমস্ত পদার্থই অবিদ্যা বা মায়ার কার্য্য বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এতাবৎ বিদ্যাও মায়ার কার্য্য, সুতরাং বিদ্যা দ্বারা যদিও অবিদ্যা নাশ হইতে পারে কিন্তু মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। ইহার উত্তর এইরূপ -

যেরূপ নির্ম্মলীবীজের রেণু জলের মলিনতা দূর করিয়া পরে

আপনিও বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ জ্ঞানাভ্যাস বলে অজ্ঞান কলুষরূপ জীবত্ব ভ্রান্তিকে নিরাকৃত করিয়া আত্মতত্ত্বের নির্মলতা সাধন পূর্বক জ্ঞানস্বরূপ বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়।

হে কৃষ্ণসূর্য আমরা তোমার চির যৌবন সম্পন্ন রশ্মিভিন্ন আর কিছুই নয়।

তুমি ডাবের জল আমরা খোসা।
তুমি সূর্য আমরা ঊষা।
আমরা রবির অংশ রবিকর-বংশ
আমরা তোমার করাঙ্গুলি, ফোটাই সংসার পদ্মগুলি।
নৃত্যগীতই কর্ম মোদের ভাবনা চিন্তা জানি না।
নব যৌবন ধর্ম মোদের বৃদ্ধ হওয়া মানি না।।

জ্ঞাননিষ্ঠ উত্তম পুরুষ ধর্মজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয় হইলেও যোগাভ্যাস ব্যতীত তিনি দেবতা হইলেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। ভাগবতে আছে, তপস্যা মন্ত্রাদিতে যে সিদ্ধি হয় সে সমস্তই যোগদ্বারা।

যোগলাভ করিবার জন্য শ্বাস জয় করিতে হইবে ইহা একবাক্যে সকল শাস্ত্রই উপদেশ দিয়াছেন। শ্বাসজয় ব্যতীত মনস্থিরের আর কোন উপায় নাই। এই শ্বাসজয় প্রাণায়াম সাধনা ব্যতীত হয় না। প্রাণায়ামের অর্থও তাই। শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। শ্বাস নির্গত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে না অথবা ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে নির্গত হইবে না। এই কুম্ভকের অবস্থাই প্রকৃত হবন ক্রিয়া। এই রূপ বিধিপূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা নাড়ী চক্র বিশোধিত হয়, বিশোধিত হইলেই সুষুম্নামুখ ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু তন্মধ্যে প্রবেশ করে। সুষুম্নায় প্রাণ প্রবেশের ফলে প্রাণ সুষুম্নাবাহিনী হইলে মনও শূন্যেতে প্রবেশ করে। তখন যোগীর সমস্ত কর্ম উন্মূলিত হইয়া যায়। যোগী আর কোন কর্মে বাঁধা পড়েন না। এই প্রাণ জীবিত থাকিতে

(অর্থাৎ চঞ্চল) ও মন মৃত (অর্থাৎ স্থির) না হইলে মনের প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তিই হইতে পারে না। শাস্ত্রাদি পুঁথি পাঠ করিয়া যে জ্ঞানের কথা বলা হয়, তাহার মুল্য কিছুই না। তাই মহাত্মা গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন, যতদিন প্রাণবায়ু মধ্যমার্গ সুষুম্নাতে প্রবেশ না করে এবং প্রায় রুদ্ধ হইয়া যতক্ষণ বিন্দু স্থির না হয় এবং যতদিন ধ্যানদ্বারা তত্ত্ব সমূহ সাক্ষাৎকার না হয়, ততদিন জ্ঞানের কথা বলা দাম্ভিকতা এবং মিথ্যা প্রলাপ মাত্র। তপস্যা, তীর্থযাত্রা, ব্রত, দানাদি কোন কার্য্যই প্রাণায়ামের ষোড়শ ভাগের একভাগও ফলদান করিতে পারে না।

যিনি অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার দুগ্ধের প্রয়োজন হয় না। আর যিনি জ্ঞানালোক সহায়ে পরম জ্ঞেয়রূপী পরাৎপর ব্রহ্মবস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাঁহার বেদাদি শাস্ত্রে কোন প্রয়োজন হয় না।

যেমন তিলের মধ্যে তেল, দুধের মধ্যে ঘি, ফুলের মধ্যে গন্ধ, ফলের মধ্যে রস, সেইরূপ দেহমধ্যে পরমাত্মা সর্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন। যোগীরা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ইঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন।

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থপূর্ণ এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া কল্পিত, ইহার কিছুই সত্য নহে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। এই প্রকার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই আত্মানন্দরূপ প্রকৃত সুখলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

আমি, তুমি ইত্যাদি বিবিধ অলীক নামরূপ ত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মকে একমাত্র যথার্থ বস্তু বলিয়া হৃদয়ের সহিত অবধারণ করিতে পারিলেই কর্মবন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

শত শত উপবাস, জপ বা হোমাদি করিলেও জীবের মুক্তিলাভ হয় না, কিন্তু আমিই ব্রহ্ম এইমাত্র জ্ঞানযোগ হইলেই জীব পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়া মুক্ত হন। এই সংসারে ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই, যে যোগী এই প্রকার অবগত আছেন, তিনি অনায়সেই পাপ ও পুণ্য এই উভয়কেই দহন করেন। তাঁহার নিকট মিত্রামিত্র, সুখ-দুঃখ, ইষ্ট-অনিষ্ট, শুভ-অশুভ, মান-অভিমান, নিন্দা ও প্রশংসা সকলই সমান বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

ভক্তের প্রার্থনা

ভগবান কি সত্যই নিষ্ঠুর, তিনি কি নির্দয়, তিনি কি আমার প্রাণের আকুল আবেদন অগ্রাহ্য করিতে পারেন। আমি যে কত দুঃখ, কত কষ্ট, কত প্রিয়জন বিয়োগ ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়া এবং অভাব অভিযোগে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি তিনি তবু আমার ডাকে সাড়া দেন না কেন? আমার আকুল প্রার্থনায়, আমার মর্ম্মবেদনায় সাড়া দেন না কেন? কেন তিনি আমার আঁখিজল মুছাইয়া দেন না? কেন আমার সন্তপ্ত হৃদয়ে তাঁহার শান্তি বারি ঢালিয়া দেন না? তবে তাঁহাকে কি করিয়া পতিতপাবন বলিব। তিনি যে গীতায় বলিয়াছেন আমি সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া সকলের নিকটেই আছি। তবে কি তাঁর কথা মিথ্যা?

না না তাঁর কথা মিথ্যা নয়, তাহা কখনও হইতে পারে না। যতটুকু দুঃখ তিনি দেন, পরে তাহার শতগুণ সুখ দিয়া থাকেন, যতটুকু ভয় দেন পরে তাহার শতগুণ অভয় দিয়া থাকেন, যতটুকু বন্ধন দেন, পরে তাহার শতগুণ মুক্তি দিয়া থাকেন। শেষে নিজ স্বরূপে তুলিয়া লন। কারণ তিনি যে সর্বসুখের আকর, তিনি যে প্রেমময়, তিনি যে স্নেহময়, তাঁর অযাচিত করুণার অন্ত নাই। আমরা মূর্খ, আমরা অবোধ, সাধন ভজন বিহীন, ভুলেও একবার দিনান্তে

তাঁহার নাম স্মরণ করি না। কেবল বৃথা আমোদ প্রমোদ বাজে গল্প ইত্যাদিতে মোহিত হইয়া অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাই কেমন করিয়া শুনিব বা বুঝিব তিনি বলিতেছেন - "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে ত্বাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িয্যামি মা শুচঃ।" "সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তি মৃচ্ছতি।"

আমরা যদি দিনান্তে একবারও ক্ষুধার্তের অন্ন চাহিবার মত, পিপাসার্থীর জল চাহিবার মত তাঁহাকে একবার বলিতাম, "ওগো আমি তোমার, আমি তোমাব্যতীত আর কাহাকেও জানি না, তোমার ঐ শ্রীপাদপদ্মে আমাকে স্থান দাও প্রভু। এতদিন ভবের ধূলা খেলা লইয়া তোমাকে ভুলিয়া 'অহংসর্বস্ব' হইয়া সংসারে বৃথাই আমোদ প্রমোদ ও বাজে গল্পে আমার অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি, আজ আমার ঘুম ভেঙেছে, আজ আমি তোমার দয়ার ভিখারী। আমাকে কি তোমার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দেবে না প্রভু? আমি হাজার অপরাধে অপরাধী হইলেও যে তোমারই সন্তান।"

এইভাবে কাতরে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি দশহাত বাড়াইয়া বলিবেন, "ওরে ভয় নাই, ভয় নাই, "সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।।"

(ঠাকুরের নিজ ভাষায় বর্ণিত)

হিন্দুধর্ম

এক্ষণে হিন্দুধর্ম কি? তাহাই আলোচনা করা যাউক। জ্ঞান-মুক্তিই হিন্দুধর্ম কি? দেবদেবী পূজা-পৌত্তলিকতাই কি হিন্দুধর্ম? বস্তুতঃ হিন্দু ধর্ম বিন্দু নহে, সিন্ধু বিশেষ। সে জন্য এক কথায় হিন্দু ধর্মের কোন সংজ্ঞা করা যায় না। যে ধর্ম মাটির ঠাকুর কে ব্রহ্মে

পরিণত করে, এবং পরব্রহ্মকে এনে মাটির ঠাকুরে বসায় তাই হিন্দুধর্ম। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত একখানি জ্ঞানপূর্ণ রেলগাড়ি চলেছে তুফান মেলের মত, তার নাম সনাতন হিন্দুধর্ম। মাটির ঠাকুর পূজা হতে ব্রহ্মে যায়, আবার ব্রহ্ম হতে পুতুলে আসে যে তুফান মেল, তাকে বলে হিন্দুধর্ম। মেলট্রেন যখন যায়, তখন ভোঁশ ভোঁশ শব্দ করতে করতে যায়। আমাদের হিন্দু ধর্ম মেল ট্রেনের শব্দ হচ্ছে "ইদং ব্রহ্ম, ইদং ব্রহ্ম।" এইত ব্রহ্ম, এইত ব্রহ্ম! হিন্দুধর্মের বৈদান্তিক ও যৌগিক মেল ট্রেন ব্রহ্ম হতে ছাড়ে। ইদং ব্রহ্ম ইদং ব্রহ্ম শব্দ করিতে করিতে সমস্ত উর্দ্ধলোক ভেদ করে, সে ট্রেন মাটিতে এসে পুত্তলিকা পূজার স্থানে এসে বলে ইদং ব্রহ্ম, ইদং ব্রহ্ম। পুতুল পূজায় যে ব্রহ্ম না দেখে সে হিন্দু নহে।

দেবদেবী মাত্রে ব্রহ্ম যে জন না মানে
হিন্দু ধর্ম সুধা সিন্ধুর বিন্দু নাহি জানে।।

যিনি দেবারাধ্য চিন্তাতীত নির্গুণ ব্রহ্ম, যাঁকে যোগী ঋষিগণ ধ্যানযোগেও দেখতে পান না, সেই সূক্ষ্মতম, স্বচ্ছতম পরমাত্মাই শ্রীবৃন্দাবনের বংশীপটে নৃত্য করছেন। বেদান্তের ও যোগের তুফান মেল ধানের ক্ষেতে, মা লক্ষ্মীর মাঠে, বটতলার মা ষষ্ঠীর নিকট দিয়ে, ডাকাতে কালীর দরজা দিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে প্রবেশ করল। আর ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দে বাষ্প উদ্গীরণ করে বলতে লাগল "ইদং ব্রহ্ম ইদং ব্রহ্ম।" এইত ব্রহ্ম এইত ব্রহ্ম। এই হল সনাতন হিন্দু ধর্ম। এই ধর্ম কিছুই বাদ দেবে না, সব নিয়ে এক 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হয়ে আছে। শ্রীমদ্ভাগবত এই বেদান্তের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন এবং শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে বেদান্ত দেখাচ্ছেন। ব্রহ্মের মধ্যে পুতুল এবং পুতুলের মধ্যে ব্রহ্ম দেখিয়ে দিচ্ছেন। হিন্দুধর্মে সর্বপূজার প্রথমে আচমন করেন। আচমনের অর্থই ব্রহ্ম দর্শন। এই আচমনে ব্রহ্ম ভাবনা করে নিয়ে তারপর অন্য পূজাদি করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ও ভাগবত গীতাই হিন্দুধর্মের চূড়ান্ত সার তত্ত্ব দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেই পূজা করার বিধি দিয়েছেন। "সর্বং প্রাণময়ং জগৎ।" সমস্ত জড়ই চৈতন্য পিন্ড। বাষ্পও যা বরফ শিলাও তাই। হিন্দুধর্ম কি? জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে যে শ্রীমদ্ভাগবৎ ও ভাগবৎ গীতাই হিন্দুধর্ম। পুরাকালে পন্ডিতেরা বলিতেন বেদ্ বেদান্তই হিন্দুধর্ম, এক্ষণে বেদবেদান্ত পাঠ সাধারণে অপ্রচলিত, সে জন্য শ্রীমদভাগবত ও ভাগবত গীতাই বর্তমান সময়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম। এই হিন্দুধর্ম বলে - "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।" ইদং ব্রহ্ম, ইদং ব্রহ্ম, ইদং ব্রহ্ম, ওঁ মধু, ওঁ মধু।
(তপোবন)

অভিমান

হে বন্ধু, আজ যদি জাগিয়া থাক, আর তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই এমনই হয় তবে তাঁহার উপর অভিমান করিও না। তিনি তোমার দ্বার হইতে বহুদিন ব্যথিত চিত্ত লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। তিনি তার জন্য তো একটি দিনও অভিমান করেন নাই। তিনি কত অপেক্ষা করিয়াছেন কিন্তু কখনও অভিমান করেন নাই। আজ তুমি জাগিয়া উঠিয়াছ আর তিনি আসিতেছেন না দেখিয়া তাঁহাকে সন্দেহ করিও না। আজ তাঁহার বিলম্ব হইতে পারে; কিন্তু তুমি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছ অথচ তিনি আসিবেন না ইহা হইতেই পারে না।

মুক্তি

মুক্তির জন্য ভাবিতে হইবে না। যেদিন তাঁর বাঁশরী শুনিতে পাইবে, সেদিন সব দরজাই খুলিয়া যাইবে। বন্ধন মায়া কিছুরই জন্য তখন আর ভাবিতে হইবে না। জগতের সব আকর্ষণই তখন ছিন্ন হইয়া যায়, সব বাঁধনই তখন খসিয়া পড়ে। প্রবল বন্যা যখন দুকূল ছাপাইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলে, তখন তাহার সেই প্রবল টানে, মোটা মোটা কাছিগুলো পট্ পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া যায়। তেমনি

ধন-মান-কুল-অভিমান যত শক্তই হোক, প্রেমের বন্যায় তা ভাসিয়া যায়। সর্প যেমন সুমিষ্ট স্বরে মুগ্ধ হইয়া আপনার খল স্বভাবকে বিস্মৃত হয়, তেমনি হৃদয়ে যখন বাঁশি বেজে উঠে, তখন সব রিপু এবং তাদের সব দৌরাত্ম্য স্বপ্নের মত অদৃশ্য হয়ে যায়। বাঁশি শুনতে শুনতে মন সরে যায়। কর্ম বন্ধন খসে পড়ে, সব দরজা খুলে যায়, জগতের মায়ার সম্বন্ধ সব চুকে যায়। তখন আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না। তখন দেখা যায় সর্বত্রই আমার অবাধ গতি। সর্বত্রই আমি।

জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে

একবার দেখা হলেই সব হয়ে গেল তখন চিরকালকার জন্যে নিশ্চিন্ত। তারপর সুখ-দুঃখ, ভাব-অভাব, জন্ম-মৃত্যু যা কিছুই আসুক তাকে আর ভয় হয় না। এই সবগুলিকেই যেন তখন ঘরের লোক বলে মনে হয়। পরিচিত বন্ধুর মত এরা হৃদয়ে আনন্দ-বর্ষণই করে। কোন অতৃপ্তি বা ক্লেশ আনয়ন করে না। যতক্ষণ চাই, দাও দাও বলে চিৎকার করি, ততক্ষণই না কষ্ট। তখন চাওয়ার কষ্ট, না পাওয়ার কষ্ট, বিরহের কষ্ট, অভিমানের কষ্ট, কত কষ্টই না পেতে হয়। এখন আশাও নাই, আকাঙ্খাও নাই, সুতরাং না পাওয়ার কষ্টও নাই, হৃদয় আর ধুক্ ধুক্ করে না, মন আর লুক্ পুক্ করে না। তখন এ হৃদয় কিছুতেই আর অবসন্ন হয় না। তখন তার জোর কি, আনন্দ কি! কেননা সত্যের মুখ দেখেছেন। সুতরাং এই মায়াহাটে ছায়ানট্ দেখে সে আর বিচলিত হয় না। অভিনয়কারীর মুখ চেনা থাকলে, সে যম সেজে এলেও আর ভয় হয় না। "সর্বভূতস্থমাত্মানাং সর্বভূতানি চাত্মনি।" আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন। ঠিক এই রকম করে একবার দেখে নেওয়া চাই। এই যে দেখা এ ইন্দ্রিয়দ্বারে দেখা নয়, এ মনে প্রাণে এক করে দেখা। এরই অপর নাম জ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার। এই জ্ঞানের উদয় হইবামাত্র তার ইহলোক পরলোকের বন্ধন খসিয়া পড়ে। ধর্মাধর্ম কর্মাকর্মের সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়।

অভিযোগ

লোকে যখন ব্যথা পায় বা দুঃখ পায় তখন কাঁদে আর তাঁকে নিন্দা করে। আরে পাগল, তিনি কি তোর শত্রু যে তোর দুঃখ দেখলে তাঁর সুখ হবে। তিনি আঘাত করেন, দন্ড দেন, সে আমাদেরই মঙ্গলের জন্য। বিষয়াসক্ত মন যে আঘাত না খেলে, দন্ড না পেলে জড় হয়ে যায়, প্রস্তরের মত কঠিন হয়ে পড়ে। তাঁকে ভুলে গিয়ে সে বিষয় সুখকে বরণ করে এবং সেই ক্ষণিক সুখের আশায় কত অনর্থের সৃষ্টি করে। তারপর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক তাপের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। জীবনের লক্ষ্য কি, কর্ত্তব্য কি কিছুই বুঝতে পারে না। এ অবস্থা দীর্ঘকাল থাকলে কি আর রক্ষা ছিল। সংসার গৃহে আসক্তি খট্টায় শয়ন করিয়া কামনা কামিনীকে আলিঙ্গন করিয়া মনুষ্য যে একটি বিরাট দুঃস্বপ্ন দর্শন করে, তাহা কখনই ভাবিত না, যদি তিনি গাত্রে হস্ত দিয়া ঠেলিয়া আমাদিগকে জাগাইয়া না দিতেন। এই নাড়ানোটাই আমাদের কাছে প্রবল দুঃখরূপে দেখা দেয়। নচেৎ তিনি ইচ্ছা করে কাহাকেও দুঃখ দেন না। কেনই বা দেবেন? কোন লোকের শীতকালের শেষ রাত্রে যদি কোন কাজ থাকে এবং সেইজন্য তার মা তাকে জাগাইতে আসেন, মা যত ডাকেন, নিদ্রাতুর তনয় মাতার প্রতি তত বিরক্ত হয়, রুক্ষ ভাষা প্রয়োগ করে। তারপর যখন তাহার ঘুমঘোর কেটে যায় তখন জাগরণকে আর খারাপ তো বোধ হয়ই না বরং সেই জাগরণটি তখন তাহার নিকট প্রভাত বায়ুর শীতল স্পর্শে একটি আনন্দ রস বলে বোধ হয়। তখন পুষ্পের সৌরভ, প্রভাতের সমীর, বিহঙ্গ কাকলী এবং তরুণ অরুণের আলোক তার চিত্তকে এক অভিনব অনির্বচনীয় ভাব জগতে লইয়া যায়, সেখানে পৌঁছিয়া সে কল্পনা জগতের অতীত এক পরম সত্যলোকের সন্ধান পায়। সেখানে মনের সঙ্গে সত্যের পরিচয় স্থাপন হয়। তখন সে আনন্দ ভোগ করে, দুঃখকে সে আর মনে স্থানই দেয় না।

লোকে বলে, তিনি যদি সর্বশক্তিমান এবং করুণা-পরবশ

হয়েই আমাদের জাগান, তবে সে জাগরণের মধ্যে দুঃখ কেন প্রেরণ করেন? দুঃখ না দিয়েও তিনি তো আমাদিগকে নিজের দিকে টেনে রাখলে পারেন। পারেনই তো, তবে তা করুণাময় বলেই করেন না, তিনি জীবকে গৌরবান্বিত করে রাখতে চান কিনা? তাই তার শক্তির বিকাশ দেখতে চান। তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার বল সে লাভ করে ইহা ইচ্ছা করেন, এবং সেই জন্যই দান করে তাকে অপমান করেন না এবং তাকে অক্ষম বা পঙ্গু করে তুলেন না। জীব নিজের শক্তিতেই যে কত বড় হতে পারে, তাই বুঝাবার জন্য তাকে ভালবেসে সখা বলে ডাকেন এবং প্রেমালিঙ্গনদ্বারা তার সমস্ত অপমানকে মুছে দেন। যদিও সবই তাঁর শক্তি, এ সবই তাঁর দান, তবু দান গ্রহণ করবার একটু রকম ভেদ আছে। আমরা যে অনেক কষ্টে, অনেক সাধ্য সাধনা করে তাঁকে পাই, সে কষ্টটাই আমাদের সঙ্গে তাঁর মিলনের পথকে গৌরব দান করে। নচেৎ আমাকে একা একা মুক্তি দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই কঠিন নহে, কিন্তু তিনি জীবকে বড়ই ভালবাসেন, তাই দান করে আমাদিগকে অপমান করতে চান না।

গায়ত্রী মন্ত্র

ব্রাহ্মণেরা যে গায়ত্রীর উপাসনা করিয়া থাকেন তাহাও বিশ্বপ্রাণ জগদম্বারই উপাসনা; উহা কেবল পাখীর মত মুখে জপ করিলে হইবে না।

গায়ত্রী মন্ত্রটি এইঃ- ওঁ, ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।

অর্থাৎ - যে পরমাত্মা হইতে, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক (অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব) প্রকাশ হইয়াছে, এবং যিনি আমাদের (অর্থাৎ মানব গণের) অন্তঃকরণে সর্বতত্ত্বগ্রাহিণী ধী শক্তির প্রেরণা করেন, আমরা যেন সেই নিখিলেশ্বরের পরম বিভূতির ধ্যান করিতে পারি।

এই নিখিলেশ্বর কে? তিনিই আমার প্রাণ। যিনি আমার একমাত্র আপন জন, সেই প্রাণের সাধনাই প্রকৃত গায়ত্রীর উপাসনা। যাহারা প্রাণের উপাসনা করেন, আশা করি তাঁরা বুঝিয়াছেন।

দেহি দেহি শব্দের অর্থ

রূপং দেহি - ইহার অর্থ, স্বরূপ প্রদান কর।
জয়ং দেহি - ইহার অর্থ, মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর বিজয় দান।
যশো দেহি - ইহার অর্থ, আমিত্বের প্রসার।
দ্বিষো জহি - ইহার অর্থ, কাম ক্রোধাদি শত্রু নাশ।
ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি - ইহার অর্থ, শান্তি দান কর।
পুত্রং দেহি - ইহার অর্থ, জ্ঞান প্রদান কর।
(কারণ জ্ঞানই নরক হইতে ত্রাণকারী।)
ধনং দেহি - ইহার অর্থ, ভক্তি প্রদান কর।
(কারণ ভক্তির মত অতুলনীয় আর কি আছে?)

স্বরূপ দর্শন

ভক্ত সাধকবৃন্দ শ্রীভগবানের অনন্ত রূপমাধুর্য্য পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া আত্মহারা হও। যাঁহার জ্যোতিঃ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, তারকা প্রভৃতি কণা মাত্রও প্রকাশ করিতে পারে না, যেখানে বিদ্যুতের তেজ সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়, যাঁহার জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে সকল জ্যোতিঃ, তেজ দীপ্তিমান হয়, যিনি সকল রূপের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ, সেই মহাশক্তিময় পুরুষোত্তমের স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হও। আর যদি রস বা আনন্দ পাইতে ইচ্ছা কর তবে সর্বরসানন্দের আকর পূর্ণতম রস বিগ্রহ, শ্রীরাসরাসেশ্বর রসিকশেখর নিত্য-নব-নটবর যুগল কিশোরের অনন্ত লীলারসমাধুর্য্য আস্বাদন করতঃ প্রেমামৃত রসার্ণবে অনন্ত কালের জন্য ডুবিয়া অনন্ত মিলনে মিলিত হও। আর প্রেম

কারুণ্য চিত্তে বল -

ত্বমেব মাতাচ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব।।

হে দেবাদিদেব তুমিই আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, ধন তুমিই আমার সর্বস্ব।

সাধনের প্রয়োজনীয়তা

কেন তুমি সাধনার ভয়ে সাধনে বিমুখ রহিয়াছ, তাঁহাকে তুমি নিশ্চয়ই পাইবে। তাঁহাকে পাইবার জন্য সাধনার ক্লেশ অতি সামান্য, অতএব বিমূঢ়ের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া আলস্যে সময় নষ্ট করিও না। একবার কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া যাও, তাহার পর অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ; সে সুখ, সে আনন্দ ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে। তাহা বুদ্ধি গ্রাহ্যও নহে, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যও নহে। সাধক কেবল নিজ সাধন শক্তির প্রভাবে উপলব্ধি করেন। তুমি সাধনার পরিশ্রমে যত দিন নিজেকে পরিশ্রান্ত করিতে না পার, হে সাধক ততদিন দেবতারা তোমার অনুকূল হইবেন না। অতএব পরিশ্রমে কোনদিন বিমুখ হইও না। আমরা বহুক্ষণ ও বহুকাল ধরিয়া সাধনা করিলে বুঝিতে পারিব আমাদের মন তখন বিক্ষেপ শূন্য হইয়াছে এবং চিত্তাকাশের সমস্ত মল বিধৌত হইয়া গিয়াছে। আরও বুঝিতে পারিব যে ঐ চিত্তে আর দ্বিতীয় কোন সত্তার চিহ্ন মাত্র নাই। সমস্ত তত্ত্বই তখন তত্ত্বাতীত অবস্থায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। তখনই আমরা নিজেদের প্রকৃত স্বরূপ, সত্তার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিব এবং জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই তিনটি আর পৃথক বলিয়া মনে উদিত হইবে না। তখন

সমস্ত ব্রহ্মময় বোধ হইবে। "সমস্ত জগদাধার মুর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ।" গীতা আলোচনা করিলে আমরা প্রণিধান করিতে পারি।

ছন্দ

এইবার ছন্দ সম্বন্ধে গীতায় কি আলোচিত হইয়াছে দেখা যাউক। তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাউক।

ছন্দ অর্থে দীপ্তি পাওয়া বা আনন্দ করা। পদ্যবন্ধ ও পদ্যের জাতিকে ছন্দ বলে। পদ্যের বিভিন্ন মূর্ত্তি ছন্দ দ্বারায় প্রকাশিত হয় এবং তদ্বারা মনও বেশ আনন্দ লাভ করে। কথার মধ্যে এই আনন্দ বা রস না থাকিলে তাহা কবিতা হয় না। মনের বিভিন্ন ভাবরাশিকে ভাষায় ব্যক্ত করিবার সময় আমরা ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ রচনা করি। তখন সেই ছন্দের তালে তালে এমন একটি স্পন্দন হয় যাহাতে আমাদের তদনুকুল মনোবৃত্তিও স্পন্দিত হইয়া উঠে। যাহা মনোমধ্যে বীজাবস্থায় ছিল, সে বীজ প্রকাশোন্মুখ হইলেই তাহার একটি গতি আমরা অনুভব করি। সেই গতিটিই ছন্দ।

কার্য্য কারণের ব্যতিক্রম হইলেই ছন্দ আর অশুদ্ধাবস্থায় প্রকাশিত হইতে পারে না। এই ছন্দ প্রকৃতই একটি অদ্ভুত শক্তি, যুদ্ধের সময় বাদ্যগুলি যে ছন্দে স্পন্দিত হয়, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র যোদ্ধাবৃন্দের সুপ্ত মনোবল জাগিয়া উঠে। তাহার ফলে যোদ্ধার হৃদয়ক্ষেত্র যুদ্ধার্থে নাচিয়া উঠে। যুদ্ধে মরিতে হইবে সে ভয় তাহার হৃদয় ক্ষেত্র হইতে মুছিয়া যায়। এইরূপ প্রভাতে ভৈরবী রাগিণী শুনিলে মনুষ্যের চিত্ত আপনা হইতেই অজানা অলক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়। কাহার অভাব, কাহার বিরহ ব্যথা যেন চিত্তকে আকুল করিয়া দেয়। সমস্ত চিত্তই বেদনায় ভরিয়া যায়। এইরূপ বেহাগ রাগ নির্জ্জন গভীর রাত্রে শুনিলে শ্রোতার হৃদয় মধ্যে এক অননুভব ব্যথা জাগিয়া উঠে। কাহার জন্য চিত্ত যেন বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া উঠে। এইরূপ ছন্দ সম্বন্ধে বহু কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, অধিক লেখা বাহুল্য মনে করিয়া লিখিতে বিরত রহিলাম।

লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা লক্ষ্মী-সরস্বতী বিবাদ।

মহাশক্তির পূজার পরই লক্ষ্মীপূজা এল। যেখানে শক্তি সেই খানেই লক্ষ্মীশ্রী উপস্থিত হয়। এই মা লক্ষ্মী দ্বিবিধা। লক্ষ্মী আর অলক্ষ্মী। যিনি সুকৃতিশালী পুণ্যবানগণের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মী, আর পাপাত্মাগণের গৃহে অলক্ষ্মী হয়ে থাকেন। এই সুকৃতিশালী কে ? আর পাপাত্মা কে ? আমরা বড় লোক ধনী মানী জমিদার বিলাসী রাজগণকে সুকৃতিশালী মনে করি। তাই তাদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা থাকে বলি। বস্তুতঃ সে ধারণা আমাদের ভুল। সেই লক্ষ্মীই অলক্ষ্মী। যত কুকর্ম করে তারা ধন সঞ্চয় করেছে। তাই তাদের লক্ষ্মী অলক্ষ্মী আর ঐ কৃষক চাষা গরীব ওরাই যথার্থ নিষ্কলঙ্ক পুণ্যবান। সেই জন্য চাষার ঘরের লক্ষ্মীই স্বয়ং লক্ষ্মী। ধনীর ঐ সব টাকা কোম্পানির কাগজে অন্যায় অর্থ সঞ্চয়, যথার্থ ধন নয়। যথার্থ ধন হচ্ছে গোধন আর ধান্য, যাহাতে কুকর্ম আর অধর্ম নাই। সেই গোধন আর ধান্যই যথার্থ ধন; সেই ধনকেই স্বয়ং লক্ষ্মী বলা হয়। ধান্যই লক্ষ্মী, টাকা লক্ষ্মী নয়। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে বলেছেন - হে গুরো, রাজাদের ঘরে যে লক্ষ্মী সে সর্বনেশে লক্ষ্মী, অমন রাজলক্ষ্মীতে আমার কাজ নাই।

ভগবান লক্ষ্মী নন, দুঃখ পারে সেতু,
সুরক্ষিতা বিষলতা বিনাশের হেতু।।
তাবৎ বিনয়ী নম্র হয়ে থাকে নরে,
যাবৎ না মানময়ী লক্ষ্মী আসে ঘরে।।
বিনীত কৃতজ্ঞ প্রাজ্ঞ আছিল যে জন,
হায় তারে লক্ষ্মী করে উদ্ধত কেমন।।
সতত সমর প্রিয় সিংহীর সমান,
দুষ্ট দুরাশয় পাশে লক্ষ্মী অবস্থান।।

অতএব হে গুরো, ঐ রাজলক্ষ্মীই অলক্ষ্মী, আর চাষার গোধন,

ধান্য ভরা গৃহের লক্ষ্মীই স্বয়ং লক্ষ্মী। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে রাজা মুচকুন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন, "হে বিভো, আপনার পদসেবা নিরভিমান পুরুষগণের প্রার্থনীয়। আমি তাই চাই। তদ্‌ভিন্ন অন্য বর অভিলাষ করি না।" অতএব এতেই প্রমাণ হয় অভাগা ধনবানেরা সৌভাগ্যশালী নয়, লক্ষ্মীমন্তও নয়। যদি কেহ সৌভাগ্যশালী নয়, লক্ষ্মীমন্ত হতে চান তবে তিনি গোধন আর ধান্য অন্নপূর্ণার ঘরে পূর্ণ করুন। টাকার ঘর তো পাপে পূর্ণ হয়ে থাকে। এই গেল বাহ্য জগতের কথা।

আর জ্ঞান চাই। জড়ত্ব জ্ঞান ছেড়ে চিন্ময় জ্ঞান ধরলেই যথার্থ জ্ঞান হল। এই জ্ঞান হল সরস্বতী। আর জড়ত্ব জ্ঞান হল অজ্ঞান অন্ধকার। অসরস্বতী যেখানে অলক্ষ্মী সেখানে, অসরস্বতী কেবল কোঁদল, ঝগড়া, বিবাদ, উচ্ছন্ন যাওয়ার পথ। আর যেখানে স্বয়ং লক্ষ্মী সেখানে স্বয়ং সরস্বতী, কোন কোঁদল নাই, সুখশান্তি মুক্তির পথ। অতএব ধনের মধ্যে গোধন ধান্য, জ্ঞানের মধ্যে চিন্ময় জ্ঞান, এই লাভই পরম লাভ। এই হল যথার্থ সুখের নিদান। যারা রজত কাঞ্চন চাচ্ছে, তারা ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হচ্ছে। আপন মরণের সিঁড়ি আপনি গাঁথছে। গোধন ধান্যে ঘর পূর্ণ যাঁর, যথার্থ লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা তাঁর। এ জীবন হবে ধন্য, ঘরে আনো গোধন আর ধান্য।

আর মনকে স্থির, ধীর. শান্ত করতে হবে, তবে সুখ শান্তি পাওয়া যাবে। এ জন্য যোগ অভ্যাস করতে হয়। যোগ কি? "সংযোগঃ যোগ ইত্যুক্তঃ জীবাত্মাঃ পরমাত্মনঃ।" জীবের মন পরমেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হলে তবে তাকে যোগ বলে। আর "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"- মনকে নিরোধ করার নাম যোগ। এই চিত্ত নিরোধই যেমন জ্ঞানপথে তেমনি ভক্তিপথে আবশ্যক।

চিত্তনিরোধ মানে মনের সংযম করা, কাম ক্রোধাদির বেগকে রোধ করা। যা কিছু সাধন ভজন করনা কেন, সমস্ত সাধন ভজন ঐ চিত্ত নিরোধে গিয়া পৌঁছায়।

এই মন নিরোধই বেদ, যোগ, সাংখ্য, সন্ন্যাস, ইন্দ্রিয়দমন ও সত্য সাধনের শেষ ফল। সমস্ত সাধন ভজন ঐ মন নিরোধে গিয়ে পড়ে - যেমন নদী সকল সমুদ্রে গিয়া মেশে। অতএব মন নিরোধ করাই সুখ শান্তি লাভের অব্যর্থ উপায়, গোধন ধান্য আর চিত্ত সংযম এই উভয়ের দ্বারাই যথার্থ লক্ষ্মী পূজা হয়।

কানামাছি

ছেলেরা একসঙ্গে মিলে বলে, ভাই, কি খেলা হবে। এস কানামাছি, কানামাছি খেলি। একজন কানামাছি হয়, তার চক্ষু সকলে কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দেয়, সে কিছুই দেখিতে পায় না। তখন সেই কানাকে আর সকলে হাত ধরে চারিদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রামের মাথায় তার হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, বল্ দেখি, এ কার মাথা ? কানামাছি বলে এটা গোপালের মাথা। অমনি সকলে হাততালি দিয়ে হেসে গড়িয়ে যায়। আবার তার দাদার মাথায় তার হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করে, বল্ দেখি ঐ কার মাথা ? কানামাছি বলে, কাকার মাথা। অমনি সকলে হেসে গড়াগড়ি দেয়। অমনি হাসির ছড়াছড়ি।

ঠিক সেই কানামাছির মত, পরব্রহ্ম চোখ আপনি বাঁধেন। চোখ বেঁধে তিনি সাধের কানা হন। লোকে বলে, এ কে, ও কে, সে কে ? কানা ব্রহ্ম বলেন ও বাবা, ও মা, ও দাদা, ও স্ত্রী, ও পুত্র বস্তুতঃ কেউ কিছুই নয় সব মিথ্যা কথা, সত্য কথা কি ? সত্য কথা হচ্ছে-"কা তব কান্তা কস্তে পুত্র সংসারোঽয়ং অতীব বিচিত্রঃ।" কেউ কারো কিছু নয়। তথাপি কানা ব্রহ্ম বলেন এ বাবা, ও স্ত্রী, সে পুত্র! অমনি দেবলোক হতে দেবতারা হেসে গড়াগড়ি যান। দেবতারা বলেন, এ কানা ব্রহ্ম কারে কি বলে রে; সত্যই কানা হয়েছে। ব্রহ্ম আপনাকে ঢাকা দিয়ে মায়াকানা হন, আর কানামাছির খেলা করেন। মানুষ সবই কানা ব্রহ্ম। জ্ঞান দৃষ্টিযুক্ত দেবগণ আকাশ থেকে ব্রহ্মের

কানামাছির খেলা দেখে খুব হাসতে থাকেন। ভগবানের এই মায়ার খেলা মানবলীলা, কানামাছির ছেলেখেলা বই আর কিছুই নয়। রাজা সখের থিয়েটার করেছিলেন - সখ করে নিজে বানর সেজেছিলেন আমলাগণ ও কর্মচারীরা দেখতেন, তারা রাজার বানর সাজা দেখে হেসে হেসে মরতেন। ব্রহ্মেরও তাই। দেবতারা ব্রহ্মের এই কানামাছির খেলা দেখে হেসে হেসে মরেন। এ সংসারটা ক্ষণকালের একটি তামাসা মাত্র। আমার মা, আমার বাবা, আমার স্ত্রী, পুত্র বলে মানুষ মুগ্ধ হয়ে পড়ে। আবার যখন একটি একটি করে সরে সরে পড়ে, তখন কানা ব্রহ্মের কি কান্না! দেখে দেখে দেবগণ সব হাততালি দেন, আর বলেন - "Encore! Encore! Once more! Once more! আবার করো, আবার করো।

ছেলেরা লাফায়, বারণ করলে শোনে না। যখন লাফাতে লাফাতে আছাড় খেয়ে পড়ে, তখন সকলে হো, হো, হো, হো করে হেসে মরেন।

গীতার রূপক

ধৃতরাষ্ট্র	-	অহং ইত্যাকার মন
যুধিষ্ঠির	-	যুদ্ধে যিনি স্থির।
ভীম	-	প্রাণবায়ু
অর্জুন	-	তেজস্তত্ত্ব
নকুল	-	জলতত্ত্ব।
সহদেব	-	ক্ষিতিতত্ত্ব
দ্রৌপদী	-	শীঘ্রগতি।
চেকিতান	-	প্রণবধ্বনি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন	-	কূটস্থের মধ্যে চিত্র বিচিত্র
কাশী রাজ	-	মহৎজ্যোতি।

পুরুজিৎ - অবরোধ।
দ্রুপদ - অন্তর্য্যামিত্ব রূপ মনের দ্রুতগতি।
কুন্তিভোজ - আনন্দ।
ভীষ্ম - ভয়।
বিরাট - যাহা অভিপ্রায় করা যায় তাহাই জানা যায়।
দ্রোণাচার্য্য - জিদ্।
কুন্তী - শক্তি।
ধৃষ্টকেতু - যাহার দ্বারা পাপ নষ্ট হয়
দুর্য্যোধন - কামরিপু
দুঃশাসন - কামবল
শৈব - শিব হইতে শৈব (যাহা পরম মঙ্গলদায়ক)
যুধামন্যু - ক্রান্তি
পৌন্ড্র - সিংহনাদ
যুধামন্যু - যাহার যুদ্ধে মন্যু অর্থাৎ দৈন্য আছে।
সুঘোষ - সুন্দরনাদ
মণিপুষ্পক - বিমলশব্দ
উত্তমৌজা - উত্তম ওজঃ অর্থাৎ বীর্য্য যাহার তিনিই আদ্যাশক্তি তাঁহার যে উপাসক, অর্থাৎ কুন্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করবার চেষ্টা।
জিতনিদ্র - চৈতন্য।
সৌভদ্র - অভিমন্যু বা সংকল্প সিদ্ধি।
কর্ণ - কানে শুনে মেনে নেওয়া।
কৃপাচার্য্য - জীবনের প্রতি তামসিক অনুরাগ।
অশ্বত্থামা - কামনার আর অন্ত নাই।
ভুরিশ্রবা - অনেক (ভুরি) শ্রবণ হেতু অবিরত সংশয়।
জয়দ্রথ - দুঃসাহস, যাতা বলে জীবকে ভড়কে

	দেওয়া।
পাণ্ডু	- পৃথিবীতে পঞ্চতত্ত্ব।
সঞ্জয়	- মনের সম্যক গতি দৃষ্টি।
শিখণ্ডি	- শক্তি কর্ত্তৃত্বপদজ্ঞান।
দেবদত্ত	- দীর্ঘ ঘন্টা নাদ।
পাঞ্চজন্য	- ভৃঙ্গ, বেনু, বীণা, ঘন্টা, মেঘের শব্দ।
গাণ্ডীব	- ধনু - সুষুম্নার উত্থান। মেরুদন্ড হইতে গলার পশ্চাদভাগ পর্য্যন্ত।

বামাচার সাধক

সামনে লক্ষ্য থাকুক বা না থাকুক, আমি অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়ে চলব এবং শেষ পর্য্যন্ত মায়া পরাভূতা হয়ে আমার অভীষ্ট সহায়ক হবে। এইরূপ সাধককে বামাচারী বলা হয়। এইরূপ সাধনায় গুরুতর রকমের বিপত্তির বা অধোগতির সম্ভাবনা থাকে। বামাচারী অভীষ্ট সিদ্ধির পূর্বেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সংগ্রামার্জিত শক্তির অপপ্রয়োগ করে বসে, যার ফলে তারা অধিকাংশই অধিকতর অন্ধকারকে, অধিকতর জড়তাকেই প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে। মানুষ থেকে ক্রমশঃ পশুর পর্য্যায়ে নেমে যায়। লক্ষ্য স্পষ্ট না রেখে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হবার চেষ্টা অর্থহীন। এতে ব্যক্তিগত জীবনে বা সমাজ জীবনে কতটুকু উন্নতি হতে পারে?

দক্ষিণাচার সাধক

দক্ষিণাচারী সাধক অনুরোধ উপরোধের দ্বারা প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে চায়! সে অনুরোধ করে - হে মায়া, হে প্রকৃতি! তুমি অন্ধকার সরিয়ে নাও, আমার পথ করে দাও। হে মায়া তুমি

বৈষ্ণবীশক্তি অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী শক্তি, সমগ্র বিশ্বের তুমিই কারণ, এই ভেদাত্মক জগৎ বীজ। তুমিই পরমা শক্তি, তুমি এই সৃষ্ট জগতের প্রতিটি সত্তাকে সম্মোহিত করে রেখেছ। তুমি প্রসন্ন হও ও মুক্তির কারণ হও।

জ্ঞানের চক্ষে মহাত্মারা দেখেন, সর্বজীবের সুহৃদ, মঙ্গলাকাঙ্খী দয়াময় ভগবান প্রাচীনও নহেন নবীনও নহেন, তিনি সদা একরূপ, তবে যে যেমনভাবে তাঁহাকে ভজনা করে তিনি তাহার পক্ষে তাদৃশ; নচেৎ নিরুপাধি ভগবানের আর উপাধি কি এবং পরিমাপহীন অনন্তের আবার পরিণাম কি ?

ভ্রূ যুগলের মধ্যে যে স্থানটি থাকে তাহাকেই মনস্থান বলা হয়। সে স্থানে মনকে রক্ষা করিলে ক্রমে বিনাবলম্বনে মনস্থির হইয়া যায়, তখন আর মনে চাঞ্চল্য থাকে না। মনস্থির হয় না বলিয়াই অবিরত নিমেষ পড়িতেছে। দৃষ্টি স্থির হইলে নিমেষ বর্জিত অবস্থা হইবে।

জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই ভগবানের রূপ। তিনি সর্বভূতাশ্রয়স্থিত এবং সর্বভূতাশ্রয়। সর্ব ভগবানের একটি নাম।

পরাৎপর কাশীর বাবার এই ক্রিয়া যোগ সাধনে এমন বিশেষ কিছু শুচি অশুচি নাই। সুতরাং সর্বদা সর্বাবস্থায় এ সাধন করিতে দোষ নাই। উচ্চ কোটির সাধক বৃন্দ (কাশীর বাবার পদাশ্রিত) এরূপ বলিয়া থাকেন।

অদ্বৈতাব্যক্তাবস্থা

অদ্বৈতাব্যক্তাবস্থা, যেখানে সমস্ত এক হইয়া যায়। এক বলিবারও কেহ থাকে না। সুতরাং সেখানে সৃষ্টি নাই। যখন ইচ্ছা জন্মিল তখনি

আবার সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতে লাগিল। ব্রহ্মের এই বিকল শক্তির নাম প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি যখন ব্রহ্মে লীন হয় তখন সৃষ্টি থাকে না, যখন প্রবুদ্ধ হয় তখন আবার সৃষ্টিকার্য্য চলিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অদ্বৈতাবস্থা সম্পূর্ণ অব্যক্ত। তৎসম্বন্ধে যখন কিছু বলিতে চাই তখনই দ্বৈতভাব আসিয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্মকে বুঝিতে বা বুঝাইতে দ্বৈতভাব ব্যতীত হইবার নহে; অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বৈত ভাব আসিয়া পড়ে। কারণ পৃথক ভাবকেই দ্বৈতভাব বলা হয়। যেমন সাধক ও সাধ্য, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ তাহা জানিবার উপায় নাই। জানিতে হইলে আর একজনের দরকার। এক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত যখন দ্বিতীয় ব্যক্তি, নিশ্চয়ই ব্রহ্মেরই অন্য একরূপ। সুতরাং ব্রহ্মকে কেবল ব্রহ্মই জানিতে পারেন।

গুঞ্জাফল ও কামিনী কাঞ্চন

অহো কি বিড়ম্বনা! পর্বতের উপর লাল টক্ টকে গুঞ্জাফল অর্থাৎ কুঁচফলের রাশি দেখিয়া পার্বতীয় বানরগণ অগ্নিবোধে দলে দলে তাহার নিকট গিয়া, পা মেলিয়া বসিয়া দুরন্ত পার্বত্য শীত নিবারণ করে। লাল টকটকে কামিনী কাঞ্চনের রাশি দেখিয়া অবোধ মনুষ্যও সুখ বোধে তাহার কাছে বসিয়া জাগতিক দুঃখ নিবারণ করেন। গুঞ্জাফলে যতটুকু শীত ভাঙ্গে, কামিনী কাঞ্চন উপভোগেও ততটুকু দুঃখ দূর হয় মাত্র।

গীতায় শ্রী ভগবান উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা অবিদ্যা দ্বারা জীব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সদা সংসার মায়ায় আবদ্ধ, তাহারা আমারি অংশ। এখানে একটি প্রশ্ন উঠে ব্রহ্ম যদি অংশ হইতে পৃথক হন, তবে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অখন্ডত্ব, সর্বব্যাপিত্ব ও অনন্তত্বের হানি হয়। বস্তুতঃ এরূপ সন্দেহ মনে আসা স্বাভাবিক। ইহার এইরূপ উত্তর দেওয়া

যাইতে পারে - আত্মা জীবলোকে সুর, নর, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীবভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদের দেহাদির জন্মমৃত্যুতে সেই আত্মার বিনাশ নাই। সেই আত্মা সনাতন; কেন না উহা ব্রহ্মরূপ আমারই অংশ, সুতরাং তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন উঠিবে ব্রহ্মের যদি অংশ অল্প থাকিয়া যায় তাহা হইলে ব্রহ্মের অখন্ডত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অনন্তত্বের হানি হয়। তখন ব্রহ্ম অংশ হইতে পৃথক বস্তু হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তু আছে ইহা মানিতে হয়। তাহার এইভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, পূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার কথা বলা হইয়াছে, এবং পরমাত্মার পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকৃতির কথাও বলা হইয়াছে। এখন শক্তিমান হইতে শক্তি যেমন স্বতন্ত্র বস্তু নহে তাহাদের সত্তা পৃথক তদ্রূপ পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তিদ্বয় তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। অতএব মম অংশ জীব ও ব্রহ্মের অভিন্ন অভেদত্বের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

মায়াশক্তি

এই জগতে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব যুক্ত বৃহৎ শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। একটি "বহিরঙ্গা মায়াশক্তি" অন্যটি "অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি।"

মায়াশক্তির প্রভাব এইরূপ যে ইহা জাগতিক জীবমাত্রকেই স্বরূপ বা ভগবান থেকে দূরে বা বহুদূরে লইয়া যায়। অন্তর্মুখী হইতে না দিয়া বাহিরে বাহিরেই আবদ্ধ করিতে চায়। মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে স্থিরতা না দিয়া আরও চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। প্রকৃত সত্যকে বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত করাইয়া অপ্রকৃত ও মিথ্যাকে একমাত্র আশ্রয় রূপে বরণ করাইয়া লয়। এই মায়াকে শাস্ত্রকাররা "অঘটন ঘটন পটিয়সী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা সাধারণত ঘটে না, তাহাই উনি ঘটাইতে পারেন। এই জগৎ স্থিতির কার্য্যে ইঁহার ক্ষমতা অসীম। 'আমি' জন্মের পূর্বেও ছিলাম আবার

মৃত্যুর পরেও থাকিব, ইহা ধ্রুব সত্য। কেননা আত্মা অজর অমর অক্ষয় নিত্য সত্য স্বরূপ কিন্তু এই ধ্রুব সত্যকে মায়া আপন প্রভাবে মিথ্যা করিয়া রাখিয়াছেন, পরকালের চিন্তায় মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তিত হইতে দিতেছেন না, পক্ষান্তরে যাহা ধ্রুব মিথ্যা অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবস্থা, যাহা সম্পূর্ণ বিকারপূর্ণ ও অসত্য, যাহার কিছুমাত্র স্থায়িত্ব নাই, যাহার অনিত্যতা আমরা প্রতিদিন কালচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে নিষ্পেষিত মানবগণের আত্মীয় বান্ধবাদির মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ও হাহাকার ধ্বনিতে মর্ম্মে মর্ম্মে বিশেষ ভাবে অনুভব করিতেছি, সেই ধ্রুব মিথ্যার অবস্থাকেও আমরা এই মায়াশক্তির প্রভাবে চিরস্থায়ী রূপে বরণ করিয়া লইয়াছি। এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই মিথ্যার চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ধন্য মায়া, ধন্য তোমার প্রভাব।

চিৎশক্তি

এই শক্তিটি ত্রিতাপ দগ্ধ জীবগণকে শান্তির সুশীতল জলে স্নাত করাইয়া প্রেমামৃত দানে অমর করিবার জন্য ভগবানের করুণাধারা রূপে প্রকটিত। এই শক্তি মায়ার ভীষণ কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিবার জন্য মায়ার বিরুদ্ধে সতত দ্বন্দ্বে নিয়োজিত। যেখানে দেখিব মানুষ মায়াপ্রবুদ্ধ প্রবৃত্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেইখানেই বুঝিব ইহা চিৎশক্তির প্রভাব। যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে পাইব, সেইখানেই বুঝিতে হইবে ইহা চিৎশক্তির কার্য্য। যখন দেখিব কেহ বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, কিম্বা ভগবানের ধ্যানে তৎপর অথবা ভগবান নামগানে মাতোয়ারা, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে চিৎ শক্তির সফলতায় মায়াশক্তি এখানে পরাজিত হইয়াছে। চিৎশক্তি সর্বদাই মায়াশক্তির বিপরীত আচরণ করিবে। মায়াশক্তি জীবগণকে যেরূপ সত্য হইতে দূরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে, চিৎশক্তিও সেইরূপ জীবকে সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে, আত্মস্বরূপের দিকে সততই টানিতেছে। মায়াশক্তি জীবের বৃত্তিগুলিকে

বহির্মুখী করিতে চায়, কিন্তু চিৎশক্তি ঐ সকল বৃত্তিকে অন্তর্মুখী করিতে চেষ্টা করে। এক কথায় চিৎশক্তি, সর্বদা মায়াশক্তির বিরুদ্ধে ক্রিয়া করিতেছে। এইজন্য চিৎশক্তিকে ভগবানের দয়া শক্তিও বলা যাইতে পারে।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল,
কৃষ্ণ সুখ বাঞ্ছা হয় প্রেমেতে প্রবল।।

এখানে ঠাকুর গুরুদেব বলিতেছেন, "হে মোহমুগ্ধ জীব নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দাও, একবার জগৎ যে কৃষ্ণময় তা বুঝিতে চেষ্টা কর, অর্থাৎ সদগুরুর উপদেশ মত জয়গুরু বলে কোমর বেঁধে সাধনায় লেগে যাও। বড় আমিকে পেতে গেলে, ছোট আমিটার লাভ লোকসান দেখতে গেলে চলবে না। অতএব হে সাধক, হে অমৃতের সন্তান, মনে রেখো আলো এবং অন্ধকার, ইহা লইয়া সংসার।

ব্রহ্ম কি ?

যে বস্তু লাভ হইলে অপর কোন প্রকার বস্তু লাভের প্রত্যাশা থাকে না, যে সুখে সুখী হইলে আর কোন প্রকার সুখকেই সুখ বলিয়া বোধ হয় না, যে জ্ঞান লাভ হইলে অপর কোন জ্ঞানেরই আর প্রয়োজন হয় না, তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া জানিবে।

ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ হইলে অপর কোন প্রকারে লাভবান হইবার ইচ্ছা হয় না, কারণ উহা হইতে কোন প্রকার লাভই শ্রেষ্ঠ নহে। যাঁহাকে দর্শন করিলে সংসারে আর কিছু দ্রষ্টব্য থাকে না, যাহা হইলে আর কোন কিছু হইতে হয় না, যাহাকে জানিলে আর কিছু

জানিবার আবশ্যকতা থাকে না, তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত।

যিনি সৎস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, যিনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই, যিনি অনন্ত ও নিত্য এবং যিনি স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

যে যোগী পুরুষ যোগবল প্রভাবে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লয় করিয়া সমস্ত বন্ধনের মূল কারণ অবিদ্যাদি মোহপাশ ছেদন করিয়াছেন, জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই তিনকে লয় করিয়া যে মোহশূন্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

রাস

আমাদের একটি কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে, তবে প্রকৃত রাস সম্বন্ধে কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিব। এক ব্রহ্ম আছেন তার একটু নিম্নস্তরে যেন দেখা যায় দুইটি ভাগ রহিয়াছে, একটি কলাইবীজের দুইটি দলের মত 'চিন্ময়ী পরা প্রকৃতি' আর 'চিন্ময় পরম পুরুষ', এই প্রকৃতি পুরুষই হইল এক ব্রহ্মের যুগল ভাব। এই যুগল ভাবই ঘনীভূত হয়ে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম হলেন প্রথম স্তর। চিন্ময় প্রকৃতি-পুরুষ ভাবই হলেন দ্বিতীয় স্তর। আর প্রকৃতি-পুরুষের দেহধারণ হল তৃতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরটি দেখ "চির স্থির নেত্রে দেখ ভবসিন্ধু পারে স্থির যৌবনেরে আর স্থির যৌবনারে।" এই প্রকৃতি পুরুষই চিন্ময় দেহ ধারণ করে "রাধা কৃষ্ণ নামে খ্যাত হয়েছেন। এই যে তিনটি স্তর এর যে স্তরটি যিনি দেখতে পান তাতেই মায়া মুক্তি হয়, ভব বন্ধন ঘুচে যায়। কেহ বা তিনটি স্তরই দেখতে পান।

প্রথম 'এক ব্রহ্ম',
দ্বিতীয় 'চিন্ময় প্রকৃতি পুরুষ',
তৃতীয় 'যুগল মূর্ত্তি'।

প্রকৃতি পুরুষ দুটি
পূর্ণ রসে উঠে ফুটি
দুই অর্ধ এক হয়ে
নির্গুণ সমধি হবে
নির্গুণ সমাধি শেষে
আবার বিভিন্ন দুটি
নব দম্পতির ভাব,
ভাবুক দেখিছে ভবে।
পুরুষের পানে ধায়
হৃদয় নারীর।
সেটি সে মূলের ভাব,
পরা প্রকৃতির।

আল্লা ও ভগবান

মুসলমানগণ যে নাম দ্বারা ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহার সহিত অথর্ববেদীয় অল্লোপনিষদোক্ত ভগবান অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের নামেরও অতি সুন্দর মিল রহিয়াছে। যথাঃ- পরমাত্মা অল্ল নিত্য পূর্ণ - - - পরব্রহ্ম অল্লই মায়াবশ হইয়া বহুবিধ হইয়াছিলেন - - - হে চিত্ত, রসুল অল্লকে অর্থাৎ রসস্বরূপ আনন্দময় পরব্রহ্মকে চিন্তা কর।''

অল্ল বা অল্‌ল = পরব্রহ্ম; অললা = প্রকৃতি, জননী বা শক্তি; ইল্লা, ইল্‌লা = একীভূত অদ্বিতীয়, রসুল = রস বা আনন্দ।

অর্ধচন্দ্রের উপর তারকা শোভিত চিহ্নই মুসলমান গণের জাতীয় ধর্ম চিহ্ন, উহার সহিত হিন্দুগণের চন্দ্রবিন্দু (ঁ) বা প্রকৃতি পুরুষাত্মক নাদবিন্দুরও বেশ মিল দেখা যায়। ওঁকারের উপরি ভাগেও

ঐ প্রকার চিহ্ন সুশোভিত রহিয়াছে। সুতরাং ধর্ম জগতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণের মধ্যেও সুন্দর মিল ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

প্রকৃত ভগবান ও আল্লাতে কোন পার্থক্য নাই। বুদ্ধির অল্পতা হেতু আমরা রাম ও রহিমে ধর্ম লইয়া পরস্পর মারামারি দলাদলি করিয়া থাকি। সেইরূপ শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যেও পরস্পর যে মিল আছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইবার শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে কোথায় ভেদ আছে তাহা দেখা যাক।

একটি প্রবাদ আছে-শিব ও রামে কোন ভেদ নাই, তাঁহারা একাত্ম এবং অভেদ; তবে যত ভেদভাব যত মারামারি, কাটাকাটি শিবানুচর ভূত প্রেত, আর রামানুচর বানর গণের মধ্যে। আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে, মূলে বা সাধনার উচ্চাবস্থায় কোনও ভেদ নাই, কিন্তু নিম্নস্তরেই যত গোলমাল যত ভেদভাব। শাস্ত্রে আছে যাহারা হরি, ঈশান, গঙ্গা এবং দুর্গাতে ভেদবুদ্ধি করেন, তাহারা নিরয়গামী হন। যথা হে মহাদেবী, ঐক্যজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়ের সম্বন্ধে পূর্ণ অভেদ ভাব ব্যতীত কিরূপে সিদ্ধিলাভ হইবে? কেহ কেহ শাক্ত ও বৈষ্ণব কে সাধনার পরপর দুইটি অবস্থা বা স্তর রূপেও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে যতদিন মানবগণ মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিতে না পারে, যতদিন তাহাদের অধীন হইয়া পরিচালিত হয়, ততদিন তাহারা শাক্ত। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদিকে জয় করিবার জন্য চেষ্টা বা সাধনা করা হয় ততদিন তাহারা শাক্ত। আর যখন মন ও ইন্দ্রিয়াদি জয় হইয়া মানবগণ জিতেন্দ্রিয় ও জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করেন, তখন তাঁহারা বৈষ্ণব পদবাচ্য। এ বিষয়ে তাঁহারা শিব ও দাক্ষায়নী সতীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন। শিব আপন শক্তিকে বশে রাখিতে পারেন নাই - সতী শিববাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষ যজ্ঞে গমন করতঃ শিবনিন্দা শুনিতে শুনিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সতীর জন্য শিব উন্মত্ত প্রায় হইলেন, সতীকে কাঁধে লইয়া নানা স্থলে ঘুরিতে লাগিলেন পরিশেষে বিষ্ণুচক্র দ্বারা সতীর দেহ খণ্ডিত হইলে তিনি যোগাসনে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এদিকে সতী

মেনকা গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন কিন্তু শিবের ধ্যান আর কিছুতেই ভঙ্গ হয় না। তখন সকলে পরামর্শ করতঃ মদন দ্বারা শিবের ধ্যান ভঙ্গের চেষ্টা করিল শিবকোপে মদন ভস্মীভূত হইল; তখন গৌরীরূপা প্রকৃতি শিবের দাসীরূপে আত্ম সমর্পণ করিলেন, অর্থাৎ যতদিন শিব শক্তির জন্য লালায়িত ছিলেন, ততদিন তিনি শাক্ত। কিন্তু যখন মদন ভস্ম হইল (জিতেন্দ্রিয় হইলেন) আর প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করিলেন (অর্থাৎ শক্তি জ্ঞান লাভ ইহল) তখনই শিব পরম বৈষ্ণব হইলেন।

ইহাতেই বুঝা যায় শাক্ত এবং বৈষ্ণবের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

গীতা শাস্ত্রমতে চার প্রকারের লোক আমার ভজনা করে না।

১। **মূর্খ** ঃ- আমার সম্বন্ধে যাহাদের কোন জ্ঞান নাই, পশুর মত আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ব্যতীত আর কিছুই বোঝেনা তাহারা সাধনার দিক দিয়াও যায় না।

২। **নরাধম** ঃ- যাহারা আমাকে একটু একটু বুঝে কিন্তু বিষয়াদিতে অত্যন্ত আসক্তি বা রতি থাকে। কূটস্থে দৃষ্টি তাদের থাকে না, মনিপুরের নীচেই তাহাদের মন পড়িয়া থাকে ইহারা নামে মাত্র মানুষ। কেবল অপকৃষ্ট কর্মেই রত, তাই মানুষের মধ্যে ইহারা অধম, সাধন পাইলেও সাধন করিতে পারে না।

৩। **মায়াপহৃত জ্ঞান** ঃ- যাহারা সাধু সদ্‌গুরুর নিকট কখন কখন উপস্থিত হইয়া আত্মজ্ঞানের কথা, ভগবানের কথা শুনে, কিন্তু

সেই সকল বাক্যের মধ্যে কোথায় দোষ আছে সেই সব কুযুক্তি খুঁজিয়া বেড়ায়. মায়ার দ্বারা এতদূর আবৃত যে এইসব তত্ত্বকথা শুনিল, হয়তো কিছু উৎসাহও হইল, কিন্তু পরক্ষণেই কাহারও যদি সর্বনাশ করিলে নিজের কিছু লাভ হয় বুঝিতে পারে তখনই তাহার পানে ছুটিয়া যায়। সংসার কিছু নয় সব মায়ার খেলা এই সব শুনিল, মনে লাগলও বেশ কিন্তু তখনই যদি কোন নিকট আত্মীয়ের পীড়া বা কাহারও কোন বিপদের সংবাদ পায়, তখন আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না। লোক দেখান সাধনা করিতে বসে কিন্তু যদি কাহারও কাছে শুনিতে পায় অমুক স্থানে এক সাধু আছে তিনি ফুঁ দিয়া লোহাকে সোনা করিতে পারেন, তখনই ছুটে যায় তাঁহার কাছে লোহাকে সোনা করিতে। সাধনা মাথায় উঠে যায়, এই তাদের চিরন্তন প্রকৃতি।

৪। **অসুর প্রকৃতি ঃ-** এই সব লোকেরা অত্যন্ত অভিমানী হয় এবং স্পর্দ্ধিত হয়। জানে ভগবৎ সাধনা করিলে মঙ্গল হইবে কিন্তু সদ্‌গুরুর নিকটে যাবে না। গেলে যদি তাঁহার কাছে যাইয়া মাথা নত করিতে হয়, নিজেকে ছোট হতে হয়। এই সব লোক তা সহ্য করিতে পারে না। যাহা জানে না তাহাও ওসব আমার জানা আছে বলিয়া নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিতে চায়। এ জন্য যদি মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয় তাতেও তাহারা পেছপা নয়। কোন জায়গায় কোন ভাল সাধু আছেন, লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে এরূপ যদি শুনে তাহারা তাহাও সহ্য করিতে পারে না। অনর্থক সেই সব সাধু মহাপুরুষদের নামে অপবাদ প্রচার করে। এই প্রকৃতির লোক এইরূপ নানা দোষে দোষী হইয়া থাকে।

চার প্রকারের লোক ভজনা করে।

আর্ত্ত ঃ- রোগ হইয়াছে চিকিৎসকের কাছে যাইলেই তো হয়, এ জন্য ভগবানকে ডাকা কেন? চিকিৎসকেরা যখন আর রোগের কিনারা করিতে পারে না, তখন আর্ত্ত ব্যক্তি রোগের যাতনায় কাতর হইয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। রোগ ভাল হইয়া যাইবে বলিয়া

বাবা তারকনাথ, বাবা বৈদ্যনাথের দরজায় লোকে এখনও ধন্না দেয়। কেহবা সাধুর নিকট সাধন শিক্ষা করে এই আশায় সাধুর আশীর্ব্বাদে যদি রোগ সারিয়া যায়। অথবা তাঁহার প্রদর্শিত সাধন পন্থায় যদি ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করে। দস্যু-ব্যাঘ্রাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল চিত্তে ভগবানের নিকট কাতর ভাবে প্রাণভিক্ষা করাও আর্ত্ত ভক্তের লক্ষণ। প্রাচীন কালে গজেন্দ্র গ্রাহ ভয়ে এবং দ্রৌপদী সভা মধ্যে বিবসনা হইবার ভয়ে যে প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিয়া ছিলেন ও তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, ইহাও আর্ত্ত ভক্তির সুন্দর দৃষ্টান্ত। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণায় উদ্ব্যস্ত হইয়া অর্থাৎ ভবরোগে কাতর হইয়াও কেহ কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হন।

জিজ্ঞাসু ঃ- আত্মানুসন্ধানের জন্য সাধু সঙ্গ করেন, শাস্ত্রাদি পড়েন, ব্রহ্ম কি? জগৎ কি? আমি কে? এই সব বিচার করেন এবং সাধনাভ্যাস করেন তাঁহারাই জিজ্ঞাসু। প্রতি যুগেই জিজ্ঞাসু ভক্ত অনেক দেখা যায়। এ হেন কলিযুগেই জিজ্ঞাসু ভক্তের অভাব নাই। এত বড় বিরাট বিশ্বটি দেখিয়া জিজ্ঞাসু না হওয়াই খুব আশ্চর্য্যের কথা।

অর্থার্থী ঃ- ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের জন্য ভগবানের সাধনা করা। ইহাদেরও ভগবানের উপর খুব বিশ্বাস। সমগ্র বিশ্বের প্রভু, সর্ব কর্মক বিধাতা বলিয়া তাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ভগবৎসেবা দ্বারা তাঁহারা সর্বাভীষ্ট লাভ করিবেন। এখানে এত বিশ্বাস যে বিচারের প্রয়োজন হয় না। শাস্ত্র গুরুবাক্যে তাহাদের মনে কোন অবিশ্বাসই আসে না। শাস্ত্রনির্দিষ্ট সমস্ত ব্রত নিয়ম পূজাদি ইঁহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া পালন করেন। ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। কিন্তু এখনও প্রাণে এভাব আসে নাই, যে ভগবানের উপর দেনা পাওনা ছাড়া আরও যে কিছু প্রাপ্তব্য ও জ্ঞাতব্য আছে, তিনি যে আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি যে আমাদের সর্বস্ব, তিনি যে 'আমার আমি।' ভাবের এই গম্ভীরতাটুকু তখনও তাঁহাদের হয় নাই। অর্থার্থীরা ক্রিয়া করিয়া কেবল শান্তি ও বিভূতিই অন্বেষণ করেন। ইঁহারা পানও তাই। শক্তি

আয়ত্ত হইয়াছে, সেইজন্য জিজ্ঞাসু অপেক্ষা ইঁহারা শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর লোক সম্প্রতি বড় দেখা যায় না। ধ্রুব প্রভৃতি এই শ্রেণীর পরে মুক্তি লাভ করেন।

৪। জ্ঞানী ঃ-উপরোক্ত তিন প্রকারের ভক্তই সকাম। জ্ঞানী ভক্তই কেবল নিষ্কাম। জ্ঞানীর মনে কোন ফলাভিসন্ধান নাই। প্রাণের টানে পড়িয়া ভগবান ব্যতীত কিছুই তাঁহার প্রাণে ভাল লাগে না। যাহা কিছু জীবনে তিনি করেন সবই ভগবানের জন্য। কোন বাসনা বা কামনা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। ইঁহারা তত্ত্ব সাক্ষাৎকারী পুরুষ, ব্রহ্মানন্দে বিভোর। জ্ঞান বৈরাগ্য সম্পন্ন পুরুষ, আত্মপ্রেমে মত্ত মাতোয়ারা। দেহ বিভ্রমশূন্য।

পরব্রহ্মের স্বরূপ

ময়ি সর্বমিদং প্রোতম্ সূত্রে মনিগণা ইব।
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা।
সর্বত পাণিপাদন্তং সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।
বহিরন্তশ্চ ভূতানামাচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।

ব্যাখ্যা ঃ- সূত্রে যেমন মণি সকল গাঁথা থাকে সেইরূপ এই জগৎ ব্রহ্মান্ড গ্রথিত রহিয়াছে আমারই মধ্যে। অব্যক্তমূর্ত্তি আমা কর্ত্তৃকই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

আমি সর্বত্রই হাত, পা, মুখ এবং মস্তক বিশিষ্ট রহিয়াছি এবং সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া সর্বত্র অবস্থান করিতেছি।

ভূতগণের চঞ্চল প্রাণরূপে আমি, স্থির প্রাণ কূটস্থ চৈতন্যরূপেও আমি অন্তরে বিরাজ করিতেছি।

আমি দূর হইতেও দূরে এবং নিকট হইতেও অতি নিকটে অবস্থান করিতেছি, অর্থাৎ অজ্ঞানীর কাছে আমি দূরে, জ্ঞানীর নিকট আমি অতি নিকটে অবস্থান করিতেছি।

গীতা শব্দের অর্থ

১ম অর্থ ঃ- গীতা - গৈ ধাতু + ত + আ। গৈ ধাতু মানে গান করা, ('ত' মানে পার হওয়া + অ) তরণ এবং আ মানে শক্তি (কুলকুন্ডলিনী)। তাই যে গীত (গান) গাইলে যোগী ভব পার হওয়ার শক্তি প্রাপ্ত হন তাহাই গীতা।

২য় অর্থ ঃ- 'গী' এবং 'তা' এই দুই শব্দ যোগে হইয়াছে গীতা। গী মানে গীত (গান); তা মানে সমতা এবং একতা এই দুই শব্দের নির্দেশক। যে গীত গাইলে, সুর করিয়া পাঠ করিলে যোগী তা (সমতা বা একতা) প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যোগী শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রথমে সমতা লাভ করিয়া ভগবান সহ মিলিত হন, পরে ভগবান সহ একতা লাভ করিয়া ভগবানে মিশিয়া যান তাহাই গী এবং তা মিলিত গীতা।

৩য় অর্থ ঃ- গীতা শব্দে দুইটি অক্ষর 'গী' আর 'তা'। 'গী' মানে গীত 'তা' মানে সমতা একতা; ঐ 'গী' গাইলে তবে 'তা' পাওয়া যায়।

গীতার ১৮টি অধ্যায় ইহা আমরা প্রত্যেকেই জানি। এই ১৮টি অধ্যায় বা ধাপই গীতার ১৮ অধ্যায়।

যথা ঃ- গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিতা, নন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী।

গীতাতে কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান নামক তিন ষটকেতে বিভক্ত। ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত 'কর্ম্ম' নামক প্রথম ষটক। ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্যন্ত 'ভক্তি' নামক দ্বিতীয় ষটক। ১৩ অধ্যায় হইতে ১৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত 'জ্ঞান' নামক তৃতীয় ষটক। এই তিন ষটকের শ্লোক সংখ্যা হইল ৭০০শত, তাই গীতাকে সপ্তশতী বলা হয়।

কিছুই না করা অপেক্ষা ঈশ্বর সাধনা কিছু করা ভাল।

মহাত্মাগণ অনেকেই বলেন দেব দেবীর মূর্ত্তিপূজা কখনই বৃথা হয় না এবং উহা সুখদায়ক কিন্তু মুক্তিদায়ক নহে। "গঠন শূন্য গোটাস্বর্ণ পাইলে তাতে কি হবে? উহা কামার বাড়ীই থাক্।" নারীগণ গোটাস্বর্ণ পাইলে তখনই ছুটিয়া সেক্‌রা বাড়ী যায় নানারূপ মনোমত অলংকার প্রস্তুতের জন্য। সেইরূপ গঠন শূন্য গোটাব্রহ্মও চাহি না উহা সাধু মহাত্মাদের নিকটই থাকুক। অল্পবুদ্ধি মানব আমরা গোটা ব্রহ্ম চাহি না, আমরা ঐ ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার ঠাকুর গড়াইয়া তাহার পূজা অর্চনা করিতে চাই। কিন্তু আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে গহনাগুলি সমস্তই স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেই রকম ঐ ঠাকুর দেবতাগুলি ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। আজ কাল যেরূপ পূজা অর্চনার প্রধান অঙ্গ হইল মাইক, সাজসজ্জা, আলোক প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বর; ঐরূপ পূজাতে ঈশ্বরকে অচিরাৎ বৈকুন্ঠ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে। পূজার ফল পাওয়া তো সুদূর পরাহত। নচেৎ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে পূজাদির শুভ ফল কিছু ফলিবেই। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকা অপেক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্যে যাহা কিছুই করা যাউক না কেন তাহাই মঙ্গল দায়ক। এ সম্বন্ধে আর বেশী লেখা বাহুল্য মনে করি।

কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি সম্বন্ধে

গীতায় ভগবান কর্মের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন হে অর্জুন, এই পৃথিবীতে তোমার কর্ত্তব্য কর্ম কিছু নাই, আবার অকর্ত্তব্যও কিছুই নাই, প্রাপ্তব্য, অপ্রাপ্তব্যও কিছু নাই, তুমি ও আমি কর্ত্তব্য কর্মে রত রহিয়াছি - ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ভগবান কর্মের পক্ষপাতী।

যোগের প্রশংসা করিয়াও বলিতেছেন - তপস্বী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। এমন কি কর্মী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জুন তুমি যোগী হও। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে তিনি যোগের পক্ষপাতী।

জ্ঞানীরও প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন - জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর ইহ সংসারে কিছুই নাই।

ভক্তির প্রাধান্য দেখাইয়া বলিতেছেন - হে কৌন্তেয় তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।

নিজ নিজ কর্ত্তব্য প্রত্যেকে পালন করিতেছে।

জীবন্মুক্ত পুরুষগণ সংসার-ব্যবহারে রত থাকিয়াই "শ্বাস-চৈতন্যে ও আকাশ-চৈতন্যে মনের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া থাকেন। জীবন্মুক্ত প্রহ্লাদ অমৃত জ্ঞান লাভ করিয়াও পাতালে দৈত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবুদ্ধ বৃহস্পতি দেব কার্য্য করিতেন। ব্রহ্মাও জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া ব্রহ্মান্ড সৃজনে বিরত হন নাই। ভগবান স্বয়ং মুক্তি

স্বরূপ হইয়াও চিরদিন অখিল পালনে আলস্য করেন না। চিদানন্দময় হরও প্রেমময়ী গৌরীকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। মুক্তিরূপা পার্বতীও ত্রিলোচনের প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিলেন। জীবন্মুক্ত নারদও সতত কলহপ্রিয় হইয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেছেন। মহামুনি বিশ্বামিত্রও ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়াও যজ্ঞ তপস্যাদি কর্মে বিরত হন নাই। মহা তেজস্বী সূর্য্যও নিজ কর্ত্তব্যরূপ দিন প্রকাশে ক্ষান্ত হন নাই। মৃত্যুরাজও তাঁহার ধ্বংস নীতি অদ্যপি পরিত্যাগ করেন নাই। তবে আমিই বা কেন কর্মে বিরত হইয়া কর্ম ত্যাগ করিব। কর্মত্যাগী অলস ব্যক্তিকে ধিক্।

অষ্ট পাশ

এক্ষণে অষ্ট পাশ সম্বন্ধে কিছু সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। অষ্ট পাশ যথাক্রমে ঃ- কুল, শীল, মান, ঘৃণা, লজ্জা, জুগুপ্সা, শঙ্কা, ভয়।

কুল ঃ- কুলের অভিমান আমাদের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নচেৎ সাধন জগতে আমাদের উন্নতি হওয়া কঠিন। আমি কুলীন শ্রেষ্ঠকুলে আমার জন্ম। এইরূপ অহংকার সাধনার অন্তরায়। ধর্মাচরণে কুলীন অকুলীন উচ্চ জাতি নীচ জাতি ভেদ নাই ইহা শাস্ত্রবাক্য।

শীল ঃ- আন্তরিক স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া, মনের কপটতা, খলতা ইত্যাদি সংশোধন করিবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করা।

মান ঃ- মান যশের অভিমান থাকিতে ধর্ম জগতে উন্নতি লাভ করা বড়ই কঠিন এ জন্য উহা ত্যাগ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, "তৃণাদপি সুনীচেন" উপদেশ দিয়াছেন।

ঘৃণা ঃ- ঘৃণা ত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, বিচার করিলে ঘৃণার বস্তু বলিয়া জগতে কিছু নাই। যাহা একজনের ঘৃণার বস্তু, তাহা অন্যজনের নিকট ঘৃণার বস্তু নয়, যে বিষ্ঠা আমাদের নিকট ঘৃণার জিনিষ তাহাই আবার এক শ্রেণীর লোক মাথায় বহন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

লজ্জা ঃ- দেখা যায় মানুষ চক্ষুলজ্জার খাতিরে আপন আপন কর্ত্তব্য পালনে কুণ্ঠিত হয়। একটা উপমা দিই - আমি যদি নেচে নেচে সংকীর্ত্তন করি তবে লোকে আমাকে কি বলবে?

জুগুপ্সা ঃ- কাহারও নিন্দা না করা, পরনিন্দা মহাপাপ। ইহাতে আপনার চিত্ত কলুষিত হয় ও মলিনতা প্রাপ্ত হয়।

শঙ্কা ঃ- এই ছেলেটির অসুখ যদি ভাল না হয়, এই কার্য্যটি যদি আমার সফল না হয়, এই টাকা যদি আদায় না হয়, এই মামলাটায় যদি আমার জয়লাভ না হয়, এইরূপ মনে মনে অনবরত জল্পনা কল্পনা করা বুদ্ধিমানের আদৌ সমীচীন নহে।

ভয় ঃ- ভয়ের মূল কারণ - মৃত্যু, আমরা বাঘ দেখে ভয় করি, সাপ দেখে ভয় করি, ভূত দেখে ভয় করি, কারণ এই বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গে, এইরূপ সদা সর্বদা অনর্থক চিন্তা না করা। শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে বহু উপদেশ আছে, মোটামুটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

যোগের সপ্ত ভূমি

যোগের সপ্তভূমি যথাক্রমে ঃ- শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংশক্তি, পদার্থভাবনী ও তুর্য্যাবস্থা।

১-২। **শুভেচ্ছা ও বিচারণা** - এই দুইটি সাধন লক্ষণ মাত্র।
৩। **তনুমানসা** ঃ- মন থাকে কিন্তু ভেতরে ডোবা।
৪। **সত্তাপত্তি** ঃ- সত্তা যে আত্মা তাহাকে প্রাপ্তি। ঐ অবস্থায় সাধকের জগৎ ভুল হয়। এমন কি আপনাকে আপনি ভুল হইয়া যায়।

আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে।।

৫। **অসংশক্তি** ঃ- দেহাদিতে সম্পূর্ণ উদাসীন। জনম মরণ, জরা ব্যাধি, সুখ দুঃখ, মান অপমান, ভয় অভয় ইত্যাদির ভ্রম জ্ঞান সেখানে পৌঁছাইতে পারে না।

৬। **পদার্থ ভাবনী** ঃ- অনবরত ব্রহ্ম চিন্তা দ্বারা বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন।

৭। **তূর্য্যাবস্থা** ঃ- সেখানে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা কিছুই নাই, ইহাই পাকা যোগারূঢ় অবস্থা। সমাধির শেষ - যাহা বলিবার জো নাই।

পাপাসক্ত ব্যক্তিকে ভগবানের অভয় দান।

অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তিকেও অভয় দিয়া ভগবান বলিতেছেন হে জীব, তুমি এ যাবৎ অতি বিগর্হিত কর্ম সব করিয়াছ, এখন কি তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হইতেছে? তোমার কোন উপায় নাই, তোমাকে রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। এইবার কি তুমি আমার শরণাপন্ন হইতে পার? যদি আমার শরণাপন্ন হইতে পার তবে তোমার আর ভয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে ভজনশীল হওয়া আবশ্যক, কারণ যাঁহারা ভজনশীল হয় তাঁহারাই অভয় লাভ করে।

অতএব ভগবৎ ভজনাই পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। বাস্তবিকই তো যাহার চিত্ত আত্মাতে রমণ না করে, সে তো দুষ্ট কর্ম করিবেই। কিন্তু এইরূপ দুষ্ট বুদ্ধি লোকেদেরও কোন কালে উদ্ধার হইবে না তাহা নহে। যে যত কুক্রিয়াসক্তই হউক একদিন না একদিন তাহাকে জাগিয়া উঠিতে হইবেই। ইহাই ঐশ্বরিক নিয়ম। যদি বল অতি কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাহার ভজনা করিবে কি করিয়া? সে ইচ্ছা করিলেও কি সহজে ভগবানে মন লাগাইতে পারিবে? অনন্যভক্তি হওয়া তো দূরের কথা সাধারণ ভাবে ভজনা করা তাহার পক্ষে দুরূহ। প্রথম প্রথম পারিবে না বটে, তবু যদি কোন প্রকারেও মনটা ভগবানের দিকে যায়, তাহা হইলেও সে একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবে না। যেমন মনে কর কোন দুরাচার ব্যক্তি কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত হইয়াছে, এখন তাহার সুবৈদ্যের আশ্রয় ব্যতীত উপায় কি? তাহার দেহাভ্যন্তরের নিদারুণ রোগ যাতনাই যে তাহাকে চিকিৎসকের দ্বার প্রান্তে উপনীত করিবে। মানুষ যখন নিজকৃত পাপের জ্বালায় দগ্ধ হইতে থাকে, তখন যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, যিনি ভগবান, যিনি জীবের আত্মা সেই আত্মার শরণ গ্রহণে কি জীব উপেক্ষা করিতে পারে? যে তাঁহার শরণ লয় শরণাগতবৎসল কখনও তাহার আবেদন উপেক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু প্রকৃত শরণাগত হইতে হইবে — মন দিয়া ক্রিয়া করিতে করিতে মনকে নিশ্চল করিয়া তুলিতে হইবে। তবে ইহা মনে করিও না যে কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার শরণ লইবা মাত্রই তাঁহার বৈকুণ্ঠের পার্ষদ হইয়া দাঁড়াইবেন। তবে তাঁর চিত্ত যে এ পর্য্যন্ত উল্টা পথে চলিতেছিল, সেই উল্টা পথ হইতে তাঁহার চিত্ত সরিয়া যাইবে। তাঁহার চিত্তের গতির পরিবর্ত্তন হইবে। এইরূপ সুপথ ধরিয়া যে চলিতে আরম্ভ করে, ধীরে ধীরে তাহার মনের উন্নতি হয়, আরও পরে, আরও পরে তাহার চিত্ত অনন্যভাবে আত্মাতে রমণ করে। সেই জন্যই দুরাচার ব্যক্তিও যখন আত্মনিষ্ঠ হইয়া ভজন আরম্ভ করিয়া দেয় সে ভজনে আনন্দ লাভ করে, তখন তাহাকে সাধুর মধ্যে গণ্য করিতেই হইবে। কেননা ঐ আত্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান ব্যক্তি অচিরেই দুষ্কৃতিমুক্ত হইবে ও তাহার আর কুক্রিয়ায় আসক্তি বা

প্রবৃত্তি থাকিবে না। কর্ম তখনই অশুভ কর্ম হয় যখন তাহা জীবকে জন্ম মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ করে। এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরিয়া বেড়ানোই তো পাপের ফল। শুভাশুভ বাসনার দ্বারা জীব এই কর্ম চক্রে জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু যে আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ক্রিয়া করে, সে যদি পূর্ব প্রকৃতি দ্বারা অবশ হইয়া মধ্যে মধ্যে কুকর্মও করিয়া ফেলে তবুও তাহার কোন ভয় নাই, সে শীঘ্রই অশুভ সংস্রব ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। তাহার কারণ যে ব্যাকুল প্রাণে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে সাধন করে, সে ভজনানন্দের রস পাইবেই! ভজনানন্দের রস পাইলেই বিষয়ানন্দকে বিরস বোধ হইবেই। যেরূপ দস্যু রত্নাকর মহামুনি বাল্মীকি হইয়াছিলেন। অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে নিমেষ মাত্র ভগবানের ধ্যান বা চিন্তা করে, তো সে ব্যক্তি তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং সে ব্যক্তি যে পংক্তি বা লোকমন্ডলীর মধ্যে বাস করে তাহাও পবিত্র হইয়া যায়।

সুষুম্না নাড়ীর বর্ণনা।

এক্ষণে আমাদের সর্বপ্রথম কর্ত্তব্য প্রাণপণ যত্নের দ্বারা ক্রিয়া করিয়া সুষুম্নাকে জাগাইতে হইবে। সুষুম্না জাগ্রত হইলে আমরা জ্ঞানের দ্বারায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিব যে এই সুষুম্না নাড়ীতেই চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্দশ ভুবন, পূর্ব প্রভৃতি দশদিক, কাশী, গয়া, হরিদ্বার, বৃন্দাবন প্রভৃতি সর্ব তীর্থক্ষেত্র, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি সপ্তনদী, দ্বীপসমূহ, পর্বত, শিলা, সাম প্রভৃতি বেদ চতুষ্টয়, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, গায়ত্রী আদি ছন্দসকল, সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ প্রভৃতি তিনগুণ এই সুষুম্না নাড়ীতেই সকলই প্রতিষ্ঠিত। জগতের যাবতীয় ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ এই নাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সুষুম্না নাড়ী সর্ব জীবের আধার স্বরূপ। ইহা হইতে নানাবিধ নাড়ী উৎপত্তি হইয়া শরীরের সকল অংশে সঞ্চারিত হইতেছে। এই সুষুম্না নাড়ীতেই মূল ও অধঃদিকে শাখা বিশিষ্ট একটি বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই সুষুম্না নাড়ী সম্বন্ধে বহু মনীষী বহুশাস্ত্রে বহুপ্রকারে

আলোচনা করিয়াছেন। তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাই আমি সংক্ষেপে মোটামুটি আলোচনা করিলাম।

মৌন, অনীহা প্রভৃতি সম্বন্ধে।

মৌন ঃ- অর্থাৎ যাহার বাক্য সংযম হইয়াছে। অর্থাৎ যাহার মন ব্রহ্মে লীন হওয়ায় কথা কহিবার ইচ্ছা নাই। জোর করিয়া কথা বন্ধ করিয়া রাখা অথবা না কথা কহিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা মৌনের লক্ষণ নহে। যেমন দুগ্ধপোষ্য বালক অথবা বোবা ইহাদের কথা কহিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু শক্তি নাই বলিয়া কথা কহিতে পারে না, ইহাদিগকে মৌনী বলা যায় না। "মুনিঃ সংলীন মানসঃ।"

অনীহা ঃ- অর্থাৎ নিঃস্পৃহতা, যাহা ইচ্ছারহিত অবস্থায় হয়, যখন ইচ্ছা নাই তখন চিন্তা নাই, চিন্তা নাই তো ক্ষয়ও নাই। "চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাম্।" অনিলায়াম্ প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তের লয় হয়, সুতরাং প্রাণায়াম চিত্তের দন্ড স্বরূপ।

উপরোক্ত অবস্থা যাঁহার হয় নাই, তিনি মৌনী বা যোগী পদবাচ্য নহেন।

মুক্তির প্রকার ভেদ

কয় প্রকারের মুক্তি শাস্ত্রে আছে তাহা আমাদের জেনে রাখা আবশ্যক।

সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, সাষ্টি ও কৈবল্য - মুক্তি এই পঞ্চপ্রকার। কেহ কেহ সাযুজ্য ও সারূপ্য মুক্তি মুলতঃ এক প্রকার ভাবাপন্ন বলিয়া মনে করায় সারূপ্যকে বাদ দিয়া সালোক্য ভাবেরই অর্ন্তভুক্ত সামীপ্য নামক আর একটি মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

ভগবৎ লোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য, তাহার সমীপে বাস করার নাম সামীপ্য। তৎ স্বরূপে অবস্থান করার নাম সাযুজ্য, ব্রহ্মের কোন প্রকার মুর্ত্তি বিশেষে মনের লয় করার নাম সাষ্টি। এই চারিপ্রকার মুক্তি। ইহার পর প্রাণায়াম রূপ আত্মকর্মের পর অবস্থার পরাবস্থায় যে মুক্তি লাভ হয় তাহাকে কৈবল্য অবস্থা বা নির্বাণ মুক্তি বলা হয়। যাঁহাদের ঐরূপ মুক্তি লাভ হয় তাঁহারা ব্যতীত আমাদের মত সাধারণ লোকের ধারণা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

প্রকৃত সুখ আত্মায়

আত্মা ধন হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত প্রিয় হইতেও প্রিয়তর এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। অতএব আত্মাতেই সমস্ত সুখ কেন্দ্রীভূত। আত্মা আর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান অভিন্ন। সুতরাং সর্ববিধ সুখ একমাত্র শ্রীভগবানেই বিরাজমান। বিশেষতঃ ভগবান স্বয়ং সুখ স্বরূপ এবং ব্রহ্মানন্দ রসে পরিপূর্ণ। জীব জগতের যাবতীয় সুখ একমাত্র সেই সর্বাধার হইতেই সতত উৎসারিত। তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র সুখের অনুসন্ধান বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব আমরা যদি প্রকৃত সুখের মুখ দেখিতে চাই তবে সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের বা পরমাত্মা আত্মনারায়ণের সাধ্যমত দৈনিক কিছু না কিছু উপাসনা করা একান্ত প্রয়োজন। নচেৎ অন্যত্র সুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

কর্মের প্রকার ভেদ

কর্ম তিন প্রকার; প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং ক্রিয়মান। প্রারব্ধ কর্মের ফল আমাদিগকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়। এমন কি সিদ্ধমুক্ত পুরুষরাও এই কর্মফল ভোগ হইতে নিস্তার পান না।

ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন ঃ- প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ

সমুদয় ভস্ম করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম (প্রারব্ধ ছাড়া) ভস্মীভূত করে। কাহারো কাহারো মতে ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয়। জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হয় আর আগামী কর্ম জ্ঞান প্রভাবে স্পর্শ হয় না। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ধরা যাউক ঃ- একজন ব্যাধ তীর ধনুক হস্তে দন্ডায়মান। সে একটি তীর ছাড়িয়া দিয়াছে। আর একটি ছাড়িবার উপক্রম করিতেছে অর্থাৎ সে ধনুকে তীর সংযোজন করতঃ তাহা নিক্ষেপ অর্থে গুণে টান দিয়াছে। তাহার পৃষ্ঠে তূণীর মধ্যে কতকগুলি তীরও সঞ্চিত আছে।

এক্ষণে বিচার করিলে দেখা যায়, যে তীরটি পূর্বে ছাড়িয়া দিয়াছে উহাতে ব্যাধের আর কোন হাত নাই; উহা কোন না কোন ফল প্রসব করিবেই করিবে। ইহাই প্রারব্ধ। ইহাতে ব্যাধের কোন হাত নাই। ব্যাধের পৃষ্ঠে তূণীর মধ্যস্থিত তীরগুলিই সঞ্চিত। সে ইচ্ছা করিলে ওগুলি নষ্টও করিতে পারে। আর যে তীরটি সে ছাড়িবার উপক্রম করিয়াছে তাহা উহার ক্রিয়মান কর্ম। ব্যাধ ইচ্ছা করিলে বাণ নিক্ষেপ বন্ধ করিতে পারে; অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মদ্বারা ভাবী কর্মফল নষ্ট করিতে পারে। ইহাই যতদূর সম্ভব তিন প্রকার কর্মের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

প্রকৃত আরতি।

এইবার প্রকৃত আরতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমরা স্বভাবতঃ প্রতিমা পূজা যেরূপ করিয়া থাকি তাহাতে মোটামুটি পাঁচটি উপচারের প্রয়োজন হয়। যথা ঃ- পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও গন্ধ এই পাঁচটির সহিত আধ্যাত্মিক ভাব জড়িত আছে দেখা যায়।

পুষ্প - আকাশ তত্ত্ব, ধূপ - বায়ুতত্ত্ব, দীপ - তেজস্তত্ত্ব,

নৈবেদ্য - রসতত্ত্ব, গন্ধ - পৃথ্বীতত্ত্ব। এই পঞ্চ উপচারে পূজা করার অর্থ পঞ্চতত্ত্ব ভগবানে অর্পণ। প্রতিমা পূজাতে দেব দেবীর আরতি করিবার যে ব্যবস্থা আছে, ঐ আরতিতেও পঞ্চতত্ত্বের ভাব বিদ্যমান আছে দেখা যায়।

দীপ, কর্পূর দ্বারা আরতি প্রভৃতি তেজতত্ত্ব। ধূপ, পাখা, চামর প্রভৃতি বায়ুতত্ত্ব। জলপূর্ণ শঙ্খ - জলতত্ত্ব। সচন্দন বস্ত্র - গন্ধতত্ত্ব, পুষ্প - আকাশ তত্ত্ব। এই সকল তত্ত্বময় উপচার দ্বারা আরতি করার বিধান দৃষ্ট হয়। জীবদেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এই পঞ্চতত্ত্বে গঠিত। সাধক পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা দেবতার আরতি করতঃ এক একটি করিয়া আপন তত্ত্ব দেবতাকে অর্পণ করেন। ইহার ভাবার্থ এই যে জীবতত্ত্ব পরমতত্ত্বে লয় করিয়া ফেলা। ইহার ভাবার্থ এইরূপ পরিশেষে সাধক একমাত্র আত্মারাম হইয়া পরমানন্দে অবস্থান করেন। ইহাই আরতির আধ্যাত্মিক অর্থ। আজকাল দেব দেবীর পূজায় যে আরতি করা হয়, উহা প্রকৃত আরতি পদবাচ্য নহে। ইহার নিগূঢ় অর্থ মূলাধার স্বাধিষ্ঠানে, স্বাধিষ্ঠান মণিপুরে, মণিপুর অনাহতে, অনাহত বিশুদ্ধাখ্যে, বিশুদ্ধাখ্য আজ্ঞাচক্রে লয় করতঃ পূর্ণ আত্মারাম হইয়া যান। এইবার গীতায় ভগবান যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই পরমগুহ্য ভগবৎ বাণী আমরা এখানে উদ্ধৃত করিব ঃ-

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

ইহাই আরতির চরম উদ্দেশ্য। ইহাই ভগবৎচরণে সাধকের আত্মসমর্পণ।

"আত্মসমর্পণ"

ভক্ত সাধক এইবার ভগবৎ পূজার আয়োজন করিতেছেন। এই পূজার প্রধান অঙ্গ হইল আত্মসমর্পণ। আপনাকে ভগবৎ চরণে নমিত করা। কিন্তু আপনাকে বড় দীন মনে হইতেছে, বড় অসমর্থ মনে হইতেছে। নিরুপায় সখা যেমন সখাকে আত্মসমর্পণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, পত্নী যেমন পতিকে, পুত্র যেমন পিতাকে আত্মসমর্পণ করে, সেইরূপ নিঃসঙ্কোচে ভক্ত সাধক আপনাকে উৎসর্গ করিতেছেন পরমাত্মার নিকট। নিজের দৈন্যের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন, ভগবানকে প্রসন্ন করিতেছেন। ভগবানকে প্রসন্ন করা এবং আত্মাকে প্রসন্ন করা একই কথা। ভগবান প্রসন্ন হন কখন? যখন শ্রীগুরু প্রসন্ন হন। এই গুরুই আত্মা। গুরুর প্রসন্নতা যখন মানস তটে তরঙ্গায়িত হয়, তখন অন্তঃকরণও প্রসন্ন হয়। মনের এই স্থিরভাব বা প্রসন্ন ভাবই শ্রী বিষ্ণুর পরম পদ। এই বিষ্ণুর পরম পদ কাহারা সর্বদা সাক্ষাৎ করেন; যাহারা সুর ও বীর সাধক। এই বীর সাধকেরা কিরূপে প্রণাম করিয়া থাকেন দেখুন ঃ- "প্রণিধায় কায়ং"- কায় - ক + অয়, ই ধাতু হইতে অয় - গমনার্থ। ক - ব্রহ্মা, যাহা ব্রহ্মা হইতে গমন করেন, অর্থাৎ শ্বাস মস্তকে স্থির করিয়া সমগ্র মেরুদন্ডটি ও তৎসংলগ্ন অবয়বটি নিম্নাভিমুখ করিয়া যোগীরা যে সাধনটি করিয়া থাকেন। এখানে সেই সাধনার ইঙ্গিত করিলেন। এই সাধনটির দ্বারা মূলাধারস্থ কুন্ডলিনী চৈতন্যযুক্ত হন। কুন্ডলিনী চৈতন্যযুক্ত হইলেই উহা তদ্‌বিষ্ণুর পরমপদ আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারস্থিত শিবের সহিত যুক্ত হয়। তখন দেহ হইতে চিৎ পৃথক হইয়া পড়ে। তখনই জীব বন্ধন বিমুক্ত হইয়া পরমশান্তি লাভ করেন। ইহাকেই ওঁকার ক্রিয়া বা কূটস্থের মধ্যে শ্বাস বন্ধ করিয়া যোগীরা যে ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাহারও ইঙ্গিত করা হইল। ইহাতেই কূটস্থের পূর্ণপ্রকাশ হয়। ইহাই গুরুর প্রসন্নতা বা গুরুকে প্রসন্ন করা। গুরুও যা আত্মাও তাই। তখন সাধক আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া মায়া, মোহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির কবল হইতে চিরশান্তি লাভ করেন। ইহারই নাম 'তুর্য্যাবস্থা।'

দক্ষযজ্ঞ

যিনি সর্ব কার্যে দক্ষ বা নিপুণ তিনিই হলেন দক্ষ। কিন্তু এই দক্ষ যদি শিব রহিত হন তবে তাঁহার সেই দক্ষতা তামস অহঙ্কারে পরিণত হয়। সুতরাং সৎ কে ধারণ করে আছেন যে বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী বুদ্ধি (অর্থাৎ সতী) তাহার নাশ হয়। এই প্রকাশাত্মিকা 'ধী'র ধ্বংস বা বিলোপ হইলে 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।' শিব অশিবরূপ ধারণ করিয়া যজমানকে বিনাশ করেন। কিন্তু এ বিনাশ শুধু দেহ নষ্ট করা নহে। কুমতির ধ্বংস সাধনই ইহার আসল উদ্দেশ্য। তাই দক্ষ একবার মরিয়াও মরিলেন না, শিব কৃপায় পুনর্জীবিত হইলেন। কিন্তু এবার যে দক্ষতা লাভ হইল তাহা সংসার বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। পরন্তু, 'তাহা পরমার্থাবলোকিনী বুদ্ধি' সেই বুদ্ধি দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। কুকর্ম ও কুবাসনার দ্বারা সত্ত্বগুণ যখন আচ্ছাদিত হইয়া যায়, তখন অজ্ঞান তমসে জ্ঞানরশ্মি আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মেঘ তো মেঘ হইয়াই চিরকাল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া থাকিতে পারে না; তাহা আপনার শক্তিতেই আপনাকে জলধারারূপে পরিণত করিয়া ফেলে, ঘন মেঘের আচ্ছাদন অপসৃত হইয়া যায়।

তখন আবার দিক পরিস্কার হয়, স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। তাই হিরণ্যকশিপু, রাবণ, জগাই, মাধাই সকলেই উদ্ধার লাভ করিলেন।

তুমি কে ?

সকলেই ঘুমিয়েছে, সবই নিস্তব্ধ, জগৎ সুপ্ত মৌন। এ সময়ে কে তুমি জেগে রয়েছ গো? তাড়াতাড়ি হাতের কাজ গুলি সেরে নিচ্ছ - কে তুমি? পাছে সূর্য্য উঠে পড়ে, তাই আগে ভাগে এসে কলিগুলিকে ফুটিয়ে তুলছ। প্রাতঃকালে মধু মক্ষিকা পাছে ফিরে

যায়, তাই তাড়াতাড়ি ফুলের কোষে কোষে তার জন্য মধু সাজিয়ে রাখছ, আমগাছের মুকুলে মুকুলে রস গন্ধ ভরে দিচ্ছ, পাছে উষাকালে কোকিল এসে তার স্বাদ না পায়? মা যেমন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে গৃহস্থালীর কাজগুলি সেরে লন, কে তুমি এই জগৎ শিশুকে অন্ধকারের অঞ্চলে ঢাকিয়া তার চেতনা লোপ করিয়া তাড়াতাড়ি সব কাজগুলি ক্ষিপ্রহস্তে সেরে নিচ্ছ? যেখানে যে ফুরিয়ে গেছে সেখানে তা যোগাইয়া সবই সরস, সবই নবীন করে রাখছ।

হায়! হায়! এ জগতে তাই কোন জিনিষ পুরানো হয় না, তোমার সৃষ্টির মাঝে এমনিই ধারা চলিয়াছে যে, কিছুই পুরানো হবে না। মার স্নেহ কতদিন থেকে পাচ্ছি তবু সে পুরানো হলো না; পুত্র-কন্যাকে কতদিন কত ভাবে আদর করছি, কত স্পর্শ করচি, তবু তার আনন্দ ফুরাল না। প্রতিদিনই মনে হয় পতি পত্নীর সমস্ত প্রেম অভিনয় আজ নিঃশেষ হয়ে গেল, কিন্তু প্রভাতে উঠে দেখি আবার নবীনতর আকর্ষণে অভিন্ন মাধুর্য্যে উভয়ে উভয়কে মুগ্ধ করছে।

হ্যাঁগো, কেমন করে এমনতরো সাজাও। ফুলের গন্ধ কত যুগ হয়ে গেল, তবু তার গন্ধ পুরানো হল না, ভাল লাগছে না, হৃদয় একথা কোনদিন তো বল্লে না? শ্যামল তৃণগুচ্ছগুলি, নবীন কিশলয় গুলি, অগণন তারকামণ্ডিত সুনীল নভোমন্ডল, বালারুণের কিরণ, চন্দ্রের সুনির্মল জ্যোৎস্না, অমাবস্যার ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার, তরুবীথিকায় মৃদু সমীরণ হিল্লোল, জীবনের সুখ দুঃখ, সবই রোজই আসে, অথচ কেউই পুরানো হয় না। প্রভাত হওয়ার আগেই কে তাদের সাজিয়ে গুছিয়ে সৌন্দর্য্য মাখিয়ে নূতন করে আবার পাঠিয়ে দেয়? তারা ঠিক গত দিনের মতই দর্শকের প্রাণ হরণ করে, ভাবুকের প্রাণে কত ভাব জাগায়। এমন পরিপাট্য এমন ব্যবস্থা যার, একবার তাঁর নিরাবরণ রূপখানি দেখিতে ইচ্ছা করে। তাই আবার বলি তুমি কে?

নির্ভাবনা

প্রভো, আমার কাছে আমি যত প্রিয়, তদপেক্ষাও প্রিয়তর আমি তোমার কাছে। তবে কেন আমি আমার জন্য ভাবি? তোমাকে কি আমার বিশ্বাস নাই? তবে হৃদয় কি তোমাকে ঠিক গ্রহণ করে নাই? আমি কই নির্ভর করতে তো পারলাম না। পতিব্রতা স্ত্রীর যদি সব যায়, তার স্বামী থাকে, তিনি হাস্য মুখে সে সমস্ত সহ্য করিতে পারেন। কারণ পতির চেয়ে পতিব্রতার নিকট আর প্রিয়তম কোন বস্তু নাই। যে ব্যভিচারিণী, সে সকলের নিকট আপনার হৃদয়কে যাচাই করিয়া বেড়ায় কিন্তু কোথাও প্রাণ দিতে পারে না। সে তাই কোথাও তেমন আশ্রয়ও পায় না, মন তার কোনখানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসে না। ব্যভিচারিণী স্ত্রীর মত আমার মন এখনও একনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। সে এখনও ঠিক করিতে পারিল না কোনখানে সে আপনাকে দিবে। প্রাণের খরিদ্দার অনেক। যশ, অর্থ, বিদ্যা, স্ত্রী, পুত্র, সংসার সকলেই প্রাণকে কিনিতে চাহে, কিন্তু সকলেই প্রায় বিনামূল্যে কিনিতে চাহে। কারণ ইহাঁর উচিৎ মূল্য কাহারও কাছে নাই। ইহার ঠিক দাম দিয়া কিনিবার সামর্থ্য বড় কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাহার খাতির বুঝে, তাহার প্রকৃত মূল্য যে দিতে পারে, তাঁহাকে সে চিনিয়া লইতে পারিল না এবং আপনারও করিয়া লইতে পারিল না। ভাল না বাসিলেও যিনি তাহাকে ভালবাসেন, মনে না করিলেও যিনি মনে আসেন, সেই চিরদিনের সখা, জীবন মরণের সহচর জীবন বন্ধুকে, রে মন, তুই কোন সম্পদের লোভে, কাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভুলিয়া আছিস? ধন চাও? রূপ চাও? প্রতিষ্ঠা চাও? এত ধন কাহার? এত ঐশ্বর্য্য আর কাহার আছে, সমস্ত ভুবনে তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য ছড়ানো। এত রূপই বা কার? স্বর্গে, মর্ত্যে তাঁহার সে রূপ যে ধরিতেছে না। আকাশে, চন্দ্রালোকে, সূর্য্যালোকে, গ্রহে নক্ষত্রে রূপের হাট বসিয়া গিয়াছে। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নরনারীর মুখে মুখে, চোখে চোখে কি অপূর্ব রূপই বিকশিত হইয়াছে। কত লোক কতদিন ধরিয়া সেই রূপ দেখিতেছে, কত রকম করিয়া কত

লোক তা বুঝিতে চেষ্টা. করিল, কিন্তু কেউ সে রূপের অন্ত পাইল না, কাহারও কাছে সে রূপ পুরানো হইল না। সে কতদিনের কথা, ধ্রুব তাঁহাকে দেখিলেন, প্রহ্লাদ তাঁহাকে দেখিলেন, অম্বরীষ তাঁহাকে দেখিলেন, নারদাদি ঋষিরা দেখিলেন, আবার ব্রজগোপিনীরা দেখিলেন, রাখাল বালকেরা দেখিলেন, অর্জ্জুন, উদ্ধব, যুধিষ্ঠির, বিদুর, ভীষ্ম দেখিলেন, সেই একরূপ, অথচ কি অফুরন্ত শোভা, কি নয়নভুলানো, হৃদয়জুড়ানো সৌন্দর্য্য কোনদিন কাহারও কাছে একটুও হ্রাস হইল না। যে দেখিল সেই উন্মত্ত হইয়া গেল, স্নেহ মমতার সব বন্ধন তাহাদের ছুটিয়া গেল। অর্থ, রূপ, যৌবন খ্যাতির সব মোহ টুটিয়া গেল।

তাঁহাকে প্রাণ অর্পণ করিয়া এমন নিশ্চিন্ত হওয়া আর কোথাও যায় না। আর যাহাকেই প্রাণ দাও, তবু প্রাণের জন্য একেবারে নির্ভাবনা হওয়া যায় না। তার কারণ এত সামর্থ্য আর কাহারও নাই, সে রকম ব্যথার ব্যথী, সে রকম দরদীও আর কেহ নাই। মা যেমন তাঁহার শিশুর মর্য্যাদা বুঝেন, এমনটি আর কেউ নহে, কারণ শিশুর এত অন্তরতর আর কেহই হইতে পারেনা। সেই হৃদয়সখা পরমাত্মা হইতেও তেমনি আমাদের আর কেহ সেরূপ অন্তরতর হইতেই পারে না, সুতরাং তাঁহার মতন করিয়া ভালবাসা আর কাহারও নিকট আশা করিতেই পারি না। তিনি এত ভালবাসেন যে যদি তুমি তাহা স্বীকারও না কর, তবু কোনদিন তিনি তোমার উপর রাগ করিবেন না, অভিমান করিবেন না, শুধু তোমার ব্যবহারে সজলনেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবেন। এই যে কত লোক কত পাপ করিতেছে, তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তিনি কি তাই বলিয়া তাহাকে আশ্রয় দিতেছেন না? না সূর্য্যালোক, হাওয়া, জল সব বন্ধ করিয়া দিয়াছেন? কিছুই না, তিনি জানেন এ অজ্ঞতা তোমার ঘুচিবেই, তাঁহার সঙ্গে তোমার নিগূঢ় সম্বন্ধ তুমি একদিন বুঝিবেই; তিনি কিছুর জন্য ব্যস্ত নহেন। তুমিই বা কেন ব্যস্ত হইবে? দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোক, তাপ সব আসুক না, ভুরিপ্রমাণ সব আসুক তবু ভয় পাইও না। এ
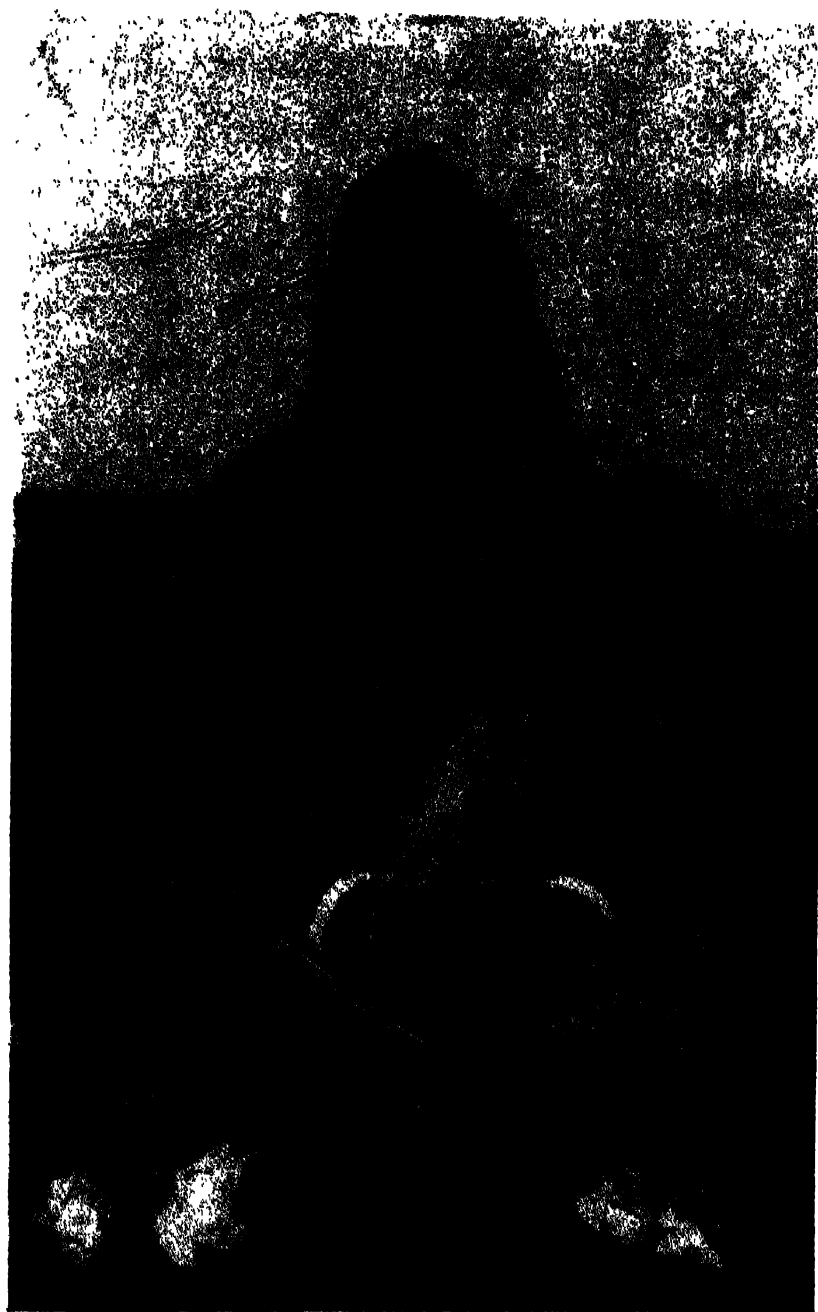
পরম পূজনীয়া মা ওঁ হাসি ভট্টাচার্য্য

যে তাঁহার বাড়ী হইতে সওগাত আসিতেছে। ইহাকে বহু মান্য করিয়া মাথা নত করিয়া বরণ করিয়া লও। তাঁহার দেওয়া ভার বহিতে হইবেই, সহিতে হইবেই। আর এমন দিন কোথায় পাইবে? তাঁহার প্রদত্ত ভার বহন করিবার আর সুযোগ কোথায় পাইবে? এমন নিবিড় করিয়া তাঁহাকে ধরিতে, জানিতে, বুঝিতে আর কোন অবস্থাতে তো পারিবে না। তাই বলিতেছি, তিনি যে ভার দিয়াছেন সে ভার লইতে কুন্ঠিত হইও না, দুঃখিত হইও না, কেন না এমন বন্ধু তো আর নাই। যাঁহার নাম করিলে যাঁহার কথা শুনিলে, গৃহকর্ম, খাওয়া-নাওয়া সব মাথায় উঠে, তাঁহাকে হৃদয়ে পাইলে আর দুঃখকে কি দুঃখ বলিয়া বুঝিতে পারিবে? তিনি যে কত ভালবাসেন একথা যখন বুঝিবে তখন দুঃখ পাইতেছ এ কথা মনে করিতেও লজ্জা অনুভব হইবে। তাই বলিতেছি যাহাই হউক তোমার লাভ কিংবা ক্ষতি, অর্থ বা অনর্থ, হেয় কিংবা উপাদেয়, জন্ম বা মৃত্যু, বিচ্ছেদ কিংবা মিলন সবই তাঁহার দেওয়া, এই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। আমি তাঁহার ভৃত্য এই মনে করিয়া তাঁহার সকল আদেশ পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক। ওরে এমন বন্ধু আর কেহ নাই, এত প্রেমপূর্ণ আর কেহ যে নহেন, এত অন্তরতর আপনার প্রাণও নয়। ইহা জানিয়া নির্ভয় চিত্তে তাঁহার সংসারে বিচরণ কর।

সুন্দর

আমি পরমপিতা পরমেশ্বর আত্মনারায়ণের ভুবনমনোমোহিনী রূপখানি দেখে ভাবছি, শরীর তো জড়পিন্ডমাত্র তা এত সুন্দর কি করে হল? কার রূপ তার শরীরে ফুটে উঠে তাকে এত রূপময়ী করে তুলেছে? বুঝেছি বুঝেছি, এরূপ ওর নয়, সেই যে এক অদ্বিতীয় পরম রূপবান, তাঁরই এ রূপ। যাঁর হাসির বিকাশে গগনে গগনে চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ জাগিয়া উঠে, যাঁহার প্রভায় ফুলে ফুলে গন্ধ জাগিয়া উঠে, যাঁহার দর্শনে জগৎ মধুময় হয়ে যায়, তাঁর সেই

রূপ দিয়ে এ রূপ তৈরী করা। ঐ যে পাগল করা তার হাসিটি, এও সেই তাঁরই হাসির অনুকৃতি। এও সেই তাঁর, সেই অপরূপ পুরুষের অপূর্ব হাসিটি তার হাসিতে যেন মিশানো। ঐ যে তার ব্যাকুলতা ভরা আঁখির চাহনির মধ্যে তার ঐ কোকিলবিনিন্দিত সুর সুধা পঞ্চম রাগিনীর মত ঝঙ্কৃত হচ্ছে এ কি রক্তমাংস অস্থিময় শরীরের সাধ্য যে এত সুন্দর হওয়া, বা এত মধুর স্বর বাহির করা। চর্মে ঢাকা মুখের মধ্যে এত জ্যোতি কি ফুটে কখনও? বলিহারি সেই অচেনা অজানা অধর-পুরুষ রঙ্গটিকে, যিনি সব সুন্দরের মধ্যে আপনার সৌন্দর্য্যটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই যে সূর্য্যের মধ্যে এত প্রকাশ দেখছ এও যে তাঁরই চক্ষের জ্যোতিঃ। এই যে চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে তাঁরই হাস্যজ্যোতি বিকশিত হয়ে উঠেছে, বায়ুর মধ্যে, সলিলের মধ্যে, পৃথিবীর মধ্যেও তাঁরই স্পর্শ, রস ও গন্ধের বিকাশ হচ্ছে, পিতার মধ্যে যে পালনী শক্তি, সে যে তাঁর, মার মধ্যে যে অপূর্ব বাৎসল্য রস,সে যে তাঁরই হৃদয় উৎস থেকে গড়িয়ে পড়ছে। ভাই, ভগ্নী, সখা, সখী, পতি, পত্নী এবং অন্য সমস্ত হৃদয়ের প্রেম প্রবাহ সবই তাঁর প্রেমধারার অনন্ত বিকাশ মাত্র। তাঁর সেই অপার শক্তি গুরুর মধ্যে ফুটিয়ে সংসার তাপ দগ্ধ শিষ্যকে সুশীতল করে দিচ্ছে। বনভূমির শ্যামল শোভায়, তৃণগুল্ম লতাচ্ছাদিত গিরিকন্দরে, মৃদুবাহিনী নির্ঝরিণীর জল কলতানে, বিহগ-বিহগীর প্রেম কূজনে, নর-নারীর হৃদয়ে প্রেম সংস্ফুটনে, ফল ফুলের কত বিচিত্র রসে, বর্ণে, গন্ধে তাঁর হৃদয়ের মাধুরীটুকুই ফুটে উঠেছে। বিশ্বের মধ্যে একি তাঁর অপূর্ব বিকাশ। এত রূপ, এত ঐশ্বর্য্য যাঁর, এত গুণ এত মাধুর্য্য যাঁর, প্রতি রসে, সব গন্ধে যাঁর এত আনন্দ, তাঁর স্পর্শ কেমন? বিশ্বের মধ্যে যাঁর এত আনন্দ, এত প্রেম ছড়ানো, একা তিনি দেখতে কেমন? এত গন্ধ, এত রস, এত স্নেহ, এত প্রেম, তিনি একা দেখতে কেমন?

এই নয়নাভিরাম মদন মোহন শ্যামসুন্দর যার মন হরণ করেছেন তাঁর কি টাকাকড়ি-ঘরবাড়ির প্রতি আর কোন টান থাকে? এরা

নিজেতো পাগল আবার যারা ইহাদের নিকটে যাতায়াত আরম্ভ করে তারাও পাগল হয়ে যায়, তারাও ধীরে ধীরে ঐ নবীন-নীল-নীরদ শ্যাম-সুন্দরের পাদপদ্মে আপনাদের সর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। এই সকল রূপের পাগল লোকগুলিকে দেখলে সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তিরা বড় ভয় পায়। এই উন্মত্ত গুলি দুনিয়ার অন্য কোন ব্যাপারের ধার ধারে না। কেবল হেসে নেচে কেঁদে বেড়ায়। এই সকল ঈশ্বর প্রেমিক ভক্ত উন্মত্তরা যাঁহারা ভগবানকে সত্যভাবে ধরিয়া আছেন তাঁহাকে তো তাঁহারা পর বলিয়া দেখেন না, নিতান্ত আপনার প্রিয়জন বলিয়া বোধ করেন, তাই তাঁহার দেওয়া সুখ দুঃখতে তাঁহারা একটুও দুঃখ বোধ করেন না। তাঁহাকে যাঁহারা স্মরণ করেন, তাহার ভজনানন্দ রসে যাঁহাদের চিত্ত ভরপুর, তাঁহারা দুঃখকে কখনও সুখ হইতে আলাদা করিয়া দেখেন না, বা দিনরাত ওজন করিয়া দুঃখকে তৌল করিয়া দেখার অভ্যাসের ধার ধারেন না। তাঁহারা জানেন প্রকাশ ও জ্বালা একই জিনিষ। অজ্ঞানী অভক্তেরা দুঃখের সময় তাঁহাকে মনে করে কিন্তু সুখের সময় তেমনি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে। যদি সুখের মধ্যেও তাঁহাকে স্মরণ করা হইত, তবে দুঃখ আর কাছেই আসিতে পারিত না। এ ভুল জীবনে আমাদের কতবারই হইয়া যায়। দুঃখের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রধান উপায়ই হইল তাঁহাকে স্মরণ করা, তাঁহার শরণাগত হওয়া। জগতে কটু, তিক্ত, টক কত রসই আছে কিন্তু সকলের সহিত মধুমিশ্রিত করিয়া খাইলে অন্য রসের তীব্রতা টের পাওয়া যায় না, তেমনই সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক প্রভৃতি যে রসেরই আবির্ভাব হউক, তাহা যদি ভগবদ্‌স্মরণ রসে মাখাইয়া লওয়া যায় তবে তাহাদের তীব্রতা বহু পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসে। তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার নাম স্মরণের এমনই মহিমা। বিপদে কম্পিত, হর্ষে উল্লসিত হইতে না হয় - এই বোধ হয় মানবের চিরন্তন আকাঙ্খা, লোকে না বুঝিয়াও এই লক্ষ্য করিয়া সকলে ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে এই তৃষ্ণাই জাগিয়া উঠিতেছে। যে এই মানব হৃদয়ের চিরন্তন লক্ষ্যটিকে বুঝিতে পারিবে, সে-ই প্রকৃত জাগিয়া উঠিবে।

কিন্তু হে প্রভু! ওগো আমার জীবন মরণের সহচর, আমার প্রাণের প্রাণ! আমরা কত ছোট, কত অসহায়, অশরণ ইন্দ্রিয়ের দাস, ভক্তিহীন, জ্ঞানহীন, শক্তিহীন। নিজের সাধন বলে তোমাকে পাইয়া উপরোক্ত মহাত্মাদের মত সর্বত্যাগী হইয়া তোমার প্রেমে উন্মত্ত হইতে পারিলাম না; সে শক্তি, সে সাধনা আমার নাই, কিন্তু তথাপিও হে অগতির গতি, পতিত পাবন, পরম করুণাময় তোমার তুল্য দরদী বন্ধুও আমার কেহই নাই। তাই তুমি নিজগুণে কৃপাপরবশ হইয়া তোমার এই অধম দুর্বল সন্তানকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে টানিয়া লও, নিঃশেষে সমর্পিত, শরণাগত করিয়া দাও। যাহাতে আমিও ঐরূপ মহাত্মাদের মত জগৎ সংসার ভুলিয়া সংসারের অসারতা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিত্য তোমার প্রেমে বিভোর হইতে, মজিয়া থাকিতে পারি, দয়া করিয়া তাহার উপায় করিয়া দাও। সুখ, দুঃখ যাহাই আসুক, লাভ কিংবা ক্ষতি, যাহাই হউক, সকলই যেন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য লাভ করি। ওগো প্রভু, ওগো দয়াল, হে শরণাগতবৎসল! আশা করি তুমি তোমার এই অক্ষম দীন সন্তানকে নিজগুণে কৃপা করিয়া তোমার চরণ প্রান্তে টানিয়া লইবে, উপরোক্ত মহাত্মাদের ন্যায় নিত্য তোমার প্রেমে বিভোর করিয়া উন্মত্ত করিয়া দিবে, দীন হীন সন্তানের এই কাতর আবেদন অগ্রাহ্য করিতে কখনও পারিবে না।

ওগো প্রভু, তুমি আমার সুখ নাও, আমার দুঃখ নাও, আমার ইহকাল, পরকাল, আমার সর্বস্ব নাও। আমাকে নিঃসম্বল করে দাও। আমি আর কিছুই চাই না, কেবল তৎগতচিত্তে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়ে আমি যেন তোমারই হতে পারি। তখন আমি যেন উচ্চকণ্ঠে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, ‘ওগো প্রভু, তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি আমার। আমার তো কোন ক্ষমতা নাই, হে বিভু, তোমার শক্তিতেই আমার শক্তি। হে করুণাময় আমি যেন তোমার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, তোমার অপার অনন্ত করুণার একবিন্দুও অনুভব করিয়া প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তি গদগদচিত্তে বলিতে পারিঃ- ওগো প্রিয়-

তোমার চরণ লাগি, সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু।।
একুলে ওকুলে মঞি দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিও চরণে মোরে আপনার বলি।।

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে,
আপন বলিয়া কায়।।
আপন বলিয়া শরণ লহনু,
ওদুটি কমল পায়।।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।

তুমি পরব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য, এই জগতের তুমি পরম আশ্রয়, তুমি নিত্য, সনাতন বেদোক্ত ধর্মের রক্ষক। তুমি সনাতন পুরুষ, ইহা আমার ধারণা।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে,
নমোঽস্তুতে সর্বত এব সর্ব।।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং,
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ।।

হে সর্ব, তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার, তোমার সকল দিকেই নমস্কার। হে অনন্তবীর্য্য, অমিতবলবিক্রমযুক্ত, এই সমস্ত বিশ্বকে তুমি ব্যাপিয়া আছ, সেইহেতু তুমি সর্বস্বরূপ।

ব্যাসের জন্ম রহস্য।

অনূঢ়াবস্থায় পরাশর সহযোগে সত্যবতী গর্ভবতী হয়েন। তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম হয়। পরাশরের স্ত্রীসংসর্গ মাত্র তৎক্ষণাৎ পূর্ণাবয়ব ব্যাস ভূমিষ্ঠ হন এবং পান্ডিত্য প্রকাশ করিতে করিতে তিনি তৎক্ষণাৎ পিতার অনুগমন করেন। এ সমস্ত ধাঁধার সদুত্তর আছে। সত্যবতী দাসরাজের পালিতা কন্যা। একটি মৎস্যের মধ্যে তাহাকে পাওয়া যায়। আমরা যতক্ষণ আত্মজ্ঞান লাভ করিনা ততক্ষণ আমরা দেহ সর্বস্ব থাকি। মাংস পিন্ডময় দেহের যে অবস্থা বা মদলিপ্ত মৎস্যভাব তাহাতেই দেহ সর্বস্ব জীব ডুবে আছে। এই অবস্থায় অর্থাৎ অদীক্ষিত জীব মাত্রেই মৎস্যগন্ধা। এই মৎস্যগন্ধাই পরাশরের স্পর্শে পদ্মগন্ধা হন। পদ্মগন্ধার অপর নাম যোজনগন্ধা। সৎ গুরুই পরাশর। পরা অর্থাৎ ব্রহ্মকে যিনি শরের ন্যায় সন্ধান করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মজ্ঞানী দীক্ষাদাতা যোগী পরাশর। গুরু যখন শিষ্যকে যোগবলে দিব্যচক্ষু দান করেন, শিষ্যের তৃতীয় চক্ষু উন্মোচন করেন, তখন সেই উপনয়নের অবস্থায় ব্যাসের জন্ম। দীক্ষা প্রাপ্তির ব্যাপারটাই ব্যাসের জন্মলাভ। তৎক্ষণাৎ বেদের চারিটি বিভাগ হইয়া যায়। ইহাই বৈদিক দীক্ষা। সেই পরাশরাত্মজ দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চতুর্দিকে জল ও মধ্যে স্থল ইহাকেই দ্বীপ বলে। দীক্ষাকালে মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ স্থল ও চতুর্দিকে শুভ্রবর্ণ অর্থাৎ জল যাহা দৃষ্ট হয় সেই অবস্থাকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম বলে এবং ঐ সময় বেদের অর্থাৎ পরাজ্ঞানের চারিটি বিভাগের অনুভব হয়। তখন বুদ্ধির বিশ্লেষণ শক্তি বিকশিত হয় এইজন্য ঐ অবস্থা পাইলেই সকলে বেদব্যাস, তখন বেদের বিভাগ দেখা যায়। শরীরের সম্মুখের দিকে ঋক্‌বেদ সর্বদা বিরাজমান, ঐ দিকে মানস নেত্রে অন্ধকারেও সূর্য্যদর্শন হয়। বাহ্য জগতে সূর্য্য যেদিকে উদিত হয় তাহা পূর্ব। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে সাধক যেদিকে মুখ রাখেন তাহাই পূর্ব। তবে সম্মুখভাগকে বাহ্যতঃ পূর্বদিকে রাখা প্রশস্ত। ঐ হিসাবে সর্বদাই ডান

হাতকে দক্ষিণ হস্ত বলা হয়। যেদিকেই মুখ রাখ না কেন ডানহাত সব সময় দক্ষিণ। বাহ্যতঃ দক্ষিণ দিক হইতে আগত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবাহ সর্বদা দেহের দক্ষিণ দিক অবলম্বনে কার্য্য করিয়া থাকে তা সাধক যে দিকে মুখ করিয়া রাখেন না কেন। দক্ষিণ দিক হইতে প্রাণের কার্য্য ও বিকাশগুলি যজুঃবেদ। পৃষ্ঠের দিকে সামবেদ এবং বামদিকে অথর্ব বেদকে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার দ্বারা পাওয়া যায়। সমস্তই এক এক অবস্থা। গুরুরাদেশ বিনা ঐ সকল অবস্থা হয় না। আমাদের বিনা চেষ্টাতেই সর্বদা শ্বাস ও প্রশ্বাস চলিতেছে। এই শ্বাস প্রশ্বাসের জপ কাহাকেও জপিতে হয় না; ইহা বিনা জপার জপ, তাই ইহাকে অজপাজপ বলে। এই শ্বাস প্রশ্বাস যেন দেহের জন্য বাঁধা দাস। ইহা যেন দাসত্বের রাজা। এমন দাসত্ব আর কেহ করে না। চব্বিশ ঘন্টায় এই শ্বাস প্রশ্বাস দেহের চরম দাসত্ব করে। মৎস্যরাজ দেহের পালক, ধীবর রাজই বাহ্যিক শ্বাস প্রশ্বাস। বহির্মুখ জীবদেহ মৎস্যগন্ধা তাই শ্বাসেরই পালিতা কন্যা। মৎস্যগন্ধার পিতার একখানি তরণী ছিল। তিনি ধর্মার্থী হইয়া বিনাশুল্কে সকলকে সেই তরণীদ্বারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন। জীবেব রক্ষা ধর্ম, শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা জীব রক্ষা পাইতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কাহাকেও শুল্ক দিতে হয় না।

এই শ্বাস প্রশ্বাস যখন দেহের অজ্ঞান অবস্থাতেও দেহের সকল ঘাটে ঘুরে বেড়ায় তখনকার অবস্থার সহিত তরণীর উপমা। দেহ তত্ত্বে ষটচক্রকে ছয় পদ্মও বলে। সাধক যখন দীক্ষা পাইয়া মনকে দেহের সমস্ত অংশ হইতে গুটাইয়া লন এবং ঐ ছয় পদ্মে থাকেন তখন তাহাকে পদ্মগন্ধা বলিতে হইবে। এইরূপে সাধনা করিতে করিতে সত্যলাভ করিলে সাধক সত্যবতী হইলেন। ইহাও এক অবস্থা আর এই অবস্থাতে সত্যবতীর ব্যাসের জন্ম দান। সে জন্ম অতি অল্প সময়েই হয়।

সুতরাং যোগী সৎগুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে কেহ

মহাভারতের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। যোগীবর পরাশর প্রথমে মৎস্যগন্ধাকে পদ্মগন্ধা ও যোজন গন্ধা করিয়া পরে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জন্ম দান করেন। ব্রাহ্মী স্থিতি দ্বারা যোগ সাধনায় সত্য প্রাপ্তিতে যে অবস্থা হয় তাহাই সত্যবতী। সেইজন্য সত্যবতী নাম মৎস্যগন্ধাকে দেওয়া হয়। ইহাতে দেহাত্ম বুদ্ধি বিদূরিত হয়। সুষুম্না মার্গে মন ও প্রাণের বিচরণ দ্বারা দেহাত্ম বুদ্ধির শুদ্ধি হইয়া সত্য শিক্ষাই সত্যবতীরূপভাব বা অবস্থা। ব্যাসের জন্ম রহস্য আর বৈদিক দীক্ষা রহস্য একই কথা। বেদ বিভাগ করিয়া ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব বেদকে যথাক্রমে পরিক্রমা করিয়া দক্ষিণ দিকে যমুনা নদী অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীকে ধাক্কা দিয়া দক্ষিণ দিকের যজ্ঞ করিয়া, দক্ষিণা দান লইয়া ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ কে আকর্যণ করিয়া সৎগুরু দীক্ষা দেন। তখন শুভ্র জ্যোতির মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ গোলকে ষট্ চক্রের প্রথম চক্রের কেন্দ্রস্থানে নক্ষত্র ভেদ হয়। ইহাই মোটামুটি তাৎপর্য্য।

শশ্মান বিচার

আমাদের অত্যধিক আসক্তি ও 'আমি-আমার' বোধ এইটিই আমাদের একমাত্র বন্ধনের কারণ। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই অনিত্য, প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে; কোন অবস্থাই স্থায়ী হইতেছে না। সদ্য প্রসূত বালকের আজ যে শারীরিক বা মানসিক অবস্থা, এক বৎসর পরে পুনরায় বিচার করিলে দেখা যাইবে যে তাহার শরীর ও মনের বহু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এইরূপে যদি পঞ্চম দশম কিংবা বিংশতি বৎসরের সময় বিচার করা যায়, তখন শরীর ও মনের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধিত দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইবে। এইরূপে যৌবনের পর জরা, বার্দ্ধক্য, অতি বার্দ্ধক্য পরিশেষে মৃত্যু। এই তো দেহের পরিণাম। এই দেহের আবার এত অহংকার। সমগ্র জগতে যে অসংখ্য নর-নারী দৃষ্ট হইতেছে, একশত বৎসর

পরে ইহাদের কেহই এ জগতে আর থাকবে না, এত যত্নে লালিত পালিত দেহটি হয় শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য অথবা শ্মশানে ভস্মীভূত হইবে। মাটির দেহ মাটিতে মিশিবে।

এই তো গেল দেহের কথা, তারপর বিষয় সম্পত্তি বাড়ী ঘর লইয়া যে আমার আমার করিয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছি; বিষয় সম্পদে মত্ত হইয়া, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতেছি, ইহার কোনটা আমার? আমার সাধের দেহটাই যখন আমার নয়, ইহাকেও যখন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তখন অন্য বিষয়ে কথা কি? এইসব বিষয়ে চিন্তা করা বিচার করা কর্ত্তব্য। বিচার শূন্য জীবনকে শাস্ত্রকাররা মৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার এই বাড়ীতে আমার পিতা, মাতা, পিতামহ আদি পূর্ব পুরুষগণ বাস করিয়া গিয়াছেন: তাঁহারা আমার আমার করিয়া ইহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ছিলেন, তাঁহারাও মোহমদিরা পানে মত্ত হইয়া এই বাড়ীতে, এই বাগানে, এই পুকুরঘাটে কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, আশা, আকাঙ্খার কতই না উন্মত্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায় কই তাঁহারা? কালের অপ্রতিহত গতি প্রভাবে সকলেই অনন্তে বিলীন হইয়াছেন। যাঁহার অনন্ত ভান্ডারের জিনিষ তাঁহারই আছে; তাঁহারই থাকিবে। কেবলমাত্র দুদিনের জন্য আমার আমার করিয়া আমরা মায়া মোহের বন্ধন আরও সুদৃঢ় করিতেছি। আমরা বিকারগ্রস্ত হইয়া অবিদ্যার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া দেহেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিতে প্রকৃত আত্মসুখে বঞ্চিত ও প্রতারিত হইতেছি; তথাপি এ ভ্রম আমাদের একটুও যাইতেছে না।

হে পরম করুণাময় ভগবান, হে নিখিল বিশ্বের ঈশ্বর, হে ভব বন্ধন মোচনকারী, পরম করুণাময় প্রভু এই আমার আমার বোধরূপ এই ভ্রান্তির কবে শেষ হইবে? কবে আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে মন প্রাণ লয় করিয়া কুহকিনী মায়াফাঁস ছিন্ন করিয়া তোমার অভয় পাদ পদ্মে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া এই মোহকূপ হইতে উদ্ধার পাইব।

জানি না কবে তোমার করুণার স্পর্শে এই মোহকূপ হইতে উদ্ধার হইয়া তোমার ঐ অভয় পাদপদ্মে নিজেকে বিকাইয়া দিয়া চির শান্তিলাভ করিব।

পঞ্চ কোষ

এই জীব দেহে পঞ্চকোষ বিদ্যমান আছে। যথা অন্নময় কোষ - স্থূল শরীরের নাম অন্নময় কোষ। ইহার উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ অন্ন। পিতা মাতার ভুক্ত অন্নের বিকার ও পরিণতি-রূপ শুক্র শোণিত দ্বারা ইহার উৎপত্তি আবার অন্নাদি ভুক্ত দ্রব্য দ্বারাই ইহার স্থিতি (কলিতে অন্নগত প্রাণ) এই জন্য ইহার নাম 'অন্নময় কোষ'।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু মিলিত হইয়া 'প্রাণময় কোষ' হইয়াছে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত হইয়া 'মনোময় কোষ' হইয়াছে। যেরূপ অন্নের বিকার দ্বারা অন্নময় কোষ এবং প্রাণের বিকার দ্বারা প্রাণময় কোষ হইয়াছে, সেইরূপ মনোময় কোষও মনের বিকারে উৎপন্ন। আত্মা নির্লিপ্ত হইলেও মনের বিকারবশতঃই সুখী দুঃখী ইত্যাদি অভিমান যুক্ত হইয়া শোক মোহাদিতে আচ্ছন্ন হয়।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধির সহিত মিলিত হইয়া 'বিজ্ঞানময় কোষ' হইয়াছে। ইহা বুদ্ধির বিকারে উৎপন্ন। বুদ্ধির বিকারেই নির্ব্বিকার, অকর্ত্তা সাক্ষীরূপে অবস্থিত আত্মাও আমি কর্ত্তা এই প্রকার অভিমান যুক্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা জনিত প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ এই ত্রিবিধ আনন্দবৃত্তি মানব অন্তঃকরণের অবস্থাকে 'আনন্দময় কোষ' বলা হইয়া থাকে। অভিলষিত বস্তু দর্শন জনিত সুখকে 'প্রিয়' এই বস্তুলাভে যে আনন্দ হয় তাহার নাম 'মোদ'। আর অভিলষিত বস্তু ভোগ জনিত সুখের নাম 'প্রমোদ'। এই সুখ ত্রয়ের বা ত্রিবিধ সুখের মিলিত অবস্থায় 'আনন্দময় কোষ'। ইহা আনন্দের বিকার হইতে জাত। ইহারই প্রভাবে প্রিয়, মোদ, প্রমোদ রহিত অপরিচ্ছিন্ন

অভেদ আত্মাও প্রিয় মোদ প্রমোদবান, পরিচ্ছন্ন সুখ যুক্ত এবং 'আমি ভোক্তা' এই প্রকার অভিমানী হয় ইহাই আত্মার শেষ আবরণ। ইহাই যতদূর সম্ভব পঞ্চ কোষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

প্রকৃত ঐশ্বর্য্যশালী কে?

অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও তিনি প্রকৃত ধনবান নহেন। জনৈক প্রসিদ্ধ মহাত্মা আকবর বাদশাহের সহিত দেখা করিতে যান। বাদশাহ তখন নমাজ পড়িতেছিলেন। নমাজ ও প্রার্থনাদি শেষ হইলে তাঁহার সহিত বাদশাহের দেখা হইল। কিন্তু মহাত্মা তখনই বাদশাহের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে বাদশাহ বিস্মিত হইয়া মহাত্মাকে বলিলেন যে "আমার দ্বারা আপনার কি সাহায্য হইতে পারে?" তাহাতে মহাত্মা উত্তর করিলেন - "আমি আপনার কাছে কিছু প্রার্থী হইয়াই আসিয়াছিলাম; আমার ধারণা ছিল, আপনি প্রকৃতই বাদশাহ! কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি আমার ভুল হইয়াছে। আপনিও একজন ভিখারী মাত্র। আপনিও রাজ্য, সম্পদ, ভোগবিলাসাদি প্রার্থনা করিতেছেন। সুতরাং ভিখারীর নিকট ভিখারীর আর কি প্রার্থনা থাকিতে পারে? আপনি যাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আমিও তাঁহার নিকট আমার আকাঙ্খিত বস্তু প্রার্থনা করিব, এক্ষণে বিদায় হই।" এই বলিয়া মহাত্মা চলিয়া গেলেন। মহামতি আকবর এই ঘটনায় বিশেষ লজ্জিত হইলেন এবং ইহা মহাত্মার কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

অতএব ধনবান হইলেই প্রকৃত ধনী ও নিঃস্ব হইলেই দরিদ্র এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক।

জগৎগুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ঃ-

শ্রীমান অর্থাৎ ধনী কে? - যাঁহার সর্ব বিষয়ে সন্তোষ আসিয়াছে; আর দরিদ্র কে? যাহার বহু আশা অর্থাৎ যাহার আশা আকাঙ্খার নিবৃত্তি বা তৃপ্তি নাই।

নিত্যানিত্য বিচার সম্বন্ধে এখানে একটি সাংসারিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। মৃত সন্তানকে কোলে লইয়া তাহার মা আলুলায়িত কেশে আকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছে - তখন দৈবক্রমে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''মা! তোমার গোপাল তো তোমার কোলেই রয়েছে - তবে কেন কাঁদছ?'' তখন জননী বলিলেন - ''হায় বাবা! গোপাল আমার চিরদিনের মত ছেড়ে চলে গেছে - সে আর মা বলে ডাকবে না।'' তখন জ্ঞানী বলিলেন, ''কেন মা! তুমি কোলে নিয়ে যাকে চুমু খেতে, যে মুখে ছানা ননী তুলে দিতে, যে দেহ দ্বারা সে তোমাকে কত আনন্দ প্রদান করতো, তার তো কিছুই নষ্ট হয় নাই সেই গোপালতো অটুট রয়েছে! তবে মা যে বস্তুটি চিরদিনের মত চলে গেছে বললে, সে পরম বস্তুটি তুমি পূর্বে কখনও দেখেছিলে কি? না তাকে তুমি দেখ নাই। সুতরাং যে বস্তুর সহিত তোমার এ পর্য্যন্ত দেখা বা পরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই, তার জন্যে শোক করা তোমার উচিত নহে। তথাপি তার জন্য এত মমতা হয় কেন, জান কি? শোন মা! স্বয়ং ভগবান তোমাকে বাৎসল্য প্রেম শিখাবার জন্য পুত্র বা গোপালরূপে এসেছিলেন - শিক্ষা দিয়ে আবার চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং নশ্বর মাটির দেহের মায়া পরিত্যাগ করতঃ তোমার বাৎসল্য প্রেম অবিনশ্বর ভগবানে সমর্পণ করিয়া ধন্য হও, আর শোক করিও না।''

অতঃপর সংসারে রাজা এবং ভিখারীর শেষ পরিণাম চিত্রটি দর্শন করিবার জন্য একবার শান্তিময় শ্মশানের দৃশ্য আলোচনা করা যাউক। এখানে পাপী, তাপী, সুখী, দুঃখী, ব্রাহ্মণ, চন্ডাল কিংবা রাজা ভিখারীতে কোনও প্রভেদ নাই; সকলেরই এক গতি। ঐশ্বর্য্যের অহংকার, ধনমানের অহংকার, সকল অহংকারের অহংকার এখানে চূর্ণীকৃত। সকল অশান্তি, সকল জ্বালা, এখানে চিরতরে উপশমিত। জনৈক মহারাজ ও একজন ভিখারীর দেহ যেন একই মহাশ্মশানে বিলীন হইতেছে। এক্ষণে মৃত্যুর পরপারে এই দুই জনের অবস্থা চিন্তা ও বিচার করিলে কি দেখিতে পাইব? এই রাজা যদি গুরুতর

দায়িত্ব পরিপূর্ণ আপন কর্ত্তব্য পালন না করিয়া স্বেচ্ছাচারী ও পাপাসক্ত হইয়া থাকেন, তবে আজ তাঁহার কি দুরবস্থা! আজ তাঁহার মত দুঃখী আর কে আছে? তাঁহার পাত্র মিত্র, সহায় সম্পদ, বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্রগণ আজ এই দুঃসময়ে কোথায়? সেই অজানা দেশে তিনি নিঃস্ব ভিখারীর মত একাকী ভীত চকিত চিত্তে কতই না বিভীষিকা দেখিতেছেন। হায়! রাজ্যেশ্বর রাজার কি এই পরিণাম? কর্মফল ভোগান্তে আবার হয়তো তাঁহাকে স্বকর্মবশে সাধারণ নিঃস্ব প্রজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করতঃ দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করিতে হইবে। বিচার করিলে এ হেন ক্ষণস্থায়ী রাজ্য ঐশ্বর্য্য লাভের কামনা থাকে কি?

এক্ষণে ঐ মৃত ভিখারীর বিষয় চিন্তা করা যাউক। দুঃখে কষ্টে জীবনাতিপাত করিয়াও যদি সে ভগবানকে স্মরণ মনন করিয়া থাকে, যদি জীবনে যথাসাধ্য ধর্মাচরণ পূর্বক ভগবানের নাম লইতে লইতে এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে মরণ যবনিকার অন্তরালে আজ তাহার জন্য কি আনন্দ নিহিত আছে তাহা একবার ভাবুন দেখি। তাহার পক্ষে অজানা দেশ নাই; সেখানে সকলেই তাহার বন্ধু, সকলেই যেন চির পরিচিত! তাই জনৈক সাধু মৃত্যুর সময়ে গাহিয়া ছিলেন -

আমার স্থির নেত্র দেখে তোরা সবাই বলছিস্ হরিবোল,
আমি তো ভাই স্থির নয়নে দেখছি শ্যামা মায়ের কোল।
ঐ যে, মা আমার ব্যাকুলা হয়ে, দুটি বাহু প্রসারিয়ে,
বলছেন আমার কোলে আয় বাপ, কি ভয় দুরন্ত শমনে?

তাই বলি এ জগতের সুখ দুঃখের কোনও মূল্য নাই। অতএব অনিত্য বিষয়ে আসক্তি বিচার দ্বারা পরিত্যাগ করতঃ নিত্য বিষয়ে অনুরক্ত হওয়ার অনুশীলন করা সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অনাসক্তভাবে শুধু কর্ত্তব্য বোধে আপন আপন ধর্ম যথাযোগ্যভাবে পালন করতঃ ভগবানের সংসারে সংসারী হইয়া তাঁহারই উপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

তুলসীদাসের দোঁহা

১। মৃগসমূহ যেরূপ আপনার নাভিস্থ সুগন্ধ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ব্যাকুলান্তরে এক অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে সেই গন্ধদ্রব্যের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সকলের শরীরেই জগৎপিতা জগদীশ্বর পরমাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ লোকে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া যেখানে সেখানে নানা পথে পরিভ্রমণ করে।

২। যেখানে দয়া সেখানেই ধর্ম বিরাজিত, যেখানে লোভ সেইখানেই পাপের আসন বিস্তৃত, যেখানে ক্রোধ সেইখানেই নাশ অবশ্যম্ভাবী। আর যেখানে ক্ষমা সেইখানেই ভগবান সদা সর্বদা বিরাজ করেন।

৩। মোটা কাপড়, ছোট ঘর এবং পাঁচটি দুগ্ধবতী গাভী যাহার আছে, অথচ যাহার কন্যালাভ হয় নাই, এ জগতে তাঁহার তুল্য সুখী আর কেহ নাই। কারণ মোটা কাপড় শীঘ্র ছিন্ন হয় না, ছোট ঘর হইলে স্বল্পব্যয়ে সংস্কার করা যায়, আর দুগ্ধবতী গাভী থাকিলে কখনও সুখাদ্যের অভাব হয় না, কিন্তু কন্যা থাকিলে বিবাহের জন্য তাহাকে অন্যের নিকট মাথা হেঁট করিতে হয়। এই জন্য দুহিতাই একমাত্র দুঃখের কারণ।

৪। আমরা দরিদ্র, আর কেহ নাই এবং তোমার তুল্য দয়াবানও কেহ নাই। ইহা বিচার করিয়া, হে প্রভু ! তুমি জীবের ভবভয় নিবারণ কর।

৫। কারণ অপেক্ষা কাজ খুব কঠিন। দধীচি মুনির হাড়ে বজ্র নির্মিত হইলেও তাহার কার্য্য জ্বলন্ত লৌহ অপেক্ষাও ভীষণ।

৬। সর্প অপেক্ষা তাহার বিষ বড় ভয়ানক। সর্পের দংশনে বরং জীবের জীবনের আশা করা যায় কিন্তু বিষ খাইলে প্রাণনাশ নিশ্চয়।

৭। যে দুর্য্যোধনের সভাতে শকুনি সুমতি বলিয়া মান্য প্রাপ্তি হয়, সে সভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণ যে প্রবঞ্চক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

৮। অনুচিৎ উচিৎ বিচার না করিয়া যে পুত্র পিতার আদেশ প্রতিপালন করেন, তিনি ইহ জীবনে অশেষ সুখ ও যশ লাভ করিয়া অন্তে ইন্দ্রের সহিত স্বর্গবাস করিবার অধিকারী হন।

৯। স্থানচ্যুত হইলেই মান সম্ভ্রম নষ্ট এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। যেমন পদ্ম যতক্ষণ জলে থাকে, ততক্ষণ সূর্য্যতাপে শুকায় না; জলভ্রষ্ট হইয়া জমিতে পড়িলেই উত্তাপে শুকাইয়া যায়।

১০ নীচলোক কখনও দেখে না, অনুভব করে না বা বুঝে না যে, মৃত্যু নিত্য তাহাদের কেশাকর্ষণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

১১। আশাদেবী নামে এক অদ্ভুত দেবতা আছেন, তিনি প্রথমে সর্বস্ব দান করিয়া শেষে বিমুখ হইয়া জীবকে একেবারে শোক সাগরে ডুবাইয়া দেন।

১২। পৃথিবীতে মেঘের বর্ষিত বারি কোন্ পক্ষী পান না করিয়া থাকে? কিন্তু মেঘের প্রতি চাতক পাখীর স্নেহ যেমন ভুবনবিদিত, তেমন কি আর কাহারো আছে?

১৩। চাতক পক্ষীর ভালবাসার ব্যাপার অতি বিচিত্রময়ী। সে আপনার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য কেবল মেঘের প্রতি মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছে।

১৪। এই তিন লোকে তিনকালের মধ্যে চাতক পাখীর মত দীন দরিদ্র আর কেহ নাই। তাহার এক মেঘ ব্যতীত অন্য কোন সখা দেখিয়াছ কি?

১৫। চাতক পক্ষী অহরহ কেবল মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে, কারণ মেঘের জল ভিন্ন তাহারা বাঁচিতে পারে না।

১৬। চাতক পাখী স্ত্রী জাতি স্বরূপ। তাহারা জলধররূপী প্রিয় পতিকে ত্যাগ করিয়া আর কাহারো কৃপাভিক্ষা কখনও করে না।

১৭। যথার্থ ভালবাসা কেহ ভুলিতে পারে না। দেখ মেঘ সকল গগনে ভীষণ গর্জন করিলেও ময়ূরসকল পুলকিত চিত্তে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে থাকে।

১৮। পিতামাতার পক্ষে সন্তানই তাহাদের দুঃখের প্রধান কারণ: এই হেতু পুত্র তাহাদের শত্রু ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রথমে পুত্র না হইলেও পিতামাতার কষ্ট, জননীর গর্ভসঞ্চার হইলে পাছে তাহা নাশ হয় এবং প্রসব সময়ে যাহাতে পুত্র কষ্ট না পায়, এই ভয়ে তাঁহারা ভীত হন। তারপর জননী সন্তান প্রসব করিলে তাহাতে কোন গ্রহ দোষ আছে কিনা সন্দেহ করিয়া কত কষ্ট পান। তারপর পুত্র বোবা হইল কিনা ইত্যাদির ভয়; উপনয়নাদির পর বিদ্যারম্ভে পুত্র শিক্ষিত না হইলেও মনে বিষম দুঃখ। তারপর বিদ্বান হইলে বিবাহ হয় কিনা, যৌবনকালে পরদার আসক্ত হইবার ভয় রহিয়াছে। পুত্র যদি ঐ সকল দোষে দূষিত না হয়, তাহা হইলে যদি দরিদ্র হয়, তবে সংসার কেমন করিয়া চালাইবে; বহু গুণশালী হইলেও বেশীদিন বাঁচিবে কিনা; তাহারও ভয় আছে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, পুত্র পিতামাতার কিছুতেই সুখের কারণ নহে বরং দুঃখেরই আস্পদ।

১৯। মকর, সর্প, ভেক ও কুর্ম সকলের জলই জীবন। জলই গৃহ হইলেও মৎস্যের ন্যায় জলের প্রতি ভালবাসা আর কাহারও নাই। কারণ জল ব্যতীত মকর, সর্প, ভেক প্রভৃতি জীবন ধারণ করিতে পারে; কিন্তু মৎস্য এক দন্ডও বারিহীন হইয়া থাকিতে পারে না।

২০। ভগবানের ছলনাও সময়ে জীবনে মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। যেমন, ভগবান ছলনা করিয়া বলিরাজের মস্তকে পদ প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

২১। শারীরিক ক্লেশ এবং ছলনাচাতুরী ভিন্ন ভিক্ষা লাভ হয় না বলিয়া ভগবান বলিরাজের নিকট বামনরূপ ধরিয়া ছলনার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন।

২২। স্ত্রী যেমন পিতৃগৃহে গমন করিলেও মন তার পতির নিকট পড়িয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি দূরে থাকিয়াও ক্ষণকাল গুরুর স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি পরম ভক্ত।

২৩। গুরু যাহাকে রক্ষা করেন তাহাকে কে মারিতে পারে? গুরু সহায় হইলে জগৎশুদ্ধ লোক বিপক্ষ হইলেও কেহ তাহার একগাছি কেশও স্পর্শ করিতে পারে না।

২৪। হাতী, ঘোড়া, ধন, ঐশ্বর্য্য এবং চন্দ্রমুখী বহু রমণী থাকিলেও পরিণামে কোন উপকার হয় না। যমদ্বারে উত্তীর্ণ হইতে হইলে ভগবানের নাম সাধনা ভিন্ন কোনও উপায় নাই।

২৫। হে দেবের দেব শ্রীগুরু! তুমি দয়া করিয়া আমাকে ভক্তিধন প্রদান কর। আমাকে যদিও পুনর্বার এই ধরাতলে জন্ম লইতে হয়, তথাপি যেন তোমার পাদপদ্ম বিস্মৃত না হই।

২৬। হে গুরু! তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন আমার মনে আর কোন বাসনা না জাগে। আমি স্বপ্নেও যেন সুখ, সম্পত্তি, স্ত্রী, পুত্র জন ধন এবং সুন্দরী স্ত্রীর আকাঙ্খা না করি।

২৭। দয়া ধর্ম্মের মূল, অভিমান নরকের মূল, অতএব প্রাণ কন্ঠাগত হইলেও দয়া ও ধর্ম্ম কে ত্যাগ করা উচিত নয়।

২৮। দেবতার মন্দির নির্মাণার্থে লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হইল কিন্তু সেই মন্দিরের উপর হতভাগ্য কাক সকল বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করে। ভগবানের এ কোন মহিমা বল দেখি।

২৯। যখন সকল বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে; তাহাকে জাগ্রতাবস্থা বলে। যে অবস্থায় বাহ্যিক ইন্দ্রিয় ব্যাপার বন্ধ হইয়া যায়; তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। আর যে অবস্থায় মনের চেতনা দূর হইয়া আত্মায় বিলীন হয়; তাহাকে সুষুপ্তাবস্থা বলে। এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহার চিত্ত তুর্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই মহাপুরুষ। তাঁহার পক্ষে ত্রিলোকের রাজৈশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎ - কর বলিয়া ধারণা হইবে।

৩০। হস্ত যেমন শরীরকে রক্ষা করে, চক্ষুর পাতা যেমন চক্ষুকে রক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ যে মানব সতত সাধুগণের সঙ্গে থাকে, সাধুগণ তাহার সকল কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন।

৩১। যেমন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দেহে নানা প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ ধারণ কেবল কষ্টের কারণ; সেইরূপ মানব হৃদয় ভক্তি বিহীন হইলে যোগ-যাগ, জপ-তপ, কিছুই সুফলদায়ক নহে। তাহাতে কেবল কষ্টই লাভ হয়, ইষ্ট সিদ্ধি হয় না।

৩২। কাপড় পরিধান না করিয়া যেমন বহুমূল্য অলঙ্কার পরিধান করিলে তাহার কোন শোভা হয় না, বরং অশোভনই হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে মন অভিনিবিষ্ট হইলে আশ্রম ধর্মে মন আর তত মজিতে চায় না। কিন্তু বৈরাগ্য না জন্মিলে বিষয় বাসনা বলবতী থাকে, সুতরাং স্বধর্ম বিসর্জন দিয়া সে সময় ব্রহ্মবস্তুর অন্বেষণ করিলে তাহার দ্বারা নরকের দ্বার মুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই হয় না।

৩৩। সর্প চন্দন বনে বাস করিলেও তাহার খল স্বভাব নষ্ট হয়

না, সেইরূপ অত্যন্ত খল স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিও সাধু মহাপুরুষগণের সন্নিধানে থাকিলেও তাহার দুষ্ট প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।

৩৪। ভবরূপ সর্পের দংশনে তোমার জ্ঞান হইয়াছে। এইজন্য চিত্রকূটবাসী নকুল স্বরূপ রাম চন্দ্রের (পরমাত্মা) চরণামৃতরূপ মহৌষধি পান করিয়া তুমি চেতনালাভ কর।

৩৫। শুদ্ধমতি, ধীর, সেবক, বুদ্ধিমান লোক জগতে কাহার না প্রিয় হয়? এক পিতার অনেক পুত্র জন্মে কিন্তু সকলে সমান গুণ সম্পন্ন হয় না, কেহ পন্ডিত, কেহ জ্ঞানী, কেহ তপস্বী, কেহ ধনবান, কেহ বলবান, কেহ সর্বজ্ঞ কেহ ধর্মজ্ঞ হইয়া থাকে। কিন্তু যে বেশী পিতৃভক্ত হয়, ইহার মধ্যে সেই পিতার প্রাণতুল্য প্রিয় হইয়া থাকে, সেইরূপ যে জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তিমান সেই তাঁহার একান্ত প্রিয়।

৩৬। যেমন কাঠের পুতুল; নারীগণও সেইরূপ অস্থি, মল, মূত্র, নাড়ী, মাংসময় কাঠের পুতুলের মত, কোন শোভা নাই ও বিবেকশালী ব্যক্তিগণ এইজন্য রমণী সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হন না।

৩৭। ঈশ্বরের কাছে যাইতে সকলেরই ইচ্ছা করে, কিন্তু কামিনী কাঞ্চনরূপ দুইটি ঘাঁটির দ্বারপালকে লঙ্ঘন করিয়া খুব কম ব্যক্তিই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারে; অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি শূন্য না হইলে ঈশ্বর লাভ সম্ভব হইতে পারে না।

৩৮। চতুর্দশ শাস্ত্র, চারি বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া কি ফল হইবে, যদি ভগবানের দর্শন লাভ করিতে না পারিলে? তুলসী দাস বলিতেছেন - শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্য আত্মারামের দর্শন। যদি তাহা না হইল, তবে সমস্তই

নিরর্থক। অর্থাৎ তুমি শাস্ত্র পড় আর না পড় যদি মূর্খ হইয়াও ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তাহা হইলেও জন্ম সার্থক।

৩৯। ধন যৌবন নিশার স্বপনের মত ক্ষণস্থায়ী; কদাচ ইহার গর্ব করিও না। মেঘের ছায়া যেমন বেশীক্ষণ থাকে না, দেখিতে দেখিতে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধন ও যৌবন বেশীদিন স্থায়ী নয়।

৪০। কর্মফল সকলের মূল না হইলে মহারাজ নল, প্রভু রামচন্দ্র ও পান্ডব রাজ ধার্মিক প্রবর রাজা যুধিষ্ঠিরকে এত ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। এই প্রকার সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া যদি বল, মানব ও মানব শরীরের প্রভুত্ব কিছু নয়, বেদ-পুরাণ কিছু নয়, ঋষিবাক্য কিছু নয়, ভগবৎ গীতাদির পাঠও বৃথা, যখন কর্মই প্রবল তখন এ সকল মানিবার আবশ্যক কি? ইহার উত্তর কর্মই প্রধান বটে, কিন্তু সেই কর্ম অদৃশ্য রূপ জড়, মানবের যত্ন ভিন্ন কোন প্রকার ফল প্রদানের ক্ষমতা তাহার নাই। যেমন যত্ন করিয়া কৃষিকার্য্য না করিলে তাহাতে চাষআবাদ ভাল হয় না, অযত্নে যেমন তাহা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ যত্ন করিয়া কাজ করিলে তাহার ফল অনিবার্য্য।

৪১। ভাল লোকে ভাল পথ এবং খারাপ লোকে খারাপ পথই অবলম্বন করে, যেমন দেবগণ অমৃতের এবং অসুরগণ সুরার প্রশংসা করিয়া থাকে।

৪২। ভ্রমর ও শুক উভয়ে তরুজীবী হইলেও ভ্রমর পুষ্প হইতে মধু পান করে, আর শুক বুদ্ধিদোষে শাখা কাটিয়া তাহার ফল ভক্ষণ করে।

৪৩। যাহার সহবাসে বিমল সুখের উদয় হয়, তাহার বিরহেও তদ্রূপ মহা দুঃখ পাইতে হয়। সূর্য্য উদিত হইলে কমল বিকশিত

হয়, আবার তাঁহার অস্তগমনে মহা বিরহে মুদিত হইয়া থাকে।

৪৪। সৎসঙ্গে লোকে সৎ হয় এবং অসৎ সঙ্গে লোকে অসৎ হয়। নৌকার শোভা নীরেই হয়, তীরে নহে।

হরিনাম তত্ত্ব

হরিনাম যুগ-যুগান্তর হইতেই তারক-ব্রহ্ম নাম রূপে জীবকে মুক্তিফল প্রদান করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুগেও করুণাসাগর প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিনামের বন্যায় শাক্ত, বৈষ্ণব, হিন্দু, অহিন্দু সকলকেই প্রেমে ভাসাইয়াছিলেন। হরিনাম অপার্থিব চিন্ময় বস্তু। হরিনাম ব্রহ্ম নাম।

ভগবান বিষ্ণু এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই হরিনাম দ্বারা লক্ষ্য করা হয়, সুতরাং ইহা যে বৈষ্ণবগণের পরম আদরের বস্তু, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর হরিনামটি বিশ্লেষণ করা যাউক। হরি শব্দটিতে হ কার, ই কার, র কার এই তিনটি বর্ণ পাওয়া যায়। হ কার, শব্দের অর্থ মহাদেব বা পুরুষ, ই কার অর্থ শক্তি বা প্রকৃতি আর র কার অর্থ রমণ বা মিলন। সুতরাং এই তিনটি যোগ করিলে হরি শব্দের অর্থ হয় যে শিব-শক্তির মিলন বা প্রকৃতি পুরুষের মিলনই হরি। সুতরাং হরি শৈব বা শাক্তদিগেরও অভীষ্ট দেবতা। আবার ব্রহ্মবাদী হরিনাম ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজও গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন-বেদে, রামায়ণে, পুরাণে, মহাভারতে, আদি অন্তে ও মধ্যে সর্বত্র শ্রী হরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

আবার ভাগবৎ পুরাণেও তিনি বলিয়াছেন সর্বভূতের আত্মা স্বরূপ ভগবান ঈশ্বরের হরিনামটি সর্বজীবের শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য, কারণ উহা মোক্ষার্থীগণের মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ। হরি যাহার কর্ণ পথে প্রবেশ করে নাই সে ব্যক্তি পশুর সমান।

হরিনামের আরও একটি গূঢ় রহস্য আছে। হরিনাম কেবল যে উপরোক্ত রূপ অর্থে এক তাহা নহে; উহা শাক্তগণের মহাশক্তি বীজ মন্ত্রের সহিতও এক হইয়া রহিয়াছে। শাক্তগণের মহাশক্তি বা মহামায়া বীজ হ্রীং, আবার ভুবনেশ্বরীর বীজও হ্রীং, এই হ্রীং ও হরি মূলে এবং বীজে একই পদার্থ। হ্রীং বীজটি বিশ্লেষণ করিলেও হরিনামের মত একই অর্থ ও একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা হ্রীং বীজটিতে হ কার, ঈ কার এবং র কার আর নাদ বিন্দুর যোগ দেখা যায়; সুতরাং ইহা দ্বারাও শিব শক্তির মিলন বা প্রকৃতি পুরুষাত্ম ব্রহ্মই অর্থ হয়। অতএব শক্তি বীজ এবং হরিনাম একই বস্তু বিশেষতঃ হ্রীং বীজটি তাড়াতাড়ি জপ করিলে হরিতেই পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণের ভগবান যে শুধু মূলে এক তাহা নহে। মূলে বীজে এবং নামেও এক। এক্ষণে বিচার করিলে শাক্ত বৈষ্ণবের প্রেমের মিলন হয় নাকি? প্রেমাবতার মহাপ্রভু সকলকেই এই অতুলনীয় হরিনাম দ্বারা চির মিলনে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম এক বই দুই নয়

বেশ কিছুদিন আগের কথা। কোন এক স্থানে এক পাদরি সাহেব উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি ধর্মের বহুবিধ উপদেশ দিতে দিতে হিন্দুধর্মের নানা প্রকার কুৎসা করিয়া বলিতে লাগিলেন হিন্দু ধর্ম কিছুই নহে, উহা অতি নিকৃষ্ট ধর্ম, উহারা যে সব মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ও বীজ মন্ত্র জপ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে তপ, জপ, ইত্যাদি করে, উহা অতীব নিকৃষ্ট, উহাতে কিছুই হয় না। আমাদের পাদরিদের যে ধর্ম উহাই সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্তরের সাধনা, আমার মতে সকলেরই পাদরি ধর্ম গ্রহণ করা উচিত। এই ভাবে নানা প্রকার লেকচার দিতে লাগিলেন। তাঁহার লেকচার শুনিয়া দলে দলে অজ্ঞ মূর্খ হিন্দুগণ পাদরি ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট সমবেত হইল।

ঠিক ঐ সময়ে একজন মহা পন্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন সাহেব আপনার কুকুরের কয়টি সংজ্ঞা জানা আছে? তাহাতে উক্ত সাহেব উত্তর দিলেন - "পন্ডিত মহাশয় হামি হাপনাদের বহু শাস্ত্র পড়িয়াছে, কুকুরের বহু সংজ্ঞা হামার জানা আছে, যেমন ডগ, কুকুর, কুত্তা, সারমেয় ইত্যাদি। হেইতো হামি কুকুরের বহু সংজ্ঞা কহিলাম। কিছু দূরে একটি কুকুর শুইয়া লেজ নাড়িতেছিল। তখন উক্ত পন্ডিত মহাশয় কুকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ও কুকুর, ও ডগ, ও সারমেয়, ও কুত্তা কিন্তু কুকুরের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তখন উক্ত পন্ডিত পাদরি সাহেবকে বলিলেন "কই সাহেব তোমার কুকুরের এত সংজ্ঞা ধরিয়া ডাকিলাম, তোমার কুকুরের তো কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। আমার বীজ মন্ত্রের গুণ দেখিবে?" এই কথা বলিয়া পন্ডিত মহাশয় তু, তু, তু বলিয়া ডাকিবামাত্রই কুকুরটি ছুটিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া আসিল। তখন পন্ডিত মহাশয় বলিলেন, "সাহেব আমার বীজ মন্ত্রের গুণ দেখিলে তো? ধর্ম জগৎ সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি নিজের ধর্মকেও বুঝিবার চেষ্টা কর নাই বা নিজের ধর্মও নিজে বুঝিতে পার নাই। তাহা যদি পারিতে তাহা হইলে অপরের ধর্মকেও ছোট করিয়া দেখিতে পারিতে না। যে নিজের ধর্মকে বোঝে এবং বিশ্বাস করে ও ভালবাসে সে অপর কোন ধর্মকে ছোট করিয়া দেখে না। মহাত্মাদের চক্ষে সমস্ত ধর্মই এক এবং অভিন্ন। পন্ডিত মহাশয়ের উক্ত কথা শুনিয়া যাহারা পাদরি ধর্মের উপদেশ লইবার জন্য উক্ত পাদরি সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন, তাহারা দলে দলে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকেই পন্ডিত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল।

আত্মানন্দই প্রকৃত আনন্দ

পতির জন্য পতি প্রিয় হয় না পতিকে পেয়ে আত্মায় আনন্দের স্ফুরণ জাগে বলেই পতি প্রিয়। পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় হয় না, পুত্রকে পেয়ে আত্মায় আনন্দের স্ফুরণ জাগে বলেই পুত্র প্রিয়।

(যে পুত্র দুরাচারী সে পুত্রকে কাছে পেয়ে পিতামাতার আত্মায় আনন্দের স্ফুরণ জাগে না, তাই সে ক্ষেত্রে পিতামাতা তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিতেও দ্বিধা করে না) সব কিছুর জন্যই সব কিছু প্রিয় নয়, সব কিছুকে পেয়ে আত্মায় আনন্দের স্ফুরণ জাগে বলেই সব কিছু প্রিয়।

কোন তত্ত্বে কি উৎপন্ন হয়

চক্র	তত্ত্ব	উৎপন্ন বিষয়
১। মূলাধার	ক্ষিতিতত্ত্ব	ভয়
২। স্বাধিষ্ঠান	জলতত্ত্ব	মোহ
৩। মণিপুর	অগ্নিতত্ত্ব	ক্রোধ
৪। অনাহত	বায়ুতত্ত্ব	কাম
৫। বিশুদ্ধাখ্য	আকাশ তত্ত্ব	লোভ

ভগবান অংশও নহেন পূর্ণও নহেন

আত্মা জীবলোকে সুর, নর, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীবভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাদের দেহাদির জন্ম মৃত্যুতে সেই আত্মার বিনাশ নাই। সেই আত্মা সনাতন, কেন না উহা ব্রহ্মরূপ আমারই অংশ; সুতরাং তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাহা হইলে এখানে প্রশ্ন উঠিবে ব্রহ্মের যদি অংশ অল্প থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের অখন্ডত্ব, সর্বব্যাপীত্ব ও অনন্তত্বের হানি হয়। অথবা ব্রহ্ম অংশ হইতে পৃথক বস্তু হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব আছে ইহা মানিতে হয়। তাহার এইভাবে উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, পূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার কথা বলা হইয়াছে এবং পরমাত্মার পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকৃতির কথাও বলা হইয়াছে। এখন শক্তিমান হইতে শক্তি যেমন

স্বতন্ত্র বস্তু নহে, তাহাদের সত্তা পৃথক, তদ্রূপ পরমাত্মার প্রকৃতি বা শক্তিদ্বয় তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। অতএব 'মম এব অংশ' জীব ও ব্রহ্মের অভিন্ন অভেদতত্ত্বের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

অলস ব্যক্তির পরিণাম

মূর্খ হইলেও সাধক যদি গুরুবাক্য মত কাজ করিয়া যান তাহা হইলেও তরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু অলস ব্যক্তির কোন উপায় নাই। অলস ব্যক্তি ভাল পথ পাইয়াও তাহাতে পরিশ্রমের ভয় পায়। সেই সকল উদ্যমশূন্য গর্দভকে সিদ্ধ মহা পুরুষেরাও কিছু করিতে পারেন না। যে নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রযত্ন করে, ভগবান তাহার ভার লইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দেন।

অসুর ভাবাপন্ন লোকের সম্বন্ধে।

যাহারা অত্যধিক আসুরিক প্রকৃতির লোক তাহারা কেবল মনে অর্থ চিন্তাই করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, এই তো আমার এত টাকা জমিয়া গিয়াছে, আরও ইচ্ছামত আমি কত টাকা লাভ করিতে পারিব। এই তো এ বৎসর ৫০/৬০ হাজার টাকা জমিয়া গিয়াছে, আগামী বৎসরও আশা করি আমার ২৫/৩০ হাজার টাকা লাভ হইবে, আর সামান্য কিছু হইলেই আমি লক্ষপতি হইয়া যাইব; এ টাকাটা কি কোন প্রকারে যোগাড় করিতে পারিব না? আমাকে যোগাড় করিতেই হইবে, তাহাতে আমার যত পাপই হোক, লক্ষপতি আমাকে হইতেই হইবে। ইহারা লোকের কাছে বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়ায় আমাকে কেউকেটা মনে করিও না। অমুক লোক জানতো কিরূপ স্পর্দ্ধিত ও ধনবান ছিল, আমি তাহার স্পর্দ্ধা চূর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া দিয়াছি। আমার বিপক্ষে যে থাকিবে তাহার কিছুতেই নিস্তার নাই, তাহাকে বিনাশ করিবই করিব। আর অমুক অমুক যে সব শত্রু

আছে তাহাদের তো উকুনের মত টিপিয়া মারিব। তাহারা যত চেষ্টাই করুক আমার কিছুই করিতে পারিবে না। আমার লাঠির বল কত, তাহারা তা কি জানে? আমিই ঈশ্বর, আমার আবার অন্য চিন্তা, অন্য নিয়ন্তা কে আছে? আমি যাহা করিব তাহাই হইবে। এমন মূল্যবান ভোগ্যবস্তু আর কাহার আছে? আমি এই সকল বস্তুভোগ নিত্য করি, অমুক লোক পাতা চাটিয়া বেড়ায়, উহার সঙ্গে আবার আমার তুলনা। আমি সিদ্ধ পুরুষ। আমার কাছে চালাকি নয়? এখনই উহার প্রাসাদতুল্য ঘর ভূমিসাৎ করিয়া দিব। আমাকে মন্দ বলা সহজ নয়, দেখিতেছ তো আমার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া কি রকম তাহার সর্বনাশ হইয়া গেল। আমার মন্ত্র শক্তির প্রভাব তো জানে না। একেবারে ভিটায় ঘুঘু চড়াইয়া দিব। অমুক লোকের কি সর্বনাশ করিয়া দিলাম। আমাকে আবার ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। জানে না তো আমার সিদ্ধি শক্তির প্রভাব কত বড়। আমাকে ধরিতে আসিলেই আমি তখন পক্ষী হইয়া আকাশে উড়িয়া যাইব। আমার সংসার সুখের সংসার। আমার কত জমি, জমিদারী, ঘর ইমারত। আমার বাড়ীতে কত লোক খাটে, কত লোক খায়, আমার ছেলেমেয়েগুলি সবই হীরের টুকরা। এত তেজ, এত সুখ আর কাহারো ভাগ্যে নাই। এইসব প্রকৃতির লোকেরা আরও বলিয়া থাকে - ধনে, মানে, কুলে, শীলে আমার মত এ তল্লাটে আর কেহ নাই। আমি এমন ধূম ধামের সহিত যাগ যজ্ঞ আরম্ভ করিব যাহা দেখিয়া লোকের তাক্ লাগিয়া যাইবে। তাহাদের বলিতেই হইবে এমন যজ্ঞ তাহারা আর কোথাও দেখে নাই। দীন, দুঃখী, ব্রাহ্মণকে এমন দানও পূর্বে কেহ করে নাই। দেখিবে তখন কত লোক আসিয়া আমায় তোষামোদ করিবে; নট প্রভৃতি আমার স্তবগান করিবে। আমিও তাহাদের প্রচুর ধন দিব, আমার যশে সমস্ত দেশ ভরিয়া যাইবে। বন্ধুবান্ধবের সহিত কত আহ্লাদ, পান ভোজন চলিবে।

এইরূপ অজ্ঞানবিমোহিত মূঢ়েরা বহুবিধ সঙ্কল্প দ্বারা পরিপূর্ণ

হইয়া পিশাচবৎ নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকে। এইরূপ নানাবিধ ঘৃণ্য সংস্কার বশতঃ নীচ যোনীতে জন্মগ্রহণ করিয়া অমেধ্য কৃমিজালপূর্ণ নরক সদৃশ স্থানে নিমগ্ন হয়। কুকর্মাসক্ত ব্যক্তির চিত্তে যে সঙ্কল্প উঠে তাহা নরক সদৃশ। সেই চিন্তাতে তাহারা সতত মগ্ন, সেজন্য তাহাদের নরকবাসই হয়। মৃত্যুর পর তদনুরূপ যোনীতেই জন্ম গ্রহণ করে; সেখানে তাহার আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারিপ্রকার কর্ম ব্যতীত আর কোন কর্ম থাকে না। এতদপেক্ষা ঘোর নরক আর কি হইতে পারে? উক্ত প্রকারের লোক নিজেকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য ফোঁটা তিলক কাটিয়া মালা গলায় দিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকে। ইচ্ছা সকলেই আসিয়া তাহার চরণে পড়ুক। সুতরাং এই সকল লোক বড় অভিমানী ও অবিনয়ী হয়। একটু সম্মান খাতিরের ত্রুটি হইলে রাগিয়া অগ্নিশর্মা হয়। তাহাদের যদি টাকাকড়ি থাকে, তবে সেই ধনের জন্য মদ ও মান উৎপন্ন হয়। সহজে কাহারও নিকট নত হইতে চাহে না। যদি যজ্ঞ করে, তাহাও আত্মাভিমানে পূর্ণ হইয়া করে। দেবতার প্রতিও কোন প্রকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকে না; বেদবিধির প্রতিও লক্ষ্য নাই। একটা যাহা হউক হলেই হলো। কেবল নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া থাকে; তাহারা শাস্ত্র বিহিত ভাবে এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া করে না। তাহাদের এই সকল যজ্ঞ কেবল বাহ্যাড়ম্বর, আপনাকে ধার্মিক বলিয়া খ্যাত করার জন্যই করে। এইসব শ্রেণীর লোকের বিষয় গীতা ও অন্যান্য বহুশাস্ত্রে বহুভাবে উল্লিখিত আছে। সেইজন্য আমি এখানে মোটামুটি দুই চারিটি উল্লেখ করিলাম।

যাঁহারা একটু সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন ও ভগবদ্বিশ্বাসী সেইসব সাধু প্রকৃতি লোকেদের পক্ষে পূর্বোক্ত আসুরিক ভাবাপন্ন লোকেদের সংস্রব বর্জন করাই শ্রেয় ও মঙ্গলদায়ক, এইরূপ করাও বাঞ্ছনীয়।

ত্রিগুণের বন্ধন

১। **সত্ত্বগুণের বন্ধন** ঃ- সত্ত্বগুণ সুখে আবদ্ধ করে বটে, কিন্তু সে বন্ধনরজ্জু ততটা দুশ্ছেদ্য নহে। সত্ত্বগুণ সুখের দিকে আবদ্ধ করে কেমন? যেমন ক্রিয়া করিতে করিতে প্রত্যহ যে শান্তি একটু একটু পাওয়া যায়; কূটস্থের জ্যোতিও মোটামুটি দর্শন মন্দ হয় না। যাহা এই দুঃখের জগতে বড়ই দুর্লভ; সেই শান্তিটুকু ও কূটস্থ দর্শনের লোভে ক্রিয়া করিতে প্রত্যহ নিয়মিত বসে। এই যে সুখের বন্ধন, ইহা অবশ্যই সত্ত্বগুণে আছে। এ বন্ধনে শেষ পর্য্যন্ত ভব-বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। এইজন্য ইহাকে মন্দ বলা যাইতে পারে না। এইরূপ নিয়মিত ক্রিয়া অভ্যাস করিতে করিতে শেষে সাধককে গুণাতীত করিয়া দেয়। অতএব সত্ত্বগুণের বন্ধনকে খারাপ বলা যাইতে পারে না।

২। **রজোগুণের বন্ধন** ঃ- রজোগুণের বন্ধন কেবল কর্মে নিয়োগ করা। সাধু হইয়াছে, ত্যাগীর বেশ লইয়াছে তবুও কর্মাসক্তি যায় নাই। সামান্য বিষয় যাহা উপেক্ষা করিলেও চলে, তাহারই জন্য মাসে কুড়িবার আদালতে ছুটাছুটি করিতেছে। সন্ন্যাসী সাজিয়াও বিষয় ভোগের দিকে খুব আকর্ষণ; কেহ কিছু বলিলে, বুঝাইয়া দেন জনক রাজার মতন তিনি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। তাই আজকাল এই ঘরে ঘরে জনক রাজার ঠেলায় অতি মাত্রায় লোককে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। আবার যিনি ধনী তিনি সাধুসঙ্গ করিলেও তাহার মধ্যেও ধনমদের দুর্গন্ধ লোককে অস্থির করিয়া রাখে। টাকাকড়ি হয়ত যথেষ্ট আছে, সংসারে প্রয়োজনও তেমন নহে, পেন্‌সন্ হইয়া গিয়াছে; তবু যে একটু ভগবৎ আলোচনা করিবে বা সাধন করিবে সে হবার জো নাই; সেই বৃদ্ধজীর্ণাবস্থাতেও ময়লা ঘাঁটিবার লালসা অতিমাত্রায় বিদ্যমান। ইহা সমস্তই রজোগুণের খেলা। রজোগুণ প্রধান ব্যক্তির আরও একটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সদা সর্বদা মনে জল্পনা কল্পনা

করে; আহা উহার কেমন সুন্দর গহনাটি, কেমন বাড়ীটি, আহা ঐ লোকের বাগানটি দেখতে কি সুন্দর। এই সব সর্বদা মনে কল্পনা করে; সেই সব বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে, হয়তো নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি নিজের স্বাধিকার বিস্তারের জন্য সদা সর্বদা উদ্যোগী। মনে শান্তি নাই সর্বদা মনে সংকল্প বিকল্পের ভাঙ্গন গড়ন চলিতেছে। মোকদ্দমা করিতেছে, কখনও জিতিতেছে, কখনও বা হারিলে আবার উচ্চতর আদালতে আপীল করিতেছে। যা কিছু দ্রব্য, ভূমি, ধন সমস্ত আমার হউক এইরূপ সদা সর্বদা মনে জল্পনা কল্পনা করিতেছে। এইরূপ কয়দিন ছটফটানি, তারপর যম এসে ধরিলেন।

৩। **তমোগুণের বন্ধন** ঃ- তমোগুণের বন্ধন আরও অদ্ভুত - কেবল কর্ত্তব্যকর্মের অকরণজনিত প্রমাদে জীবকে সংশ্লিষ্ট করে। কিছু বুঝে না তাহাও নহে, বেশ বিচার শক্তিও আছে কিন্তু এত অলস এত নিদ্রাকাতর যে ভাল পথে যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও যাইতে পারে না। হয়ত মহৎ সঙ্গ হেতু বিবেক বৈরাগ্যও আছে, ভগবানের দিকে মনও যায় কিন্তু সাধন করিবার জন্য অতক্ষণ কে আসনে বসিয়া থাকে। এই সাধন করিতে যাইবে, অমনি কেহ আসিয়া ভূতের গল্প জুড়িয়া দিল, হাঁ করিয়া তাহাই শুনিতে লাগিল। এইরূপে দুর্লভ সময় প্রমাদে, আলস্যে, বৃথা কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায়। এ সমস্তই তমোগুণের খেলা। অবিদ্যার মাত্রা এই তমোগুণেরই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মাতাল যেমন মলপিন্ড দেহের কদর্য্য ভাব অনুভব করিতে পারে না; তমোগুণীরাও সেইরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত হইয়া নিজের প্রমাদ জনিত দুঃখের অবস্থাকে অনুভব করিতে পারে না। তারপর তমোগুণের আরও একটি লক্ষণ হইতেছে যারা তমোগুণী তাহাদের মনে বিবেক বুদ্ধির উদয় হয় না। শাস্ত্র গুরুবাক্য শুনিয়াও তাহাতে উৎসাহ জাগে না। মোহবশতঃ মদ্যাদি পানে বুদ্ধিভ্রংশ, যাহা করিলে কল্যাণ হয় তাহা কিছুতেই করিবে না। নিদ্রা, আলস্য, সর্বদা শুইয়া পড়িয়া থাকা, হয়ত একটু ক্রিয়া করিতে বসিল সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া

পড়িল; সারারাত্রি ঘুমাইয়াও বেলা ৯টা পর্য্যন্ত বিছানায় পড়িয়া আছে। তারপর উঠিয়াই শুঁড়ি বাড়ী দে ছুট। হঠাৎ একদিন মৃত্যু আসিয়া উহাদের লোকান্তরে লইয়া যায়।

ভগবানের নিকট কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগী।

শ্রীভগবান গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩২শ শ্লোকে বলিতেছেন - যিনি অর্থাৎ যে যোগী পুরুষ আত্মতুলনায় অন্যের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখের সমান করিয়া দেখেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, কিন্তু তিনি যদি নিজের বা অপরের সুখ দুঃখই অনুভব করিতে পারিলেন, তবে তাঁহার নিরোধ অবস্থা থাকিল কই। যদি নিরোধভাব থাকে তবে তো তাঁহার মনও নাই, কল্পনাও নাই; সে যোগী অপরের সুখ দুঃখ বুঝিবেন কিরূপে? এইরূপ সুখ দুঃখ বুঝিতে হইলে আবার মনে ফিরিয়া আসা প্রয়োজন, দ্বৈত বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। যিনি এতটা নামিয়া আসিলেন তিনি ভগবানের নিকট এত শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইলেন কিরূপে? এখানে একটা কথা আমার মনে উদিত হইল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

যিনি ক্রিয়ার পরাবস্থায় পরমানন্দে অবস্থিতি করিতেছেন, যেখানে জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ কিছুই নাই, ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিতেছেন, (যাহা বুঝাইবার নহে) তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীন্দ্র পুরুষ। একদিকে দেখিতে গেলে তাঁহারা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, যাহাকে তুর্য্যাবস্থা বলে। এইবার একটি কথা বিবেচনা করিবার আছে -

যাঁহারা ঐরূপ অনুপম সুখ ও পরমানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া ব্যথিত কাতর জীবকে অনুগ্রহ করিয়া তাহার মুক্তির পথ দেখাইতে পঞ্চম ভূমিতে নামিয়া আসেন সেই কৃপাসিন্ধু মহানুভব যোগীন্দ্রগণ যে সর্ব শ্রেষ্ঠ যোগী হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? স্বয়ং ভগবানও জগৎ

জীবের মঙ্গলের জন্য ঠিক এইরূপই করিয়া থাকেন; তাই চিত্তসাম্যে তাঁহারা ভগবানের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। নচেৎ তাঁহারা যদি ঐরূপ উদাসীন থাকিতেন; তাহা হইলে আমাদের মত সংসার মায়ামুগ্ধ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য জীবের তো উদ্ধারের কোন আশাই থাকিত না। আমাদের কি গতি হইত। আমরা কি করিয়া পরিত্রাণ পাইতাম? সেইজন্যই এই সকল মুক্তাত্মারাই কৃপা করিয়া আমাদের মুক্তির পথ বলিয়া দিয়া কৃতকৃতার্থ করেন। সেইজন্যই সেই কৃপাসিন্ধু যোগীরাই জগৎগুরু। জগতের দুঃখ ত্রাণ কর্ত্তা সেই মহানুভব যোগীন্দ্র পুরুষদের আমরা পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া ধন্য হই।

অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও ধর্ম্মের গ্লানি সম্বন্ধে।

ভগবান কূটস্থ চৈতন্য সাধকরূপ অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে অর্জুন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আমি আপনাকে অর্থাৎ নিজেকে সৃজন করি।" কালস্রোতে পড়িয়া জীবগণ বিপথগামী হইলে তাহাকে পথ দেখাইতে ভগবান আবির্ভূত হন, কখনও বা মুক্ত পুরুষগণের বুদ্ধিস্থ হইয়া জগতের কল্যাণের জন্য ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতীর্ণ হওয়া মানে একটু নীচে নামা। জীবের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া একটু নীচে নামেন, নচেৎ আমরা তাঁহার ধরা ছোঁয়া পাইব কি রূপে? সপ্তম জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় পুরুষ আর এ জগতের কোন কথা ভাবিতে পারেন না। কিন্তু তিনি যে জগৎপিতা, জগদীশ্বর, করুণাময়, তিনি যে জ্ঞানঘনমূর্ত্তি, তাঁহাকে কেহই টলাইতে সমর্থ হয় না; তবুও তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য জীবের প্রতি করুণা পরবশ হইয়া জগতীতলে অবতীর্ণ হন; অর্থাৎ তিনি পঞ্চমভূমিতে নামিয়া আসেন।

ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান কিরূপ? ধর্ম্মের গ্লানি কখন হয়? যখন সত্যের প্রতি লোকের আদর থাকে না। দ্বিজাতিরা

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম বিহীন হইয়া যায়; শাস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও দেবতাকে কেহ মানিতে চায় না, অভক্ষ্য ভক্ষণে সকলে তৎপর হয়, ধর্মাচরণ বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়; লোককে প্রতারণা করিতে পারাই বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হয়, নারীদের মধ্যে সতীত্ব থাকে না। গুরু ও পতি সেবাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, স্ত্রী লোকেরা নারীধর্ম ছাড়িয়া পৌরুষ ভাবাপন্ন হয়; তখনই বুঝিতে হইবে ধর্মের গ্লানি হইয়াছে, অধর্মের আধিক্য হইয়াছে। ঐ অধর্ম স্রোতে জগতে নিত্য ধর্মাচরণে বাধা পড়ে। তখন রোগ, শোক, কত দৈব বিড়ম্বনা, কত যুদ্ধ, কত অশান্তি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী জগৎকে যেন গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন মনে হয় জগতে আর রক্ষাকর্ত্তা নাই। অধার্মিকেরা আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায়, ধার্মিকদের কেহ গ্রাহ্য করে না, সম্মান করে না বাধ্য হইয়া তখন তাহাদিগকে লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনে যাইতে হয়।

এই অবস্থা যখন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন আবার ধর্মচক্র ঘন ঘন বিকম্পিত ও আন্দোলিত হয়। সেই আন্দোলনের ফলে শক্তিমান পুরুষ সকলের আবির্ভাব হয়। কখনও কখনও ভগবান স্বয়ং জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ঐশ্বরিক লীলা কি অপূর্ব! কি করুণামন্ডিত! ঐ কথা মনে হইলে হৃদয় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। তখন কত আশা কত ভরসা পাওয়া যায়। কলিযুগে নিদারুণ পাপদগ্ধ জীব কিরূপে শান্তি পাইবে, কিরূপে অধর্মোৎক্ষিপ্ত জীব আবার ধর্মের ছায়ায় দাঁড়াইয়া শীতল হইবে, কবে সত্যযুগের সৎপথ ধরিয়া অসত্যকে পরিহার করিবে, ত্রিতাপদগ্ধ জীব সত্যযুগের স্নিগ্ধ প্রাতঃ সমীরণে শুদ্ধস্নাত হইয়া কবে জুড়াইতে পারিবে, তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য ভগবান জগতে অবতীর্ণ হন। ইহা অপেক্ষা পরম করুণা আর কি হইতে পারে? ইহাতে অধর্মের উচ্ছেদ হয় এবং পাপী তাপী দুষ্কর্মকারীরা নিজ নিজ কর্মজনিত ফল ভোগ করিয়া অবশেষে অনুতপ্ত হয়। আর ধার্মিকদিগকে তিনি কি প্রকারে রক্ষা করেন তাহার একটু আলোচনা করা যাউক ঃ-

যাঁহারা সাধনশীল ভগবদ্ভক্ত যাঁহারা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদেরও সময়ে সময়ে অনেক বিপত্তি আসে। সাধনে বেশ উন্নতি হইতেছে, অনেক বিভূতিও লাভ করিয়াছেন, হয়তো সেজন্য একটু অহমিকা আসিয়া পড়িল। এই অবস্থায় উন্নতির পথ একেবারে তখন বন্ধ। সাধক আর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, যেন নিজের অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িলেন। তখন সাধকের ভয় হয় চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া আবার তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন। শরণ গ্রহণ করিলেই সদবুদ্ধিরূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ভগবান দীনার্ত্ত সাধকদিগকে কৃতার্থ করেন। অথবা যাঁহারা খুব ভাগ্যবান ভক্ত, বহুজন্মের সাধন সংস্কার দ্বারা যাঁহাদের মনটি বেশ শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদেরও কখনও কখনও পূর্বজন্মের কিছু দুষ্কৃতিবশতঃ সাধন পথে কেমন যেন একটু বিঘ্ন আসে। অনেক দূর অনায়াসে অগ্রসর হইয়া শেষের ঘাঁটি যেন আর কিছুতেই পার হইতে পারিতেছে না, অথবা বেশ ভক্তি আছে, বিচার আছে কিন্তু দেহটা হয়তো তেমন সুস্থ নয়; সুতরাং মনের মতন করিয়া ভগবদ্ ভজনা করিতে পারিল না; অথবা ভগবদ্ভজনা বেশ চলিতেছে কিন্তু বিচারের কিছু ত্রুটি থাকিয়া যাওয়ায় আর তখন অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতেছে না, ভক্ত তখন বড় বিচলিত হইয়া পড়েন। ভগবান তখন "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" তাহাকে জ্ঞান দান করেন, বল দান করেন যাহাতে শীঘ্র তাঁহাকে পায়। ইহাই সাধুদের পরিত্রাণ।

মূলকথা ঃ- মনই ধর্মকে ধারণ করিয়া আছে যখন মন আজ্ঞাচক্রে স্থির থাকে, আজ্ঞা চক্র হইতে চ্যুত হইলে মন বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে, আত্মাকে ভুলিয়া যায় ও নানা প্রকার কুকর্মে রত হয়। পুনঃ সদগুরুর পথে চলিলে শিষ্যের বিষয়াসক্ত মন ও মোহ ক্রমশ ধ্বংস হইতে থাকে, ইহাই দুষ্কৃতির বিনাশ। সাধকের সাধন পাইবার পূর্বে মন যেমন বিকৃত ও পাপাসক্ত ছিল, মন দিয়া সাধন করিতে করিতে তাহার সে পূর্বভাব বদলাইয়া যায়। ইহাই দুষ্কৃতির বিনাশও বটে ধর্ম সংস্থাপনও বটে।

অমৃতের সন্তান

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মায়ের নাড়ীর সঙ্গে যোগ থাকে। নাড়ী কাটিয়া লোকে মায়ে সন্তানে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আমাদেরও সেই আকাশময় অখন্ড চৈতন্যের সঙ্গে শ্বাসের পথে কেমন সুন্দর শ্বাস নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। অহো আমাদের নাড়ী কাটা হয় নাই। অখন্ড চৈতন্যের সঙ্গে এক নাড়ীতেই আমাদের শ্বাসচৈতন্যের পোষণ হইতেছে। আমরা বিশ্বময়ীর সেই অমৃত নাড়ী ধরিয়া নাক মুখ দিয়া চোষণ করিতেছি। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।" হে অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর; অমৃতের সন্তান কেন? ঐ যে জগন্ময়ীর অমৃত নাড়ীর সঙ্গে আমাদের নাড়ী এক হইয়া আছে। নাড়ী কাটা হয় নাই, হইবেও না।

আমরা চিরদিন অমৃতের সন্তান। সকলে ঋষিবাক্য ধরিয়া অমৃতনাড়ীতে লক্ষ্য স্থির কর। লক্ষ্য যদি স্থির হল, মোক্ষ পথে পা প'ল।

এ সংসার মরুমাঝে ঋষিবাক্য ভরসা।
সত্যের ও অমৃতের অবিশ্রান্ত বরষা।।

যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে মহাত্মাদের উপদেশ

প্রাচীনকালে আর্য্য ঋষিগণ আমাদের হিন্দুধর্মের যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে প্রাণায়ামের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে এমন একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, যোগ, যাগ, প্রাণায়াম ইত্যাদি করিলে নানা প্রকার পীড়া ইত্যাদি হইয়া থাকে; কিন্তু এ ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন ইত্যাদি করিলে যদি আমাদের অপকারই হইত, তাহা হইলে মুনি ঋষিগণ কখনই প্রাণায়াম ধর্মের বিধি ব্যবস্থা দিয়া যাইতেন না। তাঁহারা কি এতই

অর্বাচীন, এতই মূর্খ ছিলেন? প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণায়ামাদি কার্য্যটি বুঝিয়া করিতে পারিলে তাহাতে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই।

আজকাল উপযুক্ত সদগুরুর অভাবে প্রকৃত যোগকর্ম বুঝিতে অক্ষম হইয়া যোগের নামে নানা প্রকার অকথা, কুকথা বলিয়া থাকি। ইহা আমাদের মূর্খতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে ভগবৎ কৃপায় সদগুরু লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের আন্তরিক চেষ্টাও নাই, ইচ্ছাও নাই। আমেরিকার পুরুষ, আর রাশিয়ার রমণী অল্‌কৃৎ ও ব্লাভাট্স্কি - ভারতে আসিয়া একমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টাতে দুর্লভ সদগুরু লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের নর - নারীরা ঐরূপ আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে সদগুরুলাভে তাহাদের আর ভাবনা কি?

আমাদের আর এক কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে, যোগ করিতে গেলে সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপস্যা করিতে হইবে। কিন্তু এ ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। গীতা শাস্ত্রখানি আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, শ্রীভগবান এরূপ কখনও বলেন নাই যে, হে অর্জ্জুন! তুমি বনে যাও। অনেকেই যোগকে কল্পনাসম্ভূত বিবেচনা করিয়া নিজেদের মূর্খতারই পরিচয় দিয়া থাকেন।

আমাদের একটি কথা সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে - আমাদের দেহের নবদ্বার দিয়া স্থিরতারূপ মহাভাব সর্বদাই বাহির হইয়া যাইতেছে। সেই স্থিরতা অভ্যাস না করিলে যোগফল লাভ হয় না, অর্থাৎ নিজবোধরূপ আত্মবোধের উদয় হয় না।

কিরূপে স্থিরতা হয়? "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" দ্বারা। নিরোধ কি? বিপথে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পথে মন না যায়। তাহাতে কি হয়? বিপথ রোধ

হওয়ায় স্বপথে অর্থাৎ আত্মার পথে (সুষুম্নার পথে) গতি হয়। বৃত্তি নিরোধ কিরূপে হয়? কর্মের একটি সুকৌশল দ্বারাই। সে কৌশল কি? প্রাণায়াম, কেবল প্রাণায়াম। তাহার ফল হবে কি? জীবাত্মা ও পরমাত্মা সংযোগ। ইহাই উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান পথ। ভারতের হৃদয় কঙ্কালে এই মহাবিজ্ঞান অবিনাশীরূপে অঙ্কিত আছে। ইহা যে কতকাল পরে আবার ভারতের মুখ উজ্জল করিবে তাহা অন্তর্য্যামী ভগবানই জানেন।

প্রাণায়ামই মহাধর্ম। তাহা হস্তলিখিত বেদশাস্ত্রেরও অগোচর। প্রাণায়াম সকল প্রকার পুণ্যকর্মের সার এবং পাপরাশি নাশক। প্রাণায়াম দ্বারা কোটি কোটি মহাপাতক, কোটি কোটি দুষ্কর্ম এবং পূর্বজন্মার্জিত পাপ সকল ও নানা দুষ্কর্মজনিত পাতক ধ্বংস হইয়া থাকে। যিনি এই প্রাণায়াম বিধিপূর্বক অভ্যাস করেন তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধন্য। মন্বাদি ঋষিরা সকলেই প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য প্রাণায়াম ধর্মের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

কবীর সাহেবের দোঁহা

১। **কবীর সহজ হিধুনি লাগি রহে সেত এ হত ঘটমাহি।**
হৃদে হরি হরি হোৎ হ্যায়, মুখ কি হাজত নাহি।।

অর্থাৎ সহজরূপ ধ্বনি এই শরীরের মধ্যেই লাগিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতেই আপনা আপনি হরি হরি হইতেছে। মুখে চিৎকার করিবার আবশ্যক নাই। ফল কথা সহজ যে প্রাণ যাহা আপনা আপনি চলিতেছে, তাহাতেই লক্ষ্য করিয়া থাক. তাহা হইলেই সব জানিতে পারিবে, তখন আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

২। **কবীর অজপা সুমিরণ হ্যোৎ হ্যায় কহো শন্ত কহি ঠৌর।**
কর জিহ্বা সুমীরণ করে এই সব মন কি দৌড়।।

অর্থাৎ অজপা স্মরণই সাধুদিগের দাঁড়াইবার একমাত্র স্থান; করের দ্বারা মালা জপ, বা জিহ্বার দ্বারা নামজপ করা, এ সকল মনের দৌড় মাত্র। ইহাতে কাজ কিছুই হয় না।

৩। **কবীর অজপা সুমীরণ হ্যোৎ হ্যায় শূন্যমন্ডল অবস্থান।**
কর জিহ্বা তঁহা না চলে মন পঙ্গুল তঁহা জান।।

অজপা স্মরণের দ্বারা শূন্যমন্ডলে অবস্থান হয়, কর ও জিহ্বা সেখানে যাইতে পারে না, মনও খঞ্জ হইয়া যায়।

৪। **কবীর মালা কঠকি বহুৎ জন করি ফের।**
মালা ফের শ্বাস কি জাহে গাঁঠি নাহি সুমের।।

অর্থাৎ কাঠের মালা ত অনেকেই ফিরাইয়া থাকে, তাহাতে কিছুই হইবে না, শ্বাসের মালা ফেরাও যাহাতে সুমেরুর গাঁঠ নাই।

৫। **মালা ত' করমে ফিরে জিহ্বা ফিরে মুখ মাহি**
মনুয়া ত' চৌদিশ ফিরে ইয়া তো স্মরণ নাহি।।

অর্থাৎ, হাতে মালা জপ করিতেছ ও মুখে তাঁহার নাম জপ করিতেছ সত্য, কিন্তু তোমার মন যে অভ্যাস বশতঃ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা কি কখনও লক্ষ্য করিয়াছ?

৬। **কবীর গুরু ধবি শিখ কপড়া সাধন শিজনি হার।**
সুরতি শিলাপর ধোইয়ে, নিকলে জ্যোতি অপার।।

অর্থাৎ, গুরু হইতেছেন ধোবা, আর শিষ্যের মনটি হইতেছে ময়লা কাপড়ের মত। ধোবা যেমন কাপড় সাজিমাটি মাখাইয়া পাটার

উপর আছাড় দিতে দিতে ময়লা কাপড় ধবধবে পরিষ্কার করিয়া থাকে, তেমনি গুরুরূপী ধোবা শিষ্যকে সাধনরূপ সাজিমাটি মাখাইয়া আত্মার ধ্যানরূপ শিলাতে মনকে বারংবার আছাড় দিতে শিক্ষা দেন। আছাড় দিতে দিতে ময়লা কাপড় যেমন পরিষ্কার হয়, সেইরূপ গুরুর উপদেশ মত সাধনার দ্বারা শিষ্যের মন হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত ময়লা কাটিয়া যায় এবং এক অপূর্ব আত্মজ্যোতির প্রকাশ হইয়া শিষ্যকে কৃত কৃতার্থ করে।

৭। **কবীর পরব্রহ্মকো তেজকা ক্যায়সা হ্যায় অনুমান।**
ক্যা ওয়াকি শোভা কাঁহা দেখন্ কছু পরমান।।

অর্থাৎ, কবীর বলিতেছেন পরব্রহ্মের তেজের অনুমান কি করিয়া হইবে? উহার যে কি শোভা তা আর কি বলিব, প্রত্যক্ষ দেখিলে তবে বোঝা যায়। যে দেখিয়াছে সেই তাহার প্রমাণ জানে; অর্থাৎ হিরণ্ময় সিংহাসনে কূটস্থ ও সম্মুখে সমস্ত সিদ্ধগণ বসিয়া রহিয়াছেন। এইরূপ প্রকাশের প্রমাণ দিবার উপায় নাই; কারণ তাহা নিজ বোধ রূপ। যে দেখে সেই জানে।

৮। **কবীর অগম অগোচর গমি নহি তাঁহা ঝলকে জ্যোতি।**
তাঁহা কবীরা বন্দোগী, পাপ-পুণ্য নাহি দ্যোতি।।

অর্থাৎ, কবীর সে স্থান অগম্য, কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, বুদ্ধি সেখানে যাইতে পারে না, কোন চিন্তা নাই অর্থাৎ মন নাই; এমত স্থান হইতে জ্যোতির ঝলক বাহির হইল। সেইখানে কবীর গিয়া দন্ডবৎ প্রণাম করিলেন যেখানে পাপ পুণ্য দুই-ই এক।

৯। **কবীর যাঁহা পবন নাহি সঞ্চারে, তাঁহা রচি হো এক গেহ।**
অচরয় এক যো দেখিয়া সিদ্ধঁ কলেজা দেহ।।

অর্থাৎ, যেখানে পবনের সঞ্চার নাই, সেখানে এক গৃহ প্রস্তুত করিলাম, আর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে দেখিলাম যে হৃদয়ও দেহেতে সিদ্ধ হইয়াছে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়াছে, তখন সূক্ষ্মরূপে সুষুন্নার ভিতরে তত্ত্বে তত্ত্বে চলিতেছে। গৃহে যেমন বাস করা যায়, সুষুন্নায় বাস করায় সুষুন্না তখন গৃহ হইল। ঐ অবস্থায় এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যে, হৃদয়ে ধপ ধপানি আর নাই, প্রাণ ভিতরে আসিয়া ভিতরেই যাইতেছে।

১০। **কবীর উন্মন লাগি শূন্যমে, নিশিদিন রহে গুলতান।**
তন্ মন্ কি কিছু সুধী নাহি, পয়া পদ নির্বাণ।।

অর্থাৎ কবীর উন্মনীতে আটকাইয়া যাওয়ায় শূন্য দেখিতে লাগিলেন। আর দিবারাত্র গলায় টান রহিয়াছে, শরীর ও মনের জ্ঞান নাই, তখন নির্বাণ পদ পাইলাম; অর্থাৎ ঊর্দ্ধে মন আটকাইয়া যাওয়ায় কূটস্থ ব্রহ্মে থাকিল। আর দিবারাত্র গলায় টান (জালন্ধর মূদ্রা) রহিল; তখন নেশায় বুঁদ হওয়ায় কোন বিষয়ে আর আসক্তি থাকিল না।

১১। **নির্গুণ হ্যায় সো পিতা হামারা, সগুণ হ্যায় মাহতারী।**
কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দোনো পাল্লা ভারী।।

অর্থাৎ, আমার পিতা হচ্ছেন নির্গুণ, আর মাতা সগুণ, এখন কাকেই বা নিন্দা করি, আর কাকেই বা বন্দনা করি, দুজনেই সমান।

১২। **কবীর কহেতে কে কহি যান দে, উনহকি বুদ্ধি মৎই লেহু।**
শকট্ আওপুনি শোয়ন্ কো, ফেরি জবার মৎই দেহু।।

অর্থাৎ, যাহারা কেবল বাক্যবীর, তাহাদিগের বুদ্ধি লইও না; তাহারা যাহা বলে বলিয়া যাক্, শুনিবার দরকার নাই। কুকুরের

স্বভাব ভেউ ভেউ করা, সে তাহাই করুক, তাহাতে জবাব দিও না।

১৩। **কবীর যাকি পুঁজি শ্বাস হ্যায়, ছিন আওয়ে ছিন যায়ে।**
তাকো য্যাসা চাহিয়ে, রহে রাম লোলায়ে।।

অর্থাৎ, যাহাদের সম্বল শ্বাস, অন্য পুঁজি কিছুই নাই; আবার সেই শ্বাসও ক্ষণকালের জন্য স্থির নয়, একবার যাইতেছে আবার আসিতেছে, এমন অবস্থায় লোকের উচিত সর্বদা আত্মারামকে লইয়া মজিয়া থাকা।

১৪। **কবীর কাঁহা ভরসা দেহকো; বিনাশী যায়ে ছিন মাঁহি।**
শ্বাস শ্বাস সুমীরণ করো; আওর উপায় কুছ নাহি।।

অর্থাৎ, দেহের আবার ভরসা কোথায়, এক ক্ষণকালের মধ্যে সে তো নাশ হইয়া যায়। প্রতি শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করা ব্যতীত ইহাকে রক্ষা করার আর কোনও উপায় দেখি না।

১৫। **তিমির গঙ্গ রবি দেখতে, কুমতি গঙ্গ গুরুজ্ঞান।**
সত্য গঙ্গ এক লোভতে, ভক্তি গঙ্গ অভিমান।।

অর্থাৎ, সূর্য্যালোকে অন্ধকার নষ্ট হয়, গুরু জ্ঞান দান করিলে কুমতি নষ্ট হয়, লোভ করিলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা যায় না; তেমনি অভিমান থাকিলে আর ভক্তি থাকে না।

১৬। **কবীর জ্ঞান না বোধিয়া হীর্দ্দয় নাহি জুড়াবে।**
দেখ দেখ কি ভক্তি করে রঙ্গ নাহি ঠাহরাবে।।

অর্থাৎ, কবীর! জ্ঞানকে ভেদ না করিতে পারিলে অর্থাৎ ক্রিয়ার পরাবস্থায় প্রবেশ করিতে না পারিলে, হৃদয়ের জ্বালা জুড়ায় না। দেখা দেখি যে ভক্তি করে অর্থাৎ সাধন ভজন করিয়া অন্যের

খুব ভাল হইয়াছে, ধন সম্পদে তাহার ভান্ডার পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অতএব আমিও ভজন করি, আমারও ঐরূপ হইবে - এই মনে করিয়া যে সাধন ভজন করিতে বসে, তাহার ভজন নিষ্ফল ও বাহ্যাড়ম্বরময় হয়। লোক দেখানো যা কিছুই করি, তাহাতে উপরে রং মাখিয়া মন্দ দেখায় না বটে কিন্তু সে রং পরীক্ষায় টিকে না।

১৭। **কবীর রাম রাম সুমিরণ করে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ।**
কহহিঁ কবীর সুমিরণ করে নারদ শুকদেব শেষ।
কবীর সনকাদি সুমিরণ করে নাম ধ্রুব প্রহ্লাদ।।

অর্থাৎ, কবীর বলিতেছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, নারদ, শুকদেব, সনকাদি ঋষিগণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বোচ্চ অবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর পক্ষে কর্ম ত্যাজ্য হইলেও অর্থাৎ তাহাদের কর্ম আর না করিলেও চলে, তবুও তাঁরা উদ্দেশ্যবিহীন হইয়াও স্বভাব ধর্ম বশতঃ লোকশিক্ষার জন্য সর্বদাই ক্রিয়া করেন, রামরূপ আত্মনারায়ণের সেবাও স্মরণ করেন।

১৮। **কবীর ছন্‌পড়ে ছন্ উতরে সো তো প্রেম ন হোয়।**
আট্ প্রহর লগা রহে প্রেম কহাওয়ে সোয়।।

অর্থাৎ, কবীর এই এখনই একটু নেশা হইল আবার ক্ষণ পরে তাহা চলিয়া গেল, তাহাকে প্রেম বলে না। প্রেম তখনই বলা যায়, যখন অষ্টপ্রহর নেশা সমান ভাবে লাগিয়া থাকে।

ত্রিসন্ধ্যা রহস্য

যোগীরা গুরূপদেশে যে যোগক্রিয়া করিয়া থাকেন, উহাকে অন্তঃসন্ধ্যা বলা হয়। উক্ত অন্তঃসন্ধ্যার দ্বারা যে স্থিতি লাভ হয় উহাকে সিদ্ধাবস্থা বলে, কিন্তু বাহ্যসন্ধ্যায় সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া সুদূর পরাহত।

শাস্ত্রে সন্ধ্যার উপাসনা ত্রিকালীন করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কোন কোন বৈদান্তিক পন্ডিতেরা বাহ্যদৃষ্টিতে বলিয়া থাকেন, সন্ধ্যা দুইবার করা উচিত; কারণ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা নাই। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে যদি মধ্যাহ্ন সময়ে বিধি থাকে তাহা হইলে মধ্য রাত্রিতেও সন্ধ্যা করা হয় না কেন? তাহা হইলে ত্রিসন্ধ্যার স্থলে চতুঃসন্ধ্যা হয়। এই যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা বলেন যে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ঊষাকালে এক সন্ধ্যা, আর সূর্য্যাস্তের সময় গোধূলি এক সন্ধ্যা। এই উভয় সন্ধিক্ষণে কালের যে মিলন বা লয় হয় তাহাই উভয় সন্ধ্যা। এই উভয় সন্ধ্যার যুক্তি দেখাইয়া তাঁহারা প্রাতঃ ও সায়াহ্ন এই উভয় সময়ে সন্ধ্যার উপাসনা করিতে বলেন।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যুক্তিটি অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এইবার আসুন সাধক, আমরা অর্ন্তদৃষ্টি দিয়া এ যুক্তিকে ভুল প্রতিপন্ন করিতে পারি কি না। সন্ধ্যার যে ত্রিকালীন ব্যবস্থা আছে, তাহাই সঠিক ও নির্ভুল। কারণ কাল অনন্ত, সেই কাল ঘটস্থ হওয়ায় তাহার সংখ্যা হইতেছে। সেই সংখ্যা হইতেই সাংখ্য। এই কাল ত্রিভাগ হওয়ায় ত্রিকাল অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ইহাদের তিনটি সন্ধিস্থল বা মিলনস্থল রহিয়াছে। ঘটস্থ কালরূপী প্রাণ ইড়া অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ী হইতে যখন পিঙ্গলায় অর্থাৎ সূর্য্যনাড়ীতে যায় তখন অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ী ছাড়িয়াছে অথচ সূর্য্যনাড়ীতে পৌঁছায় নাই - এই সন্ধিক্ষণই একসন্ধ্যা। উহা সুষুম্নার বা সত্ত্বগুণের অবস্থা। এই অবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে না পারায় সূর্য্যনাড়ীতে প্রাণের গতি হইল; আবার পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্যনাড়ী হইতে ইড়া অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ীতে যাইবার সময়ে প্রাণ যখন মধ্যাবস্থায় আসে তখন এক সন্ধ্যা। কারণ তখন সূর্য্যনাড়ীতেও প্রাণের গতি হইতেছে না এবং চন্দ্রনাড়ী ইড়াতেও গতি আরম্ভ হয় না। সুতরাং সন্ধ্যা উভয়বিধ হইল; প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সায়াহ্ন সন্ধ্যা।

এইবার মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কথা বলিতেছি যাহা যোগী ব্যতীত অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহা কল্পনা করিলে হইবে না, কার্য্যে পরিণত করা চাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণ যিনি তিনিই এই সন্ধ্যা করিতে

সমর্থ। যোগীই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। তৎপুত্রও ব্রাহ্মণ নহেন; ব্রাহ্মণ পুত্র মাত্র। যাহা হউক সাধক এই উভয়বিধ সন্ধ্যার উপাসনা করিতে করিতে যখন মধ্যাবস্থায় বা সুষুম্নায় সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করেন তখন তিনি এই সত্ত্বগুণে বা সুষুম্নায়ও একটি সন্ধ্যা দেখেন। তাহা সত্ত্বগুণ হইতে গুণাতীত অবস্থাতে যাওয়া অর্থাৎ সত্ত্বগুণেও নাই, গুণাতীত অবস্থাতেও স্থিতিলাভ করিতে পারেন নাই - একবার সত্ত্বগুণে আবার সত্ত্বগুণ ছাড়িয়া গুণাতীত অবস্থায় আসা। এই সত্ত্বগুণ অর্থাৎ সুষুম্না এবং গুণাতীত অবস্থা, এই দুইয়ের মধ্যে এক সন্ধি আছে। ইহাই প্রকৃত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। যোগী এই সন্ধ্যার উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে গুণাতীত অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই প্রকৃত ত্রিসন্ধ্যা রহস্য।

চারিবর্ণের তাৎপর্য্য

আমরা স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই গুলি সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা করিয়া থাকি বা বুঝিয়া থাকি তাহা এইরূপ - যিনি কেবল পূজা পাঠ করিতেন, তিনি ব্রাহ্মণ; যিনি যুদ্ধাদি বলবিক্রম দেখাইতেন, তিনি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। এইরূপ বাক্যের দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা সাঙ্কেতিক কোন প্রমাণই নাই; ইহা কল্পনামূলক। এইবার শাস্ত্র কি বলে দেখা যাউক ঃ-

ঋক্‌বেদে আছে ইহার সংস্কৃত শ্লোকটি উদ্ধৃত না করিয়া তাহার বাংলা অনুবাদ করিতেছি। 'মুখ' জ্ঞানের প্রকাশ দ্বার বলিয়া উহাই ব্রাহ্মণের আদি স্থান বলা হয়। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ জগৎ পরিচালনা শক্তির প্রধান কেন্দ্র বাহু; বাহুই সব কর্মের মূলে, এইজন্য ব্রহ্ম শরীরের ইহাই ক্ষত্রিয়ের স্থান। ঐরূপ বসিয়া বসিয়া যে সকল শিল্পাদি কার্য্য হয়, তাহার স্থান ঊরু। কিন্তু ইহা মুখ বা ব্রহ্মবিদ্যা হইতে অনেক দূরে। জগতে বহু শিল্পের উন্নতি ও প্রচার হইলেও নিঃশ্রেয়স তাহা হইতে লাভ হয় না; অথচ জগৎ সংস্থাপনের জন্য ইহার প্রয়োজন

আছে। এই তৃতীয় বৈশ্য জাতি এইরূপ বৈষয়িক উন্নতির মূল। তাহার পর পদ নিম্নদিকে। ইহা অধোগতির সূচক স্থূলকর্ম, গমনাদির জ্ঞাপক। ইহা ব্রহ্মশরীরে শূদ্রের স্থান। অবয়ব সংস্থানে যাহার যে স্থানই হউক, সকলে সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন। এইজন্য কেহ ঘৃণার পাত্র নহেন। আর জাগতিক কার্য্যে ইহাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন যথেষ্ট। ইহাই মোটামুটি তাৎপর্য্য।

সত্ত্ব শুভ্রবর্ণ। কূটস্থের চতুর্দ্দিকে আকাশ যখন শুভ্র জ্যোতিতে ভরিয়া যায়, ঐ জ্যোতিঃ প্রকাশে বুদ্ধি নির্মল হয়, মন শুদ্ধ ও শান্ত হয়, তখন সত্ত্ব ভাবময় বিপ্রবর্ণ। আর যখন অন্তরাকাশ ঈষৎ শ্বেতাভাযুক্ত রক্ত রঙের (গোলাপী) ইহাই ক্ষত্রিয় বর্ণ। যখন অন্তরাকাশ পীতাভ রঙে পরিপূর্ণ থাকে, তখন মনের স্থিরতা ও দৃঢ়তা তেমন থাকে না, উহাই বিশেষভাবে মনের চাঞ্চল্যই পরিলক্ষিত হয়। রজোগুণের অত্যন্ত বৃদ্ধি, সত্ত্বগুণ থাকে না। উহাই রজস্তমময় বৈশ্যবর্ণ বুঝিতে হইবে। আর যখন কূটস্থের চতুর্দ্দিকের জ্যোতিঃ অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয়, কোনও প্রকাশ বা জ্যোতি পরিলক্ষিত হয় না, তখন তাহা তমোময় শূদ্রবর্ণ। ইহাই যতদূর সম্ভব চারিবর্ণের মোটামুটি তাৎপর্য্য।

স্ত্রী - পুরুষ

আত্মাতে স্ত্রী-পুরুষ নাই। স্ত্রী-পুরুষ সেটি কেবল সেজেগুজে আসা। সত্য নয়, কেবল বাহ্য সাজ সজ্জা। স্ত্রী-পুরুষ কেবল বাইরে সাজ ঘরে হয়। জ্ঞান সকলেরই সমান, তাতে স্ত্রী পুরুষ নাই; চৈতন্য সকলেরই সমান, তাতেও স্ত্রী-পুরুষ নাই; প্রাণ সকলেরই সমান, তাতেও স্ত্রী, পুরুষ নাই। স্ত্রী, পুরুষ কেবল লীলার জন্য, খেলার জন্য সাজতে হয়। যেমন যাত্রার দলে মেয়ে সাজে, পুরুষ সাজে, তেমনি এই সংসারটিতেও স্ত্রী, পুরুষ সাজে, ইহা অভিনয়, সত্য নয়। এ সংসারে অভিনয়, মরণ - বাঁচন কিছুই নয়, সবই অমৃতময়।

রামরায় চৈতন্য দেবকে বলেছেন যে শ্রীমতী রাধা বলছেন, "না সো রমণ, না হম্ রমণী,"- সখা কৃষ্ণও পুরুষ নন, আমিও রমণী নই - কেবল লীলার জন্য দুই হয়ে বৃন্দাবনে রঙ্গলীলা করচি। মূলেতে কৃষ্ণও যা আমিও তাই।" গীতা পড়লে স্ত্রী পুরুষ থাকে না; স্ত্রী, পুরুষ বোধ না থাকলেই মুক্তির অবস্থা। গীতা পড়লে, যোগক্রিয়া করলেই বুঝব যে, আমরা ব্রহ্মাংশ জীব, সাজঘর থেকে স্ত্রী পুরুষ সেজে এসেছি। মানবলীলা অভিনয় করছি। বস্তুতঃ সব মিছে মিছি। মেয়ে পুরুষ কিছু নয়, কেউ কারো নয়; অভিনয়। "কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীব বিচিত্রঃ।"

আগুন জ্বলে খড়ে বাঁশে, চৈতন্য জ্বলে হাড়ে মাসে। অগ্নি একটি পৃথক সূক্ষ্ম জিনিষ, সে অগ্নি খড়ে বাঁশে ধরলে দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠে। তেমনি চৈতন্য একটি পৃথক সূক্ষ্ম জিনিষ, সে চৈতন্য হাড়মাসের গায়ে লাগলে দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠে। তাই হাড়মাসে জ্ঞানালোক জ্বলতে থাকে। আমাদের হাড়মাস কেবল চৈতন্যের দ্বারা চলে বেড়াচ্ছে। হায়! হায়! এমন চৈতন্যকে আমরা দেখলাম না। চৈতন্যকে দেখলেই আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন হয়। এই চৈতন্যই আত্মা বা ঈশ্বর। ঐ দেখ, চোখে চোখে চৈতন্য ফুটে উঠেছে; ঐ চৈতন্য 'আমি' জলমধ্যে হাস্য করি, অগ্নিমধ্যে নৃত্য করি। এ 'আমি' দেহ আমি নয়। এ 'আমি' বিশ্বপ্রাণরূপ স্থির প্রাণ অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে সেজেগুজে অভিনয় করছি।

এ সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কলিকাতার কোনও এক থিয়েটার হলে 'স্বর্ণলতা' নামক একখানি নাটক অভিনয় হইতেছিল। স্বর্ণলতা ঐ নাটকের নায়িকা। তাহার হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী নাচ গান ইত্যাদিতে মোহিত হইয়া একজন দর্শক ভদ্রলোকের নাম রামবাবু, পার্শ্বস্থ একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ঐ স্বর্ণলতা কে? উহার বাড়ী কোথায়?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "কেন আপনি জানেন না? ৬নং বিডন্ স্ট্রীট?" অভিনয় শেষ হইবার পর রামবাবু

একটি রিক্সাতে করিয়া উক্তস্থানে পৌঁছাইয়া ঐ বাড়ীর দারোয়ানকে বলিলেন "আমি স্বর্ণলতার দর্শন প্রার্থী তাঁহাকে খবর দাও।" দারোয়ান বুঝিতে পারিয়া বাড়ীর ভিতর গেল। তৎপর একজন হৃষ্টপুষ্ট বাবু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কাকে চান।" তখন রামবাবু বলিলেন "আমি স্বর্ণলতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।" তখন উক্ত বাবুটি হাসিয়া বলিলেন, "আমিই স্বর্ণলতার অভিনয় করিয়া আসিলাম। আমার নাম হেমবাবু।" রামবাবু বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া "তা হবে, তা হবে" বলিতে বলিতে এক পা দু পা করিয়া পিছাইয়া সরিয়া পড়িলেন।

ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, আমরা ব্রহ্মাংশ জীব সবাই স্ত্রী পুরুষ ইত্যাদি সেজেগুজে অভিনয় করছি।

কূটস্থই কুন্ডলিনীরূপে জগতের মাতৃস্থানীয়া।

মা অখিলেশ্বরী, ফুল শুকালে সৌরভের ক্ষতি কি? সৌরভ তো আকাশে যায়। 'আমি' তো ফুল নয়, 'আমি' সৌরভ। নির্মল মনের তো কোন কষ্ট নাই, দেহকষ্টেই মনের কষ্টবোধ। 'দেহই আমি' এই কুসংস্কারই আমার সকল দুঃখ কষ্টের মূল। মনভ্রমর দেহপদ্মে বসেছে, উড়ে যাবে তাতে ক্ষতি কি?

বিশ্বময়ী মা, সমুদ্রের তীরে বসে যেন একটা পিচকিরিতে সমুদ্র জল টানছি আর ছাড়ছি। অনন্ত আকাশরূপ চৈতন্য সমুদ্রের ধারে বসে নাসিকা পিচকারিতে শ্বাসের কৌশলে অখণ্ড চৈতন্যের একধার ধরে টানছি আর ছাড়ছি। আমি ত শ্বাস, শ্বাস ত বাতাস, ঐ বাতাসের মধ্যে দেখি স্থির বাতাস, তার মধ্যে দেখি স্থির আকাশ। ঐ স্থির আকাশই শুদ্ধ চৈতন্য। মা তুমি স্থির বাতাসে, স্থির আকাশে, চিন্ময়ী আকৃতি প্রকৃতিতে ভুবন মোহিনীরূপে দেখা দাও।

দেখলে সে রূপের কণা
যজ্ঞেশ্বরের জ্ঞান থাকে না।

সর্ব্বব্যাপকতা, সর্বজ্ঞতা, তোমার গুণ বিশেষ। মা, তুমি মধ্যবিন্দু, অনন্ত ব্রহ্মজ্যোতি, ব্রহ্মজ্ঞান তোমার চারিদিকের অঙ্গজ্যোতি মাত্র। তুমি চিৎঘনা, আমি চিৎকণা। চিদানন্দময়ী মৎলবিনী, অভিপ্রায়ময়ী, কৌশলময়ী, চিন্ময় স্থির আকাশে তুমিই পরমাত্মারূপে, লক্ষ্মী নারায়ণ রূপে, উপাসকের উপাস্যরূপে চিরদিন বিরাজিত রয়েছ।

যত দেখি ততই আশ্চর্য্য হইয়া যাই। কি ঐশ্বর্য্য! কি মাধুর্য! কি সৌন্দর্য্য! এই দেখে দেখে প্রাচীন আর্যঋষিগণ চক্ষু আর ফিরাইতে পারেন নাই। সেখানে বার্ধক্যবলে কিছু নেই; কেবলই যৌবন, নিত্য যৌবন, নব যৌবন, প্রাণভরা আকাশ, প্রাণভরা বাতাস, প্রাণভরা শ্বাস - আর তুমি আমার প্রাণভরা মা। সব এক প্রাণ করে মিলিয়ে মিশিয়ে দাও মা। প্রাণ কি কখনও টুকরো টুকরো হয়? বাতাস কি কখনও খন্ড খন্ড হয়? আকাশ কি কখনও ছিন্ন হয়? আর মা! তুমি কি কখনও খন্ড খন্ড হও। মা ব্রহ্মময়ী! তুমিও চিরদিন অখন্ড অব্যয়।

উপরিউক্ত যে সমুদয় বিষয় ব্যক্ত করা হইল, তাহা সমস্তই শ্রীভগবান কূটস্থকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইল। সাধক ক্রিয়া করিয়া যোনিমুদ্রার সাহায্যে যেমন অলৌকিক দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি করিয়া থাকেন (কূটস্থের মধ্যে) উপরোক্ত কথাগুলি ইহারই তাৎপর্য। যিনি যেমন যেমন ক্রিয়া করিয়া যতটুকু স্থিরভাব পাইবেন, তিনি ঐ কূটস্থ চৈতন্য ভগবান আত্মনারায়ণকে সেইভাবে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। ঐ ক্রিয়া ক্রমশঃ করিতে করিতে যখন সম্পূর্ণ স্থিরভাব সাধকের আসিবে, তখন তিনি কূটস্থের সর্বব্যাপী রূপ দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন। ঐরূপ দেখিতে দেখিতে পরে নিজের অস্তিত্বও হারাইবেন। ইহাই মোটামুটি তাৎপর্য্য।

যোগক্রিয়া বিনা শাস্ত্রাদি চর্চা নিষ্ফল

কোনও একদিন এক মহা পন্ডিত লোক নৌকাযোগে কোথাও যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে নাবিক, তুমি দর্শনশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ কি ?" নাবিক বলিল, "না মহাশয় আমি সামান্য নাবিক, দর্শনশাস্ত্র জানিব কি করিয়া।" তখন পন্ডিত বলিলেন, "এঃ তবে তোমার জীবনের সিকি অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" আরও কিছুদূর যাইয়া পন্ডিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা নাবিক, তুমি জ্যোতিষ শাস্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছ কি ?" নাবিক বলিল, "ওসব শাস্ত্রের ধার আমি ধারি না।" ঐ কথা শুনিয়া পন্ডিত বলিলেন, "ছ্যাঃ, তোমার জীবনের অর্ধেক অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" খানিক পরে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বেদ, পুরাণাদি কিছু শাস্ত্র পড়িয়াছ ?" নাবিক তখন বিরক্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে না মহাশয়, ওসব আমি কিছু পড়ি নাই, ওসব আমি কিছু জানি না। আপনি বারে বারে ওসব জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? আমি নাবিক, ওসবে আমার কি দরকার, আমার কি লাভ হইবে ?" তখন পন্ডিত বলিলেন, "এঃ, তোমার জীবনের দেখিতেছি তিন অংশ নষ্ট হইয়াছে।"

এমন সময় দৈবাৎ নৌকার তলা ফাটিয়া নৌকায় জল উঠিতে লাগিল। নৌকা জলে মগ্নপ্রায় হইলে নাবিক চিৎকার করিয়া পন্ডিতকে বলিল, "মহাশয় আপনি সাঁতার জানেন ?" পন্ডিত উত্তর করিলেন, "না বাপু, আমি সাঁতার জানি না।" তখন নাবিক বলিল, "এক সাঁতারের অভাবে আপনার সমুদয় জীবনটাই নষ্ট হইল এবং বেদ, পুরাণ, জ্যোতিষ, দর্শন প্রভৃতি সমস্তই বৃথা নষ্ট হইয়া গেল। নৌকার তলা ফাঁসিয়া নৌকা ডুবু ডুবু হইয়াছে।" তখন পন্ডিত মহাশয় ভয়ে হতাশ হইয়া নাবিককে বলিলেন, "নাবিক আমাকে রক্ষা কর, আমার

প্রাণ বাঁচাও; আমি সাঁতার না শিখিয়া নির্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি।"

ইহার দ্বারা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যোগরূপ সন্তরণ কৌশল না জানিয়া বাহিরে বেদ পুরাণাদি পাঠ করায় এবং শাস্ত্র চর্চ্চা করায় বিশেষ কোন ফললাভ হয় না।

কয়েকটি শাস্ত্রবাক্যের বঙ্গানুবাদ।

(১)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতি গণ এবং তাহাদের স্ত্রীগণ যে কেহ গুরুর সমীপে আগমন করিয়া প্রণাম পূর্বক ধমার্থকামমোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রার্থনা করিলে যদি জ্ঞানবিশারদ গুরু তাহাকে জ্ঞানদান না করেন, তবে তিনি নরকগামী হন। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানময়-ইহাতে জাতিবিচার নাই।

(২)

১২টি উত্তম প্রাণায়ামে প্রত্যাহার হয়। ১৪৪টি তে ধারণা, ১৭২৮টিতে ধ্যান এবং ২০৭৩৬টিতে সমাধি হয়।

(৩)

শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য অনেক। আয়ু অল্প এবং বিঘ্নও বহু। এস্থলে জল ত্যাগ করিয়া জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংস যেমন কেবল দুগ্ধটুকু পান করে সেইরূপ (ঐ অনন্তের মধ্যে) জ্ঞানীগণ কেবল সার অংশটুকু গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(৪)

চারিবেদ ও সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া নবনীতরূপ সারভাগ যোগীরা পাইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঘোল অর্থাৎ অসারভাগ লৌকিক পন্ডিতেরা পান করেন। নতুবা শাস্ত্রপাঠ করিয়া যদি তাহার প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়া না যায়, তাহা হইলে ইহার তুল্য কষ্ট আর নাই।

প্রমাণ ঃ- 'দর্বী'- শব্দের উত্তর হাতা। হাতা যেমন সকল অন্ন-ব্যঞ্জন পাক করিয়াও তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে না; অথবা গাধা যেমন চন্দনের বোঝাই বহিয়া থাকে, তাহার গুণ বুঝিতে পারে না, তেমনি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যিনি সার জানেন না, তিনিও গাধার ন্যায় ভারই বহন করেন মাত্র।

(৫)

যোগ, তপ, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, ঘৃণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, আস্তিক্য - এই ১১টি লক্ষণ যাঁহার আছে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। উপরোক্ত গুণগুলি যাহার নাই, তিনি ব্রাহ্মণবংশ জাত হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য নন। ইহাই শাস্ত্রে মহাত্মাদিগের বাণী।

(৬)

আমার রূপ অতি সূক্ষ্ম, সুনির্মল, জোতির্ময়, বাক্যের অতীত, আমি ত্রিগুণাতীত, আমার অংশ নাই, আমি বিকল্প রহিত, আমার আদি নাই, আমি জ্ঞানানন্দরূপ বিগ্রহ, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আমাকে এইরূপ ধ্যান করিয়া দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আমরা যে দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকি, তাহা পুত্তলিকা পূজা নহে; তাহা সেই অব্যক্তা পরাশক্তিরই পূজা। কিন্তু

তাহা উপযুক্ত লোকের অভাবে এক্ষণে পুত্তলিকা পূজায় পরিণত হইয়াছে।

(৭)

কুমতি ঃ- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, নির্দয়তা, খলতা, মিথ্যাচারিতা, হিংসা, চঞ্চলতা, অজ্ঞানতা, কৃপণতা, অশুদ্ধি, অসত্য, ভয়, অশান্তি, অক্ষমতা, অভিমান, অশুচিতা, নির্লজ্জতা, শঠতা . . . ইত্যাদি।

(৮)

সুমতি ঃ- ক্ষমা, লজ্জা, জ্ঞান, ধৃতি, অহিংসা, শুদ্ধসত্ত্বতা, অভ্রম, উদারতা, সরলতা, অক্রোধ, অভয়, চঞ্চলতারাহিত্য, অক্রূরতা, দান, তপ, জপ, দৈন্য, শৌচ, স্বাধ্যায়, অখলতা, তেজ . . . ইত্যাদি।

(৯)

জন্ম জন্মান্তরের ক্রমাগত অনুশীলন দ্বারা রিপু সকল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যাও বলিলেই উহারা সহজে যায় না।

(১০)

জীব বহু সাধনায় প্রবৃত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। প্রবৃত্তি এতই ভীষণ ছাড়িয়াও একেবারে ছাড়িতে চাহে না।

(১১)

পৃথিবীতে স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যেও এমন জীব নাই, যে

প্রবৃত্তি জাত তিন গুণ হইতে মুক্ত (অর্থাৎ কোন জীবই মুক্ত নয়)।

(১২)

অনুশোচনার দ্বারা পাপক্ষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত জগাই মাধাই এর ইতিহাসে পাওয়া যায়। জগাই মাধাই ভূরি ভূরি পাপানুষ্ঠান করিয়াও নিত্যানন্দের কৃপায় আপন আপন অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া যেমনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল অমনি ভগবানের অজস্র করুণা বর্ষিত হইয়া তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিল। পাপ অবস্তু মাত্র, পাপের স্থায়ী সত্তা নাই। মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় পুঞ্জীভূত পাপ ভক্তি বন্যায় ভাসিয়া যায়।

(১৩)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আদি গুণ অবতার
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার।।

(১৪)

মহাবলবান হস্তী পর্বতের প্রায়,
একক্ষুদ্র অঙ্কুশেতে বশ করে তায়।
একসূর্য্য গগনে দেখিতে লাগে ক্ষুদ্র,
যার তেজে আলোকিত ত্রৈলোক্য সমুদ্র।

(১৫)

ভক্ত প্রহ্লাদের সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটিত। সেই জন্য তিনি পর্বত, জল বা অগ্নি হইতে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই এবং সেইজন্যই তিনি ভগবৎ কৃপায় সর্বত্র জয়ী হইয়াছিলেন।

(১৬)

অন্যলোক আমাকে স্কন্ধে করিলে সে বুঝিতে পারে, আমার ভার একমণ কি দুইমণ। কিন্তু সেই দুইমণ বা একমণের ভার সর্বদাই আমাতে বর্ত্তমান, তথাপি 'আমার' কত ভার আমি জানিতে পারি না।

(১৭)

সদগুরুর কৃপা হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা জীবন সফল করিতে পারি, অন্যথায় নহে।

(১৮)

কর্মকান্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের অগ্নিই দেবতা। মুনিদিগের হৃদয়সিংহাসনে বিরাজিত আত্মাই দেবতা। স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যদিগের মৃন্ময় পাষাণ-নির্মিত প্রতিমাই দেবতা; আর সর্বত্র সমদর্শী মহাযোগীগণের সর্বাত্মক ব্রহ্মই দেবতা।

(১৯)

লৌকিক গুরু যে মন্ত্র বা বীজ কর্ণে শুনাইয়া দেন, সদ্গুরু সেই মন্ত্রের বাচক পরমাত্মাকে দেখাইয়া দেন।

(২০)

সেই শ্যাম বিন্দুরূপ সিন্ধুরূপাধার,
জগতের রূপ যাতে করয়ে বিহার।
শ্যামচন্দ্র উদয়ে জগৎ আলো হয়,

মুদিলে সংসার সব অন্ধকার ময়।
সপ্তাবরণের পারে আছয়ে লুকায়ে,
কেউ পাছে চিনে ফেলে নিমিষ ঢাকিয়ে।

অর্থাৎ সেই শ্যামচন্দ্রের রূপেই জগৎ আলোকিত। সে রূপের তুলনা বুঝি এ জগতে নাই। তাই তাঁহাকে অরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার রূপ নাই তাহা নহে - তাঁহার রূপ আছে বলিয়াই জগতের রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। জগতের রূপ তরঙ্গই সেই অনন্ত রূপসিন্ধু হইতেই উত্থিত হইতেছে। সেই অব্যক্ত অসীম অরূপ সত্তা হইতে এই রূপময় জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। সেই শ্যামচন্দ্রের রূপজ্যোতি হৃদয় কন্দর ব্যাপিয়া দিগদিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। বুঝি ইহাই অরূপের রূপ।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ বা আবরণের দ্বারা পরমতত্ত্ব আবৃত মনে হয়। ইহাতে পাঁচটি আবরণ হয়, এই পাঁচটি আবরণ বা কোষ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তবে যদি দেহস্থিত সপ্ত চক্রকে সপ্তাবরণ মনে করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত সপ্তাবরণ ভেদ করিলে তবে নিঃসঙ্গ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

(২১)

এমত আনন্দ সিন্ধু তাঁহাকে না খুঁজে,
ক্ষণিক অনিত্য সুখে এ জগতে মজে।
উট যেন স্বাদু বলি কন্টক চিবায়,
তার সুখ সঙ্গে মুখে শোণিত বেরায়।
সেই মত এ জগতে যত আছে সুখ,
সে সুখের সঙ্গে সঙ্গে লাগিথাকে দুখ।

সুখেতেও দুঃখ দেখি তবে সুখ কই,
এ সুখে কে সুখ মানে বিনা পশু বই।।

ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে প্রকৃত নির্মল সুখ, এক আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া নির্মল সুখ, নির্মল আনন্দ সংসারে কোথাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না। আমরা যে বিষয় পাইয়া সাময়িক সুখ অনুভব করি, তাহার মধ্যেও দুঃখ মিশ্রিত আছে। আমরা সদা সর্বদা বারোটি জ্বালা হইয়া অহরহ ছট্ ফট্ করিতেছি। তাহা এইরূপ ঃ-

কাম, ক্রোধ, আদি করি ছয় রিপু হয়।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুভয়।
ছয় রিপু, ছয় গুণ, দ্বাদশ দুয়েতে,
জগতের জীব জ্বলে এ বারো জ্বালাতে।।

ইহা হইতে একমাত্র পরিত্রাণের উপায় ভগবৎ শরণাগতি।

ব্রহ্মচর্য কি ?

শাস্ত্রে বাহিরের প্রাণকে সূর্য্য বলে এবং অন্তরের প্রাণকে বীর্য্য বলে। বীর্য্য রক্ষাই কি ব্রহ্মচর্য্য? তবে ব্রহ্মচর্য্য কি? "ব্রহ্মচর্য্যমিতি বিন্দুধারণম্।" তেজ ধারণই প্রচলিত অর্থ। 'ব্রহ্মচরেণ' অর্থাৎ পরব্রহ্মের পথে বিচরণ করা। জীবদেহে পরমাত্মা প্রাণরূপে আসছেন শ্বাস প্রশ্বাসের পথে। তিনি শ্বাস প্রশ্বাসে আসছেন যাচ্ছেন আগম নিগম হচ্ছে। ঐ পথে তুমিও বিচরণ কর, তবে হবে ব্রহ্মচর্য্য। এমনি বিন্দুধারণ হয় না, ইহা জোর জুলুমের কাজ নয়। শ্বাস স্থির, দৃষ্টি স্থির, তবে হবে বিন্দু স্থির। বায়ু থামলেই সিন্ধু আর উদ্বেলিত হবে না, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের স্বরূপ কূটস্থের সর্বব্যাপী রূপ দেখিতে পাইবে। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মসমুদ্ররূপ প্রাণ সমুদ্রে

বিচরণ করা। ইন্দ্রিয় দমন, কাম ক্রোধ দমন কেহ গায়ের জোরে করিতে পারে না। বাহিরে পণ্ডিত সেজে বেদ বেদান্তাদি আওড়িয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয় না। মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজানো যায় না, চিঁড়ে ভেজাতে গেলে তাতে জল ঢালা প্রয়োজন। তাতেই ভাগবতে রাসের সময় বলা হয়েছে –

পরমাত্মা ধরি, নাচে ব্রজনারী
আনন্দে তাদের সমাধি এলো,
তাতেই কেবল ইন্দ্রিয় সকল
আবেশে অবশ হইয়া গেল।।

ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থা

গুরূপদেশমত আধ্যাত্মিক ক্রিয়া ভক্তি সহকারে করিয়া আমাদের যখন দিব্যজ্ঞান উদিত হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, সেই নিরাকার, নির্ব্বিকার , অ-ধর, অস্পর্শ, অব্যবহার্য্য, আনন্দ নিরানন্দের অতীত, পরমাত্মা আত্মনারায়ণ বাষ্পকারী বরফের ন্যায় ক্রমবিকাশের দ্বারা আকাশে বাতাসে, তরুলতা, ফলফুল, সুর নর, যক্ষ রক্ষ এবং পাষাণ ও মৃত্তিকার পুত্তলিকায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, রূপে রূপ মিশাইয়া, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধতে কী পরম পবিত্র সুখ অনুভব করিতেছেন। তখন আর জগতের কিছুই ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বোধ হইতেছে না; তখন সবই সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইবে। ইহাই ক্রিয়ার পরাবস্থার পরাবস্থা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

তাই বার বার মহাত্মারা আমাদের সতর্ক করিয়া দেন, ওগো মায়ামুগ্ধ জীব, জড়ত্বের মায়া মোহতে অন্ধ হইয়া আত্মজ্ঞানরূপ মহামণি হারাইয়া ফেলিও না। একটি কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ কর ঃ-

এক মহা চৈতন্যের রশ্মি মোরা সবে,

ফুটাতে সংস্কার পদ্ম আসিয়াছি ভবে।
বাতাস নাচায়ে যায় কুসুম-কানন
সংস্কার নির্লিপ্ত সুখে নাচায়ে তেমন।
গলাধরি যায় তুলি মম মম রব,
আমরা আকাশবাসী দেবদেবী সব।

হে সাধক সাধিকাবৃন্দ, এস আমরা সকলে জোড় হস্তে ভক্তি গদগদচিত্তে বলি -

একি দেখিলাম দেবী, বিষ্ণুবক্ষ বিলাসিনী
জয় জয় সর্বশক্তি অরূপ রূপ ধারিণী।
সর্বরূপময়ী দেবী সর্ব-দেবীময় জগৎ
অতোঽহং বিশ্বরূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরীং।।

এইরূপ আত্মজ্ঞান জন্মিলে আমরা দেখিতে পাইব, উত্তপ্ত পৃথিবীকে শীতল ও শস্য শ্যামল করিবার জন্য আকাশের অদৃশ্য বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যেমন নবজলধর মূর্তি ধারণ করে, আবার বারিবর্ষণান্তে পৃথিবী শীতল করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ সেই নিরাকার ব্রহ্মচৈতন্য চিদঘন হইয়া উত্তপ্ত পৃথিবী সুশীতল করিবার জন্য নবজলধর মুর্তি ধারণ করিয়া পরমাত্মা আত্মনারায়ণ রাম রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কৃপাবারি বর্ষণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবেন, অর্থাৎ তখন মন থাকিবে না, মনের মৃত্যু হইবে। ইহাই গূঢ় রহস্য।

সাংখ্য দর্শন

যাহার দ্বারা 'আমি কে?' ইহা বিদিত হওয়া যায়, তাহাই সাংখ্য। 'আমি' শব্দ যাহা, তাহা 'আমি' পদবাচ্য নহে এবং এই দেহও 'আমি' পদবাচ্য নহে। এই শব্দ বা দেহের অস্তিত্ব অজপারূপ কর্মের অস্তিত্বে, অজপা ফুরাইলে 'আমি' শব্দও থাকে না। এই

কর্মধারা কর্মের অতীতাবস্থারূপ জ্ঞানের অবস্থা লাভ হইলে 'আমিকে ?' ইহা বিদিত হওয়া যায়, ইহাই সাংখ্য। উক্ত কর্মের অতীতাবস্থায় অজপারূপ সাংখ্যের স্থিতি হইয়া থাকে।

সংখ্যা বা সাংখ্য কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কাল অনন্ত, তাহার সংখ্যা নাই। সেই কাল ঘটস্থ হইয়া অজপারূপে সংখ্যা হইতেছে এবং এই সংখ্যা দেহমধ্যে ২১৬০০ বার দিবারাত্রে হইয়া থাকে। অজপারূপ সংখ্যার অবস্থাই জীবের বর্ত্তমান অবস্থা। এই সংখ্যায় জীবের লক্ষ্য নাই, জীব কেবল ইহার অবস্থায় মুগ্ধ হইয়া মায়ায় জড়িত হইয়া আছে। উক্ত অজপারূপ সাংখ্যে লক্ষ্য করিলে ইহার অতীতাবস্থা লাভ করিয়া 'আমি কে ?' তাহা বিদিত হওয়া যায়। এই কারণে শাস্ত্রে ইহাকে সাংখ্যদর্শন বলে।

বেদান্ত দর্শন

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির বাহ্যিক বেদ পুরাণাদিতে কোন প্রয়োজন হয় না। আত্মকর্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে যাঁহার নিষ্ঠা হইয়াছে তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ। নিষ্ঠা অর্থাৎ নিঃশেষরূপ স্থিতি। ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিয়া যিনি স্থির হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং "সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" রূপ সকল স্থান জলে প্লাবিত দেখিতেছেন বলিয়া তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ। এরূপ ব্যক্তি ত্রিগুণের অতীত, সমগ্র বেদ তাঁহার পক্ষে ক্ষুদ্র জলাশয় -বৎ। বেদাদি শাস্ত্রও এরূপ ব্যক্তির নিস্প্রয়োজনীয় বিষয়; কারণ বেদ অর্থে জানা, বেদস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া (ন বেদং বেদমিত্যাহু বেদ ব্রহ্ম সনাতনম্) তাঁহার আর তখন জানিবার কিছু বাকি থাকে না। তখন তাহার ওষ্ঠের উপরেই সমস্ত বেদ; তাঁহার থুঁথিই তখন পুঁথিস্বরূপ। এইরূপ ব্যক্তি যখন বেদ রচনাকারী, তখন শাস্ত্রগত বেদ আর তাঁর কি প্রয়োজন ? এ কারণ উক্ত হইতেছে সমস্ত স্থান জলে পূর্ণ হইয়া যাইলে, ক্ষুদ্র জলাশয়ের যেমন দরকার হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞের হৃদয়

সরূপ ব্রহ্মে পরিপূর্ণ হইয়া যাওযায় বেদাদি শাস্ত্রেও তাঁহার প্রয়োজন হয় না।

বাহ্যিক বেদ, বেদ পদবাচ্য নহে; বেদ ব্রহ্ম সনাতন (অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্ম) এঁকে জানিলেই সমস্ত জানার অন্ত হইয়া যায়। এ জগতে তাঁহার আর কিছু জানিবার বাকি থাকে না। তখন ত্রিকাল ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না তাঁহার নিকট এক হইয়া যায়। ইহাকেই গীতাতে 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বলিযা উক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মহাত্মাদের মতে ইহাকেই 'বেদান্ত দর্শন' বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

নকুলের বিবাহ রহস্য।

"যুধিষ্ঠিরস্য যা কন্যা নকুলেন বিবাহিতা।
সহদেবেন যা পূজ্যা সা কন্যা বরদা ভব।"

ইহার সাধারণ অর্থ এই যে, যুধিষ্ঠিরের কন্যা, নকুলের দ্বারা বিবাহিতা এবং যিনি আবার সহদেবের দ্বারা পূজিতা হইয়াছিলেন, সেই অদ্ভুত কন্যা আমাকে বর প্রদান করুন।

এইরূপ অর্থ সাধারণ দৃষ্টিতে বাস্তবিকই অসম্ভব; কারণ নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠির ভ্রাতা। তাঁহাদের মধ্যে একজন ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ এবং অন্যজন তাঁহাকে পূজা করিবেন ইহা হইতেই পারে না। বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ইহা কেমন যেন একটা সন্দেহ জনক ব্যাপার যাহা মনকে অধিকার করিয়া বসে। ইহার অন্য কোন অর্থ হয় কিনা দেখা যাউক।

এখানে যুধিষ্ঠির অর্থাৎ পর্বতরাজ হিমালয়। ইনি যুদ্ধ সময়ে বিচলিত হন না বা নাশপ্রাপ্ত হন না, সর্বদা অচল এবং একরূপ। সেই হিমগিরিসুতা পার্ব্বতীকে বিবাহ করিলেন 'নকুল' অর্থাৎ ন - কুলর্যস্য সঃ নকুলঃ' যাঁহার কুল নাই, বা যাহার আদি বংশ পরিচয়

নাই, সেই অনাদি স্বয়ম্ভু শিবের নামই নকুল; তিনিই গিরিরাজ কন্যা পার্ব্বতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই কন্যা সহদেব = দেবেন সহ অর্থাৎ দেবতাগণের সহিত সংপূজ্যা। সেই মঙ্গলদায়িনী শিবানী গৌরী বা নারায়ণী আমাকে বর প্রদান করুন। এতদ্বারা যুধিষ্ঠির শব্দের অর্থ অচঞ্চল পুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে।

উপনিষদ গাভী স্বরূপ

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।

সর্বোপনিষদো (উপনিষদ সকল), গাবো (গাভী), গোপালনন্দনঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ), দোগ্ধা (দোহন কর্তা), পার্থ (অর্জুন), বৎস (বৎসসদৃশ অর্থাৎ গোবৎস স্বরূপ), সুধী (পন্ডিতব্যক্তি), ভোক্তা (দুগ্ধ পানকর্তা); গীতামৃতং (গীতারূপ অমৃত), মহৎ (মহৎ দুগ্ধম্, অর্থাৎ সেই পরম দুগ্ধ)।

উপনিষদ = (উপ - নি + ষদ + ক্বিপ) উপ অর্থে 'সমীপে' এবং পশ্চাত বুঝায়। উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা, বেদের জ্ঞানকান্ড সমস্ত উপনিষদই কামধেনুস্বরূপা। গোলক বিহারী বিষ্ণুর পূর্ণকলাবতার গোপরাজ নন্দদুলাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সেই সর্বজ্ঞানগর্ভ অলৌকিক গাভীর একমাত্র দোহনকর্তা। পান্ডব প্রধান পার্থ বা শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনই তাহার পূত বৎস স্বরূপ। সুতরাং তাহার অর্থাৎ সর্বজ্ঞানগর্ভ অলৌকিক গাভীস্বরূপা উপনিষদই দুগ্ধ অর্থাৎ সারভাগ যাহা যথার্থই অপূর্ব পবিত্র বস্তু, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাই অমৃতোপম অতি পবিত্র গীতাশাস্ত্র। আর তাহা পান করেন ভারতের অতি পুণ্যবান ভক্ত, যোগী, সাধু ও মহাপুরুষগণ। অতএব, গীতা যুদ্ধবর্ণনা, যে কোন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে সহজেই অনুমেয়।

মা গঙ্গার দশহরার দিন মর্ত্যে আগমন।

শাস্ত্রে কথিত আছে, মহামায়া শ্রী শ্রী গঙ্গা দশহরার দিন মর্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন। দশহরা অর্থে যিনি জীবের দশবিধ পাপ হরণ করেন, তিনিই দশহরা; অথবা তিনি যেদিন এই মর্ত্যে পতিতোদ্ধারিণীরূপে সাক্ষাৎ জ্ঞানময়ীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সেই দিনের নামই দশহরা। যাহা হউক, তাঁহার আবির্ভাবে পাপী তাপী মর্ত্যবাসীর যে দশপ্রকার মহাপাপ বিনষ্ট বা বিধৌত হয় তাহাও এই প্রসঙ্গে সকলের জানিয়া রাখা আবশ্যক।

'দশবিধ পাপ' যথাঃ- (১) অদত্ত বস্তুর গ্রহণ বা অপহরণ (২) অবৈধ বা বিনাযজ্ঞে হিংসা, (৩) পরদার বা পর পুরুষে গমন অর্থাৎ ব্যভিচার এই তিন প্রকার কায়িক মহাপাপ; (১) পীড়াদায়ক বাক্য বা পরুষ ব্যবহার, (২) মিথ্যা কথন, (৩) ক্রূরতাপূর্ণ ও অসংবদ্ধ প্রলাপ বাক্য এবং (৪) পরনিন্দা এই চারিপ্রকার বাচিক মহাপাপ। (১) শাস্ত্রে, গুরুবাক্যে ও সত্যে অবিশ্বাস বা মিথ্যা অভিনিবেশ, (২) অন্যের কোন বস্তুলাভে ইচ্ছা বা পরদ্রব্যে লোভ এবং (৩) মনে মনে পরের অনিষ্ট চিন্তা এই তিন প্রকার মানসিক মহাপাপ।

এই ৩+৪+৩ = ১০ সব মিলাইয়া জীবের ১০ প্রকার মহাপাপ ভক্তি যুক্ত অন্তরে গঙ্গাস্নানে দূর হয়। গঙ্গা জ্ঞানময়ী বা জ্ঞান প্রবাহিনী। শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য "জ্ঞান প্রবাহা বিমলাদি গঙ্গা" অর্থাৎ ত্রিভুবন জননী ও ব্যাপিনী জ্ঞানকে গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহাত্মা রামপ্রসাদও এই জ্ঞানকে খড়্গরূপে বর্ণনা করিয়া ধর্ম ও অধর্ম বা, পুণ্য ও পাপরূপ অথবা আসক্তি বা বিরক্তিরূপ অজাদ্বয়কে অর্থাৎ ভোগ বন্ধন দুইটিকে বিনাশ করিবার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবই জীবের ধর্ম ও অধর্ম, বিরক্তি ও আসক্তি অথবা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বস্তুর আধার। নামরূপাত্মক লৌকিক ও অলৌকিক ভাবময় সাধন ক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা জীব অবিদ্যা নাশ ও অজ্ঞানতা হইতে চিরমুক্ত হইতে পারন। ইহাই মোটামুটি তাৎপর্য।

সাত্ত্বিক জ্ঞানই প্রকৃত গঙ্গাস্নান পদবাচ্য। তখন সত্ত্বগুণের আবির্ভাবে রজস্তমঃ ভাব নষ্ট হইয়া সমস্ত পাপ হইতে সাধক মুক্তিলাভ করেন। ইহাই জ্ঞান-গঙ্গায় অবগাহন।

অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্যরহস্য।

মহাভারতে আছে কুরু এবং পাণ্ডব এই দুই পক্ষের মোট সৈন্যসংখ্যা অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী। ইহার বাহ্যিক অর্থ পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বার্থ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক; যাহা মহাপুরুষগণ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

কুরুপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য যথাক্রমে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং উহাদের মূলীভূত সূক্ষ্মেন্দ্রিয় মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়। ইহারা প্রত্যেকেই এক এক অক্ষৌহিনী পূর্ণভাব বা নিবৃত্তিপক্ষের ভীষণ বিরোধী। ইহাই কুরুপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য বলিয়া ইঙ্গিত করা হয়।

পাণ্ডব পক্ষ অর্থাৎ নিবৃত্তিপক্ষ। ইহাদের বাকী সাত অক্ষৌহিনী সৈন্য যথাক্রমে ঃ- পঞ্চতত্ত্ব, বা পঞ্চ পাণ্ডব। কূটস্থচৈতন্যরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রহ্মচৈতন্য বা পরমাত্মা ইহারা প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিনী প্রবৃত্তি বিনাশক (সর্বশুদ্ধ এই সাধন সমরে মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সৈন্য — প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির নানাভাবযুক্ত পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টি।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে এখানে বলি, একাদশী ব্রতেরও সূক্ষ্মতত্ত্ব ও রহস্য এই; সাধক একাদশী ব্রত দ্বারা উক্ত একাদশ ইন্দ্রিয়েরই সংযম অভ্যাস করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মভাবে একাদশী ব্রত দেহ ও মনের সংযমই সাধন মাত্র।

ভগবান কুটস্থ চৈতন্য ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব।

ভগবান কূটস্থ চৈতন্য বলিতেছেন ঃ- 'আমি জগতের পিতামাতা। কূটস্থ গহ্বরের ভিতর ব্রহ্মাযোনীস্বরূপ মাতৃস্থানীয়া এবং আমিই কূটস্থ চৈতন্য পুরুষস্বরূপ পিতৃস্থানীয়। অতএব আমিই জগতের পিতামাতা। সৃষ্টিকর্তা রূপ ধাতাও আমি এবং সৃষ্টি কর্তারূপ পিতামহ (প্রজাপতি) তাহাও আমি। জানিবার বস্তুও আমি। আমাকে জানিলে আর জানিবার কিছু বাকি থাকে না। পবিত্র ও আমি, কারণ আমি নির্মল, আমাতে কোন মলিনতা নাই। আমি ওঁকার অর্থাৎ 'অ', 'উ', 'ম' এই তিনে ওঁকার উচ্চারিত হয়। অ = বিষ্ণু, উ = মহেশ্বর; ম = ব্রহ্মা এই তিনগুণ তিন দেবতা। ইড়া - তমোগুণ; পিঙ্গলা — রজোগুণ; সুষুম্না — সত্ত্বগুণ; এই তিনগুণ মিশ্রিত রহিয়াছে বলিয়া দেহকে ওঁকার রূপ বলে। এই ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না আত্মারই রূপ। অতএব প্রাণরূপী আত্মাই ওঁকার স্বরূপ। আর ঋক্, সাম্, যজুঃও সেই আত্মা; অর্থাৎ ঋক =রজোগুণ; পিঙ্গলা, তাহাও আমি, সাম = তমোগুণ = ইড়া, তাহাও আমি, যজুঃ = সত্ত্বগুণ = সুষুম্না, তাহাও আমি।

ইহা দ্বারা বেশ স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে সোনা ব্যতীত যেমন সোনার অলঙ্কার হয় না সেইরূপ কূটস্থ চৈতন্য রূপ আমি না থাকিলে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে কিছুই থাকে না। অতএব কূটস্থ চৈতন্যরূপ 'আমি'ই সব।

সমস্ত গীতা শাস্ত্রের সার

গীতার ১৮টি অধ্যায়। তারমধ্যে ১৫শ অধ্যায় অত্যন্ত রহস্যময়। সমগ্র গীতা শাস্ত্রের যাহা অর্থ, তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সমগ্র বেদের অর্থও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

"যস্তং বেদ স বেদবিৎ, বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।" সকলের মধ্যেই এই ভগবান আত্মনারায়ণ কূটস্থ চৈতন্য (পুরুষোত্তম) রহিয়াছেন, ইহাকে জানিলেই যে কোন বর্ণের লোকই হউন না কেন, তিনিই কৃতকৃত্য হইতে পারেন। সেজন্য মনপ্রাণ ঐক্য করিয়া ভক্তি সহকারে সাধনা করিতে হইবে?

কেন করিতেছি? করিয়া আমার কি লাভ হইবে? এইতো এতদিন ক্রিয়া করিলাম, কিছুই তো বুঝিতে পারিলাম না, শরীরটাও তো বেশ মাঝে মাঝে খারাপ বোধ হয়, কাম-ক্রোধের বেগ তো বিশেষ দমন হইয়াছে ইহা মনে হয় না; এই তো প্রায় দুই বছর আগে আমার স্ত্রী বিয়োগ হইল, ইত্যাদি কোনরূপ চিন্তা, কোনরূপ ভাবনা মনের কোণে স্থান দিবে না।

গুরুদেব বলিয়াছেন - তুমি কেবল ক্রিয়া করিয়া যাও, কোনদিকে তাকাইও না। প্রারব্ধবশে যাহা হইবার তাহাই হউক কেবল ক্রিয়া করিয়া চল। ইহাই তাঁহার শ্রী মুখের আদেশ। আমি তাঁহার আজ্ঞাবাহী দাস, তাঁহার আদেশ পালন করিয়া যাইতেছি, ইহাতে কি হইবে না হইবে তাহা তিনিই দেখিবেন, সে ভার তাঁহার, আমি কেন বৃথা কর্ত্তা সাজিয়া মরি, আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিয়া যাই। হে গুরুদেব! তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন সুখে দুঃখে সব সময় তোমার আদেশ পালন করিয়া যাইতে পারি, তোমার শ্রীচরণে এ অধীনের একমাত্র প্রার্থনা।

হে শরণাগত বৎসল! আশা করি আমার এ আবেদন তুমি কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবে না; ইহাই আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস। কারণ তুমিই আমার ভব পারের কান্ডারী, তুমিই আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল।

****

শ্রী বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সঞ্চয়ন

জগদ্ধাত্রী

"চলতি চাককি সব কোঈ দেখে,
খোটা না দেখে কোঈ।"

জানলে, এ জগতে এক ভগবান ব্যতীত কিছুই চিরস্থায়ী নহে। জন্ম, মৃত্যু, শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য, সুখ, দুঃখ, দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ, শীত, গ্রীষ্ম সবই ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে আসে আবার চলে যায়। এই সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, লাভ-অলাভ এর নানাবিধ চিত্র দেখে আমরা কখনও হাসি, কখনও কাঁদি, এখন আমাদের উপায় কি ? ঐ চক্রটির পানে তাকিয়ে থাকলে তো আমাদের চলবে না। ঐ চক্রটির অন্তরালে অর্থাৎ কেন্দ্রে একটা খোঁটা আছে, সেইটির পানেই আমাদের লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে। সেই খোঁটাটি চিরস্থির, চির অচঞ্চল। তাহাতে না আছে জন্ম, না আছে মৃত্যু, না আছে হাসি-কান্না, না আছে সুখ-দুঃখ, না আছে জগতের কোনও কোলাহল। সেইটিই অবিচল 'রাম', আমার 'আমি।' সেইটিই আমাদের সর্ব্বস্ব, জগতেরও সর্ব্বস্ব। ঐ খোঁটাটিকেই যোগীরা মেরুদন্ড মধ্যস্থ 'সুষুম্না' বলে থাকেন। তাতেই লক্ষ্য স্থির করতে হবে। আমাদের মেরুদন্ড মধ্যে অবস্থিত সুষুম্নায় যখন বহু সুকৃতিবশে ও কঠোর সাধনার দ্বারা আমরা প্রবেশলাভ করতে পারবো তখন আমাদের নিকট হতে এই প্রপঞ্চময় জগতের কোলাহল, জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক ইত্যাদির দাপট চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

উহাই বিশ্ব-প্রসবিনী জগন্মাতা প্রকৃতি দেবীর নিগূঢ় তৃতীয় পাদপদ্ম। সেই নিগূঢ় অভয় পাদপদ্মের সন্ধান আমাদের করতেই হবে। তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিতা। অথচ আমরা চাওয়া মাত্রই

তাঁকে সহজে পেতে পারি না। সেইজন্য যত কষ্টসাধ্যই হোক খুঁজে খুঁজে আমাদের তা বের করতেই হবে। এই নামরূপময় মিথ্যা ও অশাশ্বত সংসারের গহন কান্তার হতে সেই চিরনির্ম্মল, চির সুন্দর, সর্বপ্রকার সুখের আকর ও আনন্দের নিলয়স্বরূপ সেই জগন্ময়ী মাকে খুঁজে বের করতেই হবে। আমার মায়ের সেই কোটি সূর্য্য বিনিন্দিত অপরূপ জ্যোতি যা প্রতি মুহুর্ত্তে কত বিশ্বকে প্রসব করছে, আমার মায়ের সেই ভুবন আলো করা হাসিমুখ আমাদের দেখতেই হবে। কি মনোমুগ্ধকর, কি নয়নাভিরাম আমার মায়ের সেই চরণ কমলের অপূর্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিচ্ছটা কি নিগূঢ় তাঁর অপূর্ব্ব তৃতীয় পাদপদ্মটি! এই পাদপদ্মের দর্শন না পেলে আমাদের জীবনই বৃথা। মহাত্মারা বলেন, মায়ের সেই চরণপদ্মের বিমল জ্যোতিচ্ছটার মধ্যে ডুবে যাও, একেবারে ডুবে যাও, তবেই অমরপদ কি তা বুঝতে পারবে।

"যো ডুবা হ্যায় সো পায়া হ্যায় গম্ভীরা পানিপৈঠ।
হাম বাউরা ডুবন ডরে রহে তীর পর বৈঠ।।"

তখন দেখতে পাবে দুঃখ-শোক, ত্রিতাপের জ্বালা, জন্ম-মৃত্যু আদির মহাভয় সবই তাঁর চরণে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সব আশা, সব বাসনা, সকল প্রকার কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। মানব প্রীতি, পুত্রপ্রীতি, সংসার প্রীতি এসবই বৃথা, সবই মিথ্যা, কোন মূল্যই এদের নেই।

হে মা প্রকৃতিদেবী, তোমাকে দেখার জন্যে পাবার জন্যে আমার প্রাণে তো আকুলতা জাগে না, ব্যাকুলতা আসে না। এ কি ভীষণ মোহকূপে পড়ে অন্ধ অজ্ঞান আমি আজ দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্ত পথিক! হে মা বিশ্বপালিনী, বিশ্বজননী, আমি এইটুকু মাত্র বুঝেছি তোমার কৃপালাভ না করলে, তোমার দর্শন না পেলে, তোমার আশীর্ব্বাদ আমার শিরে বর্ষিত না হলে আমার জীবন, জন্ম, কর্ম্ম সব বৃথা, সব অর্থহীন।

মাগো, আমি আমার হৃদয় কমলে যেন তোমার আসন স্থাপন

করতে পারি। তোমার রাঙা পদযুগল বিধৌতমানসে সহস্রার বিগলিত সুধা আমি সঞ্চয় করে রেখেছি। বল মা বল, কবে তুমি আসবে, কবে তুমি ঐ আসনে বসবে, কবে তোমার অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে মা! মাগো, কবে আমার ব্রণপূর্ণ মলিন মনটি তোমার ঐ রাজীব চরণে উৎসর্গ করতে পেরে কৃতকৃতার্থ হব। কবে আমার হৃদয়কাশ হবে তোমার নীলাম্বরী শাড়ী, আমার চিত্ত হবে তোমার ঐ চরণ কমলে উৎসর্গ করবার সুমনস পুষ্প, কবে আমার প্রাণবায়ু করবে তোমার ধূপের কাজ, কবে আমার মণিপুরের তেজস্তত্ত্ব হবে তোমার দীপমালা, আমার হৃদয়ের কল্পিত সুধা হবে তোমার নৈবেদ্য, আমার অনাহত পদ্মের সুমধুর বংশীধ্বনি হবে তোমার সুমধুর বাদ্য, শব্দতত্ত্ব হবে তোমার গীত, কবে আমি রজোগুণকে রাঙিয়ে তোমার পা অলক্ত রাগে রঞ্জিত করতে পারবো মা!

আমার সনাতনী মা, আমার মধ্যে চিরদিন তোমার আসন বিছানো আছে, তুমি তো মা তাতেই বসে থাকো, কিন্তু মূর্খ আমি, অজ্ঞান আমি, তোমাকে এদিকে ওদিকে নানাভাবে খুঁজে বেড়াই। কিন্তু এদিকে ওদিকে অনুসন্ধান করে তোমাকে তো খুঁজে পাওয়া যায় না মাগো, কি করে তা সম্ভব হবে? কেন না তুমি যে বিন্ধ্যবাসিনী, সে যে সব চিন্তা বিবর্জিত অচিন্ত্য দেশ। সেই চিন্তাশূন্য দেশের মেয়েই যে তুমি, আমার মা, "চিদাকাশবাসিনী।"

মাগো! তোমার ঐ ধ্যানকল্পিত সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দশভূজা মূর্ত্তি তো আমার মনে কোন শান্তি দিতে পারল না। কেন না মহাপুরুষেরা বলেন - তুমি বিশ্বপ্রসবিনী, তুমি আদ্যাশক্তি, তুমি অনন্তভূজা, অনন্ত শক্তি স্বরূপিনী, অনন্ত বিঘ্ন বিনাশিনী। বল মা বল, কবে তোমার ঐ জগৎজোড়া রূপ দেখে আমি আমার নয়ন করবো সার্থক, আর জীবন করবো ধন্য। কেননা মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন বলেছেন -

"মা, আমার নয় খড় জড়ানো,
নয় মাটির ওপর রং মাখানো,

বিশ্বজোড়া মূর্ত্তি মায়ের
আকাশেতে প্রাণ জড়ানো।"

মা, তুমি ব্রহ্মায় ব্রাহ্মীশক্তি, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী শক্তি, মহেশ্বরে মাহেশ্বরী শক্তি, ইন্দ্রে ঐন্দ্রী শক্তি, চক্ষুতে দর্শন শক্তি, কর্ণে শ্রবণ শক্তি, হৃদয়ে স্পন্দন শক্তি, পায়ে চলন শক্তি, হাতে ধারণ শক্তি, মূলাধারে কুন্ডলিনী শক্তি।
তাই চন্ডীতে উক্ত আছে -

"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি অনন্ত বীর্য্যা
বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তেমেতদ্
ত্বং বৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তির্হেতুঃ।।"

"ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং
ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ,
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী
ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা।"

জননী কোথা হতে এলাম জানি না, কোথায় আছি তাও জানি না, আবার কোথায় যাব তাও জানি না। জীবন যে সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘিরে এলো মা, আমি এই সংসার বিজন পথে পথহারা পথিকের মত আর কতকাল ঘুরবো মা? হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল বনভূমির মত এই সংসার অরণ্যের মাঝে রিপুরূপী হিংস্র পশুর গর্জনে আমার প্রাণ যে ভয়ে কেঁপে উঠছে। তাদের হাত থেকে তুমি ছাড়া আর কে আমাকে উদ্ধার করবে মা? যদিও তুমি বিশ্বজননী, জগন্মাতা, তথাপি আমরা তোমাকে দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না, চিনতে পারি না। সুতরাং এই অন্ধকারময় ঘোর আবর্ত্তে পড়ে দিশে হারা হয়ে মা হারা সন্তান আমরা যদি অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে মরি, তবে তো আমাদের ভয় হবেই। এ ভয় থেকে তুমি ছাড়া রক্ষা করবার, এ ঘোর আবর্ত্ত

থেকে তুমি ছাড়া উদ্ধার করবার আর কে আছে মা। "এই ঘোর আঁধারে পঞ্চভূতের খেলা লেগে গেল, ভূতের কান্ড সব, তুমি কি লুকিয়ে আছ? থাক্ তো এস, বড় ভয় পাচ্ছি। এই সন্ধ্যা হল, এই মরুভূমির মধ্যে পড়েছি, চিত্তভ্রম হয়েছে, বাড়ী কোন দিকে বুঝতে পারছি না। কেবল অন্ধকার হয়ে আসছে মা।

ঘোর ঘোর আঁধার হল ডুবে গেল দিনমণি।
ভয়ে মরি এ প্রান্তরে দেখি না যে জনপ্রাণী।
কাঁপে প্রাণ সন্ধ্যা ঘোরে রিপুসব গর্জন করে।
প্রাণ ভয়ে ডাকি তোরে কথা কগো ও পাষাণি।
এ প্রান্তরে আমায় ফেলে ওমা কোথা লুকাইলে।
জীবনের এই সন্ধ্যাকালে আয় মা, ঘরে যাই জননী।"

"ওমা, আর কতদূর, আর কতদূর, আর কতদূর, আর কতদূর।
এগিয়ে এসে লও আমাদের আসছি মোরা অন্ধ আতুর।"

মা, মহাপুরুষেরা বলেন -

১। সৎ এ অবস্থিত তাই তুমি সতী।
২। তুমি সমর্থবতী তাই তুমি ভগবতী।
৩। জীবের দুর্গতি নাশ কর তাই তুমি দুর্গা।
৪। বড় দুঃখে তোমাকে জানা যায় তাই তুমি দুর্গা।
৫। দেহরূপ দুর্গে অবস্থান কর তাই তুমি দুর্গা।
৬। কালভয় হইতে জীবকে রক্ষা কর তাই তুমি কালী।
৭। আকাশবর্ণ বা কালরূপিনী তাই তুমি কালী।
৮। ত্রিতাপ নাশ কর তাই তুমি তারা।
৯। বিশ্বভুবনকে রাত্রিতে ঘুম পাড়াও তাই তুমি ভুবনেশ্বরী।
১০। ষোড়শ কলায় শ্রীদান কর তাই তুমি ষোড়শী।
১১। কান্তি ও শান্তি দান কর তাই তুমি কমলা।
১২। মদ নাশ কর তাই তুমি মাতঙ্গী।

১৩। বিশ্বকে নিজ বশে রেখেছ তাই তুমি বগলা।
১৪। মোহ নাশ কর তাই তুমি ধূমাবতী।
১৫। মায়াছিন্ন করে জীবকে মুক্ত কর তাই তুমি ছিন্নমস্তা।
১৬। ভবের কারণ তাই তুমি ভৈরবী।
১৭। বিদ্যা ও সুবুদ্ধি দান কর তাই তুমি সরস্বতী।
১৮। সর্ববিদ্যা তোমাতেই বিদ্যমান তাই তুমি সরস্বতী।
১৯। বিশ্বপ্রেমে বিগলিতা তাই তুমি বৈষ্ণবী।
২০। বিশ্বকে শ্রীমন্ডিত কর তাই তুমি লক্ষ্মী।
২১। পরমাত্মাকে জীবভাবে সংবদ্ধ কর তাই তুমি পরমা।
২২। মোহমায়া হইতে উদ্ধার কর তাই তুমি মহামায়া।
অপরপক্ষে -

কৃষ্ণস্তু কালিকা দেবী,
রাম রূপাচ তারিণী,
জামদগ্ন্য সুন্দরী স্যাৎ
বামন ভুবনেশ্বরী,
বরাহ ভৈরবীরূপাচ,
ছিন্নমস্তা নৃসিংহিকা,
মীন ধূমাবতী,
বগলা কুর্ম্মমূর্ত্তিকা,
বুদ্ধরূপেন মাতঙ্গী,
কমলা কল্কিরূপিনী,

ইতি দশ অবতার। ইহাতে স্বয়ং ভগবতীই ভগবান।

১। কৃষ্ণ - কালী।
২। তারা - রাম
৩। ষোড়শী - জামদগ্ন্য
৪। ভুবনেশ্বরী - বামন
৫। ভৈরবী - বরাহ
৬। ছিন্নমস্তা - নরসিংহ
৭। মীন - ধূমাবতী।
৮। কমলা - কল্কি।
৯। বগলা - কূর্ম।
১০। মাতঙ্গী - বুদ্ধ।

রামচন্দ্র ও ভেক সংবাদ

একদা শ্রীরামচন্দ্র মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন। মৃগের অনুসন্ধানে তিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া খুবই পরিশ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তিনি জলের অনুসন্ধানে রত হইলেন এবং একটি সরোবর দেখিতে পাইলেন। সরোবরটির নাম পম্পা সরোবর। রামচন্দ্র সরোবরটির তীরে তাঁহার হস্তস্থিত ধনুটি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া জলপান করিতে সরোবরে অবতরণ করিলেন। জলপান শেষ করিয়া তীরে উঠিয়া আসিয়া যখন ধনুটি উঠাইয়া লইলেন তখন দেখিলেন ধনুর ডগায় একটি অর্ধমৃত ভেক লাগিয়া আছে। সে কোনরূপ শব্দ বা কাতরতা প্রকাশ করিতেছে না। তখন রামচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যখন আমি ধনুটি মাটিতে পুঁতিয়া ছিলাম তখন তুমি কোন রূপ শব্দ বা কাতরতা প্রকাশ করিলে না কেন? রামচন্দ্রের প্রশ্ন শুনিয়া ভেকটি জোড়হাত করিয়া বলিল - প্রভু, জানি তুমিই স্বয়ং ভগবান, তুমিই আমার একমাত্র শরণ, একমাত্র উপাস্য। যখন অপরে আমাকে উৎপীড়ন করে তখন আমি তোমাকেই স্মরণ করি কিন্তু যখন দেখিলাম পরমাত্মারূপ তুমি স্বয়ং আমার এই উৎপীড়ন ও দুঃখের কারণ তখন আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব? তাই আমি নির্বাক ছিলাম।

ওগো ভক্ত প্রবর আদ্যনাথ রায়, এবার বুঝেছ ভক্তি কাকে বলে?

সৌরজগৎ

এক সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী গ্রহগণ এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক সমস্তকিছু। সূর্য ইহাদের কেন্দ্রস্থলে বর্ত্তমান থাকিয়া এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে ইহাদিগকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন। ইহারাও তাঁহাকে ঐরূপে স্ব স্ব অভিমুখে আকর্ষণ

করিতেছে। ইহার ফলে গ্রহ উপগ্রহাদি সূর্য্যের চতুর্দিকে একই নির্দিষ্ট পথে চিরকাল পরিভ্রমণ করিতেছে, কখনও তাহা হইতে বিচ্যুত হইতেছে না। পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণই সূর্য্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে আর উপগ্রহ সকল ঐ গ্রহ দিগের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সূর্য্যেরই সহিত সংশ্লিষ্ট। এই কারণেই ইহাদের সর্বসমষ্টি সৌর জগৎ নামে খ্যাত।

জগজ্জননীর চরণে ভক্তসাধকের প্রার্থনা।

অয়ি জীব জননী, জীব পালিনী, জীব মোহিনী, জীব গেহিনী, জীব নন্দিনী, জীব রঞ্জনী বলি তুমি আমার কে? জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছ, দুঃখে সুখ, বিপদে আশ্রয়, সম্পদে আরাম, ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় বারি অকাতরে প্রদান করিতেছ। হে মা আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কে? জগৎ জীবের উদ্ধারকারিণী তুমি আমার কে? বুঝিলাম তুমিই আমার একমাত্র আপনার, যথার্থই জানিলাম ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত এ বিশ্ব সংসার - হে বিশ্বমোহিনী মা, তোমারই মায়ায় বিমোহিত। জানিলাম ত্রিজগতে জীবের আমার বলিতে যদি কেহ থাকে তবে সে তুমিই, এ বিশ্বের ব্যথায় ব্যথিত যদি কেহ থাকে তবে সে একমাত্র তুমিই। কালের কলয়িত্রী এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তী ভূতের ভাবিনী, চেতনের চেতনা, জীবের জীবন, প্রাণীর প্রাণ বলিতে যদি কিছু থাকে তবে সে তুমিই! সে তুমিই! সে তুমিই!

আমার জগদ্ধাত্রী মা! তুমি ভাস্বরে ভাঃ, সুধাকরে সুধা, জলদে তড়িৎ, হিমাচলে গৌরী, কৈলাসে শঙ্করী, কাশীক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা, বৃন্দাবনে নন্দগেহিনী, নবদ্বীপে শচীমাতা, কালীঘাটে কালী মাতা, আর নাটোরে রাণী ভবানী। হে মাতঃ, হরিহর বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত শ্রীচরণাম্বুজদ্বয়ে আমার কোটী কোটী প্রণাম।

হে মা পর্বত দুহিত্রী পার্ব্বতী, হে মা জগদ্ধাত্রী, ত্রিলোক

পালয়িত্রী, তুমি আমার প্রণাম লও। মাগো, বুঝিলাম তুমিই আমার সব, কিন্তু বুঝিলাম না আমি তোমার কে ? মাগো তোমার ঐ রক্তরাঙা পদপঙ্কজে আমি নিজেকে বিলাইয়া নিঃস্ব হইতে চাই; কিন্তু হায়, জানিনা তোমার ঐ অভয় চরণে আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের স্থান হইবে কিনা। অয়ি কল্পনা প্রসবিনী হৃদয় আসন আসীনে, অয়ি রহস্যময়ী, তোমার ঐ যবনিকার অন্তরালে ছায়ারূপিনী মায়ার রহস্য কি চিরকালই অজ্ঞাত থাকিবে, উহা কি কখনও উদ্ঘাটিত হইবে না ? মাগো, তোমার ছায়া রূপিনী মায়ার অবগুন্ঠনের অন্তরালে আর কত কাল আত্মগোপন করিয়া থাকিবে ? তোমার ঐ রহস্য বিজড়িত অবগুন্ঠন মোচন করিয়া তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর মা, প্রকাশ কর।

হে মহামায়া আদ্যাশক্তি রূপা দেবী, তুমি সর্বেন্দ্রিয় প্রকাশিতা ভগবতী, তুমি আমার প্রণাম লও। তুমি জ্ঞানীগণের চিত্তকে স্বীয় শক্তি বলে আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাক। তুমি নিজ মায়ায় স্থাবর জঙ্গম বিশিষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করিয়া নিজেই লীলাখেলা করিতেছ, তুমি আমার প্রণাম লও। হে মা সনাতনী, তুমি নিত্যা, সদা সর্বত্রে বিরাজমানা - তুমি আমার প্রণাম লও।

মাগো, তুমিই জীব দেহস্থিতা, প্রাণকর্মের মধ্যাবস্থারূপিনী (উর্দ্ধাধঃ গতিরূপা) চঞ্চলা প্রাণশক্তিরূপা দেবী। হে সর্ব্বার্থ সাধিকে, এক মাত্র তোমার পূজার দ্বারাই জীব অনায়াসে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিতে পারে - অতএব তুমি আমার প্রণাম লও। তোমাকর্ত্তৃক প্রাণীমাত্রেই স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসার মায়ায় আবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব তুমি আমার প্রণাম লও। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই দেবতাত্রয় তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে অতএব তুমি আমার প্রণাম লও।

মাগো ঃ-

প্রকৃতি পুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্মস্থূল,
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি বিশ্বমূল।
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব,

শক্তিযোগে শিব সংজ্ঞা শক্তি লোপে শব

তাই মা ঃ-

ইন্দ্রাদি অমর বৃন্দ প্রণত ও পায়,
মস্তক কুসুম মালা চরণে লুটায়,
ধরেছে ধূসর রাগ পরাগ রেণুতে
গুঞ্জে তায় মধুব্রত মধুর রবেতে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নিদান মাত্র জানি,
ও শ্রীপাদপদ্ম তব জগৎ জননী।
চিদাত্ম সদ্‌গুণে নমঃ তুমি নারাকার,
অভীষ্ট প্রদানে কর ভবার্ণবে পার।

ওহো!

কোটী দিবাকর দ্যুতি তব শ্রী চরণ।
বিধি, বিষ্ণু, শিরোমণি রত্ন বিভূষণ।
চঞ্চল কাঞ্চনময় নূপুর যুগল,
রুণু ঝুনু রবে তাই ঝঙ্কারে কেবল।

জীব পরমাত্মা সবই স্বরূপ যাঁহার,
স্ত্রী-পুরুষ সর্বরূপে যাঁহার বিহার
কামমগ্না হয়ে পুনঃ কামান্ত কারিনী,
সে তোমারে নমস্কার হে সর্বরূপিণী।
তুমি সর্বশক্তি দেবী জগৎ দুহিত্রী,
তুমি ত্রিজগৎ মাতা ত্রিজগৎধাত্রী।
বেদরূপা সর্ববেদে তোমারই আভাস.
সর্বগুহ্যা তবু সর্বে তুমি সুপ্রকাশ।
তোমারেই হংসরূপা কহে যতিগণ.
তুমিই সে বৈষ্ণবের পুরুষ প্রধান।
কৌলিক কুলের তুমি পরমা শকতি.
তুমিই তাদের চিত্তে অচলা ভকতি।

কালচরিত্র

"সময় থাকিতে কর ঈশ্বর সাধনা
হেলায় কাটালে কাল ফিরিয়া পাবে না।"

হে কাল, তুমি কে? কোথায় থাক তুমি? সত্যই কি তুমি অসীম, অনন্ত তোমার মহিমা, অতুলনীয় তোমার ন্যায়দন্ড, অপরাজেয় তোমার শক্তি, অবাধ তোমার গতি? তোমার তুলাদন্ডে কি বৃদ্ধ শিশু সবল দুর্বল, রাজাপ্রজা, আমীর ফকির, সুখী, দুঃখী সকলেই সমান? কোন দোর্দন্ড প্রতাপে তুমি রাজাকে ভিখারী, ভিখারীকে রাজা কর, সুখীকে দুঃখী, দুঃখীকে সুখী কর, সবলকে দুর্বল, দুর্বলকে সবল কর, সুন্দরকে কুৎসিৎ আর কুৎসিৎকে সুন্দর কর? হে কাল, ধন্য তুমি, ধন্য তোমার মহিমা। কৃপা করে মোর প্রতি সদয় হও, প্রসন্ন হও প্রভু।

কালের অপ্রতিহত গতি সৃষ্টির প্রথম বিকাশ থেকেই অব্যাহতভাবে চলে আসছে। এর দুর্বার গতিবেগ কেউ কখনও রোধ করতে পারেনি আর ভবিষ্যতেও পারবে না। ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীতে কত দুঃসহ বেদনাময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, নিখিল বিশ্বের অনেকেই সেই পরিস্থিতিতে মর্মাহত হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কত সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে, কিন্তু হায়, বজ্রকঠোর কালের কাছে সবই মিথ্যা, সে কখনও কারও প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে কখনও কারও প্রতীক্ষায় থাকেনি। সে যেমনই এসেছে তেমনি চলে গেছে। সে কখনও অপেক্ষা করার প্রয়োজন অনুভব করে নি। তার গতিবেগ সে চিরদিন বজায় করে এসেছে।

জান কি, সেই সত্যযুগে, রাজার ঘরের দুলাল, ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ যখন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে হরিগুণগান ত্যাগ না করে মৃত্যুবরণ করতেও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কৃত সংকল্প, সেই রাজার ঘরের দুলাল, সেই

ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষুদ্র কণ্ঠের সুমধুর হরিধ্বনি চিরতরে রুদ্ধ করে পৃথিবী থেকে হরিনাম চিরতরে বিদূরিত করবার জন্য দেববৈরী পিতা হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক যখন উত্তুঙ্গ ও অমসৃণ পর্বত চূড়া হতে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ বিশাল বারিধি মধ্যে নিপাতিত হল, তখন সেই বেপমান বপু, মহামন্ত্র সাধনরত, রোরুদ্যমান, শ্রীহরির শরণাপন্ন, বিপদতারণের পদাশ্রিত সেই ক্ষুদ্র অসহায় শিশুর ভাগ্যে কি যে ঘটল সেদিকে কাল ক্ষণেকের তরেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি। সেই মুমূর্ষ অনাথ শিশু মরল কি বাঁচল তাও সে একবারের জন্য পিছন ফিরে দেখল না।

যেদিন ত্রেতায় শ্বাপদ সঙ্কুল দণ্ডকারণ্যে মায়া মৃগানুসন্ধানে রত দেবর ও স্বামী কর্ত্তৃক নির্জন কুটিরে পরিত্যক্তা পরমা প্রকৃতি রূপিনী বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী মা জানকীকে একাকিনী পেয়ে দাম্ভিক ও অহঙ্কারী লঙ্কেশ্বর দশানন হরণ করে নিয়ে চললেন, আর পুষ্পক রথারূঢ়া মা জানকী যখন আলুলায়িত কেশা নিরাভরণা হয়ে হা-রাম হা-রাম বলে চোখের জলে পাষাণ বিগলিত স্বরে তাঁর দয়িত ত্রিলোকনাথ শ্রীরামচন্দ্রকে আহ্বান করছিলেন সে দিনও কিন্তু কালের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয় নি, সেদিনও কাল অপ্রতিহত গতিতে আপন মনেই বা আপন অভিমানেই বহে চলেছিল। ফিরেও দেখেনি সেই অভাগিনীর ভাগ্যে কি ঘটল? আবার সেই চিরপূতা, চিরপবিত্রা, অগ্নিপরীক্ষোত্তীর্ণা সতী সাবিত্রী সীতা দেবীকে প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য যখন শ্রীরামচন্দ্র আপন হৃদয়ে বজ্রাঘাত সদৃশ সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল বিরহ সহ্য করে গহন অরণ্যে শ্বাপদ অধ্যুষিত অঞ্চলে বিসর্জন দিলেন, তখন সেই নিরাশ্রয়া, অবলা, অনাথা, রোরুদ্যমানা, সন্তপ্তহৃদয়া নারীর ভাগ্যে যে কি ঘটল তাও কাল তিলেক দাঁড়িয়ে দেখল না।

আবার দ্বাপরে, ঐ দেখ প্রাণসম পুত্র অভিমন্যু সপ্তরথী কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হওয়ায় তারই প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ ও পুত্রহন্তা জয়দ্রথের প্রাণনাশার্থ প্রতিজ্ঞা পূরণে তৎপর পুত্রশোকার্ত্ত দিনমণির অস্তকাল যাবৎ প্রতিজ্ঞাপূরণে অসমর্থ হলে প্রজ্জ্বলিত চিতায়

দেহ বিসর্জ্জন দিতে বদ্ধ পরিকর ঐ অপরাজেয় ধনুর্ধর পার্থ আর তাঁরই সারথি সংকটহারী বিপদতারণ মধুসূদন ঐ বিপত্তিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে রথ সঞ্চালন করছেন কিন্তু হায়, কাল এদের কারো জন্যই অপেক্ষা করেনি; তাঁরা এই বিষম সমস্যার সমাধান করতে পারলেন কিনা তাও একবারের জন্য লক্ষ্য করেনি।

আবার দেখ, এ কলিযুগেও, কালের সেই একই চরিত্র। মেহারে রাজা কর্ত্তৃক অনুরূদ্ধ হয়ে রাজ পুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিরক্ষর, নিরপরাধ ও নির্বোধ সর্বানন্দ অমানিশার তমসাচ্ছন্ন নিশাকে জ্যোৎস্নাপ্লুত পূর্ণিমা তিথি বলার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক প্রহৃত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত। সেই অপমানের নিদারুণ জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে তিনি অভিমানে অনাহারে এক বসনে গৃহত্যাগ করলেন। পরাবিদ্যার জ্ঞান সঞ্চয় না করে তিনি আর গৃহে ফিরবেন না - এই তাঁর সঙ্কল্প। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু পূর্ণচন্দ্র ও তাঁর পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী স্ত্রীও অনাহারে অনিদ্রায় বিশ্বের এক ক্ষুদ্র কোণে এক জীর্ণ কুটিরে সমাসীনা। সেই ভাগ্যহীনা ও অভাগিনীর জীবনে কি যে ঘটল, তাঁরা মরলেন কি বাঁচলেন কাল ক্ষণেকের জন্যেও সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল না। তার অবাধ গতিতেই সে আপন পথে আপন অভিমানেই বহে চলে গেল।

তাই দেখ, কাল কারও অপেক্ষায় থাকে না। সে সতত দুর্বার গতিতে প্রবাহিত হয়ে মহাকালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তার কাছে ধনী-নির্ধন, সুন্দর-কুৎসিত, অন্ধ-আতুর, বৃদ্ধ-শিশু, আমীর-ফকির সকলেই সমান। তার চলার পথে যা কিছু পড়ে তা তার পেছনেই পড়ে থাকে, তার কাছে আজ যা নূতন, কাল তা পুরাতন। হে কাল, তুমি কে, তোমার এত দোর্দন্ড প্রতাপ কেন? হ্যাঁ, বুঝলাম কাল, তুমিই সেই মহাকালের অধীন, তাঁরই আজ্ঞাবহ। যিনি মহাকাল তিনিই ভগবান। এমন যে প্রদীপ্ত বিশাল ও বিরাট সূর্য তাঁকেও মহাকাল গ্রাস করে ফেলেন। তবে আমাদের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণাদপি তুচ্ছ জীবকে গ্রাস করতে মহাকালের কতটুকু সময় লাগবে?

অতএব, এস, সেই কালেশ্বরের, সেই ভগবানেরই শরণাপন্ন হও এবং আকুলস্বরে ও প্রাণের আবেগে বল হে আর্ত, হে ভয়ার্ত, হে পন্ডিত, হে মূর্খ, হে ধনী, হে নির্ধন, হে অন্ধ, হে খঞ্জ, হে সম্রাট, হে ভিখারী, হে বেদনাতুর, তোমরা সকলে এস ও একসুরে বল — "হে দেবাদিদেব, হে মহাকাল, হে রাজাধিরাজ, হে প্রাণের ঠাকুর, এতদিনে বুঝেছি, তুমি ছাড়া কেহ নাই, তুমি ছাড়া কিছু নাই, তাই তোমার শরণ গ্রহণ করলাম। তোমার অভয় পদপঙ্কজে স্থান দাও প্রভু! যদি আরো ভালোভাবে বুঝতে চাও তবে মন দিয়ে কান পেতে শোন, মহাকালরূপী ভগবান তাঁর সন্তান বিশ্ববাসীকে এখনও কোলে টেনে নেবার জন্যে "নাসিকার সম্মুখে নাসিকার অব্যবহিত পরেই অখন্ড আকাশে দাঁড়িয়ে আছেন।" ঐ যে আমাদের ডাকছেন। ঐ যে তাঁর "মা ভৈঃ, মা ভৈঃ" রব চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে "ওরে ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, তোরা সময় থাকতে থাকতে আমার শরণাপন্ন হ।" যাঁরা সাধন-নিষ্ঠ মহাপুরুষ, তাঁরা সে ডাক, সে আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু হায়, আমরা মূর্খ, আমরা বধির, আমরা এ কানে সে ডাক কিছুই শুনতে পাই না এবং অন্ধ বিধায় কিছুই দেখতে পাই না। সে স্থান কেমন? না, চন্দ্র, সূর্য, অগ্নির তেজ বা আলোক সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। দিনমণি যে অস্তমিত প্রায়, দিনের আলো যে ফুরিয়ে এল। মন রে, তবে সেই মহাশক্তি মহাকালের শরণাপন্ন হ, আর তাঁকে করুণাসিন্ধু, পাতকীতারণ বলে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে কাঁদতে থাক। এতদ্ব্যতীত এই ভবসিন্ধু পার হওয়ার আর আমাদের কোন উপায় নাই। অতএব, হে আমার সাধক-সাধিকাবৃন্দ, এস, আমরা নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিয়া সেই কালেশ্বর মহাকালের শরণাপন্ন হই।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য

গীতার ১৮ নং অধ্যায়ের ৬৬ নং শ্লোকে শ্রীভগবান "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বলিয়া গীতোক্ত উপদেশের যে উপসংহার করিয়াছেন তাহাই আমরা আলোচনা করিব। শ্রীভগবান

বলিলেন -- "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" - ওগো, তোমরা ধর্মাধর্ম সব ছাড়িয়া একবার আমাকেই জড়াইয়া ধর অর্থাৎ "এতে পাপ হবে এতে পুণ্য হবে" -- এইরূপ ভাবিয়া বিবিধ কর্মসূত্রে আর ঝাঁপাইয়া পড়িও না। শ্রীভগবান ধর্মাধর্ম সব ছাড়িয়া একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিতে বলিলেন বটে, তবে ইহার উদ্দেশ্য এই নহে যে ধর্মোপদেশ পালন করিতে হইবে না। ধর্মোপদেশ, যাহা আবহমান কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার সবই পালন করিতে হইবে। তবে যাহাতে ঐ সকল কর্মানুষ্ঠান ভগবদ্ চরণে অর্পিত হয়, সেইজন্য তিনি ভগবদ্ শরণাগতির কথা বলিলেন। এই ভগবদ্ শরণাগতি সব চেয়ে বড় কথা। শরণাগত হইয়া যে কর্মই করা হউক না কেন তাহা ভগবদ্ চরণে অর্পিত হইয়া থাকে। তাই তিনি ভগবদ্ শরণাগতির কথা বলিলেন। ভগবদ্ উদ্দেশ্যে যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় না তাহাতে আত্মবিনাশ হয় এবং সংসার পাশ মোচন হয় না। সুতরাং সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে হইলে কাম-সংকল্প বর্জিত হইতে হইবে। অবশ্য ধর্ম বলিতে গার্হস্থ্য ধর্ম, যতি ধর্ম, দেহধর্ম, রাজধর্ম ইত্যাদি অনেক প্রকার ধর্মকেই মনে করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম বলিতে কোনপ্রকার ধর্মকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া উঠা শক্ত। কিন্তু মনুষ্য জীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হইল আত্মদর্শন, অথচ পূর্বোক্ত ধর্মগুলির কোনটিই আত্মদর্শনের মুখ্য উপায় নহে। তাই এই গুলিকে যথাকালে গ্রহণ ও যথাসময়ে ত্যাগ করিয়া প্রকৃত আত্মদর্শনে সচেষ্ট হইতে হইবে। এই আত্মদর্শনের প্রকৃষ্ট পথই হইল আত্মকর্ম, যে কর্মের অনুষ্ঠানে উপরোক্ত ধর্মানুষ্ঠান গুলি যথাসময়ে সবই পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে এবং কালে শ্রীভগবানের রাতুল চরণে পরিপূর্ণরূপে শরণাগত হইয়া জীবন কৃতকৃতার্থ করিতে পারিবে।

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, যাঁহারা ভাল লোক ও ধার্মিক বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত, তাঁহারাও ধর্মাধর্মের বহুবিধ শাখার শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রমতের বিচার করিতে গিয়া অনেক সময় ভুল করিয়া বসেন। তখন মনে হয় কিছুই বুঝি হইল

না, সব বুঝি আধখাপচা হইয়া থাকিল। এইরূপ অবস্থায় সাধু ও মহাত্মারা আমাদের এই উপদেশ দেন যে আমাদের প্রারব্ধ বশে যে কোন কর্মই কৃত হইক না কেন তাহার ফলাফলের দিকে কোন লক্ষ্য না রাখিয়া এবং পুঁথি পত্রের সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্মরণে যেন আমরা মন লাগাইয়া রাখি।

আমাদের মধ্যে পাপ-পুণ্য করে দেহেন্দ্রিয়াদি মন-বুদ্ধি সমন্বিত প্রকৃতি। ভগবান আত্মনারায়ণের পাপ-পুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত ক্রিয়া দ্বারা ধর্মাধর্মের গ্রন্থি খুলিয়া ফেলিলে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাইবে।

জগদাদি বস্তু নিশ্চয়কে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম আছে তাহাই সর্বধর্ম বা পঞ্চভূতাত্মক প্রকৃতির ধর্ম। এই প্রকৃতি ধর্মের অনুসরণ করিলে সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি প্রভৃতি বিভিন্ন তাপে আমাদিগকে অবশ্যই তাপিত হইতে হইবে। সেইজন্য প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অন্তর্গত সর্বধর্মের উপরে উঠিতে হইবে। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম — মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য — এই পঞ্চ চক্রস্থিত ভূতময় ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করিতে হইবে। আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করতঃ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য, দেহবন্ধন ইত্যাদির হাত হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করিয়া চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারিবে। কিন্তু আজ্ঞাচক্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বড় সহজ কথা নহে। সেইজন্য আজ্ঞাচক্রে যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন সহকারে সাধনার প্রয়োজন।

সাধনা করিয়া সাধক যখন আজ্ঞাচক্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন তখন তিনি প্রাণের সহিত বুঝিতে পারেন যে ভগবানই তাঁহার সব, তিনি ছাড়া এ জগতে আর কিছু নাই। তখন তিনি পরিপূর্ণরূপে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার মন-প্রাণ সবকিছুই সমর্পণ করিয়া

থাকেন। সে মন প্রাণ আর বিষয়াদির প্রতি ধাবিত হয় না। সুতরাং আত্মার শরণাপন্ন হওয়াই সর্বধর্মের সেরা ধর্ম।

এখানে হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে ভগবানই যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার মত মায়ার দ্বারা নাচাইতেছেন। জীবের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? ভগবান কৃপা করিলে তবে তো মুক্তি হইবে। মুক্তি ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে বটে কিন্তু এজন্য জীবকেও বহু প্রযত্ন করিতে হয়। বিনা প্রযত্নে বিনা সাধনায় কেহই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যে তাঁহাকে পাইতে চাহে তাহাকেই কিছু মূল্য দিতে হইবে। এই মূল্যই হইতেছে সাধনায় ক্লেশ স্বীকার। যদিও সে মূল্য ভগবদ প্রাপ্তির তুলনায় কিছুই নহে, তথাপি সাধককেই ঐ মূল্য দিতে হয়।

আবার অনেকে হয়ত বলিতে পারেন ভগবান যখন প্রতি ঘটে, পটে, জলে-স্থলে, গগনে-পবনে, অন্তরীক্ষে, স্থাবর-জঙ্গমাদি সকল পদার্থের মধ্যেই সমভাবে বিরাজমান, যখন তিনি আমার দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অণু-পরমাণুরূপে বিরাজ করিতেছেন তখন তাঁহার সাধনা করিব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য এবং সাধারণের অবগতির জন্য তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"গরুর দুগ্ধের মধ্যেই ঘৃত রহিয়াছে কিন্তু সে ঘৃত গাভীর শরীরের মধ্যে থাকিয়াও তাহাদের অঙ্গাদির পুষ্টিসাধন বা ক্ষতাদির উপশম করে না। দুগ্ধ গাভীর শরীর হইতে নিঃসৃত হইলে মন্থনাদির দ্বারা মাখন তাহাদের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাহাদের আরোগ্য দান করে। সেইরূপ পরমেশ্বরও সকলের দেহের মধ্যে থাকিলেও উপাসনারূপ মন্থন ব্যতিরেকে তদুৎপন্ন শক্তিরূপ নবনীত বাহির না হইলে মনুষ্যদিগের তিনি হিতকারী হন না অর্থাৎ তিনি দেহীর অন্তরস্থ থাকিয়াও তাহার ভবদুঃখ নষ্ট করেন না, যতক্ষণ না উপাসনারূপ উপায় অবলম্বিত

হয়। এই আত্মোপাসনা করা কি প্রত্যেকেরই কর্তব্য নহে।'' আমরা নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকটিতে, ভগবান এই আধ্যাত্মিক কর্মযোগের প্রক্রিয়াকে কি বলিয়াছেন তাহা একবার দেখিয়া লই। তিনি বলিয়াছেন -- এই আধ্যাত্মিক ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানই যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, সেই বিদ্যাই রাজবিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, রাজগুহ্য অর্থাৎ অতি গোপনীয়, সকল রহস্যের সার রহস্য, উত্তমং অর্থাৎ পরমোৎকৃষ্ট, পরম পবিত্র, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, বেদোক্ত সর্বধর্ম ফলপ্রদ, ইহা করা অত্যন্ত সুখকর, কোনপ্রকার কষ্টসাধ্য নহে, ইহার ফল অক্ষয় এবং অবিনাশী।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্মং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্।। (৯/২ গীতা)

কূটস্থ দর্শন হলেই জগৎদর্শন হয়

সাধকের অর্ন্তদৃষ্টিতে ভগবানের যে সকল মাহাত্ম্য লক্ষিত হয়, তাহাতেই সাধকের মোহ অপগত হয়। অনেক বিষয় যাহা পূর্বে বোঝা যাইত না তাহা বোঝা যায়, যাহা পূর্বে কখনও শোনা যাইত না সেই সকল অভূতপূর্ব বিষয় শোনা যায়, যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই তাহাও দেখা যায় এই কূটস্থরূপ চক্ষের মধ্যে। সে বিশ্বতোদর্শী বিরাট চক্ষু প্রতি জীবের মধ্যে পদ্মপত্রের ন্যায় মন্ডলাকার রূপেই অনুভূত হয়। সেই গোলাকার কূটস্থের শ্যামায়মান কান্তি দেখিলে মন-প্রাণ জুড়াইয়া যায়। মনে হয় সে চক্ষুর মধ্যে হৃদয়ের সব কথাই যেন লিখিত রহিয়াছে। সেই বিশালায়ত লোচনদ্বয় যেন আমার অন্তঃস্থল ভেদ করিয়া সব দেখিয়া লইতেছে। সে দৃষ্টি হইতে আর কিছু যেন লুকাইয়া রাখা যায় না। পদ্মপত্রে যে ঈষৎ রক্তিমাভ শ্যামশোভা বিদ্যমান তাহা বাস্তবিকই অতি মনোহর। ভগবানের সেই বিশাল নেত্রের মধ্যে কি অপূর্ব সৌন্দর্য ও কি সুগভীর প্রসন্নতা যেন ছড়ানো রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

সাধকের সৌভাগ্য বশে এই কূটস্থের মধ্যে পুরুষোত্তমরূপ যখন পরিদৃষ্ট হয় (কর্তাকে সম্মুখে দেখিলে ভৃত্যের যেমন অহংকর্তা ভাব থাকে না তদ্রূপ), তখন সাধকের কর্তৃত্বাদি অভিমানরূপ মোহ চিরদিনকার মত নষ্ট হইয়া যায়, কিছুই মনে থাকে না, তখন কর্তা আর কে হইবে বল? সাধক যখন তাঁহার মধ্যে সর্বকর্তৃত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব ও বন্ধ মোক্ষাদি বিচিত্র ভাবে দেখিয়াও তাঁহাকে অসঙ্গ ও উদাসীনভাব বুঝিতে পারেন, তখন তিনিও তদ্বৎ অসঙ্গ ও উদাসীন হইয়া যান। তাঁহার আর তখন অহংকর্তারূপ মোহ একেবারেই থাকে না।

এখন সাধকরূপ অর্জুন ভগবান আত্মনারায়ণের শরণাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার অপার ঐশ্বর্য, অনন্ত মহিমা দর্শনে বিস্ময়াভিভূত হইয়াছেন আর মনে করিতেছেন আমি কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য, আর তিনি কত বিরাট, কত মহান, অনিমা লঘিমাদি মহাঐশ্বর্যসম্পন্ন দীন দয়াল আর্তের বন্ধু। ভবরোগে কাতর ব্যক্তি যদি তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হয়, তবে তিনি কি তাহাকে আশ্রয় না দিয়া থাকিতে পারেন? এই বিশ্বাসে সাধক রূপ অর্জুন ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন — "ওগো আমার প্রভু, ওগো আমার প্রাণের দেবতা, তোমার ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু আমি কি সে রূপ দেখিবার অধিকারী নহি? যদি আমাকে অধিকারী বলিয়া বিবেচনা কর, তবে তোমার ঐ ঐশ্বরিক রূপ দেখাইয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ কর, আমাকে আশীর্বাদ কর, আমি যেন সব ভুলিয়া তোমার ঐ রাতুল চরণে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারি। ওগো ভক্ত বৎসল, আমার এ আবেদন উপেক্ষা করিও না, তোমার চরণে এ দাসের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

যম রহস্য (সংক্ষেপে)

হে যমরাজ, সত্যই কি তুমি এত ভীষণ এত ভয়ঙ্কর যে তোমার নাম শুনিলেই রাজা প্রজা, ধনী নির্ধন, সম্রাট বাদশা সকলেই আতঙ্কে শিউরে উঠেন, সকলের মুখ শুকাইয়া যায়, আবার কেহ

কেহ অপরের সহিত ঝগড়া বিবাদ বাধাইয়া গালি দিয়া বলে, "তুই যমের বাড়ী যা, যম তোকে নেয় না কেন?" আবার এইরূপ কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শোনা যায় -

ধন ধন ধন ধন, বাড়ীতে ফুলের বন,
এমন ধন রেখে কেন উপোস করে যম।

আচ্ছা, সত্যই কি তুমি এত ভয়ঙ্কর, এত আতঙ্কের বস্তু, সত্যই কি তুমি বিপদ তারণ নও, মনোহর কি তোমার মূর্ত্তি নয়? আচ্ছা তোমার বাড়ী কোথায়, উহা কতদূর? সে বাড়ীতে কত স্থানই বা আছে, সত্যই কি সেখানে এত স্থান আছে যে সেখানে অনায়াসে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যন্ত সকল প্রাণী ও বস্তুর থাকিবার স্থান একত্রে সঙ্কুলান হয়? যদি সত্যই এরূপ হয় তবে তুমি তথাকার মালিক হওয়ায় তুমি আরও কত বিরাট, আরও কত অসীম। বুঝিতে পারিলাম তুমি সীমাহীন অনন্ত, তোমার সীমা নির্দেশ করিতে যাওয়া আমার মত বর্ণজ্ঞানহীন বালকের পক্ষে বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে পারে? শ্রীভগবানও গীতায় বলিয়াছেন - "যমঃ সংযমতামহম্" অর্থাৎ সংযম বা শাসনকারীদের মধ্যে আমি যম। ওহো! তুমিই সেই বিরাট গোলক গহ্বর বিশ্বপতি, তুমিই ভগবান। এখন বুঝিয়াছি, সত্যই তুমি ছাড়া আমার আর কেহ নাই, তুমিই আমার বড় আপনার জন, আপনার ধন, আমার নিকটতম আত্মীয়, সর্বাপেক্ষা মঙ্গলাকাঙ্খী সুহৃদ। প্রভুরূপে তুমি আছ বলিয়াই ছায়ারূপে আমি আছি। তুমিই আমার এই ক্ষুদ্র দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গেতে অণু পরমাণুরূপে ব্যাপিয়া আছ। তবে তোমাকে ভয় করি কেন? সত্যই তো তুমি ভয়ঙ্কর নও, তোমাকে দেখিয়া কাহারও তো ভয় পাওয়া উচিৎ নহে। তবে ভয় পায় কেন? কারণ মানবের মূঢ়তা ও অজ্ঞতা। প্রভু গো, আমি যে এই অজ্ঞতা দূর করিতে চাই, আমি যে তোমাতেই নিজেকে বিলাইয়া, নিজেকে হারাইয়া নিঃস্ব হইতে চাই। কিন্তু কেমন করিয়া আমার এই অজ্ঞতা দূর হইবে? কেমন করিয়া তোমার শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে বিলাইয়া

নিঃস্ব হইব, তাহাই তো জানিনা। হে মোর চির সুহৃদ, চিরশরণ, এখন বুঝিয়াছি তুমিই সেই চিরভীতিময় চিত্রগুপ্তের রূপান্তর। হে কালান্তক, হে মোর মহাজীবন, মহামরণ, হৃদয়ে হৃদয় দিয়া বুঝিতেছি, তোমার রাজীব চরণে শরণ লওয়া ব্যতীত জীবের তো গত্যন্তর নাই। তাই আন্তরিক প্রার্থনা করি, হে মহাস্থিরাবস্থারূপ মহাশব, হে মহাশ্মশান, হে দেবাদিদেব, হে রাজাধিরাজ, যেন শেষের সেদিনে তোমার ঐ রাতুল চরণে এ দীনের একটু স্থান হয় প্রভু। দেখিও, আমার এ প্রার্থনা যেন বিফল না হয় (দোহাই তোমার)।

ভক্তিমান কে?

সর্বভূতে দ্বেষ শূন্য, মৈত্র ও কৃপালু, মমত্বহীন, নিরহঙ্কার, সুখ দুঃখে সমভাব, ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত, মদ্বিষয়ে স্থিরলক্ষ্য ও আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী, যিনি আমার ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

যাঁহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয়।

সকল বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন, পক্ষপাতশূন্য, চিন্তাশূন্য এবং সঙ্কল্প শূন্য যিনি আমার ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়।

যিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু পাইয়া দ্বেষ করেন না, ইষ্ট নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্খা করেন না, যিনি শুভাশুভ অর্থাৎ পাপ পুণ্য পরিত্যাগী ও মদ্‌ভক্তিমান, তিনি আমার প্রিয়।

শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, শীতোষ্ণ সুখ

দুঃখ বিকারশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনী, যাহা কিছুতেই সন্তুষ্ট, বাসস্থানহীন, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তি আমার প্রিয়।

প্রকৃত জ্ঞানী কে ?

আত্মশ্লাঘা রাহিত্য, দম্ভ হীনতা, পরপীড়া ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অন্তর্বহিঃ শুচিতা, প্রাণের স্থিরতা এবং জন্ম মৃত্যু, জরা ব্যাধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ স্পষ্ট উপলব্ধি, পুত্র দারা গৃহাদিতে অনাসক্তি, আর তাহাদের সুখ অথবা দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ জ্ঞান না করা এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েরই প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা চিত্তের একরূপত্ব। আমাকে অনন্য যোগ অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি দ্বারা একান্ত ভক্তি, নির্জনে অবস্থিতি এবং মনুষ্য সমাজে বিরাগ আর আত্মজ্ঞান পরায়ণতা এবং তত্ত্ব জ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন এই অমানিত্ব প্রভৃতি বিংশতি সংখ্যককে জ্ঞান বলে। আর যাহা ইহা হইতে অন্য প্রকার অর্থাৎ ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান।

নাম সংকীর্তন

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎসাত্ত্বিকমুচ্যতে।।

অর্থাৎ নিষ্কাম ব্যক্তি কর্তৃক নিত্যরূপে বিহিত, আসক্তিশূন্য, প্রীতিপ্রযুক্ত বা দ্বেষ বশতঃ কৃত নয় এমন যে কর্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।

ভগবানের উপরোক্ত উপদেশ হইতে ইহাই বেশ প্রতীয়মান হয়

যে, বর্তমানে আমরা যে সকল নাম-সংকীর্তনাদি করিয়া থাকি, উহা সাত্ত্বিক কর্ম বলিয়া আমার মনে হয় না। আমি নামের অছিলায় সুরে-তালে, রাগ-রাগিনীতে আসক্ত হইয়া পড়ি। সুর-তাল, রাগ-রাগিনী যদি না থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় আমি নাম-সংকীর্তনাদি করিতাম না। উপরে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, আমরা নাম-সংকীর্তনাদি বর্তমানে যেভাবে করিয়া থাকি তাহা কখনও সাত্ত্বিক হইতে পারে না। সভা সমিতি করিয়া আজকাল যে সকল হরিনামাদি সংকীর্তন হইয়া থাকে সে সকল সঙ্গবর্জিত নহে, ফলাকাঙ্খা রহিত নহে, বরং প্রীতি বা দ্বেষবশতঃ হইয়া থাকে। কারণ অনেক স্থলেই প্রায় এইরূপ দেখা যায় যে, অমুক সভায় যখন পাঁচদিন অধিবেশন ও বক্তৃতা এবং দলে দলে নাম-সংকীর্তন বাহির হইয়াছিল, তখন আমাদের এবার দশদিন হওয়া চাই, তাহাদের অপেক্ষা আমাদের দল ভাল হয়, আর নাম-সংকীর্তন পাড়ায় পাড়ায় করা চাই। নিশানের উপর লিখিয়া দিতে হইবে অমুক পাড়ার নাম-সংকীর্তনের দল। আর যিনি যিনি গগনভেদী বক্তৃতা করিতে পারেন অমন বাছাই বাছাই লোক আনিতে হইবে। তাহাতে যত টাকাই খরচ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই এবং সংকীর্তনের এমন বন্দোবস্ত করা উচিত যাহাতে মৃদঙ্গ, করতাল ও রামশিঙ্গার ধ্বনিতে নগর কম্পিত হইয়া উঠে। মোট কথা আমাদের সংকীর্তন তাহাদের অপেক্ষা যেন আড়ম্বরে কোন অংশে কম না হয়। হায়! হায়! ইহাই কি সাত্ত্বিক কর্ম?

গীতার যে শ্লোকটি উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে, ইহাকে তো কোনক্রমেই সাত্ত্বিক কর্ম বলা যাইতে পারে না। এইরূপভাবে যে সকল হরিনামাদি কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা তামসিক বা রাজসিক কর্মের মধ্যে পরিগণিত। গীতাতেও ভগবান এইরূপে অনুষ্ঠিত কর্মসকলকে রাজসিক বা তামসিক কর্ম বলিয়াছেন।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম।।
(গীতা ১৮শ অধ্যায় ২৪শ শ্লোক)

অর্থাৎ ফলাকাঙ্খী বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অতিশয় আয়াসযুক্ত যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস বলিয়া কথিত।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে।।
(গীতা ১৮শ অধ্যায় ২৫শ শ্লোক)

অর্থাৎ পরিণামে কর্মবন্ধন, নাশ, পরহিংসা ও স্বকীয় সামর্থ্য এই সকল পর্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়।

বাস্তবিক আমাদের দেশে যেরূপভাবে নাম-সংকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা রাজসিক বা তামসিক কর্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজকাল সবই ইহার বিপরীত। মৃদঙ্গ (খোল) বাজাইয়া নিশান উড়াইয়া দলে দলে সংকীর্তনের বা হরিনামের ছড়াছড়ি। হায়! হায়! ইহাই কি সংকীর্তন! ইহাই যদি সংকীর্তন হয় তবে সংকীর্তনের পরে গলা বসিয়া যায় কেন? গা গতরের বেদনাই বা থাকে কেন? এইরূপ হরিনাম করাটা সাত্ত্বিক কর্ম হইলে, সেই সাত্ত্বিক কর্মের পরিণামে ক্লেশ বা অশান্তি হওয়া তো উচিত নহে। সাত্ত্বিক কর্মের পরিণামে সুখ শান্তিই হওয়া উচিত। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ বশতঃ যে কর্মের প্রথমে সুখ ও পরিণামে ক্লেশ অনুভূত হয়, তাহাই রাজসিক বলিয়া গণ্য; এইরূপ হরি-সংকীর্তনে তাহাই হইয়া থাকে অর্থাৎ এইরূপ হরি-সংকীর্তনে যদি কোন সুখ হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলা যায় না, উহা রাজসিক বা তামসিক সুখের মধ্যেই পরিগণিত। গীতাতে ভগবান এইরূপ সুখকেই রাজসিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা -

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।
যদগ্রে চানুবন্ধেচ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃাতম্।।
(গীতা ১৮শ অঃ ৩৮শ শ্লোক)

এইজন্যই শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা আর নাই। সাধন ব্যতীত নিরপরাধ হইতে পারা যায় না। আমি নিরপরাধ হইয়াছি এই কথা মুখে বলিলেই কি হইল? বাস্তবিক আমি যতদিন ইন্দ্রিয়ের দাস, ততদিন আমার নিরপরাধ হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যদি বলি আমি নামের দ্বারাই নিরপরাধ হইতে পারিব অর্থাৎ নাম করিতে করিতেই আমার নিরপরাধের অবস্থা হইবে, তাহা হইলেও আমার নিতান্ত ভুল। কেননা নাম করিবে কে? মনে প্রাণে নাম করিতে না পারিলে আমার নাম করা না করা এ দুইই তুল্য। পরন্তু ইন্দ্রিয় সংযম ও মনস্থৈর্যের অভাবে আমার নাম করা তামসিক কর্মে পরিণত হইবে। যাহাতে উহা তামসিক কর্মে পরিণত না হয় সেইজন্যই নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার ব্যবস্থা আছে। যদি কেবল নামের দ্বারাই নিরপরাধ হইতে পারা যাইত তাহা হইলে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার বিধি থাকিত না। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

অর্থাৎ -

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান।।
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে।।

কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে. তবু জল না মাগয়।।
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না বলিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে।।
সদা নাম লবে যথালাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করি ভক্তি ধর্ম পেশ।।
ঊর্ধ্ববাহু করি কহো শুন সর্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক।।
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।।

কিন্তু আজকাল সবই ইহার বিপরীত। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বৈষ্ণব এখন কোথায়? এখন প্রায় সকলেই আমার ন্যায় ব্যাভিচারগ্রস্ত। যাহাতে ব্যাভিচারের নাশ হয় তাহার প্রতিও কাহারও লক্ষ্য নাই। এখন কেবল যশ প্রত্যাশায়, ফল প্রত্যাশায়, ভোজন প্রত্যাশায় বা অর্থ প্রত্যাশায় দম্ভের সহিত রাস্তায় রাস্তায় সভাতে সভাতে নাম-সংকীর্তনের ছড়াছড়ি! এইসকল কারণে শ্রীজীব গোস্বামী সাধনাঙ্গ সকল লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপে পাঠাইয়া ছিলেন। তাহাতে প্রাণায়ামের ক্রিয়া সকল নিহিত আছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইতিপূর্বেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উপস্থিত কালের বৈষ্ণব মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ গ্রন্থ তাঁহাদের জন্য নহে, উহা প্রভুদিগের জন্যই হইয়াছে এবং একমাত্র নামেতেই তাঁহাদের মোক্ষ হইবে। কেননা -

হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামেব কেবলম।
কলৌনাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা।।

তাঁহারা বলিয়া থাকেন কলিতে কেবল হরির নামই সার। তদ্ব্যতীত কলিতে জীবের আর অন্য গতি নাই। বাস্তবিক ইহা শাস্ত্রীয় কথা বটে, তবে শাস্ত্র কি ভুল? সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে শাস্ত্র ভুল বোধ হয় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনই হইতে পারে না, আমাদেরই বুঝিবার ভুল। একটু ধীরভাবে বিবেচনা করা যাউক। ইহার অন্য অর্থ হয় কিনা।

হরের্ণাম হরের্ণাম কেবলমেব হরের্ণাম ইত্যাদি অর্থাৎ কেবলই হইতেছে হরির নাম। এখানে কেবল শব্দের অর্থ একমাত্র নহে, কেবল একটি কর্ম বিশেষ। এই কেবলরূপ কর্মের দ্বারা কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কর্মই একমাত্র ব্রহ্মপ্রকাশের হেতুভূত।

কেবলেনাদ্যযোগেন সাধকো ভৈরবো ভবেৎ
ইতি কৈবল্যতন্ত্র।

অর্থাৎ কেবলরূপ আত্মযোগের দ্বারা সাধক ভৈরব হন। এই কেবল কর্মের যে অবস্থা তাহার নামই হরি কারণ এই কেবল কর্মই জীবের জীবভাব হরণ করিয়া কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্তি করাইয়া দেয়। ইহা একমাত্র প্রাণায়াম পরায়ণ যোগীরাই লাভ করিতে পারেন। পূরক-রেচক স্বতঃ বর্জিত অবস্থাই কেবলরূপ কর্মের অবস্থা।

ভগবান গীতাতেও বলিয়াছেন সহজ কর্ম অর্থাৎ প্রাণায়ামাদি যৌগিক কর্ম যদি দোষযুক্তও হয় তথাপি উহা ত্যাগ করিবে না। বৈষ্ণবগ্রন্থেও আছে - "সহজ সাধন সহজ ভজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়। ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ অক্যতা করিয়া মনে।" সহজ কর্ম এবং কেবলকর্ম উহা একই অবস্থা বিশেষ। সহজ কর্ম অর্থাৎ সহজরূপ প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া দ্বারা কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। ইহা দেখেই বা কে আর দেখায়ই বা কে? ইহাই মুক্তির অবস্থা, ইহাই প্রকৃত সংকীর্তন। মহাত্মা কবীর সাহেব বলিয়াছেন -

কবীর সহজ হি ধুনী লাগি রহে সে তো
এতো ঘট মেহী।
হৃদ্দে হরি হরি হোৎ হ্যায় মুককি
হাজত নেহি।।

ফলকথা, সহজ যে প্রাণকর্ম অর্থাৎ প্রাণায়াম তাহাতেই অষ্টপ্রহর লাগিয়া থাক। তখনই তোমার অন্তরে হরি হরি ধ্বনি হইবে এবং তুমি তাহা শুনিতে পাইবে। ইহা মুখে চেঁচাইয়া বলার দরকার নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুলভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমি মাত্র সারসংক্ষেপটুকুই গ্রহণ করিলাম।

আমরা সাধারণ কলিদুষ্ট জীব, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ইত্যাদি লইয়াই সদা সর্বদা ব্যস্ত। উপরোক্ত কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত আমাদের মুক্তির আর উপায় নাই। তাই হরিনাম স্মরণই কলিদুষ্ট জীবের একমাত্র উপায়।

এ সম্বন্ধে উপরে কিছু আলোচনা করিয়াছি। ইহার অর্থ এই নয় যে গলা ছাড়িয়া চেঁচাইয়া হরিনাম করিয়া বেড়ান। এইরকম হরি হরি করিয়া আমার তো সারাজীবন কাটাইলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় হরি সম্বন্ধে আমার কি জ্ঞানলাভ হল, আমরা পেলাম কি, কোন শান্তিসুখ পেলাম, এইকথাও বলিতে পারি না। পিপাসা লাগিলে জল খাওয়াই প্রয়োজন জল জল করিয়া চীৎকার করিলে পিপাসা মেটে না, মধু মধু করিয়া লক্ষ লক্ষ বার জপ করিলেই মুখ মিষ্ট হয় না, মধু খাইতে হয়। পরমহংসদেবও উপদেশের ছলে একস্থানে বলিয়াছেন - "ওরে মুখে সিদ্ধি সিদ্ধি করলেই কি নেশা হয়, সিদ্ধি বেঁটে গুলে খেলে তবে নেশা হয়।" আর একটি মূল্যবান উপদেশ -

তত্ত্ব না জানিয়া করে শ্রবণ কীর্তন।
বহু জন্ম করিলে না পায় প্রেমধন।।
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্তন।
তথাপি না পায় পদে কৃষ্ণ প্রেমধন।।

আমি পূর্বে যে সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা আমার নিজের মুখের কথা নহে বা উহাতে আমার কোন কৃতিত্ব বা পান্ডিত্য নাই। সমস্তই মহাত্মাদের বাণী, কবীর সাহেবের উপদেশ, গীতার উপদেশ মাত্র এবং চৈতন্যচরিতামৃত ও বিবর্ত বিলাস গ্রন্থের বাণী।

চতুর্ভূজ মূর্ত্তি

এইবার নারায়ণের শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী সৌম্য মূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। ইহাই চতুর্ব্যূহ সমন্বিত বিষ্ণু মূর্ত্তি, সমস্ত জগতের অন্তরে যিনি প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব না হইলে কেহই এই বাসুদেবের সন্ধান পাইতে পারেন না। ইহাই সেই জ্যোতির অভ্যন্তরের রূপ। ইহার চতুর্দিকে কিরীটের মত ছটা। কিন্তু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মবিশিষ্ট যে ভাব তাহা লইয়া মগ্ন থাকেন সাধকেন্দ্রগণ। যাঁহারা গৃহকর্মে ব্যস্ত অথচ সাধনাও করেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, "দিব্যং রূপ মিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর।" এই যে জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ, ইহাও উপসংহার কর, নচেৎ কংস থাকে কই, কামনা থাকে কই? কামনা না থাকিলে সংসার প্রবাহ চলিবে কিরূপে? তাই কংস ভয়ে এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকে সংবরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। বাসুদেব ভাব বা অবস্থা প্রাপ্ত যোগীর সব কামনাই সিদ্ধ হয়, পাছে কামনার বশে পড়িয়া যায়, তাই কংস (কামনা)- ভয়ে সাধক এই রূপ সংবরণ করিবার অনুরোধ করিতেছেন। দ্বিভুজ মূর্ত্তি, শান্ত মূর্ত্তি, তাহাতে যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশ থাকে না বটে কিন্তু সেই বংশীর যে শ্রুতিমধুর নিনাদ, তাহাতে ব্রজবালারা অর্থাৎ মনের সংসার মুখী চঞ্চল বৃত্তি সমূহ বন্ধ হইয়া যায়। তাহারা সব ভুলিয়া আত্মাভিমুখী হইতে থাকে। এই দ্বিভূজ ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে পারেন, তখন মুরলীধর মূর্ত্তিই শেষে কিন্তু কংস বা বাসনা সমূহের উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। সেই সুমধুর নিনাদ শুনিলেই বাসনার বেগবতী উচ্ছ্বাস অর্থাৎ কংস ধ্বংস হয়। তৎপরে সেই চতুর্ব্যূহ সমন্বিত ভাব আরও উচ্চকোটীর সাধকদের জন্য। সাধন প্রভাবে সত্ত্ব

বিশুদ্ধ হইয়া গেলে যখন মনে কোনও কামনার মল থাকে না তখন তিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্মবিশিষ্ট। বিশ্বরূপ বা কালচক্র আর তাঁহাকে মুগ্ধ বা ভয় বিহ্বল করিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মহাত্মা কবীর সাহেব কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা দেখা যাউক -

''কবীর পরব্রহ্মকে তেজকা ক্যায়সা হ্যায় অনুমান।
ক্যওয়াকি শোভা কহোঁ দেখন কি পরমাণ।।''

কবীর বলিতেছেন - পরব্রহ্মের তেজের অনুমান কি করিয়া হইবে? উহার যে কি শোভা তাহা আর কি করিয়া বলিব, প্রত্যক্ষ করিলে তবে বোঝা যায়। যে দেখিয়াছে সেই তাহার প্রমাণ জানে অর্থাৎ হিরণ্ময় সিংহাসনে কূটস্থ ও সম্মুখে সমস্ত সিদ্ধগণ বসিয়া আছেন। এইরূপ প্রকাশের প্রমাণ দিবার উপায় নাই কারণ তাহা নিজবোধরূপ, যে দেখে সেই জানে।

''কবীর অগম অগোচর গমি নহি তাঁহা ঝলকে জ্যোতি।
তাঁহা কবীরা বন্দোগী পাপপুণ্য নহি দ্ব্যোতি।।''

কবীর, সে স্থান অগম্য, কোনও ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, বুদ্ধি সেখানে যাইতে পারে না, কোনও চিন্তা নাই অর্থাৎ মন নাই, এমতস্থান হইতে জ্যোতির ঝলক বাহির হইল। সেইখানে কবীর গিয়া দন্ডবৎ প্রণাম করিলেন, যেখানে পাপপুণ্য দুইই নাই।

''কবীর যাঁহা পবন নহি সঞ্চারে তাঁহা রচি একগেহ
অচরঘ এক যো দেখিয়া সিদ্ধঁ কলিজা দেহ।।''

এই অবস্থা পাইবার জন্য কি উপায় করিতে হইবে, তাহার উপায় কবীর বলিতেছেন। যেখানে পবনের সঞ্চার নাই সেখানে এক গৃহ প্রস্তুত করিলাম আর আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে দেখিলাম যে হৃদয়

ও দেহেতে সিদ্ধ হইয়াছে। অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস রহিত হইয়াছে, তখন সূক্ষ্মরূপে সুষুম্নার ভিতরে তত্ত্বে চলিতেছে। গৃহে যেমন বাস করা যায়, সুষুম্নায় বাস করায় সুষুম্না তখন গৃহ হইল। ঐ অবস্থায় আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে হৃদয়ে ধপ ধপানি আর নাই, প্রাণ ভিতরে আসিয়া ভিতরেই যাইতেছে।

"কবীর উন্মন্ লাগি শূন্যমে নিশুদিন রহেগুলতান্।
তন্মন্ কি কচ্ছু সুধীনহিঁ, পায়া পদ নির্বাণ।।"

কবীর উন্মনীতে আটকিয়া যাওয়ায় শূন্য দেখিতে লাগিলাম। আর দিবারাত্র গলায় টান রহিয়াছে, শরীর ও মনের জ্ঞান নাই, তখন নির্ব্বাণ পদ পাইলাম, অর্থাৎ ঊর্দ্ধে মন আটকিয়া যাওয়ায় কূটস্থ ব্রহ্মে (শূন্যময়) থাকিল। আর দিবারাত্র গলায় টান (জালন্ধর মুদ্রা) রহিল। তখন নেশায় বুঁদ হওয়ায় কোনও বিষয়ে আসক্তি থাকিল না, তখন নির্ব্বাণ পদ পাইলাম। সর্বদা যাহার জালন্ধর মুদ্রা তাহার নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। নির্ব্বাণ-বাণ, যাহা দ্বারা জীব মাত্রই বিদ্ধ হইতেছে সেই বাণ আর থাকে না।

তৃতীয়রূপ দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যাম সুন্দর রূপ। এ রূপের মধ্যে কোনও আড়ম্বর নাই, শুধু পীতাম্বরে আবৃত নীল নভোনিভ শ্যাম জ্যোতিঃ আর তাঁহার মুরলীধ্বনি "রগ রগ বোলে রামজি / রোম রোমর রঙ্কার।" অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রণবের মধুর নিক্কণ হৃদয় মন মাতাইয়া দেয়। সেই ধ্বনি শুনিতে শুনিতে চিত্ত লয় হইয়া যায়। সাধুদের ধুনীতে যেমন সর্ব্বদা অগ্নি জ্বলে, সেইরূপ দেহঘটে শ্বাস প্রশ্বাসের যে সহজ ধুনী প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, তাহাতে মন লাগাইয়া রাখ। তখন শুনিবে, "হিরদে হরি হরি হোৎ হায়, / মুখ কি হাজত নাহি" - আপনা আপনি হৃদয়ে শ্যাম সুন্দরের বাঁশী বাজিয়া উঠিতেছে নাম আপনা আপনি ধ্বনিত হইতেছে আর মুখে নাম লইবার আবশ্যক নাই। এই অবস্থায় চিত্ত অব্যাকুল হয় ও প্রসন্ন হয়।

অজ্ঞানের নাশ ভাবের দ্বিতীয় ভাব পুনর্যোগস্বরূপ দর্শন হইল। ইহা দুর্নিরীক্ষ্য নহে, জীব মাত্রেরই অভীষ্ট, সাধকের ইষ্ট মূর্ত্তি।

কূটস্থ বর্ণনা

প্রকৃতি পটরূপ কূটে ইনি বহুরূপে প্রতিবিম্বিত হন, বহুরূপ ধারণ করেন। প্রকৃতি বক্ষবিহারী ভগবান চৈতন্যস্বরূপের অবস্থিতির জন্য ও সান্নিধ্যবশতঃ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চৈতন্যযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। কর্মকারের নেহাইকেও কূট বলা হয়। এই নেহাইয়ের উপর তপ্ত লোহিত লৌহকে পিটাইয়া লৌহের অসংখ্য রূপ সৃষ্টি করা হয় কিন্তু নেহাইয়ের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সেইরূপ অনন্তজীবের অনন্ত রূপ যাহা এই দৃশ্যমান জগতে সদা সর্বদাই ভাসমান অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে, তাহা এই কূটস্থ চৈতন্য হইতেই উদ্ভূত। এই কূটস্থ চৈতন্য বা ভগবান আত্মনারায়ণ সর্বদা ও সর্বকালের জন্য চরাচর বিশ্বে স্থাবর জঙ্গমাদি সকল বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে সমভাবে বিরাজিত। কোনদিন কোনকালের জন্য এই কূটস্থ চৈতন্যের ক্ষয় বা পরিবর্তন হয় না। ইনিই উপনিষদোক্ত অক্ষর পুরুষ, ইনিই গীতোক্ত সেই অবিনাশী অক্ষর ব্রহ্ম, যাঁহার সাধনার বিষয় গীতার বহুস্থানে বহুভাবে লিখিত হইয়াছে।ইঁহাকেই সেই সর্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ বলা হইয়া থাকে, যাহা "ভাগ্যবানে কেহ কেহ দেখিবারে পায়।" এই অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধে মহীয়সী গার্গীর সহিত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের যে বহু প্রশ্নোত্তর হইযাছিল তাহার মধ্যে গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে উদ্দেশ্য করিয়া উপদেশ দিতেছেন — "ওহে গার্গী, এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া যিনি এই লোকে হোম, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা যাহা কিছু করেন, তাঁহার সাধনা বহু সহস্র ব্যাপী হইলেও সে কর্মের ফল অচিরস্থায়ী অর্থাৎ একদিন না একদিন শেষ হইয়া যায়।"

"এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া যিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, গার্গী, সেই পুরুষই কৃপার পাত্র, এবং যিনি এই অক্ষর পুরুষকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন তিনিই ব্রাহ্মণ।'

এই অক্ষর পুরুষকে কেহ দেখিতে পায় না কিন্তু তিনি সকলকে দেখেন, কেহ শুনিতে পায় না কিন্তু তিনি সকলই শুনেন, কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকল জানেন। ইনি ভিন্ন দ্রষ্টা কেহ নাই, ইনি ভিন্ন শ্রোতা কেহ নাই, ইনি ভিন্ন বিজ্ঞাতা কেহ নাই। ইনিই একধারে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা অর্থাৎ তিনে এক একে তিন। গার্গী, এই অক্ষর পুরুষেই সকল ওতপ্রোতভাবে আছে।''

ষষ্ঠচক্র অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করিয়া পরম জ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্বদা এই পরম পদের ধ্যান করিয়া থাকেন। অশেষ সুকৃতিশালী যোগাভ্যাসী সাধক সাধিকাগণও ক্রিয়াযোগের অন্তঃকালীন যোনীমুদ্রার সাহায্যে বিষ্ণুর এই পরম পদকে প্রত্যহ সাময়িক ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন (যোনীমুদ্রা গুরূপদেশগম্য)। গুরূপদেশগম্য হইলেও ইহার সম্বন্ধে ভাষায় যতটুকু ব্যক্ত করা চলে এবং আত্মকর্মপরায়ণ সাধক এই ক্রিয়াকালীন শ্রীভগবানের সেই অব্যক্ত ভাবের ব্যক্ত ভাবকে (যাহা কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয়) দর্শন করিতে করিতে যে মানসিক ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

আত্মকর্মপরায়ণ সাধক গুরূপদিষ্ট যোনীমুদ্রার সাহায্যে সঙ্গোপনে (সঙ্গোপন অতি গোপনীয় স্থান যেখানে দ্রষ্টা ও দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নাই) প্রত্যহ এই মনোমুগ্ধকর, এই অরূপের রূপ দর্শন করতঃ তন্ময় হইয়া তাঁহাতেই মনের লয় সাধন করিতে চেষ্টা করেন। এই অনুপম রূপের মাধুরী সাধক-সাধিকার মন স্বভাবতঃ এমনভাবে হরণ করিয়া লয় যে তাঁহার তখন আর কোন পৃথক সত্তা থাকে না, নিজেকে হারাইয়া ফেলেন। এই মনোহররূপ দেখিতে দেখিতে উহাতে বিমোহিত হইয়া সাধক তখন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত মনে এই বলিয়া নিবেদন করেন — ''হায়, হায়! আহা মরি বলিহারী যাই।'' আহা কি অপূর্ব্ব দ্যুতিসম্পন্ন তোমার এই অনুপম মূর্ত্তি। মনে হয় যেন একসাথে সহস্র দিবাকর উদিত হইয়াও তোমার ঐ রূপের ছটার কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছে। আমি কি তোমার ঐ রূপের সীমা নির্দ্ধারণ

করিতে পারি ঠাকুর! আমি যত কিছু বলিনা কেন, যেমন করিয়াই তোমার ঐ রূপের ব্যাখ্যা করিনা কেন, তোমার অনন্ত রূপের এক কণাও তো ব্যক্ত করিতে প্যারিব না প্রভু! তোমার ভুবন ভুলানো রূপের মাধুরিমা ব্যক্ত করিবার মত ভাষা আমার কোথায়? সীমাহীন, তোমার রূপের সীমা নির্দ্ধারিণ করিতে যাইয়া ভাষা যে আমার হারাইয়া যায়, মন যে আমার খঞ্জ হইয়া পড়ে! আমি তখন নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলি, আর খুঁজিয়া পাইনা। "হে চিরসুন্দর হে চিরমধুর, হে চির নূতন," এমন কি আমার ভাষা আছে যে তোমার রূপের বর্ণনা করিব! জানি, আমার কোন ভাষা নাই, কোন জ্ঞান নাই, কোন শক্তি নাই; তথাপি হে মোর প্রাণাধিক, তোমার ঐ রূপের সামান্য পরিচয় দিবার লোভ সংবরণে আমি অপারগ। তাই তোমার শক্তিতেই শক্তিমান হইয়া বলি — ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর, হে মোর প্রভু, আমার প্রাণবল্লভ, ইতিপূর্বে একই অঙ্গে এত রূপের ছটা তো একসঙ্গে দেখি নাই। নীলকান্ত মণিসদৃশ অপরূপ দ্যুতিসম্পন্ন এই যে বিরাট অক্ষিগোলক, ইহাই তো "শ্যামাপদ নীলকমল" যাহার অমিয় সুধারূপ মধু পান করিতে করিতে আমার মন ভ্রমরা গুঞ্জন রব ভুলিয়া গিয়া একেবারেই মজিয়া গিয়াছে। পুনরায় যে দেখিতেছি সীমাহীন অনন্তের মাঝে হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা লাগিয়া গিয়াছে, কত "ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটায় দিকদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কই ইহার তো কোন শেষ দেখি না, সীমা দেখি না! ওহো! সত্যই তুমি কি অসীম, কত অনন্ত আর তোমার তুলনায় আমি কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য। আহা! যদি এই অসীমত্বের মাঝে নিজের সসীমত্বকে বিলাইয়া, এই অনন্তের মাঝে নিজের অন্তকে মিলাইয়া নিজেকে নিঃশেষে হারাইয়া ও নিঃস্ব হইতে ও নিজের পৃথক সত্তা ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি কতই না ধন্য হইতাম। কিন্তু হায়! কেমন করিয়া তাহা পারিব? হে প্রাণেশ্বর, জগৎস্বামী, জগন্নাথ, হে বিশ্বনিয়ন্তা, সত্যই তুমি কত বিরাট, কত সুন্দর, কত মহান, আর আমি কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য। হে বিরাট পুরুষ, তোমার রাতুল চরণে উপস্থিত হইবার যোগ্যতা কোথায়? হে অতুলনীয়, হে নির্ব্বিকার, তোমাকে কোন্ নামে ডাকিব, কি বলিয়া সম্বোধন করিব — পিতা না মাতা,

ভাই না বন্ধু, স্বামী না স্ত্রী? ওগো প্রাণের ঠাকুর, বলি তুমি আমার কে? বুঝিলাম, তুমিই আমার সব। যে নামেই তোমায় ডাকি না কেন প্রভু, হে আমার সর্বেশ্বর, হে মনোহর, হে সুন্দর, হে নয়নাভিরাম, হে দেবাদিদেব পুরুষপুরাণ, বুঝিয়াছি তুমি আছ তাই আমি আছি। তুমি না থাকিলে আমি নাই। অতএব, তুমি অহৈতুকী কৃপা করিয়া এই দীনকে, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকে তোমার ঐ অভয় পাদপঙ্কজে স্থান দাও প্রভু! তুমিই তো সেই "অতি বড় বৃদ্ধ পতি," বৃদ্ধহতে অতি বৃদ্ধ কিন্তু তোমার চির নবীনত্ব, চির নূতনত্ব তোমাকে চির কিশোর, চির সুন্দর করিয়াছে। হে বিশ্বপতি, বিশ্বেশ্বর, আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি গ্রহণ করিয়া আমার জীবন কৃত কৃতার্থ কর। সাধক যখন ভগবানের সেই অনুপম রূপমাধুরী পান করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যান তখন তাঁহার দেহজ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। পরে সেই ভাব কিছুটা কাটিলে মন যখন মনে ফিরিয়া আসে তখন সেই অনন্তের সেই বিরাটের তুলনায় তিনি যে সত্য কত ক্ষুদ্র কত নগণ্য ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া সাধক তখন সেই বিশ্বস্রষ্টার রাতুল চরণে স্থির বায়ুর (ওঁ-কার) ক্রিয়ার দ্বারা প্রণতি জানায়। তাই হয়ত কবি সেই ত্রিদিবেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি জানাইবার ছলে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন —

"বৃদ্ধ হতে অতি বৃদ্ধ হে চিরকিশোর,
আজি সঙ্গোপনে পাইয়াছি লহ নতি মোর।"

নারায়ণের উপবীত রহস্য

শাস্ত্রে নারায়ণের ধ্যান সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা এইরূপ —

ওঁ. ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণঃ ইত্যাদি

অর্থাৎ সূর্য মন্ডলের মধ্যবর্তী অবস্থায় যে নারায়ণ তাঁহারই সদা সর্বদা ধ্যান কর। এই সূর্যমন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণই আমার পরমাত্মা, ভগবান, আত্মনারায়ণ কূটস্থ চৈতন্য। ইঁহারই ধ্যান সদা সর্বদা করিবার জন্য মহাত্মারা আমাদের উপদেশ দিয়াছেন। বাহিরে আমরা যে শালগ্রামশিলা বা নারায়ণের প্রতিমূর্তি সচরাচর দেখিয়া থাকি তাহার বাহ্যিক গঠন কতকটা ডিম্বাকৃতি। তাহার মধ্যভাগে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র বা গহ্বর আছে। এই শালগ্রামশিলার চতুর্দিকে একটি রূপার অথবা সোনার বলয়াকৃতি বস্তু (সাধারণতঃ যাহাকে আমরা প্রত্যেকেই নারায়ণের পৈতা বলিয়া থাকি) বেষ্টিত রহিয়াছে দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ প্রাণায়ামরূপ আত্মকর্মের পরাবস্থায় দ্বিদল পদ্মরূপ আজ্ঞাচক্রে ধ্যাননেত্ররূপ দিব্যচক্ষে ভগবান কূটস্থ চৈতন্যের বা আত্মনারায়ণের এই প্রকৃত রূপ দর্শন করিয়াছেন এবং সেই প্রকৃত রূপের প্রতিমূর্তি গঠন করাইয়া তাঁহারই পূজা-অর্চনাদির অনুষ্ঠান দ্বারা আমাদের ন্যায় অল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানবগণের যাহাতে ধর্ম মার্গে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ হয় তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বাহ্যিক ভাবে এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন আমাদের সুকৃতির উদয় হয় তখনই প্রকৃত সদগুরুর সন্ধান পাইয়া তাঁহার অসীম কৃপায় আত্মকার্যরূপ এই ক্রিয়া লাভ করতঃ দেহমধ্যস্থিত গোলকধামে নারায়ণের প্রকৃত রূপ দর্শন করিয়া আমরা মানবজীবন সফল ও সার্থক করিতে পারি। এই গোলকধামে নারায়ণের যে অরূপের রূপ সাধক কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার সহিত বাহ্যিক শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণের প্রতিকৃতির বা প্রতিমূর্তির সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। অপূর্ব পীত অথবা শ্বেত বর্ণের জ্যোতির মধ্যে গাঢ় নীলবর্ণের বিরাট ডিম্বাকৃতি গোলক। এই গোলকের ঠিক মধ্যভাগে কেশাগ্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্বিন্দু, ইহার মধ্যে আবার কৃষ্ণবর্ণের গোলক। এই আভ্যন্তরীণ রূপের সহিত বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী পাঠক পাঠিকাগণ বাহিরের শালগ্রামশিলা মূর্তির তুলনা করিয়া লইবেন।

নারায়ণের সৌসাদৃশ্য বা আত্মনারায়ণ বোধে আসল রূপের এই

প্রতিমূর্তিকে বাহ্যিকভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত নিত্য ধ্যান, পাঠ, পূজা ইত্যাদি করিলে আমাদের মত সকামী সাধকদের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে এবং মনও ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া স্থির হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান করিতে করিতে একদিন না একদিন অন্তর্জগতের প্রতি আমাদের লক্ষ্য আসিবেই এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় ধর্মের প্রকৃত রহস্য আমরা যে একদিন নিশ্চয় জানিতে পারিব সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাতে সকলেই ধীরে ধীরে প্রকৃত পূজার রহস্য অবগত হইতে পারেন তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃপালু ঋষিগণ নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে বর্তমানে যেভাবে দেবদেবীর পূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা সমস্তই রাজসিক ও তামসিক পূজার মধ্যে গণ্য হইয়া পূজা করা আর না করা দুই-ই সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কালবশে আমাদের মন এতই মলিন হইয়া পড়িয়াছে যে অন্ততঃ সামান্য সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া একটু ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত পূজাদির অনুষ্ঠান করিতে যে কষ্ট স্বীকার করা প্রয়োজন তাহা আমরা কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কেবল কোনরকমে পুঁথি দেখিয়া মন্ত্রগুলি আওড়াইয়া সম্মুখস্থ দেব বা দেবীর মূর্তির উপর কতকগুলি ফুল ফেলিয়া দিতে পারিলেই আমরা যেন দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। এই কি পূজা, ইহাই কি আরাধনা? যাহা হউক, সম্ভব হইলে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে।

আমি নারায়ণ সম্বন্ধে পূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে তাহারই বিশদ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। শাস্ত্র বলিয়াছেন সূর্যমন্ডল মধ্যবর্তী যে নারায়ণ তাঁহারই সদা সর্বদা ধ্যান কর। ইহা শাস্ত্রবাক্য, সুতরাং কখনই মিথ্যা হইতে পারে না বা এই বাক্যের উপর আমাদের কাহারও সন্দেহ আরোপ করা উচিত নহে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে যে আমরা বহির্জগতে নারায়ণের প্রতিমূর্তিরূপ যে শালগ্রামশিলা সচরাচর দেখিয়া থাকি তাহার চারিধারে উপবীত বা পৈতা বলিয়া কথিত স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত বলয় দেখিতে পাইয়াছি।

এইরূপ উপবীত দেখিয়া আমার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের মনে স্বভাবতঃ সন্দেহ উপস্থিত হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। শাস্ত্রে নারায়ণের ধ্যান সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহাতে সূর্যমন্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণের ধ্যান করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক শালগ্রামশিলার চারিধারে বেষ্টিত স্বর্ণ বা রৌপ্যের উপবীত দেখিয়া আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে যে আমার আত্ম নারায়ণ ও বাহ্যিক শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণের মধ্যে তবে কি কোন প্রভেদ বা পার্থক্য রহিয়াছে অর্থাৎ শালগ্রামশিলা এক বস্তু ও আমার আত্মনারায়ণ আর এক বস্তু? আর যদি কোন পার্থক্য নাই-ই থাকে তবে বাহিরের শালগ্রামশিলায় শাস্ত্র কথিত সূর্যমন্ডলের অভাব দেখি কেন? বস্তুতঃ আমার মনে এইরূপ সন্দেহের উদয় হওয়া আদৌ বিচিত্র নহে। এক্ষণে দেখা যাউক বাহিরের এই শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণ যাহা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি এবং ভিতরের এই আত্মনারায়ণ বা ভগবান কূটস্থ চৈতন্য যাহা আত্মকর্ম পরায়ণ সাধক ক্রিয়াকালীন দর্শন করিয়া থাকেন, তাহা একই পদার্থ না ভিন্ন ভিন্ন বস্তু? যিনি নারায়ণ, তাঁহার আর এক নাম বাসুদেব; তিনি প্রতি ঘটে পটে, জলে-স্থলে, গগনে-পবনে, অন্তরীক্ষে, প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে, স্থাবর-জঙ্গম ও বিশাল ব্রহ্মান্ডের সকল বস্তুর মধ্যেই সর্বদা সর্বকালের জন্য প্রকাশিত। তাঁহার নিত্য প্রকাশিত শক্তিচ্ছটাই এই বিশাল ব্রহ্মান্ডকে সদা উদ্ভাসিত রাখিয়াছে। আমরা এই দৃশ্যমান জগতে এই যে কত অসংখ্য নিত্য নূতন দৃশ্য বা নামরূপময় পদার্থ, দেখিয়া থাকি তাহাদের প্রকাশ তাঁহারই অপরিসীম শক্তিচ্ছটায় সম্ভব হয়। এইস্থানে ভগবান নাই, এই কথা মনে করাই নিতান্ত ভুল কারণ তিনি ছাড়া এ জগতে আর কি থাকিতে পারে? সুতরাং আস্তিক মনোভাবাপন্ন কোন ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। অতএব, এই বিশাল ব্রহ্মান্ডে তিনি ছাড়া যখন আর কিছুই নাই তখন তিনি কিরূপভাবে উপবীত ধারণ করিবেন, কারণ এই বিশালত্বকে বেষ্টন করিবার মত উপবীত কোথায়? যদি বা এই বিশালত্বকে বেষ্টন করিবার মত বিশাল উপবীত সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় তবে কোন্

স্থানে কেমন করিয়া উপবীত ধারণ করান যাইতে পারে তাহা বাস্তবিক পক্ষে চিন্তা করিবার বিষয়। সুতরাং আমাদের বেশ সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে যে এই আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে কোন গুপ্ত সত্য লুক্কায়িত আছে কিনা। সচরাচর এই যে শালগ্রামশিলারূপী নারায়ণের চতুর্দিকে বেষ্টিত রৌপ্য বা স্বর্ণের উপবীত দেখা যায় তাহার আভ্যন্তরীণ ভাবের সহিত একটু রহস্য জড়িত আছে। এই রহস্যেরই উদ্ঘাটন করিতে হইবে। রহস্য এই যে -

পুরাকালে অথবা এই দুষ্ট কলিযুগে যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী বা মহাত্মা বলিয়া চির অমরত্ব লাভ করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই এই দেহমধ্যস্থিত ষট্‌চক্রে (ষট্‌চক্র যে কোথায় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে) অন্তর্মুখীন প্রাণায়ামরূপ আত্মকর্মের অন্তাবস্থায় যোনীমুদ্রার সাহায্যে যে অরূপের রূপ কূটস্থ মন্ডল দর্শন করিয়াছেন উহারই চতুর্দিকে শ্বেতবর্ণের জ্যোতির অভ্যন্তরে গাঢ় নীল বর্ণের গোলক (ইনিই আত্মনারায়ণ বা ভগবান কূটস্থ চৈতন্য) দর্শন করিয়া জীবন কৃত-কৃতার্থ করিয়াছেন। ঐ মহাপ্রাণ বা পরমাত্মার বিকশিত রূপই সেই শ্বেত বর্ণের জ্যোতি এবং উক্ত জ্যোতির্ময় সূর্যমন্ডল অর্থাৎ কোটি সূর্যসম প্রভাযুক্ত শুভ্র জ্যোতির মধ্যবর্তী গাঢ় নীল বর্ণের গোলকই 'আমার আমি' বা পরমাত্মা। উক্ত শ্বেত বর্ণের জ্যোতিকে অনুকরণ করিয়া বাহিরে দেখাইবার উদ্দেশ্যে বাহিরের রৌপ্যনির্মিত উপবীত প্রস্তুত করাইয়া নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি শালগ্রামশিলায় বেষ্টন করা হইয়া থাকে এবং ইহা ঐ আসল রূপেরই ইঙ্গিত মাত্র। আবার কখনও কখনও উক্ত শ্বেতবর্ণের জ্যোতির পরিবর্তে পীতবর্ণের জ্যোতির অভ্যন্তরে ঐরূপ গাঢ় নীল বর্ণের গোলক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কাঁচা সোনার রংও কতকটা পীতবর্ণের, ইহাই স্বর্ণ নির্মিত উপবীতের ইঙ্গিত মাত্র। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন -

ভূমি বা ক্ষিতি (মৃত্তিকা),
অপ (জল), অনল (অগ্নি বা তেজ),

মরুৎ (বায়ু), খং (ব্যোম বা আকাশ)
মন, বুদ্ধি ও অহংকার -

ইহাই আমার আটপ্রকার অপরা (নিকৃষ্টা) প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের স্থান যথাক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য চক্রে এবং মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটির মিলিত স্থান আজ্ঞাচক্রে। তৎপরে পুনরায় বলিতেছেন -

আমার উপরোক্ত আটপ্রকার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আরও উৎকৃষ্ট অন্য একটি জীবস্বরূপ (চৈতন্যময়ী) প্রকৃতি আছেন। ইনিই জীব জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। আমার এই প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক অবগত হও। ইনি শ্রীভগবানের পরা বা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি। ইনিই গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণের বক্ষবিহারী শ্রীরাধিকা বা শ্রীরাধা। 'রাধা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ঃ- 'রা' অর্থে ব্রহ্মান্ড, 'ধা' অর্থে ধারণ করা অর্থাৎ এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড যিনি ধারণ করিয়া আছেন তিনিই রাধা। আমরা জানি 'প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ' অর্থাৎ প্রাণ কর্তৃক বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড ধৃত রহিয়াছে। সুতরাং প্রাণই রাধা পদবাচ্য। ইনিই আবার জীবের জীবনীশক্তি বা কুলকুন্ডলিনী শক্তিরূপে মূলাধারে অবস্থান করিতেছেন।

এই কুলকুন্ডলিনীই জগতের মাতৃস্থানীয়া। এই শক্তি জাগ্রত হইলে জীবের সর্ব মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ইনিই মনুষ্যমাত্রেরই একমাত্র আরাধ্যা দেবী।

ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ।

ভীষ্মের মহাপ্রয়াণ করিবার সময় উপস্থিত। অন্তর্য্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা বুঝতে পেরে পঞ্চ পান্ডবদের বললেন - চল সখা,

পিতামহ ভীষ্ম আজ মহাপ্রয়াণ করবেন, আমরা গিয়ে তাঁকে একবার শেষ দর্শন করে আসি। কৃষ্ণের কথায় পঞ্চপাণ্ডব রাজী হলেন। তখনই রথ সজ্জিত হল। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চ পাণ্ডব ও সাত্যকীকে সঙ্গে নিয়ে চললেন ভীষ্মকে দর্শন করতে। ভীষ্ম যেখানে শর শয্যায় শায়িত ছিলেন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁরা সকলে ভীষ্মকে ঘিরে দাঁড়ালেন।সকলে দেখলেন ভীষ্ম কাঁদছেন। অর্জ্জুন এর কারণ নির্দ্ধারিণ করতে না পেরে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন - সখা, কি আশ্চর্য্য দেখ, পিতামহ ভীষ্ম যিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, মহাজ্ঞানী, অষ্টবসুর এক বসু এবং ইচ্ছা মৃত্যু যাঁর, তিনিও কিনা শেষে মৃত্যু ভয়ে কাঁদছেন? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এই কথা শুনে ঈষৎ হাস্য করে বললেন - না সখা না, পিতামহ ভীষ্ম সেজন্য কাঁদছেন না। অর্জ্জুন তখন শ্রীকৃষ্ণকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন; উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন - সখা, তুমি পিতামহকে এর কারণ জিজ্ঞাসা কর। তখন অর্জ্জুন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন - পিতামহ আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের দিকে লক্ষ্য করে বললেন - হে কৃষ্ণ, হে যাদব, তুমি স্বয়ং গোলকপতি নারায়ণ। তোমার স্মরণে লোকে মুক্তি লাভ করে। সেই তুমিই যাদের একমাত্র সুহৃদ, সখা, বন্ধু, আশ্রয়স্থল, ছায়াকায়া, তোমা ছাড়া যারা কিছু জানে না, তোমাকে ছাড়া যারা কিছু বোঝে না, একমাত্র তুমিই যাদের ধ্যান, জ্ঞান, উপাস্য দেবতা, তোমার সেই পরম ভক্ত পাণ্ডবদের কত আপদ বিপদ, কত দুঃখ কষ্ট, কত লাঞ্ছনা অপমান! হে নারায়ণ, হে মধুসূদন, সত্যই অজ্ঞান আমি। তোমাকে চিনতে পারলাম না, তোমার লীলার কিছুই বুঝতে পারলাম না, তাই কাঁদছি।

কিসা গৌতমী

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ তখন বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে ত্রিতাপ তাপিত মরু তৃষিত এই জগৎবাসীর ভব-যন্ত্রণা মোচন মানসে অপরূপ করুণার মূর্তি পরিগ্রহ করে এক জনবিরল স্থানে সমাসীন ছিলেন। অগণিত নরনারী নানা আশা নানা

আকাঙ্খা পূরণ মানসে, বহু নরনারী দূরদিগন্ত হতে তাঁর পাদপদ্মে এসে অবিরত প্রণতি জানায়। ঠিক এমনি এক দিনে কিসা গৌতমী এলো তার একমাত্র মৃত পুত্রকে বাহুযুগলে বহন করে নিয়ে; উষ্ণ বিয়োগ উৎস সরিৎ দর বিগলিত চক্ষে, রুক্ষ আলুলায়িত কেশে, ছিন্ন মলিন বসনে, ধূলি ধূসরিত দেহে; পুত্র বিয়োগ বিধুরা রমণী বুদ্ধের চরণে প্রণত হয়ে জানালেন - "শুনেছি তুমি ভগবান, আমার আঁচলের ধন, নয়নের মণি, স্বর্ণ বিহগী, ক্ষণপূর্বে মরণ শ্যেনের নির্মম নখরাঘাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। প্রভু! তুমি নিজগুণে কৃপা করে আমার প্রাণ পুত্তলির প্রাণ দান কর।" এই কথা শেষ করে শোকাতুরা জননী বুদ্ধের পাদপদ্মে তার একমাত্র সন্তানের মৃতদেহ স্থাপন করল। অভাগিনীর কথা শুনে বুদ্ধদেবের করুণ আঁখি দুটি সন্ধ্যাতারা সম রমণীর মুখোপরি স্থির হয়ে থাকে। তাকে সময়োচিত প্রবোধ মানসে ভগবান তথাগত বললেন রমণী, সত্যই তুমি পুত্র শোকাতুর। পুত্র শোকে সান্তনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। তোমার মৃত পুত্রের জীবন দান করতে পারলে আমি খুবই আনন্দিত হতাম। কিন্তু দুঃখিত আমি, মৃত ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব পর নহে। যে যায় সে চিরদিনের মতই যায়, আর ফেরে না। এটা প্রকৃতির নিয়ম, নিয়তির কাজ। কেউ একে রোধ করতে পারে না। ওগো ভাগ্যহীনা রমণী! আমার কথায় বিশ্বাস করে তুমি মৃত পুত্রকে নিয়ে ফিরে যাও, কিন্তু হায়, পুত্রশোকে পাগলিনীপ্রায় রমণীর হৃদয় বুদ্ধের সে করুণ বাণীতে প্রবোধ মানলো না। সন্তান-হারা জননী বুদ্ধের চরণ যুগলে মুখমন্ডল স্থাপন করতঃ অশ্রুজলে সিক্ত করে কাতর কণ্ঠে বললে - ওগো প্রভু! তুমি স্বয়ং ভগবান, ইচ্ছা যদি হয় তোমার, তুমি কি না করতে পার। ঠাকুর, কৃপা করে এই দুঃখিনী নারীর আঁচলের ধন, নয়নের মণিকে ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও প্রভু! রমণীর এই প্রকার কথা শুনে বুদ্ধ বুঝলেন কোনও উপদেশ দিয়েই এই ব্যথিত হৃদয়া রমণীকে ফেরান সম্ভব নয়। তাই তিনি একটি উপায় স্থির করলেনঃ-

"কহেন বুদ্ধ, তনয় তোমার নীরব সমাধি মগ্ন,
বরণ করেছে চির সুন্দর মরণের মহা লগ্ন।
থাকে যদি কোনও অশোক নিলয়, ভিখমাগি আন সর্ষপচয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ মৃণাল ভগ্ন।"

ভগবান তথাগতের এই প্রকার আশ্বাস বাণী পেয়ে পুত্র শোকাতুরা জননী রোরুদ্যমানা হয়ে ছুটল কিছু সরিষা ভিক্ষা করার আশায়। কিন্তু হায়, যে গৃহেই সে সরিষা ভিক্ষা করতে যায়, সেখানেই জিজ্ঞাসা করে অভাগিনী নারী জানতে পারে ইতিপূর্বে সে গৃহে একাধিক শোকের কারণ ঘটেছে। এইভাবে বহু অন্বেষণে বিফল মনোরথে অবশেষে বুদ্ধের পদতলে এসে রমণী কাতর কণ্ঠে নিবেদন করলো

". . . . . শিখাইলে শেষ শিক্ষা;
জিয়াতে চাহিনা তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার,
হর জগতের বিরহ আঁধার দাওগো অমৃত দীক্ষা।

এই বলে রমণী বুদ্ধের পদোপরি মুখমন্ডল স্থাপন করে অশ্রুজলে তাঁর পদযুগল সিক্ত করতে লাগল। রমণীর এই ব্যবহারে ও পরিবর্ত্তনে তথাগতের কোমল হৃদয় গলিত হয়ে আঁখি জল রমণীর মস্তকোপরি শান্তিবারি রূপে বর্ষিত হতে লাগল।

তাই বলতে পারা যায়, নিয়তি যাকে কেশাকর্ষণ করে মহাকালের অতল গর্ভে টেনে নিয়ে যায়, বিধি, হরি, শম্ভু এক সাথে এলেও নিয়তির সে কাজে বাধা দিতে পারেন না। নিয়তির কাজ নিয়তি করবেই; ভগবান তথাগত রমণীকে বলে চললেন

"একমাত্র সেইজন রোধিবারে পারে নিয়তি শাসন,
যেইজন নারায়ণে কর্ম্মফল করে সমর্পণ।"

ঈশ্বরের উপাসনা করে যাঁদের মনপ্রাণ ঈশ্বরের রাতুল চরণে লীন হয়ে গিয়েছে, যারা ঈশ্বরের অভয় পাদপদ্মে পরিপূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরা নিয়তির গন্ডী অতিক্রম করায় নিয়তির শাসন তাঁরা রোধ করতে পারেন। তাঁরাও প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ কখনও করেন না, কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রকৃতি যে কাজ করে চলেছে সে কাজে বাধাদান করলে ফল তার মোটেই ভাল হয় না। সেই জন্য শক্তি থাকলেও মহাপুরুষেরা প্রকৃতির কাজে বাধাদান করে শক্তির অপব্যবহার করেন না। সুতরাং সংসারে যেমন সুখ আছে দুঃখও তেমন আছে। তবে দুঃখের ভাগই বেশী। সুখ দুঃখ চিরন্তন নয়, কিছুকাল থেকে আবার চলে যায়।

ভগবান তথাগত আরও বললেন - সংসারে এসে মানবরূপী জীব আমরা কোনও আঘাত পেলে কোনও দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হলেই চারিদিকে অন্ধকার দেখি এবং দিশেহারা হয়ে পড়ি। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায়, অতীতে আমরা কতবার জন্মগ্রহণ করেছি আবার কতবার যে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবো তার সীমা সংখ্যা কেউ নির্দ্ধারিণ করতে পারবে না। যতবারই সংসারে এসেছি সংসারকে বড় আপনার মনে করে আরও বেশী করে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছি। পরিবর্তে পেয়েছি কি? পেয়েছি রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট, ঘাত-প্রতিঘাত। জীবনে এগুলো বহুবার এসেও সহ্য করেছি অনেক, কারণ সহ্য করা ছাড়া আমাদের আর উপায়ই বা কি আছে? এক একবার হয়তো সহ্যের বাঁধও ভেঙ্গে গিয়েছে, মনে হয়েছে এর থেকে মরণও বুঝি ভাল, কিন্তু মহামায়ার ভুবন মোহিনী মায়া এমনই যে কিছুকাল পরে সব কিছু ভুলিয়ে দিলে, আবার এই সংসার নিয়েই মেতে উঠলাম। এমনি ভাবে যে কত জীবন কত জন্ম কাটিয়ে এসেছি তা কেউ জানে না। একটা আঘাত একটা বিপদেই আমরা ধৈর্য্যহারা হয়ে পাগল হয়ে যাই। যদি অসংখ্য ঘাত প্রতিঘাতে, আপদ বিপদ জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তবে কি করব? এর জন্যই মহাপুরুষেরা বলেন - পৃথিবীতে দেহধরে যত কাল থাকবে ততকাল

নিস্তার পাবে না। এর হাত থেকে নিস্তার পাবার একমাত্র ঔষধ হচ্ছে ঈশ্বর উপাসনায় দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করা। ঈশ্বর উপাসনা করে একবার যদি তাঁর রাতুল চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারো তবে এই পৃথিবীতে যাতায়াতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আধি ব্যাধি, রোগ শোক, জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করবে। দেহ থাকলেই ভোগ আছে। যত বড় ভক্ত যত বড় মহাপুরুষই হোন না কেন দেহের ভোগ তাঁকে নিতেই হবে। পরমহংসদেব একস্থানে উপদেশের ছলে বলেছিলেন - সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, জরাব্যাধি, শোক তাপ এগুলি দেহ ধারণের ধর্ম। ভগবদ্ ভজনাকারী বা ভগবদ্ ভক্ত হলেই যে তাঁর কোনও আপদ বিপদ আসবে না এটা কেবল মূঢ় ও ভ্রান্তবুদ্ধি সম্পন্ন লোকের ধারণা। কবিকঙ্কন চন্ডীতে আছে যে কালুবীর জেলে গিয়েছিল। তাঁর বুকে পাষাণ চাপান হয়েছিল। কিন্তু কালুবীর ছিলেন ভগবতীর বরপুত্র। শ্রীমন্ত কত বড় ভক্ত ছিলেন, তাঁর মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ, তাঁকে মশানে কাটতে পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর ভক্তদের যদি এত আপদ বিপদ আসে, তবে আমাদের সম্বন্ধে আর কি বলা যেতে পারে।

সমস্ত কর্মের কর্ত্তাই কূটস্থ চৈতন্য

দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য ও চন্দ্র নাড়ীস্থ বায়ুর যে অজপারূপ গতি হইতেছে, আমি ঐ অজপারূপ ঊর্দ্ধাধঃগতি অর্থাৎ প্রাণ ও অপান বায়ুরূপে শরীররূপ জগতে ও বহির্জগতে শ্বাস প্রশ্বাস বা জোয়ার ভাটারূপ গতি আমি, আমিই প্রাণরূপে দেহে থাকিয়া আমার অগ্নি (জঠরাগ্নি) দ্বারা চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করতঃ জীবের পোষণ করিতেছি, এ কারণে আমি পোষণ কর্ত্তা। আমি প্রভু। এখানে প্র =প্রধানরূপে, ভূ - হওয়া। আমিই সমগ্র জগতের অধিপতিরূপে বিরাজিত হইয়া সমগ্র জগৎ চালাইতেছি, আমার অভাবে আর কিছুই থাকে না, জগতের মূল কারণই আমি, এ কারণে আমি প্রভু। আমিই

জ্ঞানচক্ষুরূপে দ্রষ্টা বা সাক্ষী অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অন্তর্দৃষ্টিতে আমিই আমাকে দেখিতেছি এবং অন্তর্দৃষ্টিতেও যা কিছু লক্ষ্য হইতেছে, ঐ দর্শনেন্দ্রিয় মধ্যে আমি দর্শন শক্তিরূপে রহিয়াছি অর্থাৎ উভয় চক্ষে পুষা ও অলম্বুষা নাড়ী রহিয়াছে। ঐ নাড়ী মধ্যে আমি ব্যান ও উদানবায়ু রূপে রহিয়াছি, ঐ টুকুই দর্শন শক্তি। উহা না থাকিলে চক্ষু থাকিতেও দর্শন হয় না। অতএব, আমিই প্রকৃত দ্রষ্টা। আমি সকলের নিবাস অর্থাৎ সূতায় যেমন মণিসকল গ্রথিত থাকে তদ্রূপভাবে আমাতে অর্থাৎ প্রাণসূত্রতে সকলে অবস্থিতি করিয়া রহিয়াছে। রক্ষাকর্ত্তা আমি কারণ আমিই প্রাণরূপে দেহে থাকিয়া সব রক্ষা করিতেছি। প্রাণ অভাবে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। হিতকর্তাও আমি কারণ আমিই মঙ্গল দিয়া থাকি অর্থাৎ আমার শরণে হিত সাধন হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়শরণে অহিত হইয়া থাকে, এ কারণ আমি হিতকর্তা। আমি প্রভব অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে যাহা উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইতেছে (প্রাণের ব্যক্তাবস্থা) উহা আমিই অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণরূপে প্রভব অবস্থা আমি। প্রলয়ও আমি অর্থাৎ বর্তমান চঞ্চল প্রাণ যখন প্রকৃষ্টরূপে স্থিরে গিয়ে মিশিতেছে সেই স্থির অব্যক্ত রূপ প্রলয় অবস্থা আমি। আমিই আধার অর্থাৎ আমাতেই সমস্ত অবস্থিত রহিয়াছে এবং বিশেষ রূপে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে লোকের মন আমাতেই অবস্থান করে। আমিই ঐ অবস্থা রূপ থাকিবার স্থান বা আধার। লয়স্থানও আমি। কারণ স্থির ব্রহ্মরূপ আমাতেই মন-প্রাণাদি লয় হইয়া থাকে। অতএব আমিই লয়স্থান। আর কারণরূপ বীজও আমি অর্থাৎ দেহাদি উৎপত্তির আদি কারণ আমিই কেননা প্রাণ রূপী আমিই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের দশম শ্লোকোক্ত বিন্দুরূপ জীবই এবং আমিই পঞ্চতত্ত্বাদিতে যুক্ত হইয়া ভূতরূপে উৎপন্ন হই। ভূতাদির উৎপত্তির পর নাশ হয়, আমার (শূন্যময়ী আত্মার) নাশ হয় না কারণ আমি অবিনাশী। আমিই তাপ দিয়া থাকি অর্থাৎ আদিত্যরূপ প্রাণই তাপ দিয়া থাকেন। যে হেতু তাঁহার তেজ বা জ্যোতিতেই সমুদয় বহির্জগতের ও দেহরূপ অন্তর্জগতের তেজ বর্তমান রহিয়াছে, সেইহেতু তিনি জঠরাগ্নিরূপে ও জ্যোতির্ময়রূপে দেহে রহিয়াছেন বলিয়া তৎতেজে সমুদয় শরীরের

বিস্তার ও পোষণ হইতেছে এবং সেই প্রাণের তেজেই দেহের উত্তাপ বর্তমান রহিয়াছে। প্রাণ অন্ত হইলে উত্তাপেরও অন্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ আদিত্য রূপ প্রাণই উত্তাপের কারণ স্বরূপ। একারণে উক্ত হইতেছে যে আমিই তাপ দিয়া থাকি, আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকি এবং আকর্ষণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ তিনিই তেজরূপে অপান বায়ুকে অধোদেশে নিক্ষেপরূপে বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন এবং তিনিই তৎতেজ কর্তৃক প্রাণ বায়ুকে ঊর্ধ্বে পরিচালিত রূপে বৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন (এইরূপ প্রাণ ও অপান বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা দেহের মধ্যে রক্ত চলাচল হইতেছে অর্থাৎ পূরকরূপে প্রাণবায়ুর যে উর্ধ্বগতি হইতেছে উহাই বৃষ্টি আকর্ষণ এবং রেচক রূপে প্রাণবায়ুর যে অধোগতি হইতেছে উহাই বৃষ্টি বর্ষণ; এই বর্ষণে মূলাধার রূপ পৃথিবী শীতল হইয়া থাকে অর্থাৎ উর্ধ্ব হইতে অধোতে বায়ু নিক্ষেপের পর মূলাধারে বায়ুর স্থিরাবস্থা রূপ শীতলতা হইয়া থাকে; যোগীরা এই শীতলতা উপলব্ধি করেন, তাঁহারা মূলাধারে ও সহস্রারে সর্বদা রমণ করেন বলিয়া ইহার তত্ত্ব অবগত আছেন। জীবন ও আমি, মরণ ও আমি অর্থাৎ যাহা প্রাণরূপে জীবদেহে ব্যক্ত রহিয়াছে (শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে জীবদেহে যাতায়াত করিতেছে), সেই প্রাণরূপী আমিই জীবনস্বরূপ, আর ঐ প্রাণের লয় (অব্যক্ত অবস্থারূপ) মৃত্যুও আমি অর্থাৎ মৃত্যুরূপ প্রাণের যে স্থির অবস্থা, তাহা আমার অব্যক্ত অবস্থা (চলায়মান প্রাণকে স্থির প্রাণে লয় করিয়া যখন স্থিরত্ব প্রাপ্তরূপ অবস্থা হয় সেই অবস্থার নামই প্রকৃত মৃত্যু। বর্তমানে যাহাকে মৃত্যু কহা যায়, উহা প্রকৃত মৃত্যু নহে, উহা দেহ হইতে দেহান্তর গমন মাত্র। ঐ অব্যক্ত স্থিরাবস্থা আমিই, এই কারণে আমিই মৃত্যু। গীতা শাস্ত্রমতে, যিনি দেহান্তে অষ্ট প্রকৃতিকে অতিক্রম করেন তিনিই প্রকৃত মৃত্যুর অবস্থা প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা জীবন্মৃতরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ জীবনস্বরূপ বর্তমান প্রাণকে স্থির প্রাণে লয় করিয়া সর্বদাই স্থিরে রহিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত মৃত্যুর অবস্থা বিদিত হইয়াছেন)। আমিই সৎ এবং অসৎ। সৎ অর্থাৎ নিত্য, যাহা সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান এবং যাহার ক্ষয় নাই তাহাকেই নিত্য বলে। স্থির প্রাণরূপ ব্রহ্ম, তিনিই সর্বময়রূপে

বিদ্যমান এবং তাঁহার (স্থির ব্রহ্মের) ক্ষয়ও নাই। অতএব, সেই স্থির প্রাণই নিত্য স্বরূপ সৎ। অসৎ অর্থাৎ অনিত্যরূপ চঞ্চল প্রাণ, যাহা চলিতেছে শ্বাসের ক্ষয়রূপে। ইহার প্রত্যহই ক্ষয় হইতেছে এবং একসময় ইহার চলাচল ক্রিয়া রহিত হইয়া শূন্যে ইহা মিশিয়া যাইবে। সুতরাং ইহা অনিত্য, এই অনিত্যরূপ চঞ্চল প্রাণ আমিই, সুতরাং আমিই অসৎ।

প্রকৃত ভক্ত ও ভেকধারী ভক্ত

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্তব্যং বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানি প্রজায়তে।।"

অর্থাৎ যুক্তিহীন হইয়া শুধু শাস্ত্রবাক্যের অর্থমাত্র ধরিয়া সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিলে বিপরীত ফল হইতে পারে। তর্কের যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া তত্ত্বের অগাধ জল-সঞ্চারী রোহিৎকে ধরিতে পারি না (ইহা আমার মুখের বা মনগড়া কথা নহে, ইহাও শাস্ত্রবাক্য)। সুতরাং সাধন-ভজনহীন আমার নিকট পরাবিদ্যার কোন রূপই প্রকাশ না পাওয়াতে পরম জ্ঞানের সকল বিষয়ই অবোধ্য হইয়া আছে। অতএব, আমার স্থিরভাব কিছুই নাই, যাহার অভাবে আমি পূর্বে যে তিমিরে ছিলাম এখনও সেই তিমিরেই আছি কিন্তু ইহা আমার জানা থাকা সত্ত্বেও অপরকে প্রলুব্ধ ও প্রলোভিত করিয়া নিজের বশে আনিবার জন্য আমি কল্পনা-প্রসূত ও সত্যমিথ্যায় রঞ্জিত বহু শ্রুতিসুখকর ও আপাত মধুর বাক্য রূপকের মত সাজাইয়া এমনি দূর্ভেদ্য জাল বিস্তার করিয়া ফেলি যে উহার হাত হইতে কেহই নিস্তার পায় না। তবে কিনা এই বাড়াবাড়ি ভাবটা মাঝে মাঝে আমাকে নিজের নিকটেই লজ্জিত করিয়া তুলে। কিন্তু কি করিব? কোন উপায় নাই। যে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়াছি তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায়ই দেখি না। হায়, আমার মত সকলেই চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। তাহারা আমার বাক-চাতুর্যে মোহিত হইয়া আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ

হইয়া পড়ে। আমার কোন দোষই দেখে না, নচেৎ শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ কি তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত থাকিলেও কেহই সেদিকে লক্ষ্য করে না। লক্ষ্য করিলে কি আমার ভন্ডামিতে, আমার ধাপ্পায় ভুলিত!

আচ্ছা, আমি যখন জ্ঞানী বা পন্ডিত আমার তখন ত্রিতাপ থাকার কথা নহে। কিন্তু ত্রিতাপ আসিয়া আমাকে মূহ্যমান করিয়া ফেলে কেন? কেন আমি সুখ-দুঃখ, আধিব্যাধি, শোক-তাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ি স্নানাহার ত্যাগ করি, কেন কোন প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় জ্ঞান হারাইয়া ফেলি, কেন অর্থ নষ্টের ভয়ে প্রিয় পুত্রকে ভয় করি ও সন্দেহের চক্ষে দেখি, কেন তুচ্ছ সম্পত্তির জন্য আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতি আপনজনের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ করি - ইহাই কি আমার জ্ঞানের লক্ষণ? যদি আমি ইহাকে জ্ঞানের কথা বলি তবে ইহা অপেক্ষা অজ্ঞানের কথা আর কি হইতে পারে? মুখে আমি যত বড় বড় জ্ঞানের কথা, দর্শনের কথা বলিয়া নিজের পান্ডিত্য জাহির করি না কেন, আমার ভিতর সাধন রত্নরূপিনী পরাবিদ্যার কোন প্রকাশ না থাকিলে আমি কার্যে জীবভাবেরই পরিচয় দিব। ইহা সকলের নিকট ধরা না পড়িলেও যিনি প্রকৃত জ্ঞানী ও পন্ডিত তাঁহার নিকট অবিদিত থাকে না।

মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিই যে প্রকৃত জ্ঞানী এবং তাঁহারাই যে অপরকে জ্ঞান দিতে সক্ষম সে সম্বন্ধে মহাবীর তীর্থঙ্কর যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা এই —

''সত্যজ্ঞান অর্জনের জন্য অনেকেই সন্ন্যাসী হয়, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, নগ্নাবস্থায় বাস করে, সারামাস ধরিয়া উপবাসীও হয়ত থাকে কিন্তু কামনা-বাসনার মূলোৎপাটনে তাহারা সমর্থ হয় না, ফলে কর্মচক্র হইতে মুক্ত হওয়া দূরের কথা তাহাতে আরও বেশী জড়াইয়া পড়ে। মোক্ষ বা আত্মিক মুক্তি সম্বন্ধে যত বড় বড় কথাই বলুক

না কেন, ইহলোক বা পরলোক সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞান কি তাহারা দিতে সমর্থ? সত্যপথের দিক নির্দেশ শুধু তাঁহারাই দিতে পারেন মোক্ষের জন্য যাঁহারা বীর যোদ্ধার মত কোমর বাঁধিয়াছেন; ক্রোধ, অভিমান, মায়া-মোহ প্রভৃতি পদদলিত করিয়া হইয়াছেন সম্পূর্ণ রূপে অহিংস, সর্বক্লেশের বিনাশ সাধন করিয়া হইয়াছেন শান্তির মূর্ত বিগ্রহ।''

যাহা হউক, প্রকৃত জ্ঞান বলিতে কি বুঝায় এবং জ্ঞানীর লক্ষণই বা কি অহা যোগীবর গোরক্ষনাথ শ্লোকদ্বয়ে বেশ স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন —

''যাবন্নৈব প্রবিশতি চরণ মারুতো মধ্যমার্গে।
যাবদ্বিন্দুর্নভবতি দৃঢ় প্রাণবাত প্রবন্ধাৎ।।''

''যাবদ্ ধ্যানং সহজ সদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং।
তাবদ্ জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভ মিথ্যা প্রলাপঃ।।''

অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত প্রাণবায়ু মধ্যমার্গ সুষুম্নায় প্রবেশ না করে, যতদিন পর্যন্ত প্রাণবায়ু পূর্ণে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনা আপনি রুদ্ধ হইয়া বিন্দু স্থির না হয় এবং যতদিন পর্যন্ত ধ্যান স্বাভাবিক হইয়া তত্ত্বসমূহের সাক্ষাৎকার না হয়; ততদিন পর্যন্ত জ্ঞানের কথা বলা দম্ভ, মিথ্যা ও প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে।'

আমার তো ভগবৎ উপাসনার দ্বারা জীবন কৃতকৃতার্থ করিব, এ ইচ্ছা আদৌ নয়। নিজেকে সাধুবেশে সাজাইয়া কতকগুলি শাস্ত্রের বুলি মুখস্থ করিয়া লেকচার দিয়া লোকের নিকট মান-সম্মান, প্রতিপত্তি কি করিয়া পাওয়া যায় সেই চিন্তাতেই সদা-সর্বদা ব্যস্ত। বাহ্যাড়ম্বরই আমার সম্পূর্ণ লক্ষ্য। ইহাতে আমি নিজেও ঠকি, পাঁচজনকেও ঠকাই। ইহা আমার ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই মহাত্মা কবীর সাহেব বলিয়াছেন — ''ভক্তি এবং ভেকেতে বড় তফাৎ,

যেমন আকাশ আর পাতাল। যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি কেবল ভগবানেরই শরণাপন্ন হইয়া কালাতিপাত করেন। আর যাঁহারা ভেক্‌ধারী, জগতের লাভালাভের দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য। কেবল বাহ্যাড়ম্বর, কেবল বাহ্যাড়ম্বর। আমাদের পরিণামে কি হইবে তাহা একমাত্র অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। মোটামুটি যাহা, তাহা সম্পূর্ণই লিখিলাম। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা প্রয়োজন মনে করি না।

প্রকৃত ভক্ত কি বলে?

ছাপান্ন দন্ড রাত্রিদিনে রাধাকৃষ্ণ গুণগানে
স্মরণে মননে কাটাইব।
চারি দন্ড নিদি থাকি স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখি
এক পল বৃথা নাহি দিব।

আর আমার মত ভেকধারী ভক্ত কি বলে?

ছাপ্পান্ন দন্ড রাত্রি দিতে বিষয় বাসনা ধ্যানে
স্ত্রী-পুত্র স্মরণে কাটাইব।
যখনই নিদি থাকি স্বপনে তখনই দেখি
আবার কখন হায় সিনেমা দেখিব।

ব্রহ্মকার্য প্রাপ্তিতে জাতিভেদ নাই

ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যাশ্চ শূদ্রাদ্যাবরজাতয়ঃ।
স্ত্রিয়শ্চ সকলাস্তেষাং শান্তরূপাঃ সদাশুচিঃ।।
তাসাং মধ্যে চ যা কাচিদাগত গুরুসন্নিধিম্।
প্রণম্য প্রার্থয়েজ্ জ্ঞানং ধর্মার্থকামমোক্ষদম্।।
যদি না দীয়তে তস্যা জ্ঞানং জ্ঞানবিশারদৈঃ।
তে তথা নরকং যান্তি গায়ত্রীরহিতা যথা।
ব্রহ্ম জ্ঞানময়ং হ্যেতন্নাস্তি জাতি বিচারণা।।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতিগণ এবং তাহাদের স্ত্রীগণ যে কেহ গুরুর সমীপে আগমন করিয়া প্রণামপূর্বক ধর্মার্থকামমোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রার্থনা করিলে, যদি জ্ঞানবিশারদ গুরু তাঁহাকে জ্ঞানদান না করেন, তবে তিনি নরকগামী হন। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানময়, ইহাতে জাতিবিচার নাই। যখন পূর্বাপর স্ত্রী-শূদ্রাদিরা প্রাণায়ামাদি যোগ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তখন এখনই বা কেন তাঁহারা উক্ত কার্যে অধিকারী না হইবেন বা উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? অতএব, তাঁহারা যে ঐ সকল কার্য করিবেন এবং করিলে কোন দোষ হয় না, ইহা শাস্ত্র বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। বরং যাহাতে সকলেই এই পথের পথিক হন, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিক সরলভাবে দেখিতে গেলে শাস্ত্রীয় কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না, তবে নিজের কোট বজায় রাখিবার জন্য কূট অর্থের দ্বারা শাস্ত্রীয় মতের বিরোধ জন্মান অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহা কোন কাজের কথা নহে, কেননা তাহার দ্বারা কোন মীমাংসা হয় না, বরং যে ভ্রম সেই ভ্রমই থাকিয়া যায়। ইহাতে লাভ কি? মনে করুন, যদি দ্বিজবন্ধুগণ বেদের অধিকারী না হয়, তবে এখনকার দিনে বেদের অধিকারী বা কে? দ্বিজউপাধিধারীগণের মধ্যে দ্বিজবন্ধু নহেন কে? সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক বা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, এখনত প্রায় 'দ্বিজ' উপাধিধারী মাত্রেই দ্বিজবন্ধু। তাঁহারা যদি বেদের অধিকারী হইতে পারেন, তবে স্ত্রী ও শূদ্রগণ কি দোষ করিল? দ্বিজবন্ধু ভাবাপন্ন দ্বিজগণ এবং তৎসঙ্গে স্ত্রী ও শূদ্রগণকে যদি বেদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে অধিকারীর অভাবে শাস্ত্রীয় কর্মসকল তো এককালে লোপ পাইবে। ইহাই কি উদ্দেশ্য? যদি তাহা না হয়, তবে যদ্দারা ভ্রম দূর হইয়া এই কথার মীমাংসা হয় এবং সত্যের প্রকাশ হয়, তাহাই কর্তব্য। ভগবান গীতায়ও বলিয়াছেন -

"মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।।

অর্থাৎ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিলে পাপযোনিই হউক কিংবা স্ত্রীলোকই হউক বা শূদ্র কিংবা বৈশ্যই হউক তাহারাও পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবানের এই কথার সহিত শাস্ত্রীয় অন্য বচনে অনৈক্য হইতেছে। যথা -

"স্ত্রী শূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (পতিত ব্রাহ্মণ) ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নহে। বহির্লক্ষ্যের অর্থে বস্তুতঃ বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইলে উভয় বাক্যেরই একই অর্থ দেখা যায়। অন্যত্র লিখিত আছে -

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ ভবেদ্‌বিপ্রঃ ব্রহ্মজানাতু ব্রাহ্মণঃ।।"

অর্থাৎ জন্মমাত্রে শূদ্র, তাহার পর সংস্কার হইলে দ্বিজ পদবাচ্য, তৎপরে বেদপাঠে বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রাহ্মণ বলা যায়। গৌতম সংহিতায়ও উক্ত আছে -

"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাং শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ।।"

অর্থাৎ যিনি ক্ষান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং তদ্ব্যতীত অপর সকলেই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যতদিন ব্রাহ্মণ পুত্রেরও ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না, ততদিন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পুত্র বা ব্রাহ্মণ বংশে জাত এইমাত্র বলা যায়। পরন্তু 'ব্রাহ্মণ', 'ক্ষত্রিয়', 'বৈশ্য', 'শূদ্র' এই উপাধিগুলি গুণ ও কর্মগত, বংশগত

নহে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :-

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্যা কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্তারমব্যয়ম্।।"

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ দ্বারা চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। তাহার কর্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্তা বলিয়া জানিও।

"স্ত্রী শূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

এই যে শাস্ত্রীয় বচন, ইহাই কি মিথ্যা? বাস্তবিক ইহাও মিথ্যা নহে। ইহার গূঢ় তাৎপর্য এই যে, যখন জন্মমাত্রেই সকলেই শূদ্র, তখন প্রণব দীক্ষা তো কাহারও হইতে পারে না। এইজন্য সংস্কার দ্বারা দ্বিজ হইতে হয়, তাহার পর ক্রমে বেদপাঠ দ্বারা বিপ্র পদবাচ্য এবং পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুল বিস্তৃত আলোচনা থাকায় আমি মাত্র এ সম্বন্ধে অধিক অগ্রসর না হইয়া সার সংক্ষেপটুকুই গ্রহণ করিলাম।
সংস্কার - সদগুরু কর্তৃক শিষ্যের তৃতীয় নয়ন (জ্ঞানচক্ষু) উন্মীলিত করা।

বেদপাঠ অর্থাৎ বাহ্যিক বেদপাঠ করা নহে, ক্রিয়া করাই প্রকৃত বেদপাঠ।

সুষুম্না পথে ষট্‌চক্রে যাতায়াত করার নাম প্রাণায়াম (অর্থাৎ পূরক ও রেচক)। বহুকাল ধরিয়া এইরূপ প্রাণায়াম করিতে করিতে যখন প্রাণবায়ু নাকের অভ্যন্তরে বিচরণ করে, বাহিরে আসে না, তখন তাহাকে প্রকৃত কুম্ভক বলা হয়। তখন প্রাণ আকাশের মত

বিস্তৃতি লাভ করে। ঐ আকাশের মধ্যে সূক্ষ্ম পরব্যোম স্বরূপ এক এক অণুর মধ্যে অনেক ব্রহ্মস্বরূপ অণু এবং তাহার মধ্যে অনেক ব্রহ্মান্ডও দৃষ্টি গোচর হয়। ইহাই প্রকৃত বেদান্ত দর্শন। বাহিরে লক্ষ লক্ষ বার বেদ পাঠ করিলেও উক্ত অবস্থা লাভ হয় না। ইহা আমার নিজের মুখের কথা নহে, ইহা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদিগের অভিমত। গীতাখানি ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আর একটি মূল্যবান কথা জানিবার আছে। সংস্কৃত শ্লোক পরিহার করিয়া এখানে তাহার সরল বঙ্গানুবাদ করিলাম।

১। যোগ,	৫। ব্রত,	৯। বিদ্যা,
২। তপ,	৬। শৌচ,	১০। বিজ্ঞান,
৩। দম,	৭। দয়া,	১১। আস্তিক্য।
৪। দান,	৮। ঘৃণা,	

উপরোক্ত অবস্থাগুলি যাঁহার করায়ত্ত, একমাত্র তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন এবং ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই শাস্ত্র মতে শূদ্র বলিয়া কথিত হন।

বাসনাই সংসার

চিত্তের স্পন্দন হতে এই জগৎ সংসারের উৎপত্তি হয়। চিত্তের স্পন্দন, কম্পন, আন্দোলন হতে মিথ্যা সৃষ্টি সত্যবৎ দেখা যায়। ইহা সত্য নয়, সত্যের মত। জীবগণ এই সৃষ্টি সংসারকে সত্য মনে করে। চিত্তের স্পন্দন, আন্দোলন, হয় কেন? জলের স্পন্দন হয় বাতাসে, সেইরূপ চিত্তের স্পন্দনও হয় বাতাসে। সে বাতাস হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস। শ্বাস প্রশ্বাস নাসার মধ্যে যাতায়াত করে চিত্তকে দোলায়। শ্বাস প্রশ্বাসের কল চালনার বিজ্ঞানটি সকল মনুষ্যের জানা একান্ত আবশ্যক। অতিসূক্ষ্ম বাতাস অতি সূক্ষ্ম চিত্তে ধাক্কা মারে।

তাতে চিত্তে তরঙ্গ উঠে, ঢেউ উঠে, সেইসব ঢেউ হচ্ছে বাসনা। ঐ বাসনা ঢেউগুলি সংসাররূপে, জমাট বান্ধে। বাসনাই সংসার। চিত্ত, মন নড়ে চড়ে, তাতে বাসনা জন্মায়। সমুদ্রের জল নড়ে চড়ে তাতে ফেনারাশি উৎপন্ন হয়। সেইরূপ অস্থির মন যত নড়ে চড়ে তত বাসনা ফেনা উৎপন্ন হয়। এই বাসনা ফেনা উঠে উঠে চিত্তকে ঢেকে ফেলে। বাসনাতে আচ্ছন্ন মন সংসার সাজায়। বায়োস্কোপের ফিল্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি যেমন একত্র চালিত হয়ে একটি প্রকান্ড ছবি দেখায় সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাগুলি ক্রমাগত একত্র এসে এসে পরস্পর মিশে গিয়ে সংসারের এক একটা প্রকান্ড ছবি দেখিয়ে থাকে। এইরূপ করে বাসনাই সংসারের সব ছবি গুলি গড়ে থাকে। অতএব বোঝা যায়, চিত্তের স্পন্দন ধীর, স্থির করলেই সংসারে শান্তি পাওয়া যায়। শ্বাস প্রশ্বাস অধিক হওয়ায় ঐ বায়ু চিত্তে আঘাত দিয়ে দিয়ে চিত্তকে চঞ্চল করে, তাই চিত্তটা ছট্‌ফট্ করে। তাই শ্বাস প্রশ্বাসকে স্থির ধীর করতে অভ্যাস কর। চিত্তের স্থিরতা অভ্যাসই যোগ।

যোগ কি? "সংযোগঃ যোগ ইত্যুক্তঃ জীবাত্মা পরমাত্মনঃ।" জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগই যোগ। একটি জীবাত্মা একটি পরমাত্মা, এই আত্মাই আমি। আমির দুইটি ভাব একটি হল সর্ব আমির সমষ্টি মহাআমি, আর একটি জীব আমি, দেহ ধারণায় পূর্বজন্ম সংস্কারে গঠিত দৈহিক আমি, ইন্দ্রিয় জনিত আমি। যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন ঐ দেহ আমি বা ইন্দ্রিয় আমি বর্তমান থাকিবে। ঐ দেহ আমিটি পুনঃ পুনঃ জন্ম ও পুনঃ পুনঃ মরণ ভোগ করে। মূলে যে এক অখন্ড মহা আমি, সেটি যেন সমুদ্র। আর এই খন্ড খন্ড কোটি কোটি দৈহিক আমি বা ইন্দ্রিয় জনিত সাংসারিক আমি হচ্ছে ঐ অখন্ড আমি সমুদ্রের তরঙ্গ মালা। "কাম সাগর তরঙ্গমালা।" তরঙ্গ যেমন উঠে পড়ে জন্মায় আর মরে, তেমনি ঐ খন্ড খন্ড 'দেহ আমি' জন্মায় আর মরে। আবার জন্মায় আবার মরে, তরঙ্গ সকল ভয়ে কাঁপে, তারা মল্যাম মল্যাম করে, জানে না যে তারা সমুদ্র, সমুদ্র হতে

অভিন্ন, একেবারে তারা সমুদ্রের বুকের ভিতর তারা সমুদ্রই। সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমি-তরঙ্গ সকল জানে না যে তারাও অখন্ড মহা - আমিরূপ সমুদ্রের সহিত অভিন্ন, মহা-আমি রূপ পরব্রহ্মের বুকের ভিতর আছে, ব্রহ্মেরই বুকের ধন! তারা ব্রহ্মই। এইরূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মার যে মিলন অর্থাৎ সমুদ্রের সঙ্গে তরঙ্গের যে একাত্মবোধ তাকেই যোগ বলে। জীবের শ্বাস প্রশ্বাস কাম-সাগর-তরঙ্গমালা উত্থিত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস স্থির, ধীর হলেই চিত্ত স্থির, ধীর, শান্ত ও শান্তিপূর্ণ হবে। কিরূপ প্রক্রিয়া করিলে চিত্ত শান্ত, শীতল হবে? তা গুরুর নিকট জানতে হবে, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" তা গুরুসেবার দ্বারা জানতে হয়, শুধু জিজ্ঞাসার দ্বারা হয় না।

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

বস্ত্রহরণ করে সভাস্থ সকলের সমক্ষে রাজকুলবধূ পুরনারী দ্রৌপদীকে এবং তাঁর পঞ্চস্বামীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার মানসেই অহংমদমত্ত দুর্য্যোধনের আদেশক্রমে তাঁর প্রিয় ভ্রাতা দুঃশাসন সভাস্থলে দ্রৌপদীকে এনে উপস্থিত করলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করছেন আর দ্রৌপদী নিজের লজ্জাশরম বাঁচাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, যাতে দুরাত্মা দুঃশাসন কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে না পারেন। কিন্তু পুরুষের বলের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকের শক্তি কতক্ষণ বাধা দিতে পারে? যখন দ্রৌপদী বুঝলেন এভাবে দুঃশাসনকে প্রতিনিবৃত্ত করা যাবে না এবং তাঁর একার শক্তির দ্বারা দুঃশাসনের শক্তিকে রোধ করা সম্ভব নয়, তখন তিনি শ্রী ভগবানের শরণ গ্রহণ করলেন। কিন্তু শ্রী ভগবানের শরণ গ্রহণ করলেও তখনও পর্য্যন্ত দ্রৌপদীর নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল আর ছিল কিছুটা আত্মনির্ভরতা। যেহেতু লজ্জা নিবারণ মানসে সচেষ্ট হয়ে তখনও পর্যন্ত তিনি তার বাহু যুগল বক্ষোপরি স্থাপন করে করজোড়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ভগবানকে ডাকছিলেন কিন্তু ভাগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরতা না আসাতে সে-ডাক শুনেও ভগবান নীরব রহিলেন, তাঁকে রক্ষা করতে এলেন না। কিন্তু এভাবেও দ্রৌপদী আর বেশীক্ষণ বাধা

দিতে পারলেন না, কারণ দুঃশাসনের বলপ্রয়োগে ও প্রবল আকর্ষণে তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি বক্ষের উপর হইতে স্খলিত হয়ে পড়ল। সেই স্খলিত দক্ষিণ হস্তে অঙ্গের বস্ত্রাবরণ ও বক্ষোপরি ন্যস্ত বাম বাহুর দ্বারা বস্ত্রাঞ্চল রক্ষা কল্পে তিনি তখনও যত্নশীলা। তখনও তিনি নারায়ণকে স্মরণ করছেন বটে কিন্তু সে কাতর আহ্বান শুনেও ভগবান তাঁকে রক্ষা করতে এলেন না। কারণ তখনও দ্রৌপদী ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভরশীলা হতে পারেন নি। তখনও তাঁর মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার ক্ষীণতম ভাব বর্তমান ছিল। কিন্তু ওটুকু আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা থাকতে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে পেতে হলে তাঁর রাতুল চরণে পরিপূর্ণরূপে সঁপে দিতে হবে, একমাত্র তাঁকেই আশ্রয় করতে হবে. নচেৎ তিনি ব্যতীত অপর কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিনিবেশ থাকলে তিনি আসবেন কেন? কেন না তাঁর চরণে তো সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা হল না, তাই তিনি আসতেও পারেন না। এভাবে দ্রৌপদী অধিকক্ষণ বাধাদানে অসমর্থা হয়ে যখন বুঝলেন তাঁর সকল চেষ্টা, সকল যত্ন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, আর কোনও উপায় নাই, এখনি সভাস্থলে সর্বসমক্ষে নারীর শেষ সম্মান, শেষ লজ্জা হতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হবার অন্তিম অবস্থা উপস্থিত, আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় নাই, তখন তিনি সকল চেষ্টা, সকল যত্ন, সকল প্রয়াস ত্যাগ করে আত্মাভিমান শূন্য হয়ে ঊর্দ্ধমুখে ঊর্ধ্ববাহু সহকারে করজোড়ে সেই একমাত্র অনুপায়ের উপায়, অগতির গতি, শরণীয় সেই বিশ্বস্বামী বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিতান্ত ভয়ার্ত চিত্তে দীনভাবে শরণাগত হয়ে প্রার্থনা করলেন। সেই কাতর প্রার্থনা শুনে ভগবান আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর চিত্ত বিচলিত হল, তিনি আর থাকতে না পেরে তখনই দ্রৌপদীর সম্মান ও লজ্জা রক্ষাকল্পে অনন্ত বস্ত্ররূপে এক অপরূপ লীলার বিকাশ করলেন। ইহার দ্বারা আমরা একটা মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিলাম যে ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে না পারলে, এক বিন্দুও অহংজ্ঞান থাকতে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াও পাওয়া যায় না। তাঁহাকে পাইতে হইলে সম্পূর্ণ অহংমুক্ত হইতে হইবে, অর্থাৎ মনের সম্পূর্ণ বিনাশ করিতে হইবে, মন থাকিয়াও আর থাকিবে না।

জগৎ স্বপ্ন

স্বপ্নে আমরা কত কি দেখি, কত কি শুনি, কত কি করি, কিন্তু সে সব বাহিরের কিছুই নয়। মনের মধ্যেই মন সে সব সৃষ্টি করে। মনের সে এক অদ্ভুত শক্তি। স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্যাদি সমস্তই মনোময়। বহির্জগতের প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু সব সময়েই যে বহির্ব্যাপারের প্রতিধ্বনি তা ঠিক বলা যায় না। এমন অনেক বিষয় স্বপ্নে দেখা যায় যাহা প্রকৃতই অচিন্ত্যপূর্ব্ব তাহা অলীক কল্পনা নহে, বাস্তব সত্যের মতই ঠিক। সুতরাং স্বপ্নটি বাস্তবিকই একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য, কিছু নয় বলিয়া সব সময় উড়াইয়া দেওয়া যায় না। স্বপ্নে কত জীব, কত ঘটনা, কত স্থান দেখিয়া থাকি, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে সব আর কিছুই থাকে না। মনের মধ্যেই মন তাহাদিগকে সৃষ্টি করে, মনেই তাহারা বিলীন হইয়া যায়। এও যেমন আর এই বাস্তব জগৎটাও ঠিক তেমনি। যদি এই জাগ্রত স্বপ্ন কখনও ভাঙ্গে তখন দেখতে পাবে এই জগৎ ও জগতের কোন বস্তুই নাই, কেবল 'তুমি' আছ মাত্র। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ গুলিকে অলীক বলে মনে হয় না, আবার জাগবামাত্রই সে সব মিথ্যা বলে বোধ হয়, তেমনি সূক্ষ্মদেহ জাগ্রত হলে এই স্থূল দেহ ও ভৌতিক পদার্থ নিচয় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মত অদৃশ্য হইয়া যায়। তেমনি কারণ দেহেও জাগরণ আছে। তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। ইহাতেই যথার্থ জাগরণের আভাস পাওয়া যায়। যথার্থ জাগরণ হইলে আমরা এক আলাদা মানুষ হয়ে যাই। এই জগতের লোক বলিয়া তখন আর মনে হয় না। জগতের লোকও তাকে ভিন্ন চক্ষে দেখে, সেও এই জগৎকে এক স্বতন্ত্র মূর্ত্তিতে দেখিতে পায়। তখন দেশ কাল জ্ঞানের কোন বাধাই তাহার সম্মুখে আসে না। সমস্ত জগতের মধ্যে সে তখন এক নূতন মানুষ হয়, আর তাহারও চক্ষে জগৎ যেন এক অভিনব আনন্দ নিকেতন বলিয়া ঠেকে।

স্বপ্নে পাওয়া অর্থ জাগিয়া না পাইলে যেমন আমাদের দুঃখ হয়

না, তেমনি যাঁর যথার্থ জাগরণ আসিয়াছে তাঁর আর এই জগতের মান সম্পদ খ্যাতির জন্য কোন আক্ষেপ হয় না। স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া কেহ বুঝিতে পারে না। সেইরূপ যতদিন প্রবুদ্ধ হইতে না পারা যায় ততদিন এই জগৎকে মিথ্যা বলিয়া মানিযা লওয়া নিশ্চয়ই কঠিন। স্বপ্নের মধ্যে কখনও কখনও মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখিতেছি - ইহা যেমন আরও দুর্নিমিত্তের কারণ ও মহামোহের লক্ষণ, অপ্রবুদ্ধ অবস্থায় আত্মজ্ঞানের ভানও তদ্রূপ মোহাভিভূতের চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু কিছুই থাকে না, কেবল স্বপ্নদ্রষ্টা বর্তমান থাকে এবং দ্রষ্টার মধ্যে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের অবসান হয়, তদ্রূপ এই জগৎ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্ত পদার্থ পরমাত্মার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। তখন এক পরমাত্মা ছাড়া কিছুই থাকে না। জাগ্রত লোকের স্মৃতিতে যেমন স্বপ্নটা কিছুক্ষণের জন্য লাগিয়া থাকে, তদ্রূপ এই বিশ্বস্বপ্ন জ্ঞানীর স্মৃতিতে মাত্র একটু লাগিয়া থাকে, ক্রমে তাহাও মুছিয়া যায়।

তিন প্রকারের নিদ্রা

নিদ্রা তিন প্রকারের। যথা - সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যেমন সুখে শায়িত ছিলাম, ঘুমাইয়া মনটি আজ বেশ প্রসন্ন বোধ হইতেছে এইরূপ নিদ্রার ভাবই সাত্ত্বিক নিদ্রা, এইরূপ নিদ্রাতেই দেব দর্শন হয়; ইষ্টফল লাভ হয়।

আর একপ্রকার নিদ্রা আছে, তাহা রাজসিক। তাহাতে মনে হয় আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ সে মনে কিছুই ভাল লাগে না। সুখে সহজে কিছু স্মরণ হয় না। মন যেন অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে যা তা স্বপ্ন দেখে, জাগিয়া উঠিয়া অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইতে থাকে, ইহাই রাজসিক নিদ্রা।

আর তমোভাবাপন্ন নিদ্রায ঘুম খুব গাঢই হয, কিন্তু জাগিয়া উঠিযা মন প্রসন্ন থাকে না, শরীরের ক্লান্তি দূর হয না বরং শরীরে যেন একটা ভার বোধ হয। চিত্তে জড়তা ও আলস্য যেন কাটিতে চাহে না, ইহাই তামসিক নিদ্রা।

তিন প্রকারের অরিষ্ট

অরিষ্ট অর্থে শুভাশুভ অদৃষ্ট। এটা হচ্ছে এক প্রকারের জ্ঞান, যে জ্ঞান দ্বারা আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারা যায। অরিষ্ট আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ভেদে ত্রিবিধ।

আধ্যাত্মিক - কর্ণদ্বয রুদ্ধ করিয়া অর্ন্তঘোষ শুনিতে না পাওযা। নেত্ররুদ্ধ করিযা জ্যোতিঃ দেখিতে না পাওয়া।

আধিদৈবিক - অকস্মাৎ স্বর্গ বা সিদ্ধ সকলকে দেখা অথবা সমস্ত বিপরীত দেখা। তীব্র অভিসম্পাৎও আধ্যাত্মিক অরিষ্ট।

আধিভৌতিক - যম পুরুষ বা পিতৃ পুরুষগণকে দেখা, স্বপ্নে মহিষারোহণ, দীপ নির্বাণ গন্ধ না পাওযা, অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে না পাওযা প্রভৃতি অরিষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণ গুলির মধ্যে যে কোন একটি বা দুই তিনটি প্রকাশ পাইলেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওযা আবশ্যক।

"আত্মাই কেবল গুরু
সর্বজীবে রন।
যাঁর আত্মা প্রষ্ফুটিত
তিনিই গুরু হন।"

ভক্তদাদু

একজন পরম ভক্তের কথা আমাদের জানিযা রাখা আবশ্যক বলিয়া 'ভারতের সাধক' থেকে উদ্ধৃত করা হইল।

"দেব নিরঞ্জনকেই কর পূজা, তবে সকলই আসিবে সেই সঙ্গে তাহার মধ্যে। ডাল, পাতা, ফল, ফুল সব কিছুই সেই মূল দ্বারা বিস্তৃত, হে দাদু এই সমস্ত বস্তু সম্ভার মূল হইতে ভিন্ন কিছু নয়।"

"মোহনমালী পরিপূর্ণ করিয়াছেন আমার অন্তরের সহজলোক। সাধু সুজনই শুধু তাহা জানে। কায়া ফুল·বনের মধ্যে বিরাজিত মালী, সেখানেই তিনি রচনা করলেন রাস। সেবকের সহিত খেলা করিতে স্বামী সেখানে দয়া করিয়া আপনিই আসিয়া উপস্থিত।"

"অন্তর কুঞ্জে রাসের এই রসমাধুর্য্য এই পরম অমৃত ত্যাগ করিতে দাদু চাহিবেন কেন? তাই তো তিনি তাঁহার আকুতি জানাইলেন হৃদয়নাথকে "জুগি জুগি তারণহার, জুগি জুগি দরশন দেখিয়ে, জুগি জুগি মঙ্গলাচার, জুগি জুগি দাদু গাইয়ে।" অর্থাৎ যুগে যুগে তিনি ত্রাণকর্ত্তা, যুগে যুগে তাঁহাকে কর দরশন, যুগে যুগে মঙ্গল আচার, যুগে যুগে দাদু কর স্তব গান। যুগে যুগে তিনি পরম প্রভুকে দয়িতরূপে পাইতে চাহেন, তাঁহার প্রেমরস পান করিয়া কৃতার্থ হইতে চাহেন।"

"জ্যোতির পেয়ালায় প্রেমময় তাঁহার প্রেম ভরপুর করিয়া দিলেন। হে দাদু, প্রত্যক্ষ রূপটি দেখাইয়া দিয়া আমায় তিনি করিয়া দিলেন মাতাল। দাদু হইয়া গেল রসের মাতাল, রস বিনা তাঁহার বাঁচা কঠিন। এক পলক যদি সেই রস সে পান না করে, তবে ছট্‌ফট্ করিয়া তাহাকে মরিতে হয়। দাদু হইয়াছেন রামের অনুরক্ত, প্রাণ ভরিয়া সে প্রেমরস পান করিতেছে, ওগো, যে রামের প্রত্যক্ষ রূপ মাধুর্য্যে মাতাল হইয়াছে, সে কি আর মুক্তির বালাই খুঁজিয়া ফেরে?"

"ওগো হায, আমারই লাগিয়া রাম আমার বৈরাগী, তাঁহাকে তো তাই ত্যাগ করা যায় না। অন্তর আমার প্রেমের বেদনায় আর্ত্ত,

তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া তো কোন সুখই পাই না। যোগিনী হইয়া আমি দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব। ওরে দাদুর স্বামী হইয়াছেন তাঁহার জন্য উদাসী, তবে আর কেমন করিয়া ঘরে থাকা যায়। এই সমস্ত মহাত্মাদের ভক্তির সহিত তুলনা করিলে আমাদের ভক্তি তাহার ধার দিয়াও যায় না। যেমন আকাশে আর পাতালে প্রভেদ। আমাদের ভক্তি মর্কট ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সত্য সত্য বৃথা চেষ্টা মানবের

সত্য সত্য,
বৃথা চেষ্টা মানবের, বৃথা আকুলতা,
বৃথা শাস্ত্রের শাসন, ধর্মাধর্ম, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি
অর্থহীন শব্দ আড়ম্বর!
সর্ববিশ্বে, সর্ব কার্য্যে,
সকল কার্য্যে, সকল কারণে
বিদ্যমান তুমি হৃষিকেশ!
অহিদন্তে তুমি বিষ, তুমি সুধা জননীর
হৃদয় আধারে,
হাসি অশ্রু এক আধারে মুরতি তোমার।
ভুলে যাই, তাই কাঁদে প্রাণ,
অহঙ্কারে হই দিশেহারা।
হৃদেস্থিত তুমি হৃষিকেশ,
অখিলের বিকার বিনাশ।
অধঃ, ঊর্দ্ধে, সম্মুখে, পশ্চাতে
লহো প্রণাম আমার।

বিদ্যাসুন্দর

যাহার দ্বারা, আত্মধর্ম প্রকাশ পায় অর্থাৎ যোগবিদ্যা, ইহার জনক গুরুরূপী বীরসিংহরাজা যিনি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তিনিই বীর

পদবাচ্য। সিংহ শব্দের অর্থ প্রধান, যিনি প্রধান জিতেন্দ্রিয় পুরুষ অথচ দীপ্তি বিশিষ্ট, তিনিই বীরসিংহরাজা, তাহার কন্যা বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, এই কন্যারূপ জ্ঞান লাভের জন্য গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর কাঞ্চিপুর হইতে বর্দ্ধমানে আগমন করেন গুণসিন্ধু রাজা আত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে কারণ সিন্ধু অর্থে সমুদ্রকেই বুঝায়। সমুদ্রের জলরাশি এক প্রকার অনন্ত বিধায় নির্গুণ, এই আত্মপুরুষই গুণ সিন্ধু রাজা, ইনি কাঞ্চিপুরে অবস্থিতি করিথা থাকেন, কাঞ্চিপুর মোক্ষস্থান, কাঞ্চি-দীপ্তি পাওয়া, শরীরের মধ্যে যে স্থান দীপ্তি বিশিষ্ট, সেই স্থানকে কাঞ্চিপুর বলা হয়, অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল পদ্মে উভয় কাঞ্চি অবস্থিত রহিয়াছে; একটী শিব কাঞ্চি অপরটী বিষ্ণু কাঞ্চি, এই ভ্রুর মধ্যস্থল রূপ পুরই প্রকৃত মোক্ষস্থান কাঞ্চিপুর; অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি স্থান যথায় লয়স্থানও তথায়, তবে জীব ফলাকাঙ্খার সহিত কর্ম্ম করায় লয়স্থানে জীবের স্থিতি না হইয়া পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে, জীবের উৎপত্তি স্থান কোথায় পূর্বে বলা হইয়াছে, এবং লয় স্থানও বলা হইযাছে পূর্বোক্ত লয় স্থানে স্থিতি করিতে পারিলেই জীবের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, নচেৎ নহে। জীব রূপ সুন্দর বর্দ্ধমানে (বিদ্যাকে লাভ করিবার জন্য) বীর সিংহের আলয়ে গিয়াছিলেন [বর্দ্ধমানশীল যাঁহার জ্ঞান, এমত গুরুরূপী জিতেন্দ্রিয়-প্রধান পুরুষ যিনি বিদ্যা (জ্ঞান), এই বীর সিংহ রাজার কন্যা রূপা। ইনি প্রধান পুরুষ-স্থির মন অর্থাৎ আত্মভাব, এই স্থির মনই প্রকৃত দেহ রাজ্যের রাজা বীর সিংহ।] ইনি চক্ষুষ্মান। তৎপর জীবদেহে বর্ত্তমান চঞ্চল মন অন্ধ, মোহগ্রস্ত অবিদ্যা ভাবাপন্ন অর্থাৎ বর্ত্তমান চঞ্চল মনও বর্ত্তমানে দেহ রাজ্যের নামেমাত্র রাজা হইয়া রহিয়াছেন। বর্ত্তমান মনের পুত্ররূপী ও আসুরিক ভাবরূপ রিপুকুল প্রধান হইয়া নিজের সমস্ত কার্য্য মনেরই কৃত বলিয়া বর্ত্তমান মনের উপর সমস্ত আরোপ করিতেছে। এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া রামায়ণ, মহাভারত এবং সমগ্র পুরাণ বাহ্যিকভাবে রচিত হইয়াছে জানিবে। যেমত বাহ্যিকভাবে বিদ্যাসুন্দর রচিত আছে।

জীবরূপী সাধক সুন্দর, স্থির মনের কন্যারূপা আত্মবিদ্যা লাভের জন্য মালিনীর গৃহে, মালিনী শব্দের অর্থ ভগবতী দুর্গা আদ্যাপ্রকৃতি, ইঁহার গৃহ স্ব স্ব শরীরে জীবগণের আপন শরীরাভ্যন্তরে মেরুগহ্বরের মধ্যে সুষুম্নামার্গে মেরু গহ্বরের মধ্যস্থিত মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র (ভ্রূমধ্য) পর্য্যন্ত একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা মলিন হইয়া রহিয়াছে। (ইহা শবচ্ছেদ করিয়া দেখা যাইতে পারে) উক্ত মেরু মধ্যস্থিত সুষুম্না গহ্বরের পরিষ্কার সাধন জন্য, জীব স্ব-শরীরে সহজ ক্রিয়ার দ্বারায় সুষুম্না গহ্বর রূপ গুহাকে সহজ ক্রিয়ারূপ সহজ বায়ু দ্বারায় ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া আজ্ঞাচক্রস্থিত বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়া বিদ্যার সহিত মিলন লাভ করেন, জীবের সহিত বিদ্যার মিলন লাভে জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির নাশ হইযা বিদ্যার গর্ভ হইল, অর্থাৎ এই অবস্থায় প্রকৃষ্ট রূপে আমি আমার বোধ রহিত হইয়া প্রবোধরূপ পুত্র হইয়া থাকে, প্রবোধ অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞানলাভ। ইহাই বিদ্যা সুন্দরের মোটামুটি তাৎপর্য্য।

গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেম

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের ও গোপবালকগণের যে রূপ প্রেম বা ভালবাসা বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের বিরহে গোপীরা সময়ে সমযে মৃতপ্রায় হইতেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সপ্তাহের মধ্যে একবার কেহ কি গুপ্ত ভাবেও যাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আসিতে পারিতেন না? তাহা যখন কেহ যান নাই তখন গোপীদিগের বা গোপবালকগণের প্রেম বা বন্ধুভাব কোথায়? আমার যদি কোন পরম বন্ধু দুই তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করেন তাহা হইলে আমি বোধ হয় প্রত্যহ না পারি অন্ততঃ সপ্তাহে দুই তিন দিন যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাতে যদি বলি যে গোপীরা স্ত্রীজাতি মাত্রেই অভিমানিনী, গোপীরা অভিমান ভরেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান নাই তাহাতে আর দোষ কি? দোষ যে একেবারেই নাই তাহা নহে। কারণ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবেই দেখিযা থাকিতেন। সাধ্যা পতিব্রতার

নিজ পতির নিকট অভিমান থাকা সম্ভবপর নহে। তাঁহারা তো আর এখনকার মত স্ত্রীলোক ছিলেন না, যে সর্বদাই অভিমান ভরে অহঙ্কারে পূর্ণ থাকিতেন। আরও বিশেষ মীনের জলের প্রতি যে রূপ প্রেম, পতিব্রতার পতির প্রতি সেইরূপ প্রেম। মীন যেমন জল ছাড়া হইলেই প্রাণত্যাগ করে, পতিব্রতাও সেইরূপ পতিছাড়া হইলেই পতির অভাবে দেহত্যাগ করিয়া থাকে। কই শ্রীকৃষ্ণকে দূরে রাখিয়া কোন গোপীই তো দেহত্যাগ করে নাই। তখন গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের বাহুল্য কোথায়? আজকালও ঐ রূপ প্রেমের বা ভালবাসার ছড়াছড়ি, সাধারণ নারীগণের ভিতরেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এমন স্থলে গোপীদিগের প্রেম আমার অনুকরণীয় হইবার যোগ্য নহে, যশোদারই বা পুত্রস্নেহ কিরূপ। গোপীরা না হয় অভিমান ভরে বসিয়া রহিল, কিন্তু যশোদা, মার প্রাণ, তিনিও কি একবার তাঁহার প্রাণ গোপালকে স্নেহবশে দেখিতে আসিলেন না, তাঁহার মাতৃস্নেহই বা কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি না। দেবকী হইলে বোধ হয় থাকিতে পারিতেন না। সুতরাং যশোদার পুত্র স্নেহ যেরূপ হওয়া উচিৎ ছিল, তাহা ছিল না ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে। বন্ধু বান্ধব না হয় সন্ধান না লইতে পারে, কিন্তু পিতা মাতা নিজ সন্তানকে না দেখিয়া কখনও থাকিতে পারে না, পুত্র স্নেহ বশতঃ পিতা মাতা যদি নিজ প্রাণ দিয়াও পুত্রকে পান, তাহাতেও কুন্ঠিত হন না, ইহাত কোনো কোন ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নন্দ যশোদা মান অভিমানভরে মধ্যে মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন জন্য যাইতেন না, যাহাদের এত মান মর্য্যাদা বোধ ও অহংকার বোধ থাকে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ যে কোনও কালে হইতে পারে সে বিষয়ে আমার দারুণ সন্দেহ। আমার বিশ্বাস নিজ মান মর্য্যাদা যাহারা অত্যধিক প্রত্যাশা করিয়া থাকে তাহাদের নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন বা প্রাপ্তি হইতে পারে না। এমন অবস্থায় গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল আমি বিশ্বাস করি কি রূপে?

এই সকল কারণে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে লোকে যেমন কৃষ্ণ যাত্রার পালা সাজাইয়া এবং অভিনয় করিয়া সাধারণের চিত্তরঞ্জন

করিয়া থাকে তদ্রূপ কোন পন্ডিত কর্তৃক গ্রন্থ রচিত হইয়া সাধারণের নিকট বাহ্যিকভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এবং জ্ঞানী বুদ্ধিমান সাধক মাত্রেই ইহা যে মর্মে মর্মে সত্য তাহা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সে জন্য আমিও ইহার সার মর্মটুকু গ্রহণ করিয়া খাতার কলেবর বৃদ্ধি বৃথা করিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া এইখানেই উপসংহার করিলাম।

গোপীগণের ভগবৎ প্রেম

"কবীর ইহ তনকো দীয়লা করোবাতি মেলো জীউ।
লোহু সিচো তৈল করি তব মুখ দেখো' পিউ।।"

এই শরীরকে প্রদীপ কর, জীবনকে শলিতা কর আর শরীরের রক্তকে তৈল কর। তাহা হইলেই প্রিয়তম স্বামীর মুখ দেখিতে পাইবে।

উত্তম পুরুষকে দেখিতে হইলে বাস্তবিকই তো এই শরীরকে দীপ করিতে হইবে। জীবনকে বাতি, রক্তকে তৈল করিয়া সাধনা করিতে পারিলে তবে এই দেহের মধ্যে পরমপুরুষের জ্যোতিঃদেখিতে পাইবে। তাহার মানে এই — সাধককে সাধনায় অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইবে, ক্লান্তি বোধ বা কষ্টবোধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। 'হাসি খেলা নিয়ে মিলে তে কৌন দুহাগিনী হোয়।'

হাসি খেলায় মত্ত থাকিবে এবং প্রিয়তমকেও পাইবে — ইহা কখনও হয় না। তাই বলের সহিত সাধনা বা ক্রিয়া করিলে নারায়ণের সুস্মিত সুন্দর মুখ দর্শন হইয়া থাকে (কূটস্থের মধ্যে উত্তম পুরুষের দর্শন লাভ করিতে হইলে সাধককে এইরূপ সচেষ্ট হইতে হইবে)। যাহার ভগবানে প্রেম সুতীব্র তাহার ভগবদ্ বিরহের বেদনাও

সেইরূপ সুতীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। ভগবানের অভাব বোধ হইতেই বিরহের সঞ্চার হয়। ভক্তের এজন্য এই বিরহ হওয়া চাই। কবীর বলিয়াছেন —

"কবীর বিরহ বিনা তন শূন্য হৈ বিরহ হৈ সুলতান।
যা ঘট বিরহ ন সঞ্চরে, সো ঘট জানু মশান।।"

অর্থাৎ যে শরীরে ঈশ্বর প্রেমের বিরহ নাই সে শরীর শূন্য। ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য এই বিরহই সুলতান অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবদ্ বিরহে যে শরীর (মনঃপ্রাণ) জ্বলিয়া খাক্ না হয়, সে শরীর শ্মশান তুল্য জানিবে অর্থাৎ সে দেহে আর ভগবদ্ সাক্ষাৎ কারের সম্ভাবনা নাই।

তাই সাধককে পরমানন্দ লাভের অধিকারী করিবার জন্যই ভগবান বিরহ পাঠাইয়া দেন। এই বিরহ বেদনাই গোপীদের অন্য এক জগতে লইয়া গেল। এই বিরহ গোপীদিগের মধ্যে কিরূপভাবে প্রকটিত হইতে লাগিল, তাঁহারা সেইসময় কি করিতে লাগিলেন তাহাই বলিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের গতি ও হাস্য নিরীক্ষণ এবং তাঁহার বাক্যালাপাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া তন্ময় হইয়া গেলেন। এইজন্য আপনারাই কৃষ্ণের ন্যায় গমন, হাস্য, নিরীক্ষণ ও বাক্যালাপ করিতে করিতে নিজ নিজ নাম, রূপ বিস্মৃত হইয়া 'আমিই কৃষ্ণ' বলিয়া পরস্পরকে পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এইরূপ ভুল হইবারই তো কথা। যাঁহাকে সমস্ত মন-প্রাণ অর্পণ করা হইয়াছে, আর যে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না এই কথা যখনই তাঁহাদের মনে উদিত হইল তখনই তাঁহাদের মন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, বিরহতাপে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ভাবিলেন আর বুঝি ভগবানকে খুঁজিয়া বাহির করা যাইবে না। কিছু আগেও যাঁহাকে পাওযা

সহজবোধ হইতেছিল, এখন তাঁহাকে পাওয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের মত অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। ঠিক এই অবস্থায় অধিকাংশ সাধক আর নিজ নিজ সাধন শক্তির উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়েন। গোপীকারাও তদ্রূপ হতাশায় ভাঙিয়া পড়িলেন। তাঁহারা আকুল চিত্তে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন — ঠাকুর! আর তো তোমাকে পাইব বলিয়া আশা করিতে পারি না। আমাদের শরীরের বল, মনের বল, উৎসাহ, চেষ্টা, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, প্রক্ষীণ হইয়া গেল। এখন তুমি যদি দয়া না কর আমাদের তো এমন কোন শক্তি নাই যে তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। হে মহাবাহো! কোথায় তুমি লুকাইলে — এইকথা যদি এই আর্ত অনাথাদিগকে বলিয়া না দাও তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া তোমার অবস্থিতির স্থান নিরূপণ করিব? হে সখা, আমরা যে বড় ব্যথিত, বড় তাপিত হইয়াছি। তোমার অবস্থিতির স্থানটি কোথায়, একবার এই দাসীদিগের প্রতি কৃপা করিয়া বলিয়া দাও।

ভগবানকে ভক্ত কোথায় অন্বেষণ করিবে? কোন স্থানটিতে যাইলে তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় তাহা তো ভক্তের জানা নাই। কিন্তু ভগবান যে দয়ার সিন্ধু, ভক্তের দুঃখ ও ব্যথা দেখিযা তিনি তাঁহারই হৃদয়াসনে বসিয়া অঙ্গুলী সংকেত দ্বারা ভক্তের গন্তব্যস্থলটিকে দেখাইয়া দেন। ভক্তের জন্য তাঁহার এই দরদ, ভগবানের এই অসীম করুণার কথা যখনই তাঁহাদের মনে পড়িল, গোপীরা তখনই আবার কৃষ্ণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে যিনি মুখ্য সাধিকা, যিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, তাঁহার দর্শন পাইলেন। তাঁহার নিকট গোপীরা তাঁহার সমাদর এবং তাঁহার গর্ব হেতু অপমানের কথা বিদিত হইয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তখন তাঁহারা বিজন অরণ্যের মধ্যে কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

অনন্তর গোপীরা যতদূর জ্যোৎস্না পাইলেন ততদূর পর্যন্ত কাননের ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। পরে প্রগাঢ় অন্ধকার লক্ষ্য করিযা কৃষ্ণান্বেষণে

নিবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিকই হৃদয়ারণ্যে ভক্ত সাধকের তমঃ প্রবেশ করিলেই আর সে হৃদয় দ্বারা কৃষ্ণান্বেষণ হয় না। এই তমান্ধকার হইতে সাধককে নিষ্কৃতি লাভ করিতেই হইবে। কারণ সে বস্তু যে "তমসঃ পরস্তাৎ" -- একটু হৃদয় মল থাকিলেও তাঁহাকে আর দেখা যায় না। তাই গোপীকারাও তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু কৃষ্ণ দর্শন লালসা তো তাঁহাদের নষ্ট হয় নাই, বরং সে লালসা আরও তীব্রতরই হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইযা থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা মনে মনে স্থির করিলেন হয় কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, নয় আত্মদর্শনের প্রগাঢ় চেষ্টায় এই দেহকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত আবার তাঁহারা সাধনাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন কিন্তু নিজ নিজ গৃহের কথা সে সময়েও তাঁহারা স্মরণ করিলেন না। ভগবানকে পাইতে হইলে ধন, জন, গৃহের প্রতি এইরূপই আসক্তিশূন্য হইতে হয়। গোপীকাদের সে তীব্র বৈরাগ্য ছিল, কারণ কৃষ্ণদর্শন সহজে হয় না। কৃষ্ণকে পাইতে হইলে বৈরাগ্যের মাত্রাও তীক্ষ্ণতর হওয়া আবশ্যক। সাধকের ভগবৎ প্রাপ্তির আশা যত তীব্রতর হইতে থাকে, ততই কৃষ্ণকথায় আরও গভীর শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানকে পাইতে হইলে সাধনা কত গভীর , কত তীব্র হওয়া উচিত তাহা অনুধাবন করিয়া প্রত্যেক সাধকেরই সাধনায় দৃঢ় প্রযত্নশীল হওয়া আবশ্যক। এই প্রযত্নশীলতার মধ্যে কোন হতাশার ভাব না রাখিয়া কৃষ্ণভাবই একমাত্র পাথেয় সম্বল করিয়া সংসাররূপ গৃহ হইতে মনকে ভগবন্মুখী করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এইভাবে অগ্রসর হইলে অচিরেই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া সাধক পূর্ণমনস্কাম হইবে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ কে ?   ইনিই ভগবান আত্মনারায়ণ কূটস্থ চৈতন্য।

গোপীকারা কে ? - যাঁহারা ভগবানকে পাইবার আশায় গোপনে

সাধনা করিয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে এই পুস্তকে বহুস্থানে বহুভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনে নিবৃত্ত হইলাম।

ভবব্যাধি ও তাহা হইতে মুক্তির উপায়

নানাবিধ দুষ্কর্ম্মদ্বারা আমার এই শরীর মন হইতে প্রতিনিয়ত উত্থিত পূতিগন্ধ কিরূপে বিদূরিত হয়, কেহ কি বলিয়া দিতে পারে? হে সজ্জন, সদাশয় সাধুগণ! ইহার ঔষধ কি তোমাদের কাছে আছে? ঐ শুন, পরম কারুণিক শাস্ত্রকার ঋষিগণ আমাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন, ওগো চিররোগী, হৃতস্বাস্থ্য পথহারা ভ্রান্ত পথিক! তোমার সর্বাঙ্গ যে ব্রণে পরিপূর্ণ। বড় বিকট দূর্গন্ধ তাহা হইতে উত্থিত হইতেছে, তুমি কি তাহা এইবার বুঝিতে পারিয়াছ? এতদিন রোগকে রোগ মনে কর নাই. কেবল ঔদাস্য অবলম্বন করিয়াছিলে। আজ সে রোগ বীজাণু সমস্ত শরীর মন দূষিত করিয়া দিয়া জীর্ণ করিয়া দিয়াছে। যদি তোমার দুর্দশা এইবার বুঝিয়া থাক, তবে একবার হৃদয় জুড়ানো নয়ন ভুলানো ঐ জ্ঞান সরোবরের দিকে তাকাও, একবার তাহাতে অবগাহন কর, একবার তাহার মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দাও। তাহা হইলে তোমার দেহ মনের বিবিধ ক্ষত ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজরাশি এবং তাহা হইতে অসহ্য বৃশ্চিক দংশন জ্বালাবৎ অনুভূতি হইতে মুক্তিলাভ করিবে। একবার সব ভুলিয়া সেই স্বচ্ছ নীরে নামিয়া যাও আর মুখে বলিতে থাক "হরে মুরারে মধু কৈটভারে", আর একবার ঐদিকে তাকাইয়া দেখ — জ্ঞানসরোবরের মধ্যস্থলে তাহার অগাধ জলরাশি ভেদ করিয়া কি সুন্দর, কি শোভাময়, কি অপরূপ কমল ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহাই চক্ষু মেলিয়া দেখ দেখি, দেখিবে তাহার অপূর্ব সুষমায়, অনন্ত সৌরভে, তাহার স্নিগ্ধ কিরণে দিক্‌দিগন্ত ভরিয়া উঠিয়াছে, ভক্তির মৃদু পবন হিল্লোলে প্রভাবিত হইয়া উহার অপূর্ব

সুগন্ধ তোমার দেহ মনে পবিত্রতার অমোঘ ঔষধ অনুলেপন করিয়া দিতেছে। ঐ দেখ, তোমার ক্ষত শুকাইযা গিযাছে। তোমাকে এইবার কত সুন্দর কত মনোহর দেখাইতেছে। তোমার দেহ মন প্রাণকে যেন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐ দেখ, শরীরের (কেলিমল, অহংকার, অবিশ্বাস, কপটতা, পরদ্রোহ, ব্যাভিচার) মধ্যে কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যস্থানে দেখ, কি অপূর্ব সুরভি মোদিত কমলিনী, তাহার কি সুন্দর স্নিগ্ধ গন্ধ! উহাই গীতা। যখন গীতা বুঝিতে পারিবে, গীতার অপূর্ব সুষমায় মুগ্ধ হইয়া যাইবে, তখন তোমার জীবনটাও একটি সুন্দর পদ্মে পরিণত হইয়া যাইবে। তুমি তখন সেই শোভায় ভরা, গন্ধে ভরা হৃদয কমলটি ঐ শ্রীগুরু চরণে অঞ্জলি দিও, কৃতার্থ হইয়া যাইবে। ঐ গুরুই শ্রীকৃষ্ণ, সব গুরুই শ্রীকৃষ্ণ। অত করিয়া না টানিলে কেহ কি সে দেশে যাইতে পারে?

কমলা প্রতিনিয়ত যাঁহার চরণ সেবা করিয়া থাকেন, সেই ষড়ৈশ্বর্যবান ভগবান রমাপতি শ্রীকৃষ্ণবন্দনা করিলে যে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে মন দ্বারা প্রতিনিয়ত তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণতঃ হয়, সে পঙ্গু হউক, বাকশক্তি বিহীন অথবা বধির হউক না কেন, তদপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যশালী আর কেহই থাকিতে পারে না। অবশ্য এইসব দুরদৃষ্ট বিদূরিত হইতে চক্ষের পলক ফেলিতে যেটুকু "বিলম্ব হয়" ততটুকু সময়ও লাগে না। তবে পৃথিবীর কত ভক্ত, কত জ্ঞানী যে অজস্র কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদের দুঃখ তো দূর হইতে দেখা যায় না। তাহার কারণ ভগবানের সামর্থ্যের অভাব হয়, ইহা নহে। প্রকৃত ভক্ত সাধক যে এপ্রকার দয়ার প্রার্থী নহেন। তিনি চান কেবল তাঁহার ভজনানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে। অন্ন জুটিল কি না জুটিল, দুঃখ ঘুচিল কি না ঘুচিল, এজন্য তিনি তিলমাত্রও চিন্তা করেন না।

এইজন্য ভক্ত কবীর সাহেব বলিযাছেন - "ভক্তি ও ভেকে বড তফাৎ, ঠিক যেমন পৃথিবী ও আকাশে ভেদ। যিনি প্রকৃত ভক্ত

তিনি আত্মারামের শরণাগত হইয়া কেবল তাঁহারই ধ্যানে মগ্ন থাকেন, বাহ্য জগতের লাভালাভের প্রতি তাঁহার কোন আকর্ষণই নাই। আর যে সাজ পরা ভক্ত সে কেবল জগতের লাভালাভের দিকেই তাকাইয়া থাকে। এইরূপ বহু প্রমাণ আমরা বর্তমানে পাইতেছি ও পাইয়া থাকি। দাঁড়কাক ময়ূর পুচ্ছ সজ্জিত হইলেও ময়ূরের মত সুমধুর কণ্ঠ তাহার নাই।

স্বকেন্দ্রে ফিরিয়া যাওয়ার উপায়

গুরূপদেশ মত অকৈতবভাবে সাধনা করে, সাধনার উদ্দেশ্য কোন ফল প্রাপ্তি নহে, কেবল তাঁকে প্রাপ্তি এইরূপ মনে ধারণা করিয়া ভজনা করে, সে জগতের অন্য সব কথা ভুলিয়া যায়, তাঁহাকে ভিন্ন তাহার আর কিছুই মনে থাকে না - এইভাবে ভজনা করিতে করিতে সে উত্তম পুরুষকে ঠিক দেখিতে পায়, তখন সব বন্ধন তার মিটিয়া যায়, তখন সে সর্ববিদ্ হয়। কারণ সকল বস্তুতেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাকে যে জানিল সেও ব্রহ্মরূপই হইয়া গেল। "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।" সর্বত্র ব্রহ্ম দৃষ্টি না হইলে, সর্বের সহিত নিজেকে না মিলাইতে পারিলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায় না। সর্বজ্ঞ পুরুষই সর্বভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারেন। চিত্ত একান্ত হইলে যখন তাহাতে অন্য কোন বৃত্তির উদয় নাই তখনই সর্বগত বাসুদেবের ভজনা হয়। সর্বভাবে ভজন করিতে করিতে 'সর্ব' অর্থাৎ নামরূপ মিটিয়া যায়, তখন দ্বিতীয় বস্তুর কোন ভাণ থাকে না, এমন কি জ্ঞাতৃ ভাব পর্যন্ত থাকে না। প্রথমতঃ সর্বত্রই নিজেকে দেখিতে পান, পরে সর্ব বলিয়াও কিছু থাকে না, সর্বের অনুভবও মিটিয়া গিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সে ভাব তখন বুঝিবার জন্যও দ্বিতীয় কেহ থাকে না। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থা অল্প অল্প উদয় হইতে থাকিলে একটা নেশার মত ভাব হয়, তাহাতে প্রথম প্রথম সব বস্তুই মনে পড়ে, কিন্তু কোন বস্তুর প্রতি মন জমে না। ক্রমে আর কোন বস্তুই মনে পড়ে না, তখন সব হইতে মন সংহৃত হইয়া মনের মধ্যে মন জমিয়া বসে,

তখন আর সঙ্কল্প বিকল্পের কোন ঢেউ উঠে না। মন যে আছে সঙ্কল্প বিকল্প না থাকায়, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পরে সে ভাবও ডুবিয়া যায়, তখন এক অবিজ্ঞাত রাজ্যের পর্দা খুলিয়া যায়। যে জ্ঞান পূর্বে ছিল না, যে দৃশ্য পূর্বে দেখা যাইত না, যে শব্দ পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই - তাহাই বোধের বিষয় হয়। পরে সে অলৌকিক বোধও আর থাকে না। তখন সব বোধ একের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক হইযা যায়, যেমন সব নদী সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহারা সমুদ্রই হইয়া যায়, তাহাদের আর পৃথক নামরূপ থাকে না, তদ্রূপ উহাই গুণাতীত ব্রহ্মভাব। ভগবানের সেই যে রূপ তাহা কোন আকৃতি নহে, তাহাই অরূপের রূপ। মন যাহাকে দর্শন করিলেই পরম তৃপ্তিলাভ করে যাহাতে সমস্ত শোক তাপ দূর করে। তাই ভগবানের কোন মায়িক রূপদর্শনই সাধনার শেষ ফল নহে। তাঁহার স্বরূপে নিত্যস্থিতি ও সেই স্বরূপে নিজেকে ডুবাইযা দেওয়াই ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা, এবং সেই ভাবই নিজ বোধরূপ জ্ঞান স্বরূপ। তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারাই ভগবদ্ভজনার সর্বোত্তম ফল। এই স্থিতির নামই ক্রিয়ার পর অবস্থা। তাঁহার অলৌকিক শক্তিকার্য্যরূপে এই দৃশ্যজগৎ ভাসিত হইতেছে। মন এই প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করে ও ভোগ করে, কিন্তু সমস্ত দৃশ্যের মূলে যে একটি বিন্দু রহিয়াছে, সেই বিন্দু বা কেন্দ্রমূলে ফিরিযা যাওয়াই কার্য্য জগতের অতীত বা পরাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। সেখানে আর নানাত্ব নাই। কল্পনার বহুমুখী প্রকাশই বাহ্যজগৎ, মনের স্বরূপ মূর্ত্তি; সেই কল্পনার মূল মন স্বকেন্দ্রে ফিরিয়া গেলে তাহার বহুমুখী প্রকাশের অভাব হয়। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান বা যোগ। এই যোগাভ্যাস সকলেরই কর্তব্য, যোগাভ্যাস ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি কিছুই লাভ হয় না। যোগাভ্যাস আত্মদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায। অন্য কোন বলই যোগবলের তুল্য নহে। যোগবলবিবীন ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয জয়ে অসমর্থ হইয়া বিষয়ে নিমগ্ন হয়।

প্রমাণ ঃ-

প্রাণের স্থিরতা হলে মন স্থির তবে।

মনস্থিরে বুদ্ধিস্থির আপনিই হবে।।
প্রাণস্থিরে মনস্থির হইবে যখন।
দিব্যধাম প্রকাশিত হইবে তখন।।
মধ্যপথে বহিঃপ্রাণ হইলে নিশ্চল।
চরমে পরম বোধ হবে সুবিমল।
প্রাণের বিচেষ্টা যাবে সঙ্কল্প মনের।।
ভাতিবে অপূর্ব জ্যোতিঃ জ্ঞান ভাস্করের।।
প্রাণস্থিরে মনস্থির হইলে তোমার।
বিন্দুস্থির দেহস্থির হবে পর পর।।

অক্ষর মধ্যে অকার

শ্রীভগবান কূটস্থ চৈতন্য বলিতেছেন অক্ষর অর্থাৎ বর্ণ সমুদয় বর্ণমালার মধ্যে ৪৯টি বর্ণ আছে; দেহের মধ্যেও ৪৯টি বর্ণ আছে তাহাই ৪৯টি বর্ণ বিশেষ। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত এই বর্ণের পরিচয় কেহ জ্ঞান করাইতে পারে না। উক্ত ৪৯ বায়ুরূপ বর্ণ সমূহের মধ্যে সুষুম্না নাড়ীস্থিত স্থির বায়ু অ কার স্বরূপ। পিঙ্গলা নাড়ীস্থ বায়ু-ম কার স্বরূপ। ইড়া নাড়ীস্থ বায়ু উ কার স্বরূপ। অ কার বিষ্ণু উ কার শিব, ম কার ব্রহ্মা, অর্থাৎ সুষুম্না মধ্যস্থ স্থির বায়ুই বিষ্ণু। এ কারণ বলিতেছেন বর্ণ সমুদয়ের মধ্যে আমি অ কার।

সমাস সকলের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব; সমাস অর্থে দ্বি বা বহু পদকে এক পদী করণ, এই সমাস ছয় প্রকার (যথা দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু, অব্যয়ীভাব) ষষ্ঠ প্রকার সমাসের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ দ্বিভাগের মিলন (জোড়) ভাব যাহা তাহাকেই দ্বন্দ্ব বলে (যেমন স্ত্রী পুরুষ) পুরুষ ও প্রকৃতি রূপ দ্বিভাগের মিলন অবস্থায় (পুরুষ প্রকৃতি যুক্ত ভাবরূপ অবস্থাই) দ্বন্দ্ব পদবাচ্য; সমাস সমূহের মধ্যে আমি ঐ পুরুষ প্রকৃতি মিলন (যুক্ত) অবস্থা রূপ দ্বন্দ্ব। আমি প্রবাহ রূপ অক্ষয় কাল অর্থাৎ কাল অর্থে সময়, অজপারূপ

কালের অতীতাবস্থাই অর্থাৎ গতি রহিত স্বতঃ স্থির অবস্থাই অক্ষয় কাল এবং উহাই প্রবাহ রূপ (অবিচ্ছেদরূপ) কাল; যেহেতু উক্ত স্থিরতার প্রাপ্তি হইলে সে ভাবের আর বিচ্ছেদ নাই। ঐ বিচ্ছেদ রহিত স্থির প্রাণই আমি; তাই উক্ত হইতেছে আমি প্রবাহ রূপ অক্ষয় কাল। আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা অর্থাৎ সর্ব্ব বিষয়ের সৃষ্টি কর্ত্তা রূপ বিধাতা, বায়ুই হইতেছেন ধাতা স্বরূপ (যথা - বায়ু বায়ু বলং বায়ু বায়ুর্ধাতা শরীরীনাম্ ইত্যাদি) দেহ মধ্যে নভঃ প্রাণ নামে এক বায়ু আছে, ঐ বায়ু বিশুদ্ধ চক্রস্থ ১৬ দল পদ্মের ৭ম দলেতে রহিয়াছে, উক্ত বায়ুই হইতেছে ধাতা কারণ কন্ঠের ঊর্দ্ধেতে স্থিরভাব, ঐ কন্ঠ হইতেই প্রাণের চঞ্চল ভাব হইয়া পরে অজপার বিস্তাররূপে সর্ব্ব বিষয়ের ব্যক্তভাব রূপ সৃষ্টি বিস্তার হইতেছে, প্রাণরূপী আত্মাই উক্ত বায়ুরূপে সর্ব্ব সৃষ্টি ব্যক্ত করিতেছেন তাই তিনিই বিশ্বতোমুখ ধাতা।

আত্মা অণু হইতে অণু বৃহৎ হইতে বৃহৎ

এই আত্মা অবদ্ধ, অমৃত স্বরূপ, অণু হইতে অণু, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর। ক্ষুদ্রত্ব নিবন্ধন তুমি তোমার ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা তাঁকে গ্রহণ করিতে পার না। বিজ্ঞানের ভাষায় অণু বলিতে যদি ইংরাজী মলিকিউল, তার চেয়েও ছোট অ্যাটম, তার চেয়েও ছোট প্রোটন, নিউট্রন, ইলেক্ট্রন, আরও কত কি আছে - আমরা স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরিতে পারি না। ধরিবার জন্য মনন শক্তির সহায়তা নিতে হয়। আবার ঐগুলিকে যদি আরও বিশ্লেষণ করা যায় তবে মনন শক্তির কাজ বন্ধ করে ফেলে ভাবে সমাহিত হইতে হয়। ইন্দ্রিয় সমূহের ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব গ্রহণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই আত্মা যেমন অণু হইতে অণু তেমনি আবার বৃহৎ হইতে অতিবৃহৎ, ইন্দ্রিয় ক্ষমতার বাহিরে। এই আত্মা আমাদের ভাবলোকের জ্ঞাতা হয়ে আমাদের অস্তিত্ববোধের সাক্ষীরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছেন চিদাকাশে। যদি আমরা ভাবময়

সত্তাকে বৃহৎ ভাবের দিকে নিয়ে যাই তাহলে বৃহৎ ভাবে ভাবিত হওয়ায় ক্ষুদ্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, তাঁর থেকে আমাদের পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। আবার যদি তাঁর অণু হইতে অণুতর ভাবের দিকে আমরা ভাবময় সত্তাকে নিয়ে যাই, তাহা হইলেও আমাদের মন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, এই যে তিনি, তাঁকে পাওয়ার ভাব নিতে গেলে মনের চঞ্চলতা সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের কামনা বিহীন হতে হবে, তখন আমাদের খন্ডের মোহ কেটে যাবে। ভূমার প্রসাদ আমাদের উপর বর্ষিত হবে, মন স্থিতিলাভ করবে সুখ দুঃখের পরপারে পরম প্রশান্ত ধামে (যাহাকে গীতাতে কূটস্থ চৈতন্য বলা হয়)। তখন আমরা হব প্রকৃত সত্যিকারের বীতশোক, তখনই আমরা বুঝিব সেই মহিমময় পরমাত্মাকে। তদগ্রে তাঁহার ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব সম্বন্ধে কিছুই অনুধাবন করিতে পারিব না, কারণ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গণের যে সীমাবদ্ধ জ্ঞান তাহার দ্বারা তাঁহার ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কামনা বাসনা থাকিতে ভগবান বহুদূরে

সাধক ক্রিয়া করিতে করিতে মনে করেন বাঃ বাঃ আজ কেমন শব্দ শুনিলাম, আজ কি উজ্জ্বল চিত্র সব দেখিলাম, এইবার বুঝি পৌঁছে গেলাম। কিন্তু তা নয়, তা নয় - ''ইহ বাহ্য আগে কহ আর''- এ সবকে টপকাইয়া যাইতে হইবে। দেখাশুনার প্রবৃত্তি যতক্ষণ, ততক্ষণ বৈরাগ্য আসে নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং শুদ্ধবুদ্ধি বহুদূরে। শুদ্ধ বুদ্ধির উদয় না হইলে কি দিয়া তাঁহাকে দেখিবে বা বুঝিবে? বুদ্ধিতে এই মোহ লাগিয়া আছে, তাহা ছাড়াইতে হইলে দুমাস, ছমাস বা দুবছর পাঁচবছর বা দুচার ঘন্টার সাধনার কর্ম নহে। বাসনা তো মনের কাজ, মনটি এমন হইবে যে তাহা হইতে আর বিষয় বাসনার ঢেউই উঠিবে না। সে মনে কেবল ব্রহ্ম বাসনাই জাগিবে অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ হইতে থাকিবে, রসায়ন দ্বারা যেমন রোগ নষ্ট হয়, এই ''রাম রসায়ন'' দ্বারা তখন অবিদ্যা বিক্ষেপ সমূলে

উৎপাটিত হইয়া যাইবে .এই রাম, যিনি দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে রমণ করেন, সেই আত্মারাম বাবাজীর কাছে পৌঁছাইতে হইবে। সে আর এ তা খুঁজিলেই চলিবে না, এ তীর্থ সে তীর্থ করিয়া বেড়াইলেও চলিবে না। একবারে ব্রহ্মান্বেষমান দৃষ্টি হইবে, তবে তাঁর কাছে পৌঁছিতে পারিবে। তখনই বুদ্ধি হইতে মোহ গলিয়া বাহির হইয়া যাইবে। তখন এ সব শব্দ বা দৃশ্যাদির জন্য কোনও ক্ষোভ থাকিবে না। শ্রুতি বলিয়াছেন - ''পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণোনির্বেদমায়াৎ'' যাঁহারা সেই ব্রহ্মপদ চান, তাঁহারা স্বর্গাদি সুখ সকলকে তুচ্ছ বলিয়া জানিয়া এই সকল প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্খা না করিয়া তাহাতে বীতরাগ হইবেন। দেহ বা গুণাদিতে মন খেলা করে যতক্ষণ ততক্ষণ এ সবকে তুচ্ছ বোধ হয় না, কিন্তু যাঁহারা ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের চিত্ত নেশাখোরের মত ভোঁ হইয়া থাকে। এই সব ছাই ভস্মের জন্য তাহাদের প্রাণ তখন মোটেই ব্যাকুল হয় না। এ অবস্থা সাধকের কখন হয় তাহাই বলিতেছি। প্রাণায়াম পরায়ণ ক্রিয়াশীলের বাহিরের হাওযা বাহিরেই থাকিবে, চক্ষু ভ্রূর মধ্যে থাকিবে, পলক পড়িবে না। প্রাণ (ফেলা) আর অপান (টানা) দুই সমান থাকিবে, নাকের মধ্যে বায়ু সঞ্চরণ করিবে, ইন্দ্রিয় সকল কাজে কাজেই সংযত থাকিবে। মন এবং বুদ্ধি তাহাও সংযত থাকিবে। এরূপ যে সকল লোক তাঁহারা মোক্ষপরায়ণ নিষ্ক্রিয় ইহারই নাম জীবন্মুক্তি, বেঁচে থেকে মুক্তি। ইচ্ছা রহিত, ভয়ক্রোধ রহিত হইয়া যিনি থাকেন তিনি সদাই মুক্ত। ইহাকেই আত্মার সহিত একাকারে অবস্থিত চিত্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহা কিরূপ? নির্বাত স্থানের প্রদীপ যেমন বিচলিত হয় না, আত্মাবিষয়ক যোগাভ্যাসকারী সংযত চিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের ইহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া কথিত হয়। নিষ্কম্পতা, ও প্রকাশকতা বশতঃ নির্বাতস্থ দীপের মত যোগীর চিত্ত অচঞ্চল থাকে। সে অবস্থা কেমন তাহাও বলিতেছি। যেখানে সুখের অন্ত নাই, সে সুখ বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে ও ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহে, ক্রিয়ার পরাবস্থায় থেকে এই বস্তু এই ইহা বলিয়া জানিতে

পারা যায় না। অথচ বায়ু স্থির রহিয়াছে অথচ চলিতেছে পঞ্চতত্ত্বেতে, তাহা না হইলে মরিয়া যাইত। এই অধ্যাত্ম বিদ্যাই বিদ্যা, ক্রিয়াই বিদ্যা। ইহা অনেক দুঃখেতে সম্যক প্রকারে যোগ হয় অর্থাৎ প্রাপ্তি হয়। ইহার বিশেষ রূপ ভালরূপে আটকিয়া থাকিলেই যোগ বলা হয়। তন্নিমিত্ত গুরু বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া নিশ্চয় হইয়া ক্রিয়া করা উচিৎ অন্যদিকে আসক্ত না হইয়া।

এ অবস্থা যাঁহারা পান তাঁহারা মান ও মোহশূন্য হন, ইন্দ্রিয় সঙ্গমেও দোষ শূন্য হন, সুখ-দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হন, তাঁহারাই বিবেকী পুরুষ। অতএব তাঁহারা ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য অধিকারী হন। সেই স্থান কেমন তাহাই বলিতেছি।

চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ুর গতি তথা নাই,
স্বকীয় প্রভাবে ধাম উজ্জ্বল সদাই।

প্রমাণ -

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।।

কুরুক্ষেত্রের রণনদী

ভীষ্ম, দ্রোণ যেমন এই রণনদীর তট, আমাদের ভয় ও বিক্ষেপ এই সংসার নদীর তেমনি দুইটি তট। বিবিধ কামনা এই নদীর জল। জয়দ্রথ হইতেছে জয়শীল রথ। আমাদের অসংখ্য কামনা রাশিই অধ্যাত্ম পথের বিরুদ্ধ পক্ষের বিজয়শীল রথ। কামনা যতদিন আছে, অধ্যাত্ম পথ ততদিন অর্গল বদ্ধ। সর্বপ্রকার দুষ্কর্মে দুঃসাহসিকতাই জয়দ্রথ। শল্য অর্থাৎ বহুরূপ দুর্বাক্য ভাষণই সংসার নদীর কুম্ভীর।

সদা নিন্দিত কর্মে অনুরাগ, যাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করা সম্ভব নহে। এই দুর্যোধন বা দুর্মতিই সংসার প্রবাহের ঘোর আবর্তরূপ। যে আবর্তে পড়িলে আর উঠিবার সাধ্য কাহারও থাকে না। গান্ধার অর্থাৎ শকুনি এই সংসার নদীর ঘোর দুর্নিমিত্ত স্বরূপ দুর্লক্ষণ। কৃপাচার্য্য অর্থাৎ কৃপা বা মমতা যে সংসার নদীর প্রবাহ, যাহা না হইলে নদী শুষ্ক হইয়া যায়। সংসার যাহার আদি অন্ত নাই, মমতার দ্বারাই সেই সংসারকে আমরা আঁকড়াইয়া আছি। এইজন্য কৃপা অমর। কর্ণ - অন্ধবিশ্বাস এই নদীর বেলাভূমি। অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই লোকে সংসারে আসক্ত হয়। দুর্মতি এই অন্ধবিশ্বাসের সাহায্যেই অনর্থ উৎপন্ন করে। এই অন্ধ বিশ্বাস হইতে অভিমান ও আপনার শক্তির উপর অসীম বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। একা নদী বিশক্রোশ এই বেলাভূমির জন্যই বোধ হয়। বেলা দেখিয়া মনে হয় নদী পার হওয়া বুঝি অসম্ভব। বিকর্ণ - যাহার কর্ণ নাই। যিনি সদ্‌উপদেশ শুনিয়াও শোনেন না, সবতাতেই অবিশ্বাস। অশ্বত্থামা যাহা সত্য নহে। মনে কত কল্পনা দিবারাত্র উঠিতেছে যেন কল্পবৃক্ষ অথচ এই সকল মনোবেগের স্থায়িত্ব কিছুই নাই। এই বিকর্ণ ও অশ্বত্থামা এই সংসার নদীর মকর। ইহারা তিনভাগ পার-যাত্রীকে খাইয়া ফেলেন। এই অনন্ত বাসনাবেগময়ী রণনদী আমাদিগকে যিনি উত্তীর্ণ করিয়া দেবেন তিনিই ব্রহ্মাদিরও অনুগ্রাহক কেশব। কেশব অর্থে যিনি ক্ষয়োদয় রূপ বিকার বা অস্থিরতার শান্তি কারক। তিনিই কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ সর্বহৃদয়ের অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত। মনস্থিব করিলেই চিত্তের অস্থিরতার শান্তি হয়। মনের এই শান্তি, স্থির ভাবই কেশব। সেই কেশব আমাদিগকে এই সংসাবরূপ ভীযণ যুদ্ধের বল ও সাহস দেন।

ক্রিয়া করিব কি করিব না

অনেকে আমরা পরিশ্রমের ভয়ে ক্রিয়া করিতে চাহি না। ক্রিয়া করিলে মহা মঙ্গল হইবে তাহা বুঝিয়াও আমরা মোহ বশতঃ ক্রিয়া করিতে শিথিল প্রযত্ন করিয়া থাকি। সব সাধকেরই এই দুর্দশা, হাল

ছাড়িয়া বসিয়া থাকা। "ন যোৎস্যে।" ইহা আমরা সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকি। কিন্তু গুরুদেব তো হাল ছাড়েন না। তাহার কারণ তিনি আমাদের মঙ্গলাকাঙ্খী সুহৃদ, তিনি গোবিন্দ, আমার সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। আমাকে কি করিতে না করিতে হইবে সকলই তাঁহার অধীন। ক্রিয়া করিব বলিতে যে জীব, করিব না বলিতেও সেই জীব।

শরীরে তেজ না থাকিলে এই দুই কথার কোন কথাই চলে না। এক দিকে প্রবৃত্তি পক্ষ অর্থাৎ কৌরব পক্ষ। আর একদিকে নিবৃত্তি পক্ষ অর্থাৎ পান্ডব পক্ষ, এই দুই দল। আর দুই দলের বা দুই ভাবের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি চিরজাগ্রত অন্তর্য্যামী, সর্ব্বেশ্বর এই আত্মা। তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে সর্ব্বদা জীবের পরে চাহিয়া আছেন, নচেৎ এ ভব বন্ধন কি কাটিত? একটু পরিশ্রম করিয়া সাধন করিলে ভববন্ধন মোচন হয়, কিন্তু কিছুতেই আমরা তাহা করিতে চাহি না। আমাদের এতই স্পর্দ্ধা, এতই মোহাভিভূত ভাব; কিন্তু তবুও আমাদের চিরসখা, জীবন মরণের সহচর, জীবন বন্ধু ভগবান কি একটুও রাগ করিলেন বা বিরক্ত প্রকাশ করিলেন? না তাহা তিনি করেন না। কারণ তিনি তো জীবের অন্তবাসী, তাই তখনও জীবের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তাহার কল্যাণের জন্য তাহার অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এতই অপরিসীম করুণা। সেই জন্যই ভক্ত সাধকবৃন্দ তাঁহাকে করুণা সিন্ধু বলিয়া থাকেন।

অতএব আমাদের আলস্য, মোহনিদ্রা ত্যাগ করিয়া ক্রিয়া সাধনে প্রযত্নশীল হইয়া নিজের ভববন্ধন মোচন করা কর্ত্তব্য নহে কি?

দৈব ও পুরুষকার

ক্ষর - অক্ষর

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। বাস্তবিকই দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে কোনটির প্রাধান্য অধিক তাহা

নির্ণয় করা সহজ নহে। দৈবই বীজ স্বরূপ এবং পুরুষকারই ক্ষেত্রস্থানীয়। ক্ষেত্র ভাল হইলে অপকৃষ্ট বীজও উত্তম ফল উৎপন্ন করে, ক্ষেত্র ভাল না হইলে উৎকৃষ্ট বীজও উত্তম ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হয়, কিন্তু উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কিছুই হয় না। পুরুষকার প্রবল হইলে যদি দৈব ক্ষীণবলও হয়, তথাপি হতাশ হইবার কারণ নাই। কারণ ভগবান স্বয়ং পৌরুষরূপেই প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

সুতরাং আমার কর্মোদ্যম বা আত্মচেষ্টাকে আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে বলিয়া যেন শিথিল করিয়া না ফেলি। প্রবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া দন্তে দন্ত চাপিয়া এ জন্মের শুভ কর্মের দ্বারা প্রাক্তন অশুভ কর্মফল জয় করিতে হইবে। আমার অদৃষ্ট ভাল নয় বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিৎ নহে। উদ্যোগী পুরুষ, তাহার উদ্যোগের ফলই দৈবরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইবে এবং প্রাক্তন অশুভ ফলও ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইবে।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান - এইগুলি আসুরিক সম্পদ। যাহারা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক তাহাদের ঐ গুলি স্বভাবজাত গুণ। আর যাহারা নির্ভীক, শুদ্ধচিত্ত, যাহাদের কর্মে তৎপরতা ও জ্ঞানে নিষ্ঠা আছে, যাহাদের বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত, যাহারা দান করে, যজ্ঞ করে, শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তপস্যা করে এবং যাহারা সরল, লোভহীন, দয়ালু, অক্রূর, অচঞ্চল, তেজস্বী, ক্ষমাশীল, শুচি, অনভিমানী ও অহিংসক - যাঁহাদের কুকর্ম করিতে লজ্জা হয়, পরনিন্দা, পরদ্রোহ করিতে ভাল না লাগে, যাঁহাদের চিত্ত ভগবদ্ভজনা করিতে আনন্দ পায় এবং ভজনার ফলে যাহাদের চিত্ত শান্ত ও স্থির হইয়াছে, তাহারাই দৈববলে বলীয়ান বুঝিতে হইবে। তাহাদের তপস্যা ও আত্মান্বেষণ সাফল্য মন্ডিত হইবেই। এজন্য উদ্যোগ চাই, নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভগবান গীতার মধ্যে কোনস্থানেই নিশ্চেষ্টতার প্রশ্রয় দেন নাই।

গীতার পুরুষোত্তম তত্ত্বই গীতার একটি বিশেষত্ব। এই জীব ও জগতের মধ্যে দুইটি শক্তি খেলা করিতেছে দেখা যায়। একটি স্থির ও নিত্য এবং অন্যটি চঞ্চল। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু এই স্থির বস্তুটি না থাকিলে যেটি নিত্য পরিবর্ত্তনশীল তাহার অস্তিত্বই কল্পনা করা যাইত না। এই নিত্য ও অনিত্য বস্তু দুইটির একটিকে ক্ষর ও অপরটিকে অক্ষর বলা হইয়া থাকে। আত্মার কূটস্থ অপরিণাম ভাবটিই পুরুষ এবং আত্মার বহুরূপে প্রকাশ বা পরিণামশীল ভাবটিই ক্ষর পুরুষ। এই অক্ষর অপরিণামী কূটস্থ ভাবটিকে আশ্রয় করিয়াই ক্ষর পুরুষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। অক্ষর পুরুষই আত্মার সত্যবিম্ব এবং তাহা হইতে যে সহস্র সহস্র প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয় তাহাই ক্ষরভাব। পুরুষোত্তমের সহিত অক্ষর এর বহু সাদৃশ্য আছে বলিয়া পুরুযোত্তমকেও অক্ষর বলা হইয়া থাকে। ক্ষরকেও পুরুষ বলা হয় কারণ চিতের প্রতিবিম্ব পড়িয়া তাহাকেও চৈতন্যময় করিয়া রাখিয়াছে। এই ক্ষর পুরুষ সর্বদা বহু দৃষ্টি সম্পন্ন, সেইজন্য তিনি নিজ স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এক আত্মাই বহুরূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা না বুঝিয়া যিনি নানাত্বরূপ ভেদ দর্শন করেন তাঁহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত তাঁহার কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। ইহাই প্রকৃত পক্ষে বিনাশ। আবার যত্ন পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার দ্বারাই জিতশ্বাস হইতে পারিলেই অবিনাশী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হয় না।

(সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম)

তৃতীয় সঞ্চয়ন

ধর্ম্ম জ্ঞানীর চক্ষে সবই সমান।

বেশ কিছুদিন আগের কথা। কোনও একস্থানে এক পাদ্রী সাহেব উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মের বহুবিধ উপদেশ দিতে দিতে হিন্দুধর্ম্মের নানাপ্রকার কুৎসা করিয়া বলিতে লাগিলেন হিন্দুধর্ম্ম কিছুই নহে।

উহা অতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম। উহারা যে সব মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ও বীজমন্ত্র জপ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে তপ জপ ইত্যাদি করে উহা অতীব নিকৃষ্ট; উহাতে কিছুই হয না। ·আমাদের পাদ্রীদের যে ধর্ম্ম উহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের সাধনা। আমার মতে সকলেরই পাদ্রী ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। এইভাবে নানা প্রকার লেকচার দিতে লাগিলেন। তাঁহার লেকচার শুনিয়া দলে দলে অজ্ঞ মূর্খ হিন্দুগণ পাদ্রী ধর্ম্ম গ্রহণ করার জন্য তাঁহার নিকট সমবেত হইল।

ঠিক ঐ সময়ে একজন মহাপন্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত হইযা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন সাহেব, আপনার কুকুরের কয়টি সংজ্ঞা জানা আছে? তাহাতে উক্ত সাহেব উত্তর করিলেন - পন্ডিত মহাশয়, হামি হাপনাদের বহু শাস্ত্র পডিয়াছে. কুকুরের বহু সংজ্ঞা হামার জানা আছে যেমন - ডগ, কুকুর, কুত্তা, সারমেয় ইত্যাদি। হেইতো হামি কুকুরের বহু সংজ্ঞা কহিলাম। কিছুদূরে একটি কুকুর শুইয়া লেজ নাড়িতেছিল। তখন উক্ত পন্ডিত মহাশয় কুকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন - "ও কুকুর, ও ডগ, ও সারমেয়, ও কুত্তা।" কিন্তু কুকুরের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তখন উক্ত পন্ডিত মহাশয় পাদ্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, - "কই সাহেব, কুকুরের এত সংজ্ঞা বলিলাম তবু তোমার কুকুরের তো কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। আমার বীজমন্ত্রের গুণ দেখিবে?" এই কথা বলিয়া পন্ডিত মহাশয "তু, তু, তু" বলিয়া সম্বোধন করা মাত্রই কুকুরটি ছুটিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া আসিল।

তখন পন্ডিত মহাশয বলিলেন, সাহেব, আমার বীজ মন্ত্রের গুণ দেখিলে তো? ধর্ম্মজগৎ সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞানই নাই। তুমি নিজের ধর্ম্মকেও বুঝিবার চেষ্টা কর নাই, বা নিজের ধর্ম্মও নিজে বুঝিতে পার নাই। তাহা যদি পারিতে তাহা হইলে অপরের ধর্ম্মকেও ছোট করিয়া দেখিতে পারিতে না। যে নিজের ধর্ম্মকে বোঝে এবং বিশ্বাস করে ও ভালবাসে সে অপর কোন ধর্ম্মকে ছোট করিয়া দেখে না। মহাত্মাদের চক্ষে সমস্ত ধর্ম্মই এক এবং অভিন্ন।" পন্ডিত মহাশয়ের উক্ত কথা শুনিযা যাহারা পাদ্রী ধর্ম্মের উপদেশ লইবার জন্য উক্ত পাদ্রী সাহেবের নিকট গিয়াছিল তাহারা দলে দলে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকেই পন্ডিত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল।

স্বরূপ - দর্শন।

ভক্ত সাধকবৃন্দ শ্রীভগবানের অনন্তরূপমাধুর্য্য পরিপূর্ণরূপে দর্শন করিয়া আত্মহারা হও। যাঁহার জ্যোতি চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা প্রভৃতি কণামাত্রও প্রকাশ করিতে পারে না, যেখানে বিদ্যুতের তেজ সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া যায়; যাঁহার জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে সকল জ্যোতি, সকল তেজ দীপ্তিমান হয়, যিনি সকল রূপের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ সেই মহাশক্তিময় পুরুষোত্তমের স্বরূপদর্শন করিয়া কৃত কৃতার্থ হও।

আর যদি রস বা আনন্দ পাইতে ইচ্ছা হয়, তবে সর্ব রসানন্দের আধার পূর্ণতম রস-বিগ্রহ, শ্রীরাস-রাসেশ্বর রসিকশেখর, নিত্য-নব-নটবর যুগল কিশোরের অনন্তলীলা রস মাধুর্য্য আস্বাদন করতঃ প্রেমামৃত রসার্ণবে অনন্তকালের জন্য ডুবিয়া অনন্ত মিলনে মিলিত হও। আর প্রেম কারুণ্য কন্ঠে বল ঃ-

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব।।

হে পরম পুরুষ "রত্নাকর" তোমার গৃহ, স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি তোমার গৃহিণী। তোমার তো কোন কিছুর অভাব নেই প্রভু। তবে হে পুরুষোত্তম! তোমাকে আমি কি দেব? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে যাঁরা তোমার প্রকৃত ভক্ত তারা তোমার মন কেড়ে নিয়েছেন। তাই তোমার মধ্যে একটা জিনিষের অভাব ঘটেছে - তোমার মন হারিয়ে গেছে। হে প্রভু! আমি আমার মন তোমাকে দিলাম, তুমি তা গ্রহণ কর।

ভগবৎ চরণে অর্জ্জুনের নিবেদন।

অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিতেছেন ঃ- হে মহাত্মন, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগদনিবাস, কি জন্য তাঁহারা তোমাকে নমস্কার না করিবেন। কি রূপ তুমি? তুমি ব্রহ্ম অপেক্ষা গুরুতর, আদিকর্ত্তা, ব্রহ্মার জনক। আরও ব্যক্ত যে জগৎ তার অব্যক্ত যে প্রকৃতি - তাহাদেরও মূল কারণ যে অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও তুমি। এই সর্ব্ববিধ কারণের জন্য (মহাত্মন, অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, ব্রহ্ম অপেক্ষাও গুরুতর আদি কর্ত্তা, ব্যক্তের মূল, অব্যক্তের মূল ও অক্ষররূপী যে তুমি, সকলেই যে তোমাকে নমস্কার করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

আদিদেব ঃ- ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্ব যাহা না থাকিলে লোক লোকান্তর এবং তত্ত্বৎ স্থানে অবস্থিত কোন প্রাণীরই উদ্ভব সম্ভব হয় না, সেই অনাদ্যা প্রকৃতিতে তুমিই বীজ আধান করিয়াছ - তাই এই ত্রিলোকের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই তুমি আদিদেব।

তুমি পুরুষপুরাণঃ- দেহপুরে শয়ন করিয়া আছেন বলিয়া তিনি পুরুষ। তিনি চিরদিনই আছেন, ত্রিকালে তাঁহার অস্তিত্বের অভাব হয় না, এইজন্য তিনি পুরাণ।

বিশ্বের তুমি পরম নিধান ঃ- অর্থাৎ সংসারের নিঃশেষরূপে স্থিতির স্থান। সংসারের যতকিছু বস্তু সবই কালবশে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বা বিলুপ্ত হইতেছে, সেইজন্য যাহাকেই আশ্রয় করা যাউক সেই আশ্রয়স্থল একদিন ধ্বংস হইবেই - কিন্তু অপরিণামী তোমাকে পাইলে আর বিনাশ নাই। কারণ আত্মাকে যে লাভ করে সে তখন আত্মাই হইয়া যায়, তাহার যাহা কিছু সব উপাধি নষ্ট হইয়া কেবল এক আত্মাকারে তাহার স্থিতি হয়।

বেত্তা ঃ- তুমিই তোমাকে জান, আর কেহ তোমাকে জানিতে পারে না। যে তোমাকে জানিতে যায় সেও তুমিই হইয়া যায়।

বেদ্য ঃ- জানিবার যাহা কিছু তাহাও তুমি। কারণ তুমি ছাড়া আর কি বস্তু আছে ? এই যে লোক অন্যকে জ্ঞান দান করে, তাহাও তোমার কৃপায়। জ্ঞানরূপে তুমি স্ফূরিত না হইলে আমরা কেহই কাহাকেও কিছু বুঝাইতে পারিতাম না।

পরমধাম ঃ- লয়বিক্ষেপশূন্য অবিদ্যাবিরহিত যে স্থিতি। যেখান হইতে মন আর বিষয়ের আকর্ষণে আসিতে পারে না। তাহাই ক্রিয়ার পরাবস্থা পরমানন্দ স্বরূপ স্থিতির স্থান। এই স্থিতি সাধকের নিজবোধরূপ।

অনন্তরূপ ঃ- সেই স্থির প্রাণ চঞ্চল হইয়া অনন্ত নামরূপময় জগৎরূপে লীলা করিতেছেন। তাঁহার সেই অনন্ত লীলা বুঝিতে হইলে প্রথমে এই দেহব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

"ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান
ঈশ্বরের তিন নাম।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বলে —
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।"

তমালিনী দেবীর
মৃত সন্তানের প্রতি উক্তি

আহা! মৃত্যুময় সংসার কি দুর্ব্বিসহ। সহ্য হয় না বলিয়াই এক শোকাকুলা জননী বলিয়াছেন ঃ-

স্বপথে স্বস্থানে গেছ স্বধামে স্বপথে আছ
পার্থিব মাতার কথা কিছু মনে রাখিও।'

জননী জঠরে ছিলে এ ভারতে এসেছিলে,
জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি জানিও।
কিন্তু রে হতেছে সাধ ধর মাতৃ আশীর্ব্বাদ
হরিপদ কমলের জ্ঞানমধু খাইও,
যেন সে স্মৃতির পটে বিস্মৃতি নাইক ঘটে,
যেন হেন জীবদেহে আর নাহি আসিও।

(জীব ঘটে না আসাই মুক্তি)

"গায়ত্রী মন্ত্র"

গায়ত্রী মন্ত্রটি এই ঃ- "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।" অর্থাৎ যে পরমাত্মা হইতে, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক (অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব) প্রকাশ হইযাছে এবং যিনি আমাদের (অর্থাৎ মানবগণের) অন্তঃকরণে সর্ব্বতত্ত্ব গ্রাহিনী ধীশক্তির প্রেরণা করেন, আমরা যেন সেই নিখিলেশ্বরের পরম বিভূতির ধ্যান করিতে পারি।

এই নিখিলেশ্বর কে? তিনিই আমার প্রাণ। যিনি আমার একমাত্র আপনার জন, সেই প্রাণের সাধনাই প্রকৃত গাযত্রী উপাসনা। যাঁহারা প্রাণের উপাসনা করেন আশাকরি তাঁহাদের পক্ষে ইহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

"জরা মরণ হইতে নিষ্কৃতি ও অধ্যাত্ম কর্ম্ম রহস্য।"

আমরা দেহলাভ করিয়া আমাদের পরমসংকট অবস্থা হইতেছে জরা ও মরণ। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ জরায় জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আজ

যাহাকে পরম সুন্দর দেখাইতেছে, কাল তাহা শ্রীভ্রষ্ট কদর্য্য হইয়া যাইতেছে। কাল বশীভূত জীব কালদ্বারা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ভোগ সুখাসক্ত জীব কালকৃত এই সকল পরিবর্ত্তন পছন্দ করে না, সে সর্ব্বদা রূপে রসে ডুবিয়া থাকিতে চায় কিন্তু এই বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হয় না, ভোগ করিতে করিতে আশা মিটিতে না মিটিতেই জীবন ফুরাইয়া যায়। মনের আশা মনেই থাকিয়া যায়, অবশ হইয়া কোন অজ্ঞাত আবাসে তাহাকে চলিয়া যাইতে হয়, যে স্থান হইতে তাহার কোন সংবাদ পর্য্যন্ত পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জরা মরণের দুর্ধর্ষ প্রতাপে জীব সতত সন্ত্রস্ত, বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইতেছে; এই জরা মরণের কবল হইতে সকলেই রক্ষা পাইতে চাহে বটে কিন্তু তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় কি তাহা জানে না। বিষয় বিমুখ চিত্তে অনন্যশরণ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে তবে কালভয় দূর হইতে পারে। অধ্যাত্ম কর্ম্ম দ্বারা যখন ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হইতে পারে, তখনই জীব অনন্যশরণ হয়, ইহাই ভগবৎ আশ্রয়। দেহের সহিতই জরা-মরণ নিত্য সংযুক্ত হইয়া আছে। যিনি ক্রিয়ার পরাবস্থায় আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন তিনি ব্রহ্মে অচল স্থিতি লাভ করেন এবং জরা মরণের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। আত্মদেবের ভজনা বা আত্মোপাসনা করাই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা। এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, মন স্থির হইবে, কূটস্থ জ্যোতির প্রকাশ গ্রহণ দেখিতে পাইবে। সেই সকল সাধকই পরে আরও বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহাদের মধ্যে যে অধ্যাত্ম বা কূটস্থ রহিয়াছে উহা পরব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন। ইহা বুঝিলেই জরা মরণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং যে অধ্যাত্মকর্ম্ম দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার হয় সেই অধ্যাত্ম কর্ম্মের রহস্য বুঝা যাইবে।

"ভগবানে অনন্য শরণাগতি ও ভজনশীলতাই পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়।"

অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তিকেও অভয় দিয়া ভগবান বলিতেছেন - হে জীব, তুমি এ যাবৎ অতি বিগর্হিত কর্ম সব করিয়াছ, এখন কি তোমার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা হইতেছে? তোমার কোনই উপায় নাই, তোমাকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই।

"বাহ্যিক ধ্যানকে ধ্যান বলা যায় না, মন শূন্যময় হইলেই তবে প্রকৃত ধ্যান বলা হয়। সেই ধ্যানদ্বারা সুখ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।"

যোগ

শ্বাস জয় তথা মোক্ষলাভের উপায় প্রকৃত হবন ক্রিয়া।

শাস্ত্রবাক্য

১। জ্ঞান নিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও যোগাভ্যাস ব্যতীত তিনি দেবতা হইলেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না। ভাগবতে আছে তপস্যা, মন্ত্রাদিতে যে সিদ্ধি হয় সে সমস্তই যোগ দ্বারা।

২। যোগলাভ করিবার জন্য শ্বাসজয় করিতে হইবে, ইহা একবাক্যে সকল শাস্ত্রই উপদেশ দিয়াছেন। শ্বাসজয় ব্যতীত মনস্থিরের আর উপায় নাই। এই শ্বাসজয় প্রাণায়াম ব্যতীত হয় না। প্রাণায়াম ব্যতীত প্রাণবায়ু সুষুম্নাগত হয় না। প্রাণায়ামের অর্থও তাই, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদই প্রাণাযাম। শ্বাস নির্গত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে না, অর্থাৎ ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে নির্গত হইবে না। এই কুম্ভকের অবস্থাই প্রকৃত হবন ক্রিয়া।

এইরূপ বিধিপূর্ব্বক প্রাণাযাম অভ্যাসদ্বারা নাড়ীচক্র, বিশোধিত হইলেই সুষুম্নামুখ ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু তন্মধ্যে প্রবেশ করে। সুষুম্নায় প্রাণ প্রবেশের ফলে প্রাণ সুষুম্না বাহিনী হইলে মনও শূন্যেতে প্রবেশ করে, তখন যোগীর সমস্ত কর্ম্ম উন্মূলিত হইয়া যায় অর্থাৎ যোগী আর কোনও কর্ম্মে বাঁধা পড়েন না। এই প্রাণ জীবিত থাকিতে (অর্থাৎ চঞ্চল) এবং মন মৃত (স্থির) না হইলে মনে প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তিই হইতে পারে না।

পুঁথিপাঠ করিয়া আমরা যে জ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকি তাহা জ্ঞানীগণের চক্ষে মোটেই মূল্য নাই। এ সম্বন্ধে মহাত্মা গোরক্ষনাথ কি বলিয়াছেন দেখা যাউক - যতদিন প্রাণবায়ু মধ্যমার্গ সুষুম্নায় প্রবেশ না করে এবং প্রাণবায়ু রূদ্ধ হইয়া যতক্ষণ বিন্দু স্থির না হয় এবং যতদিন ধ্যান দ্বারা তত্ত্ব সমূহ সাক্ষাৎকার না হয় ততদিন জ্ঞানের কথা বলা দাম্ভিকতা এবং প্রলাপমাত্র।

তপস্যা, তীর্থযাত্রা, দানাদি, ব্রত কোন কার্য্যই প্রাণায়ামের ষোড়শভাগের একভাগও ফলদান করিতে পারে না।

মৃত্যু - বিজয়।

মা দুর্গে, শক্তি, শক্তি, শক্তি। ও মা শক্তি দেবী, কত সুরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র দেখলাম বড়ই শক্তিমান, সে তাদের ভোগাসক্তি, সে শক্তি নয়। তোমার রাজ্যের যে শক্তি, সে শক্তি বহু দূরে! সংযমেই শক্তি, ত্যাগেই শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তি ঋষিদের শক্তি। সেই ত্যাগ শক্তিতেই রাজমুকুট ঋষিপদতলে লুন্ঠিত। মা মৃত্যু-বিজয় এই শক্তির কার্য্য।

মা, ত্যাগশক্তি কোথা হতে হবে? কিসের লোভে, কি লোভে লোক ত্যাগ স্বীকার করবে? ধন, জন, ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য অন্য বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

কিন্তু সে ত্যাগ সামান্য মা, তোমার জন্য তোমাকে লাভ করবার জন্যই কেবল সর্ব্বত্যাগ করা যায়। তুমি প্রাণস্বরূপ, তাই তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তির জন্য লোকে ত্যাগ স্বীকার করে বটে, সে শক্তি কেবল মোহশক্তি মায়ার শক্তি; আর তোমার জন্য যে মহাত্যাগ, সেটি মহামায়ার শক্তি; তোমারই মহাশক্তি, মা, এখন ইশারাতেই সব বুঝে লও; আর অনেক কথা বলতে পারি না। বলতে গেলেই, জননী তোমার ঐ বালিশের কোণে যে "অনন্ত" গুঁজে রেখেছ, সেই দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়, অমনি বলা কওয়া সব স্থির হয়ে আসে, অবাক হয়ে থাকি।

মা, একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখছিলাম যেন আমাকে কুকুরে কামড়িয়েছে; আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি। দেখছি "জলাতঙ্ক" হল। এর মধ্যে ঘুম ভেঙ্গেছে, তখন দেখি বুকটা ধড়ফড করছে, প্রাণটা কাঁপছে, কিন্তু দেখলাম জলাতঙ্ক কোথাও নাই, একটি স্বপ্ন দেখছি মাত্র। তখন বল্লাম, রাম রাম বল। বাঁচলাম। কিছুই সত্য নয়, সব স্বপন। অমনি দেখি তুমি এসে উপস্থিত। এসেই বল্লে, কি রে, জলাতঙ্ক দেখছিস কেমন? আমি বল্লাম - মা শ্মশানবাসিনী, খুব দেখেছি, এমন বিভীষিকা দেখিও না।

মা, তখন তুমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, আর বল্লে দেখলি, ঐ রকম সব। ঐ তোর জলাতঙ্কও যেমন ভাবাতঙ্কও তেমনি। আমার বিচিত্র কান্ডই ঐরূপ। তোরা ভাবিস জগৎটা মাটির গড়া, তা নয়; মাটি ফাটি কোথাও নাই, সবই মনের সংস্কার দ্বারা গঠিত মাত্র। এই সংসার ঘনীভূত কল্পনা, দৃষ্টিদোষ, সংস্কার দোষেই সত্য বলে বোধ হয়। ও সব স্বপন, এখনি ঘুম ভাঙ্গবে আর বলবি - রাম রাম বাঁচলাম। কিছু সত্য নয়, সব স্বপন। পার্থিব মনোবৃত্তি স্থির হলেই মায়ামোহের জলাতঙ্ক দূর হয়ে যাবে, তখনই আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাবি। সে আর একপ্রকার মনোবৃত্তি। তাকে মনোবৃত্তি বলে না, তাকে বলে "আত্মবোধ।"

মা, আমার ভাগ্‌নী যোগবাসিনীর কন্যা কনকলতা যখন প্রথম 'ক' 'খ' পড়ে তখন তার দিদিমা পড়াচ্ছেন খুকি, বল, তালব্য -শ। অমনি কনক বল্লে সে কি দিদিমা? সেটা কি? দিদিমা একটা তাড়া দিয়ে বল্লেন আরে গেল; বল তালব্য-শ। খুকি বল্যে তালব্য শ মানে কি দিদিমা? কাকে বলে তালব্য শ? আগে বলে দে তবে পড়ব। দিদিমা শুনে অবাক হলেন। মা, আমিও তোমার কলিকালের ছেলে। ছেলেবেলায় বলেছিলাম মা জগৎ কাকে বলে? জগৎ মানে কি? আগে বলে দাও তবে জগতে প্রবেশ করবো।

মা তুমি বুঝিয়ে দিলে যে, কোটি কোটি জগৎ কেবল আকাশ কুসুম, আদৌ তার অস্তিত্ব নাই, কেবল স্রোতের ন্যায় একটা মনোভাব বা সংস্কারের স্রোত মাত্র চলেছে; সেই সংস্কারের উপর সংস্কার চাপিয়ে একটা ঘনীভূত স্বপ্নরঙ্গ বা অভিনয় বা ছায়াক্রীড়া মাত্র উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু মিথ্যা হলেও ওর মূলে সত্য আছে, সার্থকতা আছে, জগৎ বৃথা নয়।

বাজীকরের বাজী মিথ্যা, বাজিকর সত্য, তার অংশরূপ ঢোলা মালাও সত্য, তাতেই বাজির সার্থকতা।

এই যখন বুঝলাম, তখন সংসারে কোমর বেঁধে নাচতে নাচতে এসে আসরে নামলাম। এসেই মা তোমার "দেবাসুরের যুদ্ধ" পালা আরম্ভ করেছি। মা, তুমি এস। এবার যেন রক্তবীজ বধ হয়। মা খড়্গেশ্বরী এইবার তোমার রক্তবীজকে নিও মা, এই প্রার্থনা করি।

(ইহার নিগূঢ় অর্থ সাধারণের বোধগম্য নহে। আশাকরি ক্রিয়ান্বিত সাধক সাধিকারা ইহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ক্রিয়ায় যিনি যেমন যেমন অগ্রসর হইবেন, তিনি ইহার মর্ম্ম ততটাই অবগত হইবেন। কূটস্থই কুল কুণ্ডলিনীরূপে জীবশক্তি। এই রচনার যে যে স্থানে মা শব্দটি প্রয়োগ

করা হইয়াছে তাহা ভগবান্ আত্মনারায়ণ কূটস্থ চৈতন্যকেই উপলক্ষ্য করিয়া লেখা হইয়াছে। ইনিই অর্থাৎ কূটস্থই কুলকুন্ডলিনী রূপে সমগ্র জীব জগতের মাতৃ স্থানীয়া)

মৃত্যুরূপ পার্শ্বদ্বার দিয়া ফাঁকতালে,
গ্রীনরূমে যায় জীব পট - অন্তরালে।
নৃত্যকারী পুত্তলিকা জুড়াইতে প্রাণ,
পট - অন্তরালে গিয়া করে সুধাপান।
অমৃত সিঞ্চন করি গ্রীনরূমে একা
ত্রিদিব দুহিতা শান্তি ঢুলাইছে পাখা।.

জগৎ রঙ্গমঞ্চ

"এ মায়া প্রপঞ্চময়" ভব রঙ্গমঞ্চ মাঝে রঙ্গময়ী মহামায়া যারে যা সাজান, সে তাই সাজে। কর্ম্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সব গাঁথা, কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্য্যা, কেহ ভ্রাতা, কেউ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা, কত রঙ্গে অভিনেতা আসছেন কত সাজ সেজে। যার যখন হতেছে সাঙ্গ, রঙ্গভূমির অভিনয়, কাকস্য পরিবেদনা, তখন সে আর কারো নয়, কোথা পুত্রের কাতর বিনয়, কোথা প্রিয়তমার প্রণয়, মানে না কোনো অনুনয়, চলে যায় সাজ সজ্জা ত্যজে।

দেহ গেলে হয় কি ?
দাঁত পড়লে ভয় কি ?
দেহ গেলে আমরা তুষ্ট,
ফুল ঝরলে ফল পুষ্ট।
শুখায় নারে ফুল ফল,
আনতে যায় সব নূতন বল।

এ সংসারে সই, মরণ দেখলি কই ?
ত্রিতাপ তাপে ঐ ধানটা ফুটে খই।

ব্রহ্মচর্য্য বল

পূর্ণ অধঃপাতে দিতে নবীন যৌবনে
জ্বালাময় তৃষ্ণা উঠে মানবের মনে।
নরপাখী ধরিবারে কাম ব্যাধ চারিধারে
পাতিয়াছে রমনীর রমনীয় জাল;
হতভম্ব নর-করী নারী স্তম্ভে সারি সারি
বাঁধা ঐ পদে কাম শৃঙ্খল বিশাল।
নর মীন গ্রাসিতেছে আয়ু করি লোপ,
বাসনা বঁড়শি সূত্রে বিম্বাধরা টোপ।
নর অশ্ব পালে পালে বাঁধা নারী অশ্বশালে
নরহস্তী বাঁধিবারে নারী হস্তীশালা,
রমণী বেদেনী ছুঁড়ী, কাম মন্ত্র পড়ি পড়ি
ধরি নর কালসর্প পূরিতেছে ডালা।
ভাঙ্গিবে সে বিষদন্ত! সবে কত আর
বিজয়ী মানব আত্মা অনাদি অপার।
ত্রিকালজ্ঞ যোগী গণে ব্রহ্মচর্য্য বল,
কি হবে চিত্রিত ফুল সাংখ্য পাতঞ্জল।

নয়নের ধারা দাওগো মুছায়ে
ব্যথাহারী ভগবান।
সহিতে পারি না এ ঘোর যাতনা,
করগো করুণা দান।
জীবন তরণী যদি ডুবে যায়,
ঠাঁই দিও প্রভু তব রাঙ্গা পায়,
মিনতি আমার ওগো দয়াময়,
গাহি তব জয়গান।।

অন্ধত্ব ও দৃষ্টি

কেহ দিবা অন্ধ, কেহ নিশা অন্ধ, কেহ নিশিদিন
সমান অন্ধ, কাহারও বা নিশিদিবা সমান দৃষ্টি।
দিন অর্থে আত্মজ্ঞান মোক্ষ প্রকাশক,
সংসারীরা অন্ধতায় দিবান্ধ পেচক।
নিশি অর্থে মায়া মোহ তাহে দৃষ্টি নাই,
আত্মজ্ঞানীগণ সদা নিশা অন্ধ তাই।
দুঃখ ক্লেশে মোহবশে কাষ্ঠ মৌনী যাঁরা,
নিশিদিন "অন্তর্বাহ্যি" দুয়ে অন্ধ তাঁরা।
চৈতন্য সমাধিগত "সর্ব্বব্রহ্ম" যাঁর,
দিবানিশি "অন্তর্বাহ্যি" সমদৃষ্টি তাঁর।

কানামাছি

ছেলেরা একসঙ্গে মিলে বলে, "ভাই, কি খেলা হবে? এস কানামাছি কানামাছি খেলি।" একজন কানামাছি হয়, তার চোখ সকলে কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়, সে কিছুই দেখতে পায় না। তখন সেই কানাকে আর সকলে হাত ধরে চারিদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। রামের মাথায় তার হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বল্ দেখি এ কার মাথা?" কানামাছি বলে, "এটা গোপালের মাথা।" অমনি সকলে হাততালি দিয়ে হেসে হেসে গড়াগড়ি যায়। আবার তার দাদার মাথায় তার হাত ছুঁইয়ে জিজ্ঞাসা করে, "বল দেখি, এ কার মাথা?" কানামাছি বলে, "কাকার মাথা।" অমনি সকলে হেসে গড়াগড়ি যায়। অমনি হাসির ছড়াছড়ি।

ঠিক সেই কানামাছির মত পরব্রহ্ম আপন চোখ আপনি বাঁধেন। চোখ বেঁধে তিনি সাধের কানা হন। লোকে বলে এ কে? ও কে? সে কে? কানা ব্রহ্ম বলে, ও বাবা, ও মা, ও দাদা, ও স্ত্রী, ও পুত্র, ও কন্যা। বস্তুতঃ কেউ কিছু নয়, সব মিথ্যা কথা! সত্য কথা

তবে কি ? সত্য কথা হচ্ছে "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ। সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।" কেউ কারো কিছু নয়। তথাপি কানা ব্রহ্ম বলেন, এ বাবা, ও স্ত্রী, ও পুত্র। অমনি দেবলোক হতে দেবতারা হাততালি দিয়ে হেসে গড়াগড়ি যান। দেবতারা বলেন 'এ কানা ব্রহ্ম বলে কিরে! সত্যই কানা হয়েছে। ব্রহ্ম আপনাকে ঢাকা দিয়ে মায়া কানা হলেন, আর কানামাছির খেলা করেন। মানুষ সবই কানা ব্রহ্ম!

জ্ঞানদৃষ্টিযুক্ত দেবগণ আকাশে থেকে ব্রহ্মের কানামাছি খেলা দেখে খুব হাসতে থাকেন। ভগবানের এই মায়ার খেলা মানবলীলা, কানামাছির ছেলেখেলা বই আর কিছুই নয়।

রাজা সখের থিয়েটার করেছিলেন, সখ করে নিজে বানর সেজেছিলেন, আমলাগণ ও কর্ম্মচারীগণ দেখতেন। তাঁরা রাজার বানর সাজা দেখে হেসে হেসে মরতেন। ব্রহ্মেরও তাই। দেবতারা ব্রহ্মের এই কানামাছি খেলা দেখে হেসে হেসে মরেন।

এ সংসারটা ক্ষণকালের রংতামাসা মাত্র। আমার মা, আমার বাবা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র বলে মানুষ মুগ্ধ হয়ে পড়ে। আবার যখন একটি একটি করে সরে সরে পড়ে, তখন কানা ব্রহ্মের কি কান্না! দেখে দেখে দেবগণ সব হাততালি দেন, আর বলেন, Encore! Encore! once more! once more! আবার করো, আবার করো। ছেলেরা লাফায়, বারণ করলে শোনে না। যখন লাফাতে লাফাতে আছাড় খেয়ে পড়ে, তখন সকলে হো-হো করে হেসে ওঠে। কানা ব্রহ্ম যখন খানায় পড়েন, তখন দেবতারাও হো হো করে হেসে মরেন।

"মরণ - বাঁচন মিথ্যা কথা, সেজে গুজে অভিনয়,
প্রমোদ উদ্যান খেলা, আমোদ বই ত নয়।"

জানবার কথা।

(১) কুমতি ঃ- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, নির্দয়তা, খলতা, মিথ্যাচারিতা, হিংসা, চঞ্চলতা, অজ্ঞানতা, কৃপণতা, অশুদ্ধি,. অসত্য, ভয়, অশান্তি, অক্ষমতা, অভিমান, অশুচিতা, নির্লজ্জতা, শঠতা ইত্যাদি।

(২) সুমতি ঃ- ক্ষমা, লজ্জা, জ্ঞান, ধৃতি, অহিংসা, শুদ্ধসত্ত্বতা, অভ্রম, উদারতা, সরলতা, অক্রোধ, অভয়, চঞ্চলতারাহিত্য, অক্রূরতা, দান, তপ, জপ, দৈন্য, শৌচ, স্বাধ্যায়, অখলতা, তেজ ...... ইত্যাদি।

(৩) জন্ম-জন্মান্তরের ক্রমাগত অনুশীলন দ্বারা রিপু সকল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যাও বলিলেই উহারা সহজে যায় না।

(৪) জীব বহু সাধনায় প্রবৃত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। প্রবৃত্তি এতই ভীষণ ছাড়িয়াও একেবারে ছাড়িতে চাহে না।

(৫) পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যেও এমন জীব নাই যে, প্রকৃতিজাত তিনগুণ হইতে মুক্ত (অর্থাৎ কোন জীবই মুক্ত নয়)।

(৬) অনুশোচনার দ্বারা পাপক্ষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত ''জগাই - মাধাই'' এর ইতিহাসে পাওয়া যায়। জগাই মাধাই ভূরি ভূরি পাপানুষ্ঠান করিয়াও নিত্যানন্দের কৃপায় আপন আপন অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া যেমনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিল, অমনি ভগবানের অজস্র করুণা বর্ষিত হইয়া তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিল। পাপ অবস্তুমাত্র, পাপের স্থায়ী সত্তা কিছুই নাই, মৃত্তিকা স্তূপের ন্যায় পুঞ্জীকৃত পাপ ভক্তি বন্যায় ভাসিয়া যায়।

(৭) 'মহাবলবান হস্তী পর্ব্বতের প্রায়, এক ক্ষুদ্র অঙ্কুশেতে বশ করে তায়। এক সূর্য্য গগনে দেখিতে লাগে ক্ষুদ্র, যার তেজে আলোকিত ত্রৈলোক্য সমুদ্র।'

(৮) ভক্ত প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটিত। সেইজন্য তিনি পর্ব্বত, জল বা অগ্নি হইতে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই এবং সেইজন্যই তিনি ভগবৎ কৃপায় সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছিলেন।

(৯) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আদি গুণ অবতার,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার।

(১০) অন্য লোক আমাকে স্কন্ধে করিলে সে বুঝিতে পারে আমার ভার একমণ, কি দুই মণ। কিন্তু সেই দুই মণ বা একমণের ভার সর্ব্বদাই আমাতে বর্ত্তমান, তথাপি "আমার" কত ভার "আমি" জানিতে পারি না।

(১১) সদ্ গুরুর কৃপা হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা জীবন সফল করিতে পারি, অন্যথায় নহে।

(১২) আপন ইচ্ছায় জীব শত বাঞ্ছা করে,
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা তার একটিও না স্ফুরে।

(১৩) কর্ম্মকান্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগের "অগ্নিই" দেবতা; মুনিদিগের হৃদয় সিংহাসনে বিরাজিত "আত্মাই" দেবতা; স্থূল বুদ্ধি মনুষ্যদিগের মৃন্ময় পাযাণ নির্ম্মিত প্রতিমাই দেবতা, আর সর্ব্বত্র সমদর্শী মহাযোগীদিগের সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মই দেবতা।

(১৪) "কবীর কহেতে কে কহি যান্ দে, উন্হকি বুদ্ধি মৎই লেহ।

শকট আওপুনি শোযন্ কো, ফেরি জবাব মৎই দেহ।”
অর্থাৎ যাহারা কেবল বাক্যবীর, তাহাদিগের বুদ্ধি লইও না; তাহারা যা বলে বলিয়া যাক্, শুনিবার দরকার নাই। কুকুরের স্বভাব ভেউ ভেউ করা, সে তাহাই করুক, তাহাতে জবাব দিও না।

(১৫) “শোয়নরূপ সংসার হয়, ভুকন দে ঝকমারী।”

-অর্থাৎ সংসার প্রায়ই কুকুররূপী, তাহারা অনর্থক ঘেউ ঘেউ করিবে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই তাহাদিগকে ডাকিতে দাও।

(১৬) কবীর যাকি পুঁজি শ্বাস হ্যায়, ছিন্ আওয়ে ছিন্ যায়ে।
তাকো য্যাসা চাহিয়ে, রহে রাম লোলায়ে।।

-অর্থাৎ যাহাদের সম্বল শ্বাস, অন্য পুঁজি কিছুই নাই; আবার সেই শ্বাসও ক্ষণকালের জন্যও স্থির নয়, একবার যাইতেছে আবার আসিতেছে, এমন অবস্থায লোকের উচিৎ সর্ব্বদা আত্মারামকে লইয়া মজিয়া থাকা।

(১৭) কবীর কাঁহা ভরোসা দেহ কো; বিনাশী যায়ে সিন মাঁহি
শ্বাস শ্বাস সুমীরণ করো, আওর উপায় কুছ নাহি।।

-অর্থাৎ দেহের আবার ভরসা কোথায়, এক ক্ষণকালের মধ্যে সে ত নাশ হইয়া যায। প্রতি শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ করা ব্যতীত ইহাকে রক্ষা করার আর কোনও উপায় দেখি না।

(১৮) লৌকিক গুরু যে মন্ত্র বা বীজ কর্ণে শুনাইয়া দেন, সদ্গুরু সেই মন্ত্রের বাচক পরমাত্মাকে দেখাইয়া দেন।

(১৯) সেই শ্যাম বিন্দুরূপ, সিন্ধুরূপাধার

জগতের রূপ যাতে করয়ে বিহার।
শ্যামচন্দ্র উদয়ে জগৎ আলো হয়।
মুদিলে সংসার সব অন্ধকার ময়।
সপ্তাবরণের পারে আছয়ে লুকায়ে
কেউ পাছে চিনে, আছে নিমিষ ঢাকিয়ে।

-অর্থাৎ সেই শ্যামচন্দ্রের রূপেই জগৎ আলোকিত সে রূপের তুলনা বুঝি এ জগতে নাই, তাই তাহাকে অরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার রূপ নাই তাহা নহে তাঁহার রূপ আছে বলিয়াই জগতের রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। জগতের রূপ-তরঙ্গ সেই অনন্ত রূপসিন্ধু হইতে উত্থিত হইতেছে, সেই অব্যক্ত অসীম অপরূপ সত্তা হইতে এই রূপময় জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই শ্যামচন্দ্রের রূপজ্যোতি হৃদয় কন্দর ব্যাপিয়া দিগদিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। বুঝি ইহাই "অপরূপের রূপ।"

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ বা আবরণের দ্বারা পরম তত্ত্ব আবৃতবৎ মনে হয়, ইহাতে পাঁচটি আবরণ আছে এই পাঁচটি আবরণ বা কোষ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তবে যদি দেহস্থ সপ্তচক্রকে (অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞা ও সহস্রার এই সপ্তচক্রকে) সপ্তাবরণ মনে করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত সপ্তাবরণ ঠিক হয়। যোগীকে এই সপ্তাবরণ ভেদ করিতে হয়, তবে নিঃসঙ্গ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয়।

(২০) এমত আনন্দ সিন্ধু তাঁহাকে না খুঁজে,
ক্ষণিক অনিত্য সুখে এ জগতে মজে।
উটে যেন স্বাদু বলি কন্টক চিবায়,
তার সুখ সঙ্গে মুখে শোনিত বেরায়।
সেইমত এ জগতে যত আছে সুখ,

সে সুখের সঙ্গে সঙ্গে লাগি থাকে দুখ।
সুখেতেও দুঃখ দেখি তবে সুখ কই,
এ সুখে কে সুখ মানে বিনা পশু বই।

-ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রকৃত নির্ম্মল সুখ এক আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া নির্ম্মল সুখ নির্ম্মল আনন্দ সংসারে কোথাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না। আমরা যে বিষয় পাইয়া সাময়িক সুখ অনুভব করি, তাহার মধ্যেও দুঃখ মিশ্রিত আছে, যাহা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় শ্লোক কয়টিতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

আমরা সদা সর্ব্বদা এই সংসারে বারোটি জ্বালা লইয়া অহরহ ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ-

কাম, ক্রোধ, আদি করি ছয় রিপু হয়
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুভয়।
ছয় রিপু ছয় গুণ, দ্বাদশ দুয়েতে
জগতের জন জ্বলে এ বারো জ্বালাতে।

ইহা হইতে একমাত্র পরিত্রাণের উপায় ভগবৎ উপাসনার দ্বারা তাঁহার শরণাগত হওয়া।

(মাগো) আমার আঁধার ঘরে অন্তরে তুই
জ্বালিয়ে দে না আলো।
তোর ঐ রাঙা পায়ের আলতা ছাড়া
সবই দেখি কালো।
শিখিয়ে দে মা সেই সাধনা,
যেন ঘোচে মা সব যাতনা,
মরণকালে পাই যেন মা
সকল জ্ঞানের আলো।

-

''রাত্রিদিন তোল ফেল শ্বাস অনিবার,
বিষম বিরক্ত বোধ হয় না তোমার?
রাত্রিদিন নেত্রপাতা তোল আর ফেল,
স্থির কর চক্ষু দুটি ব্যথা হয়ে গেল।।''

সাধক - সঙ্গীত।

আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে।
মানুষ কেবল সাক্ষীগোপাল, মিছে আমি আমার বলে।।
ছায়াবাজী পুতুল যেমন, এ জীবের জীবন তেমন।
তারা দেবতা হতেও পারে, যদি তোমার পথে চলে।।
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী, আত্মারথে তুমি রথী।
মানুষ কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতা ফলে।।
সর্ব্বজীবের মূল তুমি প্রাণের প্রাণ হৃদয় স্বামী।
পাপীকে সাধু কর, তুমি নিজ ইচ্ছা বলে।।
''সচ্চিদানন্দ কাতরে'' কয়, করগো কৃপা দয়াময়।
শরণাগত দীন আমি, রাখ প্রভুর চরণ তলে।।

ত্রি-গ্রন্থি ভেদ।

১। ভীষ্মের শরশয্যা - ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ।
২। দ্রোণাচার্য্য বধ্ - বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ।
৩। কর্ণবধ - রুদ্র গ্রন্থি ভেদের সূত্রাবস্থা।
শল্যবধ ও অশ্বত্থামা
কর্ত্তৃক নিশায় নৃশংস
হত্যা

—

আজ্ঞাচক্র ভেদ।

সত্ত্বগুণ যুগলাশ্ব লক্ষ্যরূপে, নেত্র নিমিলিয়া,
ভেদি আজ্ঞাচক্র জীব দেখে কৃষ্ণ অর্জুন হইয়া।
ধর্ম্মক্ষেত্রে সারথীরূপেতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান,
উপদেশে পার্থবীরে কর্ম্মক্ষেত্রে হতে আগুয়ান।
কর্ণে শুনি সে অমৃত বাণী অপনীত হল মোহঘোর
ধ্যান মগ্ন সাধক বয়ান উৎসাহে আনন্দে বিভোর।

কালীয় - দমন।

কালীয় = কালশক্তি, যমুনা = কূপ; কালীদহ = সুষুম্না দন্ডস্থিত গভীরতম স্থান, মূলাধার। ঐ মূলাধার চক্রে কুন্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতাবস্থায় আছেন। ঐ শক্তির নিদ্রিতাবস্থায় কালশক্তির প্রাবল্য হয় এবং ঐ শক্তির জাগ্রতাবস্থায় সঞ্জীবনী শক্তির বিকাশ হয়। কালশক্তির বিকাশ ও আধিক্য ঘটিলে জীবদেহে কালবিষের সঞ্চার হয় এবং জীব ক্রমশঃ ক্ষয়ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সঞ্জীবনী সঞ্চার না হইলে কূটস্থ দর্শন হয় না; সুতরাং জীব অমৃতত্বের বিনিময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। সেই হেতু কালীয়কে ভীষণ সর্প বলা হয়। জগৎগুরু কূটস্থ চৈতন্য সুষুম্নাদন্ডে নিমজ্জিত হইয়া ঐ কালশক্তিকে পদদলিত করিয়া তাহার উপর দন্ডায়মান হইলেন। কূটস্থ চৈতন্যরূপ প্রভুর চরণ অর্থাৎ স্থির বায়ু; সেই স্থির বায়ুর সংস্পর্শে ক্ষয় নিবারিত হইয়া কালীয় বশীভূত হইল এবং সুষুম্নায় ঐ শক্তি সঞ্চালিত হইল। এ কারণ কালীয় বিষে জর্জ্জরিত ও আবৃত জ্যোতিপুঞ্জের সঞ্জীবনী শক্তির জাগরণ ঘটিল অর্থাৎ কূটস্থের প্রকাশ হইল। তখন প্রণব ধ্বনি (ওঁকার ধ্বনি) সাধকের শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি পদবাচ্য। উত্তম প্রাণায়ামে ষট্‌চক্রের ভিতর দিয়া

যাতায়াতের সময় যে সুমধুর সূক্ষ্মধ্বনি হয় এখানে তাহারই ইঙ্গিত করা হইল। তখন সাধকের আর আনন্দের সীমা থাকে না। ইহাই মোটামুটি তাৎপর্য্য। ধন্য প্রভু কূটস্থ চৈতন্য। ধন্য তোমার মহিমা। হে জীব, হে সাধকবৃন্দ, এস আমরা কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ বৃন্দাবন চন্দ্রের চরণে বারবার প্রণাম জানাই।

কয়েকটি যোগ - সঙ্গীত।

(১) আপনা চিনিলে ভ্রম যাবেক তোমার
জগৎ দেখিতে পাবে আপন প্রকার।
আমাতে যে বস্তুরূপে দেহমাঝে আছে
সর্ব্বজীবে তদাকারে বস্তু রহিয়াছে।
অক্ষয় অব্যয় বস্তু আছে সর্ব্ব ঠাঁই,
রামের রমণ ছাড়া কোন জীব নাই।
সদ্‌গুরু প্রসন্ন হইলে সৎশিষ্যকে ইহা দেখাইয়া দেন ঃ-
এ হেন সদ্‌গুরু যবে হন কৃপাবান,
শব্দাতীত পরব্রহ্ম চক্ষুতে দেখান।

(২) এক পয়সার মাছ কিনলাম
পিঁড়েই বসে বাছি
কোন চিল্‌টা নিয়ে গেল
ঠ্যাং তুলে তুলে নাচি।

(৩) বল দেখি মা - আমি কোথা?
কোথা থেকে কইছি কথা?
কর্ষণ করে আকাশ ভূমি
প্রাণ লতায় বীজ পুঁতলে তুমি।
যে দু' একটি কচ্ছি কথা
বেরুল দু'টি কচি পাতা।

বাড়ল লতা চারি ভিতে
অনন্তে স্থান পারবি দিতে ?
রাখিস্ তখন অঞ্চল ধনে,
পাদপদ্মের রেণুর কোণে।

(৪) গ্রন্থপাঠে হয় না জ্ঞান,
জ্ঞান চাও তো শেখ ধ্যান।
হাজার জ্ঞানে জ্ঞান হবে না,
ধ্যান বিনা জ্ঞান দাঁড়াবে না।

(৫) যেখানটায় সূর্য্য ঢাকা, সেইখানটাই ছায়া
যেখানটায় আত্মা ঢাকা, সেইখানটায় মায়া।
যেটি ছায়া সেইটিই ত মায়া,
জড়তাই কায়া মূর্খতাই মায়া
জড়তা মূর্খতা জুট্‌ল আর
উঠল শোকের হাহাকার।

(৬) বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আকাশের গায়
স্বরসে সংকল্পপ্রভা খেলিয়া বেড়ায়
মগ্ন সে চৈতন্য রসে রস আছে যত
ময়ূরের ডিম্বরসে পেখমের মত।

(৭) বিবিধ মেঠাই মূলে শর্করা যেমন,
পার্থিব সুখের মূলে কামিনী কাঞ্চন।
মূলে সে মাটির রস যত দেখ ফুল
যত সে চেতন রস চৈতন্যই মূল।

(৮) সুস্থির চৈতন্য অঙ্গে লীলাশক্তি ধায়,
ছুটে যেন ভাগীরথী হিমগিরি গায়।
চিদঙ্গে সুন্দরী মায়া ছুটিছে সাদরে
যেমন ভাসন্ত স্রোত প্রশান্ত সাগরে।

(৯) সূর্য্যের নিকটতম কিরণের মত,
ব্রহ্মের নিকটতম ব্রহ্মা বিষ্ণু যত।
অখন্ড চৈতন্য জানি অশেষ বিশেষ
আগে কর মায়া মোহ বিভ্রম নিঃশেষ।

(১০) তোমার ভুবনে নাহি পুরাতন,
সৃষ্টির ধারা নিত্য নূতন।
কে তুমি? কে তুমি? খোল আবরণ,
হেরি রূপ প্রাণ ভরিয়া।

গুরুবাক্যে বিশ্বাসী মূর্খও তরিয়া যায়, কিন্তু অলসের কোন উপায় নাই।

মূর্খ হইলেও সাধক যদি গুরুবাক্য মত কাজ করিয়া যান তাহা হইলেও তরিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু অলসের কোন উপায় নাই। অলস ব্যক্তি ভাল পথ পাইয়াও তাহাতে পরিশ্রম করিতে পারে না; সেই সকল উদ্যমশূন্য গর্দ্দভকে সিদ্ধ মহাপুরুষেরাও কিছু করিতে পারেন না। যে নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রযত্ন করে, ভগবান তাহার ভার লইয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া দেন।

ভূতশুদ্ধি।

সূক্ষ্ম পঞ্চভূত দ্বারাই জীবচিত্তে বহু মনোবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাকে আবদ্ধ করে। যোগাভ্যাস দ্বারা শরীর ও প্রাণ শুদ্ধ হইলে মনোবুদ্ধিও বিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়। সেইজন্য প্রাচীন আচার্য্যেরা ও ঋষিরা যোগাভ্যাসের জন্য সকলকে উপদেশ করিয়াছেন। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে ভূতশুদ্ধি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ষট্‌চক্রের প্রাণায়াম দ্বারা মন প্রাণের স্থিরতা

পূর্ণভাবে যাহাতে আসে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিৎ। প্রাণমনের স্থিরতা না হইলে প্রকৃত ভূতশুদ্ধি হওয়া অসম্ভব।

আধ্যাত্মিক রহস্য।

শাস্ত্রমতে একাদশ রুদ্র ঃ-

(১) অজ ঃ- জন্মরহিত।
(২) একপাৎ ঃ- শিব।
(৩) অহির্বধ্ন ঃ- অধিদেবতা বা প্রাণ।
(৪) পিনাকী ঃ- ধনুকধারী।
(৫) অপরাজিত ঃ- ৪৯ বায়ুর মধ্যস্থিত পবন নামীয় বায়ু।
(৬) ত্র্যম্বক ঃ- তিন লোকের পিতা।
(৭) মহেশ্বর ঃ- স্থির প্রাণ
(৮) বৃষাকপি ঃ- ৪৯ বায়ুর মধ্যস্থিত প্রকম্পন নামীয় বায়ু।
(৯) শম্ভু ঃ- অর্থে - (শম = কল্যাণ, ভূ = হওয়া অর্থাৎ মঙ্গলময় শিবই শম্ভু)
(১০) হর ঃ- যিনি জীবের জীবভাব হরণ করেন।
(১১) ঈশ্বর ঃ- প্রাণরূপী আত্মা অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য।

অষ্টবসু।

(১) আপ, (২) ধ্রুব, (৩) সোম, (৪) অনল, (৫) অনিল, (৬) প্রত্যুষ, (৭) ধর, (৮) প্রভাব। এই অষ্টবসু হইতেছেন অষ্টনাড়ীস্থিত বায়ুরূপী দেবগণ।

ভৃগু আদি প্রসিদ্ধ সপ্তমহর্ষি অর্থাৎ পুরাণ প্রসিদ্ধ সপ্ত ব্রাহ্মণ।

ইহা পুরাণে নিশ্চয় হইয়াছে। তাহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি মহর্ষি চতুষ্টয় এবং স্বয়ম্ভূবাদী চতুর্দ্দশ মনু ইহারা মদীয় প্রভাবযুক্ত এবং হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সঙ্কল্পমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। (অর্থাৎ এ সমস্ত হাত-পাওয়ালা মুনি ঋষিদের কথা বলা হইতেছে না।)

সপ্তমহর্ষি - ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য এবং ক্রতু।

চারজন মহর্ষি - (১) সনক, (২) সনন্দ (৩) সনাতন, (৪) সনৎকুমার।

চতুর্দ্দশ মনু - (১) সায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি, (১৪)ইন্দ্রসাবর্ণি।

এখানে আমাদের প্রত্যেকের জানিয়া রাখা উচিত যে. উপরোক্ত যাহা কিছু লেখা হইল, তাহা ভগবান আত্মনারায়ণ কূটস্থ চৈতন্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। বাহিরের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। আত্মক্রিয়ার দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সহকারে আমরা ধীরে ধীরে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব।

কপিধ্বজ রথ।

সাধন সমর আরম্ভ হইলে (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ক্রিয়া) কপিধ্বজ অর্জ্জুন, কপি - বায়ুরূপী হনুমান, কপি শব্দের অর্থ কাঁপা, বায়ুরূপী রুদ্রের কম্পন গতি থাকায় বায়ুরূপী প্রাণই কপিপদবাচ্য। ধ্বজ অর্থাৎ চিহ্ন, বায়ুরূপী প্রাণই জীবের শরীররূপ রথোপরি কূটস্থ স্বরূপে ধ্বজা বা চিহ্নরূপী বলিয়া এইস্থলে জীবভাবরূপ অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ বলা

হইতেছে। তেজস্তত্ত্বরূপী অর্জ্জুনকে জীবভাব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণের যে তেজ ঐ তেজস্তত্ত্বের স্থান নাভিমন্ডলে। নাভিতে জঠরাগ্নিরূপে যে তেজস্তত্ত্ব রহিয়াছেন উহাই জীবের জীবনীশক্তি; উহার অভাবে জীব শবে পরিণত হয়। এই নাভিস্থিত তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক মাধ্যাকর্ষণ রহিয়াছে। নাভি "সমান বায়ুর" স্থান, এই নাভিস্থিত তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক মূলাধার ও সহস্রার ধারণ রহিয়াছে ইহাই মাধ্যাকর্ষণ। এই মধ্যাবস্থা হইতেই জীবভাব উৎপত্তি হইতেছে। এইজন্য প্রাণের তেজরূপ অর্জ্জুনকে নরনারায়ণ বলা হয়। ঐ নররূপী অর্জ্জুনের রথে, বায়ুরূপী হনুমান ধ্বজার স্বরূপ ছিলেন, অর্থাৎ জীবরূপী দেহের উপরিভাগে বায়ুরূপী প্রাণই কূটস্থ স্বরূপে (ধ্বজা) রহিয়াছেন, ধ্বজ শব্দের অর্থ গমন করাও বুঝায়। এই প্রাণবায়ুই দেহে গমনাগমন করিতেছেন বলিয়া ধ্বজপদবাচ্য। এই কারণ জীবভাবরূপ অর্জ্জুনকে কপিধ্বজ সম্বোধন করা হইতেছে। সাধন সমর আরম্ভ হইলে তিনি ধার্ত্তরাষ্ট্র গণকে (ইন্দ্রিয়গণকে) যুদ্ধে উদ্যোগী দেখিয়া নিজ গান্ডীবধনু উত্তোলন পুরঃসর (প্রণবঃ ধনুঃ ওঁকাররূপ — দেহই ধনুর স্বরূপ, যাহা এই অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে) অর্থাৎ শরীররূপ ধনু খাড়া করিয়া (মেরুদন্ড সোজা করিয়া বসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) অর্থাৎ সাধন সমর শুরু হইলে সাধক কূটস্থ চৈতন্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে যে নিজমনোভাব ব্যক্ত করেন এখানে তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আমি কাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব? তৎ উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মনারায়ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিলেন, তুমি সাধন সমরে ইন্দ্রিয়গণকে দমন করতঃ আত্মরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য যত্নবান হও, শ্রীগুরুদেব তোমার সহায় হইবেন। তুমি সাধন সমরে নিশ্চয় জয়লাভ করিতে পারিবে। কেননা যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব কোমর বাঁধিয়া গুরূপদিষ্ট কর্ম্মে প্রাণপণ যত্ন বা প্রাণপণ চেষ্টা কর; ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণই তোমার বশীভূত হইবে। যদি তুমি সাধন সমরে জয়লাভ করিতে পার, তবে শুধু ইন্দ্রিয়গণ কেন, সমস্ত বিশ্বই তুমি জয়লাভ করিতে পারিবে। কারণ যিনি মনজয় করিয়াছেন তিনি বিশ্বকে জয় করিয়াছেন।

(জিতং জগৎ কেনঃ -- মন হি যেন।)

ছিন্নবস্ত্র পরিত্যাগ নূতন বস্ত্র ব্যবহার।

যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইয়া যাইলে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া মানবগণ নূতন বস্ত্র পরিগ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই ভোগদেহ জীর্ণ হইয়া আসিলে বা সেই দেহের ভোগ কর্ম্ম শেষ হইলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মা পুনরায় তাহার আগম কর্ম্মের ভোগানুকূল নূতন বা ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান এই বাক্যে কর্মবন্ধনের একটি অভিনব সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন: দেহ জীর্ণ হইয়া যাইলে, নূতন দেহ ধারণের উদাহরণ প্রসঙ্গে জীর্ণ ও নবীন বস্ত্রের কথা তিনি বলিয়াছেন। পুরাতন গৃহের পরিবর্ত্তে নূতন গৃহ গ্রহণের উদাহরণও দিতে পারিতেন, কিংবা ঐরূপ যে কোনও বস্তুর উদাহরণও দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না দিয়া বস্ত্রের সহিত তুলনা করিবার পক্ষে তাঁহার যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার বাক্য বা প্রত্যেক শব্দই অভ্রান্ত ও পরিমিত, একটিও নিরর্থক নহে। সাধারণ বুদ্ধি মানব তাহার যথার্থ মর্ম্ম নির্ণয় করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাই তাহার নানা অর্থ কল্পনা করিয়া থাকে। যাহা হউক, শ্রীগুরুকৃপা হইলে ভগবানের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। গৃহ, অট্টালিকা, মন্দির বা মঠাদির পরিবর্ত্তে বস্ত্রের কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বস্ত্র প্রস্তুতের মূলীভূত উপাদান বস্তু কেবল কতক গুলি সূত্র; ইষ্টক, কাষ্ঠ বা প্রস্তরাদি অন্য কোন বস্তু নহে। সেইসূত্র আবার বস্ত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বা দুই নামে পরিচিত হয়। একটির নাম "টানা" অন্যটির নাম "পোড়েন"। টানার সূতাগুলি সম্মুখে ও দূরে তাঁতের দুইদিকে দুইটি বংশ বা দণ্ডের সহিত প্রথম হইতে সংবদ্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহার আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন অর্থাৎ 'কমান', 'বাড়ান' বা 'নড়ন' 'চড়ন' করিবার আদৌ প্রয়োজন হয় না, তাহা বস্ত্রের দৈর্ঘ্যানুরূপ পূর্ব্ব হইতেই পরিমিত বা স্থিরভাবে দৃঢ়বদ্ধ থাকে; কিন্তু পোড়েনের সূতাগুলি যাহা "মাকুর" মধ্যে দিতে হয়, তাহা সময়মত সংযোগ বিয়োগের প্রয়োজন হয়, তাহা বস্ত্রের ঘনত্বের তারতম্য অনুসারে অর্থাৎ বস্ত্রের জমি 'পাৎলা'

বা 'খাপী' করিবার ইচ্ছানুসারে অল্প ও অধিক দিতে হয় এবং সেই পূর্ব্বপরিচিত টানার সূতার সহিত উপর নীচে হইয়া বস্ত্রের বয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যায়। মনুষ্যের ব্যবহার উপযোগী হইয়া থাকে।

জীবের ভোগদেহও ঠিক বস্ত্রের ন্যায়ই সূত্র সহযোগে রচিত হয়। তবে এই দেহের উপাদানসূত্র বস্ত্রের ন্যায় কার্পাসাদি স্থূল বস্তুজাত নহে। ইহার নাম "জীবের কর্ম্মসূত্র।" ইহাতে 'টানা ও পোড়েন' রূপে দুই শ্রেণীর প্রধান সূত্র বিদ্যমান আছে। জীবের পূর্ব্বজন্মার্জিত প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছে বা প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, এইরূপ কর্ম্মফলরূপ সূত্র সমূহ এই জন্মে তাহার ভোগ দৈর্ঘের পরিমাণ অনুসারে দৈবনির্দ্দিষ্ট হইয়া জীবের জীবন তাঁতের দুই প্রান্তে অর্থাৎ সম্মুখে ও পিছনে জন্ম ও মৃত্যুরূপ যেন দুইটি দন্ড বা বাঁশের মধ্যে "টানার" ন্যায় যথা পরিমিত ব্যবধানে সংবদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ জীবের জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বা তাহার ভোগকাল নির্দ্দিষ্ট আয়ুর মধ্যেই সুখ-দুঃখ জড়িত যত কিছু, তাহার প্রারব্ধ ভোগের সংযোগ আছে, তাহা প্রত্যেক জীবকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয়। জীব কর্ম্মফলবশে কেবল যে এই সংসার ভোগ করিতেই আইসে, তাহা নহে, ভোগাইতেও আসে। একজন অন্যজনের সুখের বা দুঃখের উপলক্ষ্য কারণ হইয়া পরস্পর সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রারব্ধকাল ক্ষয় বা পূর্বনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মফল ভোগ শেষ করিয়া থাকে। ইহাতে কাহারও কোন বাধা প্রারব্ধ বা জন্মার্জিত কর্ম্মফল ভোগের সঙ্গে সঙ্গে জীব সততই নূতন নূতন কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে। সেই নূতন কর্ম্মরূপ সূত্রগুলিই পূর্ব্ব কথিত প্রারব্ধ বা টানার সহিত উপর নীচে হইয়া কখন বামে, কখন দক্ষিণে, অর্থাৎ কখনও সৎ, কখনও বা অসৎ, কখন পাপ আসক্তি বা মুক্তির প্রতিকূলভাবে এবং কখনও পূর্ণবিরক্তি বা মোক্ষের অনুকূল ভাবে পরিচালিত হইয়া যেন নিজ নিজ নূতন ভোগবস্ত্র বয়ন হইয়া যাইতেছে। জীবের অভিমানই সত্ত্বঃ, রজঃ, ও তমোগুণ পুষ্ট পুরুষার্থরূপে এই নবীন কর্ম্মসূত্র নির্মাণের একমাত্র হেতু।

আধ্যাত্মিক ক্রিয়ায় উচ্চ ক্রিয়ান্বিতদের উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা।

সৃষ্টির আদি, অন্ত ও মধ্যভাগ সবই আমি। এক অখণ্ড আত্মা ত্রিকালে বর্ত্তমান। আকাশে আদি, অন্ত, মধ্যরূপ খন্ডভাব নাই। ঘট পটাদিতে আকাশ খন্ডিত বলিয়া মনে হইলেও ঘটপটাদি ব্যবধান আকাশকে যেরূপ প্রকৃতই খন্ড খন্ড করিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মার অসংখ্য শরীরাদি উপাধি থাকিলেও এক অখন্ড আত্মাই চির বিদ্যমান, তাহাকে কোন বেষ্টনের মধ্যে আনা যায় না। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন দেহবোধ থাকে না তখন আদ্যন্তমধ্যবিহীন আত্মার অখণ্ড স্বরূপের বোধ হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিদ্যা - এই অধ্যাত্ম বিদ্যাই আত্মবিদ্যা, যদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ''বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি প্রদা যা'' - দেহকে অধিকার করিয়া আছেন বলিয়া আত্মাই অধ্যাত্ম। এই দেহ সম্বন্ধে ও তাহাতে অবস্থিত আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান আত্মক্রিয়ার দ্বারাই লভ্য, এইজন্য এই ক্রিয়া সাধনকেও অধ্যাত্ম বলা যায়। এই আত্মক্রিয়ার দ্বারাই দেহাত্মবোধ নষ্ট হয় এবং সত্যবোধ বা পরমার্থ বোধের উদয় হয়। ওঁকাররূপ শরীরের মধ্যে সর্ব্বত্রই কূটস্থের অনুভব হইতে পারে, কিন্তু দুইস্থানে কূটস্থ স্থির অর্থাৎ নিত্য, ভ্রূমধ্যে ও মূলাধারে।

কূটস্থ অব্যক্ত ও নিত্য। তিনিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাকেই ব্রহ্ম বলে। মূলাধারে বায়ু গমন করিলে সকল সৃষ্টির ক্ষমতা হয় অর্থাৎ দূরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অনুভব এই ঘটেতেই হয়। এই ব্রহ্মের সকল দিকেই সুখ, ইহার এতাদৃশ পরাক্রম যে, যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। চক্ষুর দ্বারা অরূপের রূপ - কূটস্থ, বিন্দু দেখেন। কর্ণদ্বারা অশব্দের শব্দ ওঁকার ধ্বনি শোনেন। জিহ্বা দ্বারা অরসের রস আস্বাদন করেন, অর্থাৎ বায়ুরূপ অমৃত (মিষ্ট) গলায় বোধ হয়। নাসিকায় অগন্ধের গন্ধ, নানা দ্রব্যের ও পুষ্পের গন্ধ পান। ত্বক অস্পর্শীয় ব্রহ্ম বায়ু দ্বারায় স্পর্শ করেন। সেই এক ব্রহ্ম বস্তুই আপনাকে বহুভাবে অনুভব করেন।

গুরুসমীপে শিষ্যের কর্ত্তব্য।

আমরা গুরূপদেশে আধ্যাত্মিক ক্রিয়া পাইবার পর যতদিন আমরা গুণাতীত হইতে না পারি ততদিন আমাদের এই ক্রিয়া প্রাণপণ যত্ন সহকারে করা কর্ত্তব্য। কারণ গুণ বর্ত্তমান থাকিতে সম্যক জিতেন্দ্রিয় অবস্থা আমরা পাইতে পারি না। বরং পুনরায় আসুরিক ভাবের আবির্ভাব হইয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। পরাৎপর পরমগুরুদেব বলিয়াছেন-

যতদিন চক্রপথে প্রাণায়ামের রাস্তা থাকিবে, যতদিন ঐ রাস্তা শেষ না হইবে, যতদিন মূলাধার সহস্রার এক না হইবে ততদিন সাধন সমর চলিবে। অন্যথায় সিদ্ধমুক্ত অবস্থা পাওয়া সুদূর পরাহত। আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, Rome was not built in a day আপন গুরু বা উপদেষ্টার স্বগ্রামে বাস থাকিলে তাঁহাকে সাধনের সময় যে যে প্রকার মনের অবস্থা হইবে অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ এবং সৎ অসৎ প্রকারের চিন্তা মনে যাহা হইবে তৎ সমুদয় কিছুমাত্র গোপন না করিয়া সমস্ত জ্ঞাপন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। উপদেষ্টা গুরু তৎ সমুদয় শ্রবণ করিয়া বাধা বিঘ্ন নিবারণে যে সকল সদুপদেশ দেবেন তাহা পালন করতঃ গুরুর আজ্ঞামত চলিলে আমরা অচিরে শুভফল প্রাপ্ত হইব তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যদ্যপি গুরুধাম হইতে সাধকের এক ক্রোশ মধ্যে বসতি হয় তাহা হইলে দিবসের মধ্যে একবার তাঁহার নিকট গমন করিয়া সাধনের ফলাফল তাঁহার নিকট জানান আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। যদ্যপি অর্দ্ধযোজন মধ্যে পরস্পর বাসের ব্যবধান থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক পক্ষে অন্তত চার পাঁচদিন তাঁহার সমীপে গমন করিয়া সাধনার ফলাফল জানান বিশেষ কর্ত্তব্য। আর যদি দ্বাদশ যোজনের মধ্যে বসবাস হয় তাহা হইলে মাসান্তে একদিন কিংবা তিনমাসের মধ্যে একদিন গুরুধাম অবশ্যই দর্শন করিয়া গুরুসমীপে সাধনার ফলাফল ও কার্য্য সমূহ গুরুকে দেখাইয়া অকপটে মনের ভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

ইহাব অধিক দূববর্ত্তী স্থান হইলে অন্ততঃ বৎসে বর্ষে একবাব গুরুসমীপে আগমন কবা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

সাধক সাধিকাদিগের মঙ্গলের জন্য উপবোক্ত মূল্যবান উপদেশগুলি লিপিবদ্ধ করিলাম। আশাকবি সকল সাধক সাধিকাবৃন্দ উপরোক্ত উপদেশগুলি স্মরণ করিয়া কার্য্য করিবেন। যিনি করিবেন তিনি তবিবেন, যিনি না কবিবেন তিনি মরিবেন। এতে আমাব কি ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে, শরীরটি বেশ সুবিধাব নয অতএব শুইযা পডিলাম। তবে দুঃখেব বিষয নিদ্রা আসিতেছে না।

ক্রিয়ার অন্তরায়।

শাস্ত্র বলিযাছেন প্রাণাযামের তুল্য শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নাই। কিন্তু এই প্রাণাযামাদি যোগ অভ্যাস কবিতে গেলে আমরা নযটি অন্তরায দেখিতে পাই। সেই অন্তবায নযটি যোগ-বিঘ্নকর। এই সকল অন্তরাযগুলি দূর করিবার জন্য আমাদেব যথাসাধ্য চেষ্টিত হওযা উচিৎ। সম্যক প্রকার চেষ্টা যত্ন থাকিলে আমরা গুরুকৃপায কতকটা সফল কামও হইতে পারি। অন্তরায কযটি কি কি তাহা নিম্নে বলিতেছি।

১। **ব্যাধিঃ-** শরীরগত ধাতুর বৈষম্য হেতু ইন্দ্রিযাদির বিফলতা ও তৎসহ শারীরিক অস্বাস্থ্য, শবীরে পীডা থাকিলে যোগলাভে সম্যক প্রযত্ন হইতে পারে না, আহারেব সংযমও আমাদের নেই, ইন্দ্রিযের সংযমও নেই। এই অসংযমেব কারণেই যাবতীয পীডা উৎপন্ন হয, যিনি এ বিষযে যত অবহিত তাঁহাকে অস্বাস্থ্যের কষ্ট তত কম ভোগ কবিতে হয।

২। **স্ত্যানঃ-** চিত্তের অবসাদ, মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, কিন্তু তথাপি সাধনে চিত্ত বসিতে চায না এই বাক্ষসীই বহু সাধককে

খাইয়া ফেলে। সাধন অপ্রীতিকর বোধ হইলেও চেষ্টা যাহার আছে সে একদিন না একদিন ইহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবেই।

৩। **সংশয়ঃ-** সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে কিনা সন্দেহ, নিজের সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহ - আমার দ্বারা ইহা শেষ পর্য্যন্ত হইবে কিনা? ভগবানের করুণার প্রতি সন্দেহ তিনি চেষ্টাশীলকে দয়া করেন কিনা? গুরুর প্রতি ও শাস্ত্রের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা থাকে তাহার মনে এই প্রকারের সংশয় প্রায়ই উপস্থিত হয় না।

৪। **প্রমাদঃ-** যিনি আত্মবিস্মৃত, যিনি সাধন করিতে গিয়া কোন একটি বিষয়ে আসক্তিবশতঃ সাধনায় শিথিলপ্রযত্ন হন, আর তেমন উদ্যম থাকে না, বাহ্য বিষয় লইয়া তখন মগ্ন, ইহাই প্রমাদ। ভরত রাজা যেমন হরিণের প্রতি আসক্ত হইয়া তপস্যার শৈথিল্য দেখাইয়া ছিলেন। এইজন্য যাহাতে আত্মস্মৃতি জাগরুক হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

৫। **আলস্যঃ-** আহারাদির অনিয়মবশতঃ শরীর ও মনের যে জাড্য, পরিশ্রম করিতে শরীরও চায় না, মনও চায় না। গুরু আহার ও নিদ্রাধিক্য আলস্যের জনক। অনেক বুদ্ধিমান ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তিও এই আলস্যের কবলে পড়িয়া আপনার জীবনে উন্নতিলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন।

৬। **অবিরতিঃ-** বিষয় ভোগের আসক্তি দূর না হওযা। মনকে সর্ব্বদা অনাবশ্যক চিন্তা করিতে না দিলে বিষয়ের হেয়ত্ব বিচার করিলে এবং মনকে অন্ততঃ শ্বাসে শ্বাসে জপ অভ্যস্ত করাইতে পারিলে এই ভাবটি কমিয়া যাইতে পারে।

৭। **ভ্রান্তিদর্শনঃ-** যাহা সত্য বস্তু নহে তাহাকে সত্য মনে করা, সামান্যকে অসামান্য ভাবা, অথবা অবিবেকবশতঃ সাম্প্রদায়িক সংস্কার দ্বারা বুদ্ধিকে সংস্কারাবদ্ধ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা। চিত্তকে উদার

করিলে এবং শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া সব বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিলে ভ্রান্তি দর্শন মিটিয়া যায়।

৮। **অলব্ধভূমিকত্বঃ-** ঠিকস্থানে পৌছিতে না পারা, যথেষ্ট সাধন করিয়া কোন কিছু প্রত্যক্ষ করিতে না পারা। ইহা পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত অন্তরায়, ইহার জন্য ধৈর্য্য সহকারে সাধনায় স্থির থাকিয়া চলিতে হইবে।

৯। **অনবস্থিতত্বঃ-** সাধনার দ্বারা ভূমি লাভ করিয়াও তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে না পারা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি যোগ বিঘ্নকর। এই সকল অন্তরায় দূর করিবার জন্য যাহা বলা হইয়াছে তাহার সম্যক পালনে বিঘ্নগুলি দূর হইয়া যাইতে পারে। যাহারা সম্যক চেষ্টাশীল ও উদ্যমযুক্ত পুরুষ তাঁহারা একদিন না একদিন কৃতকার্য্য হইবেনই, আর যাহারা চেষ্টা করিবে না, তাহাদের এসব পথে আসাই বিড়ম্বনা মাত্র।

এইস্থানে মহাত্মা কবীর সাহেব যে মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন তাহা আমাদের সর্ব্বতোভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কবীর বলিয়াছেনঃ- ভগবানকে পাইবার জন্য এই শরীরকে জ্বালাইয়া কালি কর, অর্থাৎ খুব পরিশ্রম কর; আর কালির কলম দিয়া সেই কালিতে রামের নাম লিখিয়া পাঠাও। এইরূপ অষ্টপ্রহর যে লাগিয়া থাকে, সেই ভগবানকে পাইয়া ভগবানের প্রেমাস্বাদের নেশায় ভোর হইয়া যায়।

কবীর আরও উৎসাহের সহিত বলিয়াছেন ঃ-

"কবীর প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়া রটি রহা গুরুজ্ঞান।
দিয়া নাগারা শব্দকা, লাল খাড়ে ময়দান।।"

কবীর ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থারূপ প্রেম বাটি ভরিয়া

পান কর, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ সব প্রেমে ভরপুর হইয়া উঠুক, এইভাবে গুরুদণ্ড সাধনা দিনরাত বাঁটিতে থাক, তখন কত অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য, কত অদ্ভুত কান্ড সকল দেখিতে পাইবে। রাজা আসিলে যেমন তাহার আগমনের চিহ্নস্বরূপ নানাবিধ সুস্বর সংযুক্ত বাজনা বাদিত হইতে থাকে; তদ্রূপ এই দেহের মধ্যে ওঁকারের বিবিধ নাদ ঝঙ্কৃত হইতে থাকিবে এবং তখন দেখিবে তোমার যিনি সর্ব্বস্ব লালমণি তিনি ময়দানে চিদাকাশের প্রান্তরে অপরূপ দিব্য সাজে সাজিয়া সাধকের চিরদিনের আশা সফল করিতেছেন।

শ্মশান বাসিনী মা।

মা! লোকে তোকে বলে শ্মশানবাসিনী, শ্মশান তোর বড় প্রিয়, তবে মা আমার হৃদয়ে তোর বসবার বেশ ঠাঁই হবে। আমার হৃদয়ের মত এমন মহাশ্মশান আর পাবি না মা! একবার আমার হৃদয় পানে চেয়ে দেখ্, সেখানে দয়া নাই, শ্রদ্ধা নাই, কোমলতা নাই, পূজ্য পূজা নাই, সব অবিশ্বাসের অগ্নিতে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। সেখানে কেবল জ্বালা, প্রাণের জ্বালা, কামের জ্বালা, ক্ষুধার জ্বালা, রূপের জ্বালা, ধনের জ্বালা দাউ দাউ করে দিবারাত্র জ্বলছে। সেখানে আর কিছু শব্দ নাই, কেবল থেকে থেকে ষড় রিপুর বিকট চিৎকার শ্মশানে ফেরুপালের অভিনয় করে ফিরছে। শ্মশানে যেমন দগ্ধাস্থিখন্ড স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হয়ে থাকে এবং শবদেহের গন্ধে পূর্ণ থেকে পথিকের ভীতি উৎপাদন করে, তেমনি আমার হৃদয় শ্মশানে আর কিছু নাই। সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, কেবল পাপস্মৃতির কঙ্কালরাশি, বিকৃত অনুষ্ঠানের অস্থি আবর্জ্জনা, আর অতীত গৌরবের অভিমান – স্পর্দ্ধার নরমুন্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে! লোকে শ্মশান দেখলে যেমন ভয় পায়, আমিও আমার হৃদয় পানে তাকিয়ে তদ্রূপ ভীত হয়ে পড়েছি মা! আমার হৃদয়ের মত এমন ভয়ঙ্কর শ্মশান আর কোথায়? এখানে প্রতিদিন শত শত শুভকামনা শুষ্ক কাষ্ঠের মত প্রবৃত্তির আগুনে পুড়ে ভস্ম হচ্ছে।

আয় মা! তবে একবার এই শ্মশান হৃদয়েই তোর আসন পরিগ্রহ কর। আমার হৃদয়ের করুণ বেদনা, রোগের ভীষণ আর্ত্তনাদ, মর্ম্মফাটা রোদনের অব্যক্ত ধ্বনি সেখানে সঙ্গীতের কাজ করবে। পত্র, পুষ্প, নৈবেদ্য আর কি আহরণ করব মা? আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র কোমল ভাবগুলি অন্ততঃ গন্ধহীন পুষ্পের কাজ করবে। ভক্তেরা যে তোমার আকাশথালে চন্দ্র সূর্য্যের দীপ সাজিয়ে মনকে অর্ঘ্য করে পঞ্চ প্রাণের পঞ্চ প্রদীপ জ্বালিয়ে সহস্রার কমল-ক্ষরিত সুধা-ধারাকে আচমনীয় ও পানীয় জলরূপে নিবেদন করেন; অভক্ত আমি, দীন কাঙাল আমি, সে কোথায় পাব বল? আমার শ্রদ্ধাবিহীন, ভক্তিবিহীন শুষ্ক ভাবকুসুমগুলি এবং অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ের তপ্ত অশ্রুই আমার পূজার সম্বল।

আমার প্রাণের অক্ষম শক্তির ব্যাকুলতা অর্ঘ্যরূপে প্রদান করব। মা গো! এতো কৈলাস নয়, এ যে শ্মশানের পূজা, এখানে এই দীন পূজার দীন আয়োজনেই তোমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তারপর তোমার বলির কথা ভাবছি। কি আছে আমার, তোমার চরণে কি বলি দেব? ভক্তেরা যে আত্মবলি তোমার চরণে নিবেদন করেন, সে শক্তি তো আমার নাই? তুমি জোর করে আমার মোহ আসক্তিকে বলিরূপে গ্রহণ কর। আমি এত চেষ্টা করেও এ পর্য্যন্ত আমাকে "আমার" করে নিতে পারি নাই; তবে তোমার পাদপদ্মে আর কি বলি দেব মা! অসুরনাশিনী, একবার হুহুঙ্কারে দিগন্ত সংক্ষুব্ধ করে রিপুকুলকে স্তম্ভিত করে দাও। তাহারা যেন স্বেচ্ছায় তোমার চরণে আপনাদিগকে বলি দেয়। একটা কথা তোমাকে বলতে বড় ইচ্ছা হয় মা! এ সমস্ত জগদ্ব্যাপার সবই তো তোমার মায়া! তুমি যেমন মুক্তিদাত্রী মাতৃ মূর্ত্তিরূপে ভক্ত প্রাণকে সুশীতল কর, তেমনি তুমিই তো এই মহা-মোহরূপিনী অনাদ্যাঅবিদ্যা। হাঁ গো অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে! যদি মায়ার পরপারে না গেলে মুক্তি দেবেই না স্থির করে থাক, তবে একবার তোমার পরম ঋষি বাক্যের সার্থকতা কর।

"সংমোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বংবৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তির্হেতুঃ।"

এই তো তারা বলেছেন তুমি প্রসন্না হলেই জীবের মুক্তি হয়। এইবার তোমার চরণে এই দীনের একমাত্র প্রার্থনা, একবার তোমার আবরণ উন্মোচন কর, চক্ষের ধাঁধাঁ, মনের সন্দেহ সব মিটে যাবে। ওমা! গণেশ জননী, আমাদের ভীত কম্পিতবক্ষ শান্ত কর, একবার শরণাগত জনের অভয়দায়িনী হইয়া অভয় দান কর। আমাদের সমস্ত ভয়, সমস্ত শোক, সমস্ত বিদ্বেষ, সমস্ত বিভেদ তোমার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে অমৃত হইয়া উঠুক। সুদীর্ঘ পথ বহু ভার স্কন্ধে নিয়ে এ ভব ভ্রমণ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এইবার নিজগুণে কৃপা করে শ্রান্তিহরা মুখখানি লইয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াও। তোমার অমল কমল মুখখানি দেখতে দেখতে এ নশ্বর জগৎকে ভুলে তোমার পাদপদ্মে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারি। এই বিরাট বোঝার ভারে মাথা ফেটে গেল, সে ভার নামিয়ে নেওয়ার তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই জননী। তাই এই কাতর দীনের ব্যাকুল প্রার্থনা তুমি উপেক্ষা করবে না। মা! আমার এখনও একটা কথা মনে পড়ে ঃ-

"জন্মিলে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিল যে
মরিলে অমৃত ক্রোড়ে তুলে নেবে সে।"

কাপালিক।

আমাদের এক্ষণে কাপালিক সম্বন্ধে কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক। কাপালিকেরা চিতা ভস্মে নিজ দেহকে আবৃত করিয়া রাখে এবং অস্থি মালা গলদেহে ধারণ করিয়া রাখে, কপালে অঙ্গারের তিলক করিয়া সময় সময় ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করিয়া থাকে এবং হস্তে নরকপাল ধারণ করিয়া থাকে, এই নরকপালে ভোজন পাত্রেরও কার্য্য চালাইয়া থাকে। তাহারা মুখে লোকজন দেখিলে কালী তারা ভৈরব

ইত্যাদি বিকট শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। আর মদ্যপানে আরক্তলোচন করিয়া লোকের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া থাকে এবং নিজেকে সাক্ষাৎ ভৈরব বলিয়া প্রকাশ করিয়া নিজেকে মুক্তপুরুষ বলিতেও কুন্ঠিত হয় না। আরও নিজেকে কুলাচার্য্য, কুলাবধৌত উপাধিতে ভূষিত করিয়া লোকসমাজে নিজে সিদ্ধমুক্ত বা সিদ্ধমুক্তগণের গুপ্ত আশ্রমাদি দর্শন করিয়াছি ইত্যাদি ভাবে বলিয়া নিজেদের বিজ্ঞতা দেখাইয়া থাকে। ইহাদের ছায়াও স্পর্শ করা কাহারও উচিত নহে, কারণ ইহারা প্রতারক মধ্যে গণ্য, জানিবে। ইহারা তন্ত্র বা যোগশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না থাকায় বিপরীত অর্থ করিয়া নিজেও বিপথগামী হইয়া থাকে এবং সাধারণকেও বিপথগামী করাইয়া থাকে। এ কারণ ঐ সমস্ত তান্ত্রিক গণের কথায় কাহারও বিশ্বাস স্থাপন করা বিধেয় নহে।

এইবার মনে করা যাউক উপরোক্ত তান্ত্রিকগণ কারণ অর্থে মদ্য বলিয়া থাকে, ইহা কি কারণ অর্থের বিপর্য্যয় অর্থ নহে - যাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাই কারণ শব্দের প্রকৃত অর্থ, তন্ত্রের মধ্যে কারণ শব্দ অনেকস্থলে উল্লেখ আছে সে কারণ মদ্য - নহে। এক্ষণে কার্য্য কাহার দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে তাহা দেখিলেই কারণ শব্দের প্রকৃত অর্থবোধ আপনাআপনিই হইয়া যাইবে। কার্য্য কাহাকে বলে তাহা জানা চাই যাহা করা যায় তাহাকে কার্য্য কহা যায়, হস্ত ও পদাদি, মন ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারায় আমরা যে সকল কার্য্য করি তৎ সমুদয়ই গৌণ কর্ম্ম। এই সমস্ত কার্য্য করণে, মুখ্য কারণ শক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। এমত অবস্থায় শক্তিই একমাত্র "কারণ" পদবাচ্য। বাহ্যিক মদ্যতেও একটা মত্ততা শক্তি আছে একারণ উহা নিকৃষ্ট। ভ্রান্ত তান্ত্রিকেরা কহিয়া থাকে মদ্যের দ্বারা কুন্ডলিনী চৈতন্য হইয়া থাকে, ইহা মদ্যপায়ীর পক্ষে বলা অসম্ভব নহে, কেন না ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মদ্যপান করিবার এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কি হইতে পারে। এমনি আমি যদি মদ্যপান করি লোকে আমাকে ঘৃণিত মাতাল বলিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মদ্যপান করি তাহা হইলে প্রত্যেকে আমাকে সাধু, মহারাজা বলিয়া দক্ষিণা যোগে পায়ে

লুটাইয়া পড়িবে, এমন সুন্দর সুযোগ কি হেলায় হারান যায়। একেবারে "মার হাপ্পা।"

এইবার শক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। শক্তি অর্থে বল বা সামর্থ্য বুঝিও, দেখ মৃত শরীরে কোন সামর্থ্য বা বল থাকে না। শরীরে যতক্ষণ প্রাণের অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণই বল বা সামর্থ্য জীবের থাকে, প্রাণের অভাবে সকল শক্তিরই অভাব হইয়া থাকে। এই প্রাণ দুই প্রকার, স্থির ও চঞ্চল, প্রাণের এই চঞ্চল অবস্থায় ক্রিয়াশক্তি, বর্ত্তমানে প্রাণ কর্ম্মের ক্রিয়াশক্তি কার্য্যোৎপাদনের যোগ্য ধর্ম্ম, ইহাই আদ্যাপ্রাণশক্তিরূপা প্রকৃতি, ইনিই কারণ স্বরূপ, ইনি শরীররূপ যন্ত্রে রহিয়াছেন এবং শরীররূপ যন্ত্রে মন্ত্রও রহিয়াছে তাহা মুখে পাখীর মত আবৃত্তি করিতে হয় না। শ্বাস ও প্রশ্বাস যাহা চলিতেছে, তাহাই মন্ত্র। শিব বা ব্রহ্মা হইতে কৃমি পর্য্যন্ত জীবগণের যে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে তাহাই মন্ত্রপদবাচ্য।

"শিবাদি কৃমি পর্য্যন্তং প্রাণীনাং প্রাণবর্ত্তনং।
নিঃশ্বাস শ্বাস রূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে।।"

তবে তা দেখেই বা কে, আর দেখায় বা কে। অনেকে তন্ত্র শাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র হইতে নানা বচন সংগ্রহ করিয়া নিজের নাম দিয়া এবং নিজেকে লোকের নিকট সিদ্ধ যোগী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে সিদ্ধমুক্তগণের গুপ্ত আশ্রম বা গুপ্ত পুস্তকাগার প্রভৃতি হইতে গুপ্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি, ইত্যাদি বলিয়া মিথ্যা ভাণ করিয়া লোকের চিত্তহরণ করিয়া থাকে, এই প্রকার লোকের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া কোন কার্য্য করিলে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

সিদ্ধমুক্ত মহাপুরুষগণের কোন গুপ্ত পুস্তকাগার থাকা সম্ভব নয়। তাহাদের গুপ্তভাবে কোন পুস্তকাগার রাখিবারও কোন প্রয়োজন

নাই। কারণ আপনাকে আপনি উদ্ধার করিয়া জীবকে জ্ঞানালোক প্রদান করিতে যাঁহারা সদাই প্রস্তুত, তাঁহাদের গুপ্তভাবে কার্য্য করা বা থাকা অসম্ভব। অগ্নিকে ভস্মদ্বারা, সূর্য্যকে মেঘের দ্বারা চিরকাল ঢাকিয়া রাখা যেমন অসম্ভব, সিদ্ধমুক্ত মহাপুরুষগণেরও তদ্রূপ ঢাকিয়া রাখা অসম্ভব জানিবে। তাঁহাদের দেহের অস্তিত্বকালে তাঁহারা লোক সমাজে সাধারণ লোকের ন্যায়ই সামাজিক কার্য্যাদি করিয়া সামাজিক লোকের ন্যায়ই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রকাশ থাকিয়াও বর্ত্তমানে সাধারণের চক্ষে অপ্রকাশ ভাবে থাকেন। এইজন্য সাধারণ লোকে তাঁহাদের ধরা ছোঁয়া পায় না।

বৌদ্ধকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ধর্ম্মভাবের উপর একটা অস্বাভাবিক আচার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। সে কারণ সাধু সম্বন্ধে সাধারণের অন্যপ্রকার ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। তাহারা মনে করে স্ত্রী, পুত্র, পৈত্রিক বাটি, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া জটা ধারণ না করিলে কেহই সাধু সন্ন্যাসী হইতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, কারণ বেশ ধারণ করিলে সাধু বা সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতা ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

জীব যবন বা ম্লেচ্ছ পদবাচ্য নহে।

যাহারা আত্মধর্ম পরিত্যাগী কদাচারী অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রস্তুত, লোকের প্রতি হিংসা, নিন্দা যাহাদের একমাত্র কর্ম্ম তাহাদিগকে শাস্ত্রে যবন বা ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। যে মানব আত্মধর্ম পরিত্যাগী, তাহাদিগকে যবন বা ম্লেচ্ছ বলা হইয়া থাকে। তাহারা নামে বা পরিচয়ে আর্য্য বলিয়া বর্ণিত হইলেও প্রকৃত আর্য্য পদবাচ্য নহে। আমি মুখে আত্মবাদী বা ঈশ্বরবাদী পরিচয় দিয়া থাকি অথচ আত্মা বা ঈশ্বর কি তাহা আদৌ অবগত নহি, কার্য্যাকার্য্যের কোন বিচার নাই; আসক্তির

সহিত আসুরিক ভাবের অনুমোদিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেও গোপনে বা প্রকাশ্যে বিরত হই না। ইহাকে আর্য্যোচিত ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের লক্ষণ বলে না। এ কারণ আসুরিক ভাবাপন্ন মানবকে যবন পদবাচ্য বলিতেছি।

এরূপ জীবও কখনও চন্ডাল পদবাচ্য নহে। ক্রোধ ভাবই চন্ডাল পদবাচ্য এবং হিংসাভাবই চন্ডালিনী পদবাচ্য, জীব কখনও চন্ডাল পদবাচ্য নহে। প্রাচীনকালে কতকগুলি লোক আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কদাচারী এবং স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় আর্য্যকুলতিলক সগররাজা তাহাদের মস্তক মুন্ডন করাইয়া আর্য্যভূমি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। দেশ ও আলয় ত্যাগ করিবার পর উহাদিগকে যবন বলিয়া অভিহিত করা হইত। য - শব্দের অর্থ ত্যাগ, বন্ শব্দের অর্থ আলয়, আলয় ত্যাগ করার দরুণ উহাদিগকে যবন বলা হইত। এইবাক্যে শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যথা ঃ- "সাগর রাজনে যায়াং সর্ব্বশিরোমুন্ডনম্ সর্ব্ব ধর্ম্মরাহিত্যঞ্চ কৃতং তে চাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুরিতি।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীব যবন, ম্লেচ্ছ বা চন্ডাল পদবাচ্য নহে। যাহারা আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসুরিক ভাবের বশ্যতাপন্ন হইয়া আত্মার অধোগতির সহিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করেন তাহারা আর্য্যবংশ সম্ভূত হইলেও যবন বা ম্লেচ্ছ পদবাচ্য। উপরি উক্ত লোকেরাও যদি নিজের ভ্রম প্রমাদ বুঝিতে পারিয়া পুনরায় আর্য্যোচিত কর্ম্মে অর্থাৎ আত্মকর্ম্মে উদ্যোগী হন এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রাণপণ যত্ন সহকারে সাধনাদি করেন তবে ভগবদ্ কৃপায় অচিরে তাহারা শুভফল লাভ করিয়া আর্য্য বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বাক্যে সন্দেহ করিলে সে বিনাশপ্রাপ্ত হয় কারণ "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" প্রমাণ ঃ-

জাব্বল ঋষি, মাতঙ্গ ঋষি,কবজ ঋষি নমঃশূদ্র (চন্ডাল) হইয়াও

নিজ সাধনার বলে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। মহাত্মা সুরদাস নীচ বংশে (মুচিগৃহে) জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগৎবরেণ্য হইয়াছিলেন। যবন হরিদাস ও ভক্ত দাদুও তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এইরূপ বহু প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আমি মোটামুটি দুচারটি উল্লেখ করিলাম।

পুরীর জগন্নাথ কি ঠুঁটো

পূর্ব্বে চারিবেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যজুর্ব্বেদ প্রথম। এই যজুর্ব্বেদ দুই শাখায় বিভক্ত, শুক্ল যজু ও কৃষ্ণ যজু। এইজন্য ইহাকে যুক্তবেদ বলে। যজুর্ব্বেদোক্ত কৃষ্ণযজুই জগন্নাথ বা শ্রীকৃষ্ণ এবং শুক্ল যজুই বলরাম। মধ্যে সুভদ্রা, যিনি অতিশয় মঙ্গলযুক্তা অর্থাৎ কুন্ডলিনী শক্তি। "যা দেবী বায়বী শক্তিং" ইতি রুদ্র যামল। এই শক্তি চৈতন্য হইলেই অর্থাৎ কুন্ডলিনী শক্তি চৈতন্য হইলেই জীবের সমস্ত মঙ্গল হয়। এই শক্তি শুক্ল কৃষ্ণের মধ্যমার্গে অবস্থিত। জগন্নাথদেবের মন্দিরে চিত্রতেও তাহাই দেখানো হইয়াছে অর্থাৎ সুভদ্রাকে কৃষ্ণ ও বলরাম এর মধ্যে রাখা হইয়াছে হস্ত পদাদি কাহারও দেওয়া হয় নাই। তাহার কারণ উহাতে সংযম ভাবেরই লক্ষণ দেখানো হইয়াছে। যেখানে পূর্ব্বোক্ত রূপ শ্রীমন্দির সেইখানেই অর্থাৎ সেই দেহরূপ মন্দিরেই সর্ব্বদা জগন্নাথদেব ও বলরাম দেদীপ্যমান থাকেন। শ্রীমন্দির ব্যতীত অপর সাধারণ দেহরূপ মন্দিরে তাঁহারা প্রকাশ থাকিয়াও অপ্রকাশ। মন্দিরের বহির্ভাগের কুৎসিতভাবে চিত্র অঙ্কিত করিবার অভিপ্রায় কি ?

দেহস্থিত ইন্দ্রিয়গণ সমস্তই বহির্ম্মুখ এবং তাহাদের কার্য্যও সমস্ত বহির্ম্মুখী। মন্দিরের বাহিরের যে সমস্ত কুৎসিত চিত্র দেখানো আছে তাহার সমুদয়ই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের কার্য্যের পরিচায়ক। দেহমন্দির মধ্যে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিতে হইলে দেহের বহির্ভাগের ইন্দ্রিয়

বিষয়ে লক্ষ্য থাকিলে বা তৎ তৎ বিষয়ে আসক্ত হইলে দেহ মন্দিরের ভিতরস্থিত জগন্নাথ দেবের দর্শন হয় না। সেইজন্য শুদ্ধমনের একান্ত প্রয়োজন। বাহিরের পুরীতে মূর্ত্তিত্রয়ের হস্ত-পদাদি না দিয়া হস্ত-পদের সংযম ভাবই দেখানো হইয়াছে, নচেৎ তাঁহাদের যে হস্ত-পদাদি নাই ইহা বলিতে পারি না। কারণ গীতায় ১১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে তাঁহার অনেক বাহু, উদর, মুখ ও চক্ষু সম্বন্ধে বর্ণিত আছে। সুতরাং তাঁহার হস্ত-পদ নাই তাহা কি করিয়া বলিতে পারি? সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার রূপ তাঁহার যে হস্ত-পদাদি আছে আর আমার জগন্নাথের নাই, তিনি ঠুঁটো, ইহা হয় না।

বাহু শব্দের অর্থ - যাহার দ্বারা বহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রাণ বায়ুর বহির্গমনাগমন যাহা আমরা ২১,৬০০ বার করিয়া টানা ও ফেলা করিতে থাকি ইহাই প্রকৃত বাহু পদবাচ্য। উপরে যে ঠুঁটো জগন্নাথ দেখানো হইয়াছে তাহাতে জিতশ্বাসেরই অর্থ প্রকাশ পায়। ইহা আমরা ৫ম অধ্যায় ২৭ ও ২৮ শ্লোক আলোচনা করিলে বুঝিতে পারিব। (বর্ত্তমান জীবদেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা।) জগন্নাথের ঠুঁটো হস্ত পদের উপলক্ষ্য করিয়া হংসরূপ হস্তপদের সংযম অবস্থা যাহা. তাহাই জগন্নাথের মূর্ত্তিতে দেখানো আছে। বহিরঙ্গ হস্তপদের সংযমস্থল এ হংসের সংযম অবস্থা দেখানো আছে। এতদ্ব্যতীত উহা কিছুই নহে। উহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে সাধন প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ কূটস্থ চৈতন্যই জগন্নাথ।

এইবার বলরাম কে, তাহাই আমাদের দেখা দরকার। বলরামঃ- বল = শক্তি; রাম = রম, ক্রীড়া করা অর্থাৎ যিনি রমার সহিত রমণ করেন তিনি রাম পদবাচ্য। রমা = চঞ্চলা প্রাণ শক্তি, ইনিই আদ্যা প্রকৃতি; এই চঞ্চলা প্রাণশক্তির যে স্থিরত্বের ক্রিয়ারূপ অবস্থা তাহাই বলরাম পদবাচ্য ইনিই শুক্ল যজু। উক্ত বলরামের আর একটি নাম লাঙ্গলী অর্থাৎ যাহার হাতে লাঙ্গল আছে, তিনি লাঙ্গলধারী ছিলেন। তিনি যে অস্ত্রের অভাবে ঐরূপ লাঙ্গল ধরিতেন তাহা নহে, উহাতে

জীবের আত্মোন্নতি করিবার একমাত্র উপায় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিলে জীবের আত্মোন্নতি লাভ হইয়া থাকে নচেৎ নহে জানিবে। এ কারণ রাম প্রসাদ সেন বলিয়াছেন ঃ-

"মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ ক'রলে ফ'লতো সোনা।"

ইহাই মোটামুটি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

রথযাত্রা - রহস্য।

আমরা দেহরূপ রথে চড়িয়া সংসারে প্রবৃত্তিরূপা মাসীর বাড়ীতে আসিয়া সংসারের ধূলাখেলা করিতেছি। ইহাই জগন্নাথের রথযাত্রা। পুনরায় যোগমায়ারূপ সংসার ছেদন করিয়া যখন আমরা নিজ নিকেতনে পৌঁছাইব তাহাই উল্টোরথ বা পুনঃযাত্রা। এই ভাবকে অবলম্বন করিয়া বাহ্যিক রথযাত্রা প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই প্রকার আধ্যাত্মিক ভাবকে অবলম্বন করিয়াই বাহিরে রূপক ভাবে পুরাণ, রাস, দোল, ঝুলনপূর্ণিমা ইত্যাদিও রচিত হইয়াছে। এই সব নিগূঢ় মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আত্মকার্য্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করা প্রয়োজন, নচেৎ গল্প শোনাই সার হইবে।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন ব্যাপারটি বড় সুন্দর। ইহার যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। জীবদেহে দোষের অভাব নাই,

সহস্র সহস্র দোষরূপ ছিদ্র জীবদেহে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই দোষরূপ ছিদ্রযুক্ত দেহরূপ কলসে জল স্বরূপ আত্ম নারায়ণকে যিনি স্থিতি করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত সতী পদবাচ্য। বর্ত্তমানে জীবদেহে জীবন কৃষ্ণ মূর্চ্ছারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচৈতন্য রহিয়াছেন। জীবনকৃষ্ণ (প্রাণকে) এই মূর্চ্ছারূপ ব্যাধি হইতে চৈতন্য করিবার চিকিৎসক গুরুরূপী কৃষ্ণ। গুরুরূপী প্রাণকৃষ্ণ বলিলেন, দোষরূপ স্বছিদ্র (দেহরূপ ঘটে) কলসে যিনি বারি ধারণ করিতে সক্ষম তাঁহার সেই বারি দ্বারাই জীবন কৃষ্ণের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতে পারে নচেৎ মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে না।

রাধাই একমাত্র ছিদ্র কলসে বারি ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে সতী বলা হইয়াছিল। কৃষ্ণ যোগনিদ্রারূপ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। অজ্ঞান কর্ত্তৃক উক্ত স্থির অবস্থা উপলব্ধি হইতেছে না ইহাই কৃষ্ণের মূর্চ্ছারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া।

ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত কর্ষণ ক্রিয়ারূপ অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা যিনি প্রাণকর্ম্মে নিবৃত্তি রূপ বারিতে (জলস্বরূপ আত্মনারায়ণকে) দেহরূপ কুম্ভে স্থিতি করিতে পারেন তিনিই সতী। বারি অর্থে অবরোধ বুঝিবে। এই অবরোধ বিনা অবরোধে অবরোধ এইরূপ অবরোধ দ্বারা জলস্বরূপ আত্মনারায়ণকে দেহরূপ কলসীতে স্থিতি করিতে একমাত্র রাধাই সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কারণ রাধাই প্রধানা গোপী বলিয়া বিখ্যাত। কর্ষণ ক্রিয়ার নিবৃত্তি অবস্থারূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার জন্য তাঁহারা পতিভাবে সাধনা করিয়া থাকেন। সেই পতিভাবে সাধন করাকে গোপীভাব বলা হইয়া থাকে। ব্রজাঙ্গনাগণ সকলেই প্রাণশক্তিরূপা ভগবতী কাত্যায়নীর পূজারূপ সম্বর্দ্ধন ক্রিয়া অভ্যাসে স্থির প্রাণরূপ জীবন কৃষ্ণকে প্রাপ্তির জন্য নিত্য সাধনা করিতেন। তন্মধ্যে প্রধানা গোপীকে রাধা বলা হইয়া থাকে। ইনিই জিতশ্বাস হইয়া জীবাত্মার চঞ্চলভাব এবং পরমাত্মার স্থিরভাব এই উভয় অবস্থার ঐক্যভাব করিয়া পরমব্রহ্মভাব (অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রাণ কর্ম্মের মধ্যাবস্থার

অতীতাবস্থা) সাধন দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রধানা গোপী বৃষভানু নন্দিনীকে রাধা কহা যায়। গোপী অর্থে সাধারণ গোয়ালিনী নহে। গোপী অর্থে গো শব্দে গমন করা, প শব্দে পবন, ঈ শব্দে শক্তি (স্থির বায়বী শক্তি) অর্থাৎ প্রাণরূপী পবন যাহা আগম নিগম পথে (নাসারন্ধ্রে) গমনাগমন করিতেছে তাহাকে ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত স্থির বায়বী শক্তির দ্বারা যাঁহারা বিনা অবরোধে নাসাভ্যন্তরচারী করিয়া অভ্যাসরূপ সাধন করেন, তাহারাই গোপী পদবাচ্য বলিয়া জানিবে, এবং ব্রজপুরী শরীরকেই বুঝিবে। প্রাণকৃষ্ণ এই দেহরূপ পুরীতেই গমনাগমন করিতেছেন, সুতরাং জীবদেহই প্রকৃত ব্রজপুরী। ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া সার সংক্ষেপটুকুই গ্রহণ করিলাম। রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন কিরূপ জান? ইহার মর্ম্মার্থ এই যে সাধন অবস্থাতে সাধকের কিছু না কিছু দোষ থাকেই থাকে। সাধনের অতীত অবস্থাতেই একমাত্র দোষশূন্য হওয়া যায়। সাধক বা সাধিকা যাহারা পতিভাবে সাধনা করিয়া থাকেন তাহাদেরও প্রথম প্রথম বিষয় স্পৃহা কিছু না কিছু থাকেই রাধারও তদ্রূপ ছিল, ইহাই কলঙ্ক।

ক - শব্দে শরীর, ল - শব্দে দান করা, ঙ - শব্দে বিষয়ে স্পৃহা, ফের আর একটি ক আছে, এই ক শব্দের অর্থ মন। অর্থাৎ শরীর ও মন স্থির প্রাণরূপ কৃষ্ণকে দান করিয়া রাধা সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পতিভাব থাকায় দ্বৈতভাব রহিত হ'ন নাই এই দ্বৈতভাব রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাধার কলঙ্ক ছিল। ইহাই বিষয়ের স্পৃহা অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্তির বাসনা। তারপর যখন রাধা দেহরূপ কলসে জলস্বরূপ জীবন কৃষ্ণকে ক্রিয়াযোগ দ্বারা ক্রিয়ার অতীতাবস্থার নিবৃত্তির অবস্থার সহিত ঐক্য সাধন করিয়া বিনা অবরোধে স্থিতিরূপ নিবৃত্তির সহিত মিলন করিয়াছিলেন সেই মিলনরূপ অবস্থাই পরম ব্রহ্মভাব। তখন আর কোন স্পৃহাই মনে স্থান পায় নাই। ইহাই প্রকৃত কলঙ্ক ভঞ্জন। ইহাই মোটামুটি তাৎপর্য্য।

বিধাতা-পুরুষ জাত বালকের কপালে কি লিখিয়া দিয়া যান জানেন কি?

আমরা বহুকাল হইতে একটি কথা জানিয়া আসিতেছি যে সূতিকা গৃহে ছয়দিনের দিন ষষ্ঠী পূজা বা ষেটেরা পূজা হইয়া থাকে। আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এই দেশের সাধারণ লোকের ষষ্ঠ দিবসে জাত বালকের মঙ্গলার্থে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিয়া পরে ব্রাহ্মণগণকে যথাসাধ্য মিষ্টান্ন ও অর্থদান করিয়া ব্রাহ্মণগণের পদরজঃ জাত বালকের মস্তকে দিয়া থাকেন। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, এইদিন রাত্রে বিধাতাপুরুষ জাত বালকের কপালে আয়ু এবং অপর সদসৎ কর্ম্ম যাহা বালকের ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা লিখিয়া দিয়া যান। বস্তুতঃ আমার ভূমিষ্ঠ হইবার পর আর আমার কপালে লিখিবার কিছু বাকি থাকে না। তাহাই যদি হইত তবে অনেকে মৃত সন্তান প্রসব করেন কেন, কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিন চার ঘন্টার অথবা দুই চার দিনের মধ্যেও আঁতুড় ঘরের মধ্যে সন্তান মারা যায়, এরূপ প্রমাণ বহু পাওয়া যায়। সাধারণ লোকে যাহা বলিয়া থাকে তাহাতে তাহাদের বিধাতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। বিধাতা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকে।

বিধাতা কে? কেই বা কপালে লিখে যায় এবং কার কপালে বা লেখে আর লিখিয়া দিয়াই বা তিনি যান কোথায়? বস্তুতঃ বিধাতা বলিয়া কোন অস্থি মাংস বিশিষ্ট দেহধারী পুরুষ অথবা কোন অপার্থিব দেহধারী পুরুষ আসিয়া আমার কপালে লিখিয়া দিয়া যান না। বিধাতা শব্দের অর্থ, যিনি লোক সমূহকে বিশেষরূপে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। কে লোকসমূহকে ধারণ করিয়া আছেন? এক্ষণে তাহাই দেখা যাউক। ইতিপূর্ব্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বহুবার বলা হইয়াছে যে, প্রাণই ভগবান ঈশ্বর, প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা এবং লোকসমূহ প্রাণ কর্ত্তৃকই ধৃত রহিয়াছে, এই প্রাণই একমাত্র ধাতা বা বিধাতা পদবাচ্য। এই প্রাণ কর্ত্তৃকই জীবের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া

থাকে। অবশ্য এই প্রাণ বর্ত্তমানে যে শ্বাস প্রশ্বাসরূপে চলিতেছে তাহা নহে। শ্বাস প্রশ্বাস প্রাণের ছায়ামাত্র। বর্ত্তমান শ্বাসপ্রশ্বাস রূপ প্রাণকেও যিনি ধারণ করিয়া আছেন অর্থাৎ স্থির প্রাণ "প্রাণস্যঃ প্রাণঃ" বলিয়া কথিত হন। এই স্থির প্রাণই একমাত্র ধাতার স্বরূপ এবং জীবের বিধাতা পদবাচ্য অপর কেহ নহে। ইহারই পূজার দ্বারা জীব ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ইনিই বিধাতা পুরুষ, এতৎ ব্যতীত অপর কোন হাত পা ওয়ালা বিধাতা পুরুষ হইতে পারে না।

ননী - চোর।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মান, অভিমান, আমি - আমার বোধ, সুখ, দুঃখ আরও কত কি প্রাণ কর্ম্মের মধ্য অবস্থা হইতে জাত হইয়া থাকে, এই প্রাণকর্ম্মের মধ্যাবস্থা অর্থাৎ শ্বাস টানা ও ফেলা যাহা আমরা প্রত্যহ ২১,৬০০ বার করিয়া টানা ফেলা করিয়া থাকি, এই টানা ফেলার গতি অন্তর্মুখী প্রাণায়াম দ্বারা কৌশলে রুদ্ধ করিতে না পারিলে কাম, ক্রোধ ইত্যাদি যাহা উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোন উপায় নাই। এ কারণ প্রাণায়ামরূপ যোগকৌশল দ্বারা উহাদের গতি রুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ প্রাণায়ামরূপ মন্থন ক্রিয়ার দ্বারা ননী (মাখন) রূপ ব্রহ্মবীজ প্রকাশ হইলে সতর্কতা অভাবে উহা গোপাল (সত্ত্বগুণ) কর্ত্তৃক চুরি না যায় বা গোপাল চুরি করিয়া খাইয়া না ফেলে সে দিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম সুখভোগের ইচ্ছার দ্বারাই ও বাহ্যিক জ্ঞানের সঙ্গ দ্বারাই আসক্ত করিয়া জীবকে ননীপ্রাপ্ত হইতে দেয় না; না দিয়া সুখভোগের প্রলোভনে লালসায় রত করিয়া নিজের অধিকারে রাখিবারই প্রয়াস পাইয়া থাকে। সত্ত্বগুণের আশ্রয় ব্যতীত প্রাণায়ামরূপ মন্থন ক্রিয়ার ননী বাহির হইবে না, ইহাও সত্য। তবে যাহাতে ননী চুরি না যায় সে কারণ উক্ত সময়ে গুণাতীত অবস্থার উপর স্থিতি লাভের জন্য বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আর ননী চুরি না হইয়া ননী হইতে তখন ক্রিয়া বিশেষ (ওঁকার, ঠোকরের

ক্রিয়া) দ্বারা ঘৃত স্বরূপ পরমাত্ম ভাব প্রাপ্তি হইবে, নচেৎ নহে। এ জন্য সত্ত্বগুণে আবদ্ধ না হইয়া কঠোর সাধন দ্বারা গুণাতীত পদ—প্রাপ্তি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ গুণাতীত পদপ্রাপ্তি হইলে আর কোন প্রকারের পতনের আশঙ্কা থাকে না। সত্ত্বগুণ হইতেও পতনের আশঙ্কা থাকে।

রাসলীলা

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা সম্বন্ধে বহুস্থানে বহুভাবে উল্লিখিত আছে। ‘‘সাধক ও সাধনা’’ নামক পুস্তকেও গুরুকৃপায় বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখন আমার শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। এই রাসক্রীড়া প্রতি ঘটে ঘটে নিত্য হইতেছে এবং এই শরীরকেই বৃন্দাবন বলিয়া মহাত্মারা অভিহিত করিয়াছেন। বৃন্দাবন চৌরাশী ক্রোশ ব্যাপী, এই দেহও অর্থাৎ প্রত্যেক দেহ নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চৌরাশী অঙ্গুলী, ইহাই চৌরাশী ক্রোশ এবং প্রাণাদি পঞ্চকোষ ইহাই দেহরূপ বৃন্দাবন। এই দেহরূপ বৃন্দাবনের রাস নিত্য ক্রীড়া; এই রাসের রাসেশ্বরী স্বয়ং চঞ্চলাপ্রাণশক্তিরূপা আদ্যা প্রকৃতি, শ্রীরাধিকা এবং রাসেশ্বর পুরুষ প্রধান স্থিরপ্রাণরূপ আত্মনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। এই পুরুষ ও প্রকৃতি অষ্ট সখী সহ (যথাঃ- ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহংকার)। শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে যে লীলারূপ ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাই রাস পদবাচ্য।

সেতার।

বাহ্যিকভাবে সেতার বাজাইয়া অনেকেই আমাদের আনন্দ দান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেহরূপ সেতার সেরূপ নহে। বাহিরের সেতারের মত আমাদের দেহরূপ সেতার সেরূপ তার সংলগ্ন নহে। ইহাতে পবন অর্থাৎ বায়ুরূপী তার সংলগ্ন আছে; সুতরাং বায়ুরূপী তারে আঘাত করিতে হইলে বায়ু দ্বারাই আঘাত করিতে হইবে, তবে

প্রকৃত ধ্বনি বাহির হইবে, সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সকলেই মোহিত হয়, এমনকি দেবতাগণ ও ঋষিগণও মোহিত হইয়া থাকেন। আপনাতে আপনি তন্ময় হইয়া যান। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে আমার এই দেহরূপ সেতারের সবই উল্টা। ইহাকে বাজাইতে হইলে, উল্টা পবনের ঠোকর দ্বারা মধ্যমতারে আঘাত করিতে হয় তবেই ইহার প্রকৃত ধ্বনি বাহির হয়। সেই ধ্বনিই নারদাদি ঋষিগণের বাঞ্ছনীয়। ঋষিপ্রবর নারদ এই দেহরূপ ত্রিতন্ত্রীই বাজাইতেন এবং এই ধ্বনির সাহায্যে জীব সমূহকে জ্ঞান উপদেশ দিয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইতেন। নারদ শব্দের অর্থও তাই অর্থাৎ যিনি মনুষ্য সমূহকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান করেন। তিনিই নারদ পদবাচ্য। অপরে নহে। নারদ কি একটা অলাবু ও কাষ্ঠদন্ডের দ্বারা নির্ম্মিত ত্রিতন্ত্রী বা সেতার ঘাড়ে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তাহা হইতেই পারে না। একথা বলিলে ঋষিকে কলঙ্কিত করা হয় মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সাধারণ ত্রিতন্ত্রী বাজাইয়া বেড়াইতেন না ইহা নিশ্চয়। নারদ শরীররূপ সেতার বাজাইয়া প্রণব ধ্বনি শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পরে সেই জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা মনুষ্যগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ধ্বনি শ্রবণকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান গীতায় ২য় অধ্যায় ৫৩ শ্লোকে বলিয়াছেন ঃ-

শ্রুতি বিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।

অর্থাৎ ওঁকার ধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি যখন অবিচলিত হইয়া পরমেশ্বরের নিশ্চলা ও অভ্যাস পটুতা দ্বারা স্থির থাকিবে, তখন তুমি যোগ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত হইবে। নারদ শরীররূপ যন্ত্রের মধ্যে যে ত্রিতন্ত্রী রহিয়াছে, অভ্যাসবলে সাধন দ্বারা তিনি তাহা বাজাইয়া প্রণব ধ্বনি শ্রবণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনিও এই ওঁকার ধ্বনি এবং শরীরই বংশী। বাঁশের বাঁশী তিনি বাজাইতেন না। যে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া জগতের জীব সমূহ মোহিত হয় তাহা বাঁশের বাঁশী, কাষ্ঠের

বাঁশী হওয়া অসম্ভব। সেই বংশীধ্বনি এই প্রণব ধ্বনি এবং জীবদেহই শ্রীকৃষ্ণের বংশী। যাহা হউক বর্ত্তমানে আমার শরীরের কার্য্য যে ভাবে হইতেছে ইহার সব বিষয়ের উল্টা না করিতে পারিলে প্রকৃত ধ্বনিরূপ বোল বাহির হইবে না। আমার শরীর মধ্যস্থ বায়ুরূপী তার বর্ত্তমানে যেভাবে চলিতেছে তাহার উল্টা করা চাহি, নচেৎ আমার প্রকৃত ধ্বনিরূপ বোল ও তাহা হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ হইবে না। এই উল্টাভাবকেই লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা কবীর গাহিয়াছেন, "উল্টা নাম জপৎ জগ্ জনা, বাল্মিকী হুয়া ব্রহ্ম সমানা।" বাল্মিকীও উল্টা করিয়া লইয়া নাম জপ্ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন রাম নামের উল্টা জপ করিয়া যে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল, তাহা নহে। কারণ 'রাম' শব্দ উপাধি মাত্র। উহা রাম নহে। যিনি রমার সহিত সদা রমণ করিতেছেন তিনিই একমাত্র প্রকৃত রাম পদবাচ্য, অর্থাৎ যিনি আদ্যাপ্রকৃতির সহিত রমণ করিতেছেন তিনিই রাম অর্থাৎ পুরুষ প্রধান। স্থির প্রাণরূপ আত্মাই রাম। ইহার উল্টা করিলেই ব্রহ্মবিদ্যা সকলের লাভ হইতে পারে। সোজায় হইবার নহে বা পাইবার নহে। আমরা সোজা রামকে উল্টা করিয়া চালাইতে পারিলেই প্রকৃত বোল বাহির হইতে পারে এবং ধ্বনিরূপ বোল প্রতিপন্ন হইলে তখন বোধগম্য হইবে, নচেৎ নহে।

আমার এই বোলের বা ধ্বনির কোন অলঙ্কার নাই। আমিও কোনও অলঙ্কার দ্বারা আমার দেহরূপ সেতারের বোলকে বাজাইতে চাহি না, অর্থাৎ আমার দেহরূপ সেতারের বোল সাধারণের প্রিয় হইবে এই অভিপ্রায়ে উহাকে কোনও প্রকার অলঙ্কার দ্বারা সাজাইতে চাহি না। কারণ অলঙ্কার দ্বারা প্রকৃত সুন্দর বিষয়ের সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় এবং অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়ায় প্রকৃত সুন্দর বিষয়ে ততটা লক্ষ্য পড়ে না।

যাহারা বাহ্য অলঙ্কার প্রিয়, তাঁহাদের নিকট আমার শরীররূপ সেতারের বোল প্রিয় হইবে, সে আশা আমার নাই, অপরের নিকট

আমার এই দেহরূপ সেতারের বোল প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক তাহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই, কোনও একটি যে সকলেরই প্রিয় হইবে তাহা হইতে পারে না, যাহা আমার প্রবৃত্তির বিরোধী তাহা যেমন প্রকৃত ভাল হইলেও আমার ভাল লাগে না বরং মন্দ বলিয়া বিবেচনা করি, আমার দেহরূপ সেতারের বোলও অনেকের নিকট অপ্রিয় হইতে পারে। প্রবৃত্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত অপর বিষয় আমার ভাল লাগে না সুতরাং দেহরূপ সেতারের বোল যে সকলেরই প্রিয় হইতে পারে তাহা আমি বলিতে পারি না বরং না হওয়াই স্বাভাবিক। অপরের নিকট আমার দেহরূপ সেতারের বোল ভাল লাগুক বা না লাগুক তাহা আমার দেখিবার প্রয়োজন নাই বা প্রয়োজন মনে করি না। পরাৎপর পরমগুরুদেব এ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহা পরিহার করিয়া সংক্ষেপটুকু আলোচনা করিলাম।

মেয়েদের গোঁফ দাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা।

ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "আমিই বীজপ্রদ পিতা।" এখানে বীজ যদি একই প্রকারের হয় তাহা হইলে একই প্রকারের বীজ হইতে, স্ত্রী-চিহ্ন বিশিষ্ট এবং পুংচিহ্ন বিশিষ্ট উভয় প্রকার সন্তান কিরূপে উৎপন্ন হইতেছে? স্ত্রী-গণের গোঁফ দাড়িই বা কেন হয় না, এবং পুরুষের স্তন চিহ্ন থাকিয়াও স্ত্রীলোকের ন্যায় ঐ স্তন বর্দ্ধিত হয় না কেন? এবং পুরুষের গোঁফ দাড়িই বা বৃদ্ধি পায় কেন? এই প্রশ্ন আমার মনে উদয় হওয়ায়, আমার স্থির মন হইতেই উত্তর আসিতেছে।

অজপারূপ প্রাণ কর্ম্ম যে উভয় লিঙ্গ বিশিষ্ট একথা পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। অজপারূপ প্রাণ কর্ম্মের বামাবর্ত্তন ও দক্ষিণাবর্ত্তন গতি যখন যে ভাবে থাকে, জরায়ুও সেইভাবে বীজ গ্রহণ করিয়া থাকে। যোনি মুখে জরায়ু মধ্যে তিনটি নাড়ী আছে। এই নাড়ী তিনটির মধ্যে একটির নাম সমীরণা, দ্বিতীয়টির নাম চন্দ্রামসী এবং

৩য়টির নাম গৌরী। যে অবস্থায় বাম বা দক্ষিণ নাসার মধ্যে কোনটিতেই অজপার গতি না থাকিয়া কেবল সুষুম্নাতেই গতি থাকে, ঐ অবস্থায় রোপিত বীজ সমীরণা নাড়ীমুখে গতিপ্রাপ্ত হইয়া নিষ্ফল হয়। যে অবস্থায় বাম নাসায় অজপার গতি থাকে ঐ অবস্থায় বীজ রোপিত হইলে ঐ বীজ চন্দ্রামসী নাড়ীমুখে গতিপ্রাপ্ত হইয়া উহাতেই স্থিতিলাভ করে এবং তাহাতে কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয় এবং যে অবস্থায় দক্ষিণ নাসায় অজপার গতি হয় সেই অবস্থায় যদি বীজ রোপিত হয় তবে ঐ বীজের গতি গৌরী নাম্নী নাড়ীমুখে হইয়া ঐ নাড়ীতে অবস্থিত হওয়ায় পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়। বামাবর্ত্তন গতি সময়ে বীজ রোপিত হওয়ায় এবং চন্দ্রামসী নাড়ীও যোনীমুখে জরায়ুর বামভাগে অবস্থিত থাকায় এবং উহাতেই বীজের অবস্থিতি হইয়া কন্যা সন্তান উৎপন্ন হয় বলিয়া সাধারণতঃ নারীগণকে বামা কহা হয়।

এক্ষণে স্ত্রীগণের গুম্ফ কেন ওঠে না এবং স্তনই বা কেন বর্দ্ধিত হয় এবং পুরুষের তদ্বিপরীত ভাবই বা কেন, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জরায়ুর ঊর্দ্ধে বাম ও দক্ষিণে দুইটি অন্ড আছে, ইহাদিগকে জরায়ু কোষ বলা যায়। ইহা কুমারী অবস্থায় অল্প বয়সে অতি ছোট আকারের থাকে বলিয়া নারীগণের স্তন অল্প বয়সে প্রায় পুরুষদের মতই থাকে এবং জরায়ুর কোষস্থিত অন্ডদ্বয় যেমন বৃদ্ধিপায় স্তনের গঠনও তদনুযায়ী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গর্ভধারণের পূর্ব্বে ইহার আকার সম্যক বৃদ্ধি পাইয়া গর্ভাবস্থায় উহা আরও বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে নারীর এই অন্ড নিতান্ত ছোট থাকে বা একেবারেই থাকে না তাহাকে ষন্ডী (এক প্রকার ক্লীব বিশেষ) কহা যায়। জরায়ু কোষস্থিত অন্ডের বৃদ্ধিতে স্তনেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহার সহিত স্তন দুগ্ধও জন্মিয়া থাকে নারীগণের জরায়ু কোষের অন্ডের কার্য্য অন্তরেই হইয়া থাকে এবং ঐ অন্ডের কার্য্যশক্তি বক্ষঃ স্থলস্থিত স্তন যুগলে ব্যয়িত হওয়ায় স্ত্রীলোকের গোঁফ দাড়ি প্রকাশ পায় না। পুরুষের অন্ড বহির্ম্মুখে অবস্থিত থাকায় পুরুষের স্তনবৃদ্ধি না পাইয়া ঐ অন্ডের ক্রিয়াশক্তি বাহিরের গোঁফ দাড়ি বৃদ্ধি এবং অপর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য যে স্থির প্রাণরূপ আত্মা বা অজপারূপ বর্ত্তমান প্রাণকর্ম্মরূপা প্রকৃতিশক্তি ইহারা উভয়ে উভয় লিঙ্গ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ভাবে পুং চিহ্ন বা স্ত্রী চিহ্ন বিশিষ্ট নহেন তবে ইঁহারা যখন যেরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট দেহে অবস্থিতি করেন, তখন ইঁহারা তাহাই অর্থাৎ নারীদেহে অবস্থিতি করিলে স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুরুষ দেহে অবস্থিতি করিলে পুংলিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হন। বস্তুতঃ ইহারা না নারী না পুরুষ। ইহারা দেহী কিন্তু দেহ নহেন। ষণ্ডী বা স্বভাবতঃ ক্লীবের স্তন বা গোঁফ দাড়ি প্রায়ই হয় না ইহা দেখা যায়। ইহাই মোটামুটি তাৎপর্য্য।

নারী জাতি ভগবতী তুল্যা; পুরুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালিনী।

পুরুষ এবং নারী আমরা উভয়েই ঘটস্থ জীব, উক্ত ঘটস্থ জীবের মধ্যে (নর এবং নারী) নর অপেক্ষা নারী জাতি অধিক শক্তিশালিনী। তাঁহারা অল্পয়াসেই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। নারী জাতিই ভগবতীর বাহ্যিকরূপ জগদ্ধাত্রীরূপা অর্থাৎ জগতের যাবতীয় জীব সমূহের ধাত্রীস্বরূপা এবং নর অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালিনী। তাহারা পুরুষ অপেক্ষা ভোজনে দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, ব্যবসাতে (ব্যবসা শব্দের অর্থ উদ্যম, নিশ্চয়তা, ইচ্ছা) এবং কামে (কাম শব্দে কামনা বুঝিতে হইবে) অষ্টগুণ শক্তিধারণ করেন, এবং এইরূপে পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের উপরোক্ত শক্তি সকলের আধিক্যই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, নারীগণের শিক্ষার দোষে উক্তগুণ সকল আসুরিক ভাবের দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। যদি উক্তগুণ সকল পার্থিব বিষয়ে ধাবিত না হইয়া নিজের শরীরস্থ মনের আসুরিক ভাব সমূহকে দমিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত করিয়া আত্মকর্ম্মের দিকে চালিত হয় তাহা হইলে নারীগণ প্রকৃত ভগবতী পদবাচ্যা হইতে পারেন। বর্ত্তমানে তাহারা ভগবতীর বাহ্যিক রূপমাত্র

হইয়াই রহিয়াছেন। যিনি প্রকৃত ভগবতী পদবাচ্য তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যবতী। ভগ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌভাগ্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার ঐশ্বর্য্য। ভগ শব্দের অর্থ সেবাও বুঝায়। সুতরাং যিনি আত্মকর্ম্মের সেবার দ্বারা (অর্থাৎ ক্রিয়া যোগের সেবার দ্বারা), উপরোক্ত গুণ বা ঐশ্বর্য্যসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন; তিনিই প্রকৃত ভগবতী পদবাচ্যা হয়েন অপরে নহেন। যিনি প্রাণাদি ধাতু সমূহের ক্রিয়াকরারূপ সেবার দ্বারা বহিঃ প্রাণাদি বায়ুর স্থিরীকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ভগবতী পদবাচ্যা অপরে নহেন। উক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যের অবস্থা ষট্‌চক্র পথে মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত, প্রত্যেক চক্রের কার্য্য দ্বারা ছয় চক্রে ছয়টি অবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ইহা ক্রিয়াযোগের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে, বিনা সাধনে কাহারও লাভ হয় না, ইহা স্থির নিশ্চয়। দেব হউন আর দেবীই হউন, নর হউন আর নারীই হউন, সকলকেই ইহা সাধন দ্বারাই লাভ করিতে হইবে, নচেৎ ইহার অন্য উপায় নাই।

কলা বৌ বা নব দুর্গা।

বাহ্যিকভাবে আমরা যে কলা বৌ দুর্গাপূজার সময় দেখিয়া থাকি উহা প্রকৃত প্রস্তাবে কলাবৌ বা নবদুর্গা নহে। ইহা নবশক্তি একত্র সম্মেলন। বাহ্যিক কদলী (কলা) দাড়িম্ব (ডালিম) ধান্য, হরিদ্রা, কচু, মানকচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী ইহাই নব পত্রিকা, এই নয়টি গাছকে শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়া বাঁধিয়া স্ত্রী আকার করা হয় এবং উক্ত গাছগুলিকেই মাতৃকাবোধে নবদুর্গা বলা হয়। কিন্তু উহা প্রকৃত নবদুর্গা পদবাচ্য নহে। ইহা বাহ্যিক ভাব। নবপত্রিকাকে নবদুর্গাও বলা হয়। ইহা নব-শক্তির একত্র সম্মেলন। বাহ্যিক যে সব বৃক্ষলতা একত্র করিয়া বাঁধিয়া নব-পত্রিকা করা হয়, ঐগুলি সমস্ত ওষধি বিশেষ। ঐ সমস্ত দ্রব্যগুলিতে শারীরিক ব্যাধি নিবারণের কতকটা

শক্তি থাকায় উহাকেই ভ্রম ক্রমে নবশক্তি বা নবদুর্গা বোধে উহার উপর দুর্গার পূজা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বাহ্যিক ঔষধির শক্তি দ্বারা ভবব্যাধি অর্থাৎঅশান্তির সহিত জন্মমৃত্যু রূপ ভবব্যাধি দূর হয় না। বিহার ও মিথিলা ব্যতীত পশ্চিম অঞ্চলে আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত দেবীর পূজা স্তবাদি অর্চনা হইয়া থাকে, তথায় প্রতিমার কোন মূর্ত্তি গঠিত হয় না। নবদূর্গা, নব - নু - স্তব করা হইতে নব শব্দ উৎপন্ন। প্রাণ-শক্তিরূপা মহামায়া রূপিনী দুর্গার "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" ইত্যাদি কথিত যে স্তব সমূহ চন্ডীতে উক্ত আছে, উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দেবীর স্তব করা এবং উক্ত প্রাণ-শক্তিরূপা দেবীর সম্বর্দ্ধনরূপ আত্মক্রিয়া অনুষ্ঠানই একমাত্র পূজা বা অর্চ্চনা। আমাদের বঙ্গদেশে তন্ত্রোক্ত বাহ্যিক পূজাদি যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা সমস্তই মিথিলার ব্রাহ্মণগণের অনুকরণ মাত্র জানিবে। এক সময়ে মিথিলা শাস্ত্রাদি পাঠের ও শিক্ষার স্থান ছিল। সম্ভবতঃ সেই সময় হইতেই তন্ত্রোক্ত বা পুরাণোক্ত বাহ্যিক পূজার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। বাহ্যিক পূজা সমস্তই রাজসিক বা তামসিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা সাত্ত্বিক পূজা বা সাত্ত্বিক কর্ম্ম নহে।

দুর্গাকে দশভূজা দেখা যায় ইহার প্রকৃত অর্থ সাধককে ক্রিয়া যোগ দ্বারা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই বায়ুগুলির স্থির সাম্য অবস্থা আনয়ন করিয়া স্থির করা। ইহাই বাহ্যিক ভাবে দেবী দুর্গাকে দশভূজা মূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে।

তাঁর একপাশে সরস্বতী মূর্ত্তি দেখা যায়। কেন না ইহার অর্থ প্রাণ স্থির হইলেই আত্মবিদ্যা প্রকাশ পায়। তখন সাধকের মুখমন্ডলে লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ প্রশান্ত সাম্যভাব দেখিয়া লোক মুগ্ধ হয়। এই কারণে

অপর পাশে লক্ষ্মী মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে (লক্ষ্মী = শ্রীরূপা ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী)। তাঁর একপাশে কার্ত্তিক মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে কার্ত্তিক শব্দের অর্থ স্কন্দ - ক = মস্তক, স = শ্বাস প্রশ্বাস, ন = নাই, দ = যোনি; অর্থাৎ যিনি ক্রিয়া করিয়া জিতশ্বাস হইয়াছেন। এই জন্য কার্ত্তিকের হস্তে ধনুঃশর দেখান হইয়াছে। তাঁর আর একপাশে গণেশ মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে। গণঃ- সংখ্যারূপী কাল, যাহা আমরা ২১,৬০০ বার করিয়া টানা ফেলা করি তাহার ঈশ্বর অর্থাৎ স্থির ভাব। গণেশের শুঁড় দেখান হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য তাহার যে হাতীর মত শুঁড় ছিল তাহা নহে। আমাদের স্বভাবতঃ শ্বাস প্রশ্বাস ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বহিঃগমন করে, এই ভাবকে অবলম্বন করিয়াই বাহ্যিকভাবে গণেশের শুঁড় কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম; অধিক লেখা বাহুল্য মনে করি।

(শাস্ত্র মতে গণেশের ১৯টি মুখ দেখিতে পাই; মূলাধার প্রভৃতি ষট্‌চক্র, প্রত্যেক চক্রে তিনগুণ ৩ x ৬ = ১৮ এবং আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস টানা ফেলা করি উহাই এক মুখ; ইহাই সবশুদ্ধ ১৯টি মুখ)

দুর্গাপূজায় যে পাঁঠা, মেষ, মহিষ বলি দেওয়া হইয়া থাকে ইহার নিগূঢ় অর্থ সাধন সমরে কাম, ক্রোধ ও লোভ রিপুকে দমন করা। কথায় বলে পাঁঠা - কামী জানোয়ার, মেষ - লোভী জানোয়ার (আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকে ওঠে) মহিষ - ক্রোধী জানোয়ার। মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের গানগুলি আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারিব।

"মেষ মহিষ আর ছাগলছানা
কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে
দাও বলি ছয় রিপুগণে।।"

চতুর্থ সঞ্চয়ন

আত্মপূজা

আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নাই। কিন্তু এই আত্মা আনন্দ স্বরূপ, সন্মাত্র চিদানন্দ রূপী নির্ব্বিকল্প ও একরূপ পদার্থ, সুতরাং কিরূপে তাঁহার পূজা করিব ? আত্মা পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার আবাহন সম্ভবে না, আত্মায় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার সুতরাং তাঁহার আসন প্রদান অসম্ভব এবং যিনি স্বচ্ছ পদার্থ, তাঁহার পাদ্য বা অর্ঘ্যেরই বা কি প্রয়োজন ? আত্মা নিত্য বিশুদ্ধ,, সুতরাং আচমনীয়েরও কোন প্রয়োজন নাই। যে আত্মার উদরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত, তাঁহার আবরক ও লজ্জানিবারক বস্ত্রও সম্ভবে না। আত্মা নিত্য বিশুদ্ধ, সুতরাং তাঁহার যজ্ঞোপবীতই বা কেমন করিয়া থাকিবে ? আত্মা নিত্য মনোরম, সুতরাং তাঁহার অলঙ্কারেরও কোন প্রয়োজন নাই। আত্মা নির্লিপ্ত, তাঁহার গন্ধলেপ সম্ভবে না। আত্মা বাসনা রহিত, অতএব তাঁহার পুষ্পের প্রয়োজন নাই। যিনি ঘ্রাণশক্তিহীন, তাঁহার ধূপের প্রয়োজন কোথায় ? আর যিনি প্রকাশমান পদার্থ, প্রদীপ তাঁহার কি করিবে। যিনি নিত্যতৃপ্ত, তাঁহার নৈবেদ্যের আবশ্যকতা কি ? যিনি নিষ্কাম পুরুষ, তাঁহার ফলই বা কি ? সর্ব্বব্যাপকের তাম্বুলই বা কোথায় এবং নিত্যানন্দ বস্তুর দক্ষিণারই বা কি আবশ্যক। যিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ, তাঁহার আরত্রিকের প্রয়োজন কোথায় ? যিনি অনন্ত পুরুষ, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করা অসম্ভব এবং যিনি অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহাকে কে নমস্কার করিবে ?

যিনি অন্তর, বহিঃ সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে শোভমান, তাহার সম্বন্ধে মুদ্রা বন্ধনও সম্ভবে না। অতএব সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাকে বক্ষ্যমান রূপে সাত্ত্বিক পূজা করিবে। এই দেহই দেবালয় এবং এই দেবালয়ে যে জীব বাস করেন তিনি সদাশিব দেব পরমাত্মা। অতএব অজ্ঞান রূপ নির্ম্মাল্য বিসর্জ্জন পূর্বক ''সোঽহং'' ভাবে পূজা করিবে।

ইহার নাম আত্মপূজা

তুমি আমি বা আমি তুমি ভেদ নাই, আমরা সকলেই অনন্ত শিবরূপী অতএব পরমপুরুষ। সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করি। যিনি যোগী পুরুষ তাঁহার দেহে অভিমান থাকে, যিনি ভোগপরায়ণ তিনি কর্ম্মে আসক্ত, যিনি জ্ঞানী, তিনি সর্ব্বদা মোক্ষাভিলাষী। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ (সোহহং জ্ঞান সম্পন্ন) তাঁহার কিছুতেই অভিমান থাকে না।

মহাপ্রলয় সময়ে যেমন জল দ্বারা নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সমস্তই আত্মাদ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতেছি।

অতএব আমি কি করিব কোথায় যাইব, কোন বস্তু গ্রহণ করিব, আর কোন পদার্থই বা ত্যাগ করিব।

(দাদুর দ্বারা সংক্ষেপে বর্ণিত)

দশ মহাবিদ্যার বিস্তৃত আলোচনা ঃ-

১। **কালী** ঃ- মহাশক্তি, মহাবিদ্যা, অবিনাশী সৎমূর্ত্তি, সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী ত্রিগুণময়ী, মহাকালের শক্তি, অনন্তকাল-রূপিনী কালজ পদার্থ বিলীন কারিণী, সংহারিনী কার্য্য রূপা প্রকৃতি, অনন্ত বিশ্বমূর্ত্তি (কার্য্য) আধার মহাকাল। অন্যান্য তত্ত্ব শিবশক্তি তত্ত্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

২। **তারা** ঃ- চিৎশক্তি, জ্ঞান-মূর্ত্তি তত্ত্বময়ী কারণরূপা প্রকৃতি, অনন্ত দেশমূর্ত্তি-দেশজ পদার্থ বিলীন কারিণী সংহারিণী অনন্ত ব্রহ্মান্ড মূর্ত্তি, গলে নর কপালের মুন্ড মালা (কারণরূপী অনন্ত ব্রহ্মান্ড) নীল বর্ণা, ইঁহার এক নাম নীল সরস্বতী আধার মহেশ্বর। কালী ও তারাতে সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে। এই জন্য তাহাদের নাম মহাবিদ্যা। অবশিষ্ট আটটি বিদ্যা কালী ও তারার অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বিশেষ অবস্থা।

৩। **ষোড়শী** ঃ- আনন্দশক্তি, কালী তারার আনন্দ ভাবটিই ষোড়শী মূর্ত্তি। ইহার আর এক নাম রাজ-রাজেশ্বরী। পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চ দেবতা এই আনন্দময়ীর ধ্যানে নিমগ্ন। তদুপরি গুণাতীত পুরুষের নাভি কমলে ইঁহার আসন। ষোড়শ বর্ষে রমণীর পূর্ণত্ব হয়, এজন্য আনন্দময়ী মা ষোড়শীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। মহাশক্তির কোন সময়ের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; এজন্য ষোড়শী চির যৌবনা। ইঁহার অন্য আর একনাম ত্রিপুরা সুন্দরী।

৪। **ভুবনেশ্বরী** ঃ- মায়ের শান্ত ভাবটিই ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি। ইঁহার আধার বিশ্বকমল। ইনি "শক্তিরূপা" শান্ত শক্তি।

৫। **ভৈরবী** ঃ- চন্ডী শক্তি, ইঁহার ভাব প্রচন্ড বা উগ্র, ইঁহার সহকারিণী প্রচন্ডতাময়ী আটটি নায়িকা আছেন। উঁহারাই তন্ত্রোক্তা অষ্টনায়িকা বা অবিদ্যা।

৬। **ছিন্নমস্তা** ঃ- ইনি মায়ের বিশেষ প্রচন্ড বা উগ্রশক্তি। ছিন্নমস্তা প্রচন্ডা বিশ্ব পালিকা শক্তি। মায়ের অধিকাংশ মূর্ত্তিতেই প্রলয়ের ভাব বিদ্যমান থাকিলেও ছিন্নমস্তাতে বিশেষ ভাবে পালিকা শক্তির বিকাশ হইয়াছে। জগতের প্রত্যেকেই জগৎব্যাপী বিরাটদেহ হইতেই আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। একটা জীব অপর একটি জীবকে আহার করিয়া পুষ্ট হয়। এই ভাবটিই জগতের সর্ব্বত্র সতত ক্রিয়াশীল ইহাই ছিন্নমস্তা তত্ত্ব। ইহাই আপনার মুন্ড কাটিয়া আপনিই রক্তপান করত: ভোগ করা। ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ তিনটিই জগৎ পালনের হেতু। একটির অভাব হইলেই অন্যগুলি বৃথা হয়। এই তিনটি ভাব ছিন্নমস্তার তিনটি রক্তের ধারা। এই জগতে ভোক্তার অভাব নাই, ভোগ্যেরও অভাব নাই। কিন্তু ভোগ না হইলে ভোক্তা বা ভোগ্যের কিছুই মূল্য নাই। একব্যক্তি ইচ্ছামত বহু ভোগ্য দ্রব্য আহার করিতে পারে, কিন্তু তাহা যদি সে পরিপাক করিতে না পারে, তবে তাহার আহারের কোন মূল্য নাই। সুতরাং ভোগই জগৎ পালনের মূল হেতু।

এই জন্যই ভোগ ধারায় ছিন্নমস্তা নিজে পান করিতেছেন, আর তাহারই একাত্ম দুই শক্তি "ভোগ্য ও ভোক্তা" এই দুইটি ধারা পান করিতেছেন। জগতের ভোগ শেষ হইলেই প্রলয় হয়।

৭। **ধূমাবতী** ঃ- মায়ের মহা প্রলয় মূর্ত্তি ভোগ শেষ হেতু জরাজীর্ণ বৃদ্ধা লম্বিত পয়োধরা, পক্ক কেশা, যমের কাকধ্বজ প্রলয় রথে আরূঢ়া। ইনি বিশ্বোদরী, কুলাহস্তে বিশ্বের বীজ সংগ্রহ করতঃ আপনার বিরাট মুখ গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছেন, সমস্ত বিশ্ববীজই ইঁহার উদরে লীন হইতেছে।

৮। **বগলা** ঃ- ইনি মায়ের আর একটি প্রচন্ড উগ্রচন্ডা মূর্ত্তি, বগলা বেদ বিরোধী অসুর বিনাশিনী মূর্ত্তি। অধর্ম্ম বা অজ্ঞান নাশে ধর্ম্ম বা জ্ঞানের উৎপত্তি।

৯। **মাতঙ্গী** ঃ- অজ্ঞানরূপা অবিদ্যানাশিনী জ্ঞানরূপিনী বিদ্যামূর্ত্তি। মায়ের করেতে "বিবেক" অসি এবং বৈরাগ্য দন্ড। যেখানে অজ্ঞানতা অধর্ম্ম নাশ হইয়া ধর্ম ও জ্ঞানের বিকাশ হয় সেইখানেই ঐশ্বর্য্যেরও পূর্ণতম বিকাশ হইয়া থাকে।

১০। **কমলা** ঃ- অষ্ট ঐশ্বর্য্যশালিনী আনন্দদায়িনী মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি। সর্বত্রই মায়ের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ তাই কমলা আধার কমল বাসিনী, বিশ্বব্যাপিনী। দশবিধা প্রকৃতি শক্তি। দশমহাবিদ্যার সমষ্টি রূপই দশদিক ব্যাপী দশভূজা চন্ডিকা। ইনিই "সর্ব্বদেবময়ী" ও সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী মহাদেবী দুর্গা।

"প্রয়াগ"

প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া ত্রিবেণীতে স্নানের অর্থ এই যে, প্রয়াগ অর্থে যে তীর্থে ত্রিবেণী আছে। (ত্রিবেণী অর্থে ত্রিধারা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী) সেই ত্রিকূট বা আজ্ঞাচক্রে মাথা

অর্থে মস্তিষ্ক (জ্ঞান বুদ্ধির আধার) অতি উচ্চস্থান, মুড়াইয়া অর্থে পরিষ্কার করিয়া অর্থাৎ অবিদ্যা চরণ ছেদন করা। ত্রিবেণী অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটি মহানদীর মিলন স্থান বা সঙ্গম স্থান, স্নান অর্থে অবিদ্যামল ধৌত করা অর্থাৎ যে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার নাশ হয় সেই জ্ঞানের উপর যে অবিদ্যার আবরণ সেই আবরণ গুরূপদিষ্ট জ্ঞান খড়্গ দ্বারা ছেদন করিবে। পরে প্রত্যক্ষ অনুভূতির জন্য কূটস্থে বা ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মধ্যে বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবেণীরূপ তিনগুণের মিলন স্থানে ডুব দিবে অর্থাৎ মনকে লয় করিবে। এই সাধনা দ্বারা নিষ্কাম হইয়া জীব শিবত্ব লাভ করতঃ প্রয়াগ তীর্থে যথার্থ সুখ উপভোগ করিতে পারিবে।

গীতা ১৫ অঃ ১২ শ্লোক

সূর্যের যে তেজ যাহা সূর্য হইতে আসিয়াছে তদ্বারা সব প্রকাশিত তদ্রূপ কূটস্থের তেজ এই শরীরে থাকায় সব প্রকাশ হইতেছে সেই তেজই রূপ ব্রহ্মের হইতেছে - যাহা আকাশ হইতে আসিয়াছে কিন্তু আকাশে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু সেই আকাশের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে পরব্যোম স্বরূপ এক এক অণুর মধ্যে অনেক ব্রহ্ম স্বরূপ অণু। তাহার মধ্যে অনেক ব্রহ্মান্ড রহিয়াছে সেই ব্রহ্মান্ডের মধ্যে তুমি একজন; তুমি কত ছোটলোক তাহা আপনা আপনি বিবেচনা করিতে পার না। তোমার আস্ফালনের আর সীমা নাই। তুমি কি তা তুমি নিজে বলতে পার না। এইরূপ চন্দ্র অগ্নির তেজের অণুর মধ্যে আমারই রূপ। ইহা দৃষ্টি গোচর হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইল। ক্রিয়া না করিলে এরূপ অবস্থার বোধ বল্লে হবে না বোধ হইলেই বোধ হইবে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থা।

(পরাৎপর কাশীর বাবার ব্যাখ্যা)

গীতার ব্যাখ্যা দাদুর দ্বারা সংক্ষেপে বর্ণিত

"ভগবানের স্বধামে মায়া মোহ শোক
তাপ জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই নাই।"

এই পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে, তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীলা নিরন্তর কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া আছে, ক্রিয়ার পরঅবস্থায় এই স্বকীয় ধাম। অতএব এই পথ—যাত্রীদের প্রতি এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া না থাকেন। যাহাতে এই কৈবল্যাবস্থা লাভ হইয়া থাকে তার জন্য এই প্রাণের খুঁটিটিকে সবলে যেন ধরিয়া থাকেন। এই খুঁটি বা স্থির ভাব এবং শ্বাস বা গতি সকলের মধ্যে রহিয়াছে। যে শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে সেই সংসার গতি অতিক্রম করিতে পারে। নিরন্তর শ্বাস - প্রশ্বাস চলিতেছে এবং পলকে পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সাধারণ স্রোতে আপনাকে বহিয়া যাইতে না দিয়া সেই অচল লক্ষ্যে পৌঁছাইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধরিতে পারা যায়। একবার সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পারিলেই "অবিচল রাম" কে প্রাপ্ত হইবে, যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন।

কয়েকটি আধ্যাত্মিক কবিতা

"কে বা গৃহত্যাগী কে বা গৃহ নিবাসী।"
সন্ন্যাসেও গৃহী আছে, গৃহে সন্ন্যাসী।
মানুষ গরু পশু পাখী
এই জাতি ভেদ উঠাও দেখি।"

"যেমন বৈশাখী রৌদ্রে শীতল জলে স্নান,
ক্রিয়ার স্নানে পরাবস্থায় -
তেমনি জুড়াই প্রাণ।"

"ভক্তি রস ব্যঞ্জনটি
ব্রহ্ম জ্ঞানটি নুন
প্রেমটি ছাঁচি পানের খিলি
জ্ঞানটি তাতে চূন।"

"সঙ্গোপনে শক্তি বাড়ে
মন্ত্র গোপন তাই,
বহুকাল সঙ্গোপনে
রাখতে কিছু নাই।
গোপন হতে হতে হয়
সঙ্গোপনে লয়,
এতই গুপ্ত যোগক্রিয়া
নাই বললেই হয়।"

"আত্মদরশনে দূরে যায় রূপ রং
প্রাণ মাঝে বাজে শুধু সোহং সোহং।"

"মন রে সোনা মানিক ধন,
চুপ কর আজ ধ্যানে বসি,
কাল তোমারে করব রাজা,
এনে দেব রাজ মহিষী।"

"দুঃখের অন্ত আছে কিন্তু সুখের অন্ত নাই ভাই,
অনন্ত স্বরগ আছে অনন্ত নরক নাই।।
নিরোধ দ্বারা ইন্দ্রিয় মারা সুখটি কেমন ধারা?
দুধটি মেরে ক্ষীরটি করা সুখটি বাটি ভরা।"

"ভাবছ মলে যাব পুড়ে।
আমি ভাবছি যাব উড়ে।।
মরণ তরণ কঠিন নয়,

শীতের সিনান ভাবলে ভয়।"

"মনের ঘরে বারে বারে,
যেতে দিও না যারে তারে,
আসছে যাচ্ছে যাচ্ছেতাই -
মনের ঘরে কপাট নাই।"

"যোগ সঙ্গীত তারাই গায়,
সুরটি যাদের লাগে,
এই শরীর তানপুরা
বাঁধতে শেখ আগে।"

"কুলবধূ খোঁজে শুধু ভাল অলঙ্কার;
হার বালা কন্ঠ মালা দেখে চমৎকার।
কি দরের স্বর্ণ সেই দেখিতে না জানে
পিতল গহনা কেহ গিল্টী করি আনে।
সেরূপ নির্বোধ লোকে সাজায় সংসার
সে যে গিল্টি সোনা নাহি ভাবে একবার।

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আকাশের গায়
স্বরসে সংকল্পপ্রভা খেলিয়া বেড়ায়।
মগ্ন সে চৈতন্যরসে রস আছে যত,
ময়ুরের ডিম্বরসে পেখমের মত।

বিবিধ মেঠাই মূলে শর্করা যেমন,
পার্থিব সুখের মূলে কামিনী কাঞ্চন।
মূলে সে মাটির রস যত দেখ ফুল,
যত সে চেতন রস চৈতন্যই মূল।

সৃষ্টির চৈতন্য অঙ্গে লীলাশক্তি ধায়,

ছুটে যেন ভাগীরথী হিমগিরি গায়।
চিদঙ্গে সুন্দরী মায়া ছুটিছে সাদরে,
যেমন ভাসন্ত স্রোত প্রশান্ত সাগরে।
সূর্য্যের নিকটতম কিরণের মত,
ব্রহ্মের নিকটতম ব্রহ্মা বিষ্ণু যত।
অখন্ড চৈতন্য জানি অশেষ বিশেষ,
আগে কর মায়া মোহ বিভ্রম নিঃশেষ।

তোমার ভূবনে নাহি পুরাতন,
সৃষ্টির ধারা নিত্য নূতন।
কে তুমি কে তুমি খোল আবরণ,
হেরিরূপ প্রাণ ভরিয়া।

"জীবশক্তি"

এক্ষণে জীবগণের উপর মায়া ও চিৎশক্তির প্রভাবের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মায়া শক্তির বিরুদ্ধে চিৎশক্তি সতত ক্রিয়াশীল; পরস্পর বিরোধী এই শক্তিদ্বয়ের দ্বন্দ্বের ফলে একটী তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী; দ্বন্দ্বের পরিণাম স্বরূপ এই তৃতীয় শক্তিটীর শাস্ত্রীয় নাম "কুটস্থ জীব শক্তি"। এই জীব শক্তির ইঙ্গিতেই জগতের যাবতীয় জীবগণ পরিচালিত হয়; এই জীব-শক্তি প্রত্যেক মানবে পরিস্ফুট রূপে বিরাজ মানা। (যাঁহারা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াবান তাঁহাদিগকে কূটস্থ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না ইহাই আমার বিশ্বাস।)

গীতার একটি মূল্যবান শ্লোক

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটি।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং

সগদগদং ভীত ভীতঃ প্রণম্য।।

দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অনুভব হইতেছে ঃ- এসব শুনে কূটস্থের দ্বারা অনুভব হইয়া শরীরের তেজ গদ্‌গদ্ ভাবে ভয় প্রযুক্ত প্রণাম করিতেছে। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অনুভব হইতেছে কাহার? সাধকের! সাধক তো সাধনা ছাড়িয়া দিয়া ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছেন, অসিদ্ধ বা সাধনভ্রষ্ট সাধকের কি দিব্য দৃষ্টি হয়? এই সাধক যদিও ব্রাহ্মী স্থিতি প্রাপ্ত সিদ্ধ সাধক নহেন, কিন্তু কূটস্থে দৃষ্টি রাখিয়া কূটস্থের মধ্যে যে জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহা অনুভব করিবার মত সাধনা তাঁহার আছে, নচেৎ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার অনুভব হওয়া সম্ভব হইত না। এই জন্য ইঁহাকে কিরীটি বলা হইল। যে সাধক নিম্নভূমি গুলি জয় করিয়াছেন কিন্তু উচ্চ ভূমি আজ্ঞাচক্র প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বাবস্থায় থাকার অধিকার এখনও প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার ভয় হয় পাছে এ অবস্থাটিও না থাকে। অন্তরস্থ বায়ুর বেগ ধারণে এখনও তিনি অসমর্থ, তাই ভয়ে ভয়ে শ্বাস টানিতেছেন, কিন্তু কূটস্থে ঠিক লক্ষ্য রাখিয়াছেন ইহাই "ভীত ভীত প্রণম্য" হইয়া কৃষ্ণকে নিজ মনোবেদনা জানাইবার ইঙ্গিত। তিনি কিরূপভাবে বলেন? বেপমান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া। নিজের অবস্থা ঠিক কি না এই আশঙ্কায় ক্রিয়ায় একটু কম্পন হয়, অথবা মনে দ্বিধা আসায় ক্রিয়া করিবার সময় (উৎকৃষ্ট প্রাণায়ামে) পুলক না আসিয়া কম্পন (স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু - এই চারি অবস্থার দ্বিতীয় অবস্থা) কম্পন মাত্র হইতেছে। সে অবস্থাতেও কূটস্থ জ্যোতির প্রকাশ অনুভব হইতেছে; নচেৎ মনের কথা কাহাকে জানাইবেন? এই প্রকাশের ভাবটিকে ঠিক রাখার নাম "কৃতাঞ্জলি।" অঞ্জলি/অনজ ধাতু হইতে, তাহার অর্থ প্রকাশ পাওয়া, এই প্রকাশের অবস্থাটি আসিবার মত সাধন করাকেই কৃতাঞ্জলি বলে।

মন বলে তুমি আছ ভগবান
জ্ঞান বলে তুমি নাই।

ভগবানের একমাত্র শক্তিই

১। ভোগে ভবানী।
২। পৌরুষে বিষ্ণু।
৩। কোপে কালি।
৪। সমরে দুর্গা।

যখন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন মনে হয় তুমি প্রভু আমি তোমার দাস। জীব বুদ্ধি হইলে মনে হয়, তুমি পরমাত্মা আর আমি তোমার অংশ। কিন্তু প্রকৃত সত্য অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, তুমিও যা আমিও তাই অর্থাৎ তুমি আমি অভেদ।

রামায়ণে একটি গল্প --আমরা পাই গল্পটি এইরূপ

একদা রাম ও লক্ষ্মণ নৌকা যোগে পার হয়ে মিথিলায় যাচ্ছিলেন। গল্পে আছে শ্রীরামের চরণস্পর্শে নৌকাখানি স্বর্ণময় হয়ে গেল। নৌকার কর্ণধারের পত্নী এই তথ্য অবগত হল, সে তখন গৃহের সমস্ত কাষ্ঠ বয়ে নিয়ে এসে তাঁর চরণে স্পর্শ করিয়ে সে গুলিকে স্বর্ণে পরিণত করে নিল। স্ত্রীর এই বুদ্ধিহীনতা দেখে কর্ণধার তখন পরামর্শ দিল, "দেখ এভাবে তুমি কত পরিশ্রম করবে, বুদ্ধিমতীর মত কাজ কর, যে চরণে এত গুণ তুমি সেই চরণের শরণ লও। এতে তুমি জগতের যে কোন বস্তুকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারবে। (এখানে দাদু বলিতেছেন কথাটীর নিগূঢ় অর্থ তোমরা বুঝতে পারলে কি? যদি বুঝতে না পেরে থাক, তবে আত্মক্রিয়ায় সব মন প্রাণ ঢেলে দাও। তখন এ জলের মত পরিষ্কার বুঝতে পারবে।)

"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন।
সুখ-বাঞ্ছা নাহি, সুখ পায় কোটীগুণ।"

"গোপী দরশনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তদপেক্ষা কোটীগুণ গোপী আস্বাদয়।।"

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ-বাঞ্ছা হয় প্রেমেতে প্রবল।।

(এখানে দাদু বলিতেছেন) হে মোহ মুগ্ধ জীব নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দাও, একবার জগৎ যে কৃষ্ণময় তা বুঝ্‌তে চেষ্টা কর, অর্থাৎ সদগুরুর উপদেশ মত জয় গুরু বলে কোমর বেঁধে সাধনায় লেগে যাও, বড় আমিকে পেতে গেলে, ছোট আমির লাভ লোকসান দেখতে গেলে চলবে না, অতএব হে সাধক, হে অমৃতের সন্তান, মনে রেখো আলো এবং অন্ধকার এই নিয়ে সংসার।।)

"কত যে সুন্দর তুমি এ জগতে নিরুপম।
তুমি যে অমৃতময় জগৎ জীবন ধন।
তুমি যে জগৎময় তোমাতে জগৎ ভরা,
জগতের প্রতি অণু তোমার অণুতে গড়া।"

ধন্য তুমি, ধন্য আমি, ধন্য তুমি আমার প্রভু, আমার জীবন নাথ, ধন্য আমি তোমার ভৃত্য, তোমার কৃপা ভিখারী। ধন্য আমরা দুজনে দুজনের সখা।

যে বস্তু লাভ হইলে অপর কোন প্রকার বস্তুলাভের প্রত্যাশা থাকে না, যে সুখে সুখী হইলে আর কোন প্রকার সুখকেই সুখ বলিয়া বোধ হয় না, যে জ্ঞান লাভ হইলে অপর কোন জ্ঞানেরই আর প্রয়োজন হয় না, তাঁহাকে "ব্রহ্ম" বলিয়া জানিবে।

যিনি সৎ স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, যিনি ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই, যিনি অনন্ত ও নিত্য এবং যিনি স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ শূন্য তাঁহাকেই "ব্রহ্ম" বলিয়া জানিবে।

যে যোগী পুরুষ যোগবল প্রভাবে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লয় করিয়া সমস্ত বন্ধনের মূল কারণ অবিদ্যাদি মোহপাশ ছেদন করিয়াছেন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা এই তিনকে লয় করিয়া যে মহাশূন্যে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকেই "ব্রহ্ম" বলিয়া জানিবে।

(ইহার অধিকাংশই দাদুর দ্বারা বর্ণিত)

আমাদের একটি কথা বুঝিয়া রাখিতে হইবে, তবে প্রকৃত রাস সম্বন্ধে কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিব। ঃ-

এক ব্রহ্ম আছেন। তাঁর একটু নিম্নস্তরে যেন দেখা যায় দুইটি ভাগ রহিয়াছে, একটা কলাই বীজের দুইটি দলের মত "চিন্ময়ী পরা প্রকৃতি" আর "চিন্ময় পরম পুরুষ" এই প্রকৃতি পুরুষই হইল এক ব্রহ্মের যুগলভাব। এই যুগল ভাবই ঘনীভূত হয়ে মূর্তি ধারণ করেন। "এক ব্রহ্ম" হলেন প্রথম স্তর! "চিন্ময় প্রকৃতি পুরুষ" ভাবটি হলেন দ্বিতীয় স্তর। আর প্রকৃতি পুরুষের যুগল "দেহ ধারণ" হল তৃতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরটি দেখ "চির স্থির নেত্রে দেখ ভবসিন্ধুর পারে স্থির যৌবনেরে আর স্থির যৌবনারে।" এই প্রকৃতি পুরুষই চিন্ময় দেহ ধারণ করে "রাধা কৃষ্ণ" নামে খ্যাত হয়েছেন। এই যে তিনটি স্তর, এর যে স্তরটি যিনি দেখতে পান তাতেই মায়া মুক্তি হয়, ভব বন্ধন ঘুচে যায়। কেহ বা তিনটি স্তরই দেখতে পান। প্রথম "এক ব্রহ্ম," দ্বিতীয় "চিন্ময় প্রকৃতি পুরুষ।" তৃতীয় "যুগল মুর্ত্তি" ধারণ।

প্রকৃতি পুরুষ দুটি
পূর্ণ রসে উঠে ফুটি
দুই অর্দ্ধ এক হয়ে

নির্গুণ সমাধি হবে
নির্গুণ সমাধি শেষে
আবার বিভিন্ন দুটি
নব দম্পতির ভাব,
ভাবুক দেখিছে ভবে।
পুরুষের পানে ধায়
হৃদয় নারীর
সেটি সে মূলের ভাব
পরা-প্রকৃতির।
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ
সূয়তে স চরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয়
জগদ্বিপরিবর্ত্ততে।''

এইবার গীতায় ভগবান পরব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কি উপদেশ দিয়াছেন তাহা আমাদের প্রত্যেকের জানিয়া রাখা উচিত ঃ-

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।
ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
সর্ব্বতঃ পানিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ।।

ব্যাখ্যা ঃ- সূত্রে যেমন মণি সকল গাঁথা থাকে, সেইরূপ এই জগৎ ব্রহ্মান্ড গ্রথিত রহিয়াছে আমাতেই। অব্যক্ত মূর্ত্তি আমা কর্তৃকই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

আমি সর্বত্রই হাত, পা, মুখ এবং মস্তক বিশিষ্ট রহিয়াছি এবং সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়াও সর্বত্র অবস্থান করিতেছি।

ভূতগণের চঞ্চল প্রাণ রূপে আমি, স্থির প্রাণ কূটস্থ চৈতন্য রূপেও আমি অন্তরে বিরাজ করিতেছি। আমি দূর হইতেও দূরে এবং নিকট হইতেও অতি নিকটে অবস্থান করিতেছি, অর্থাৎ অজ্ঞানীর নিকট আমি দূর হইতে দূরে এবং জ্ঞানীর নিকটে আমি নিকট হইতেও অতি নিকটে অবস্থান করিতেছি।

" মহাত্মাদের উপদেশ "

আম ফলের নীরস আঁটিটিও খাইতে ভাল নয়। উপরের খোসাটিও খাইতে ভাল নয়। আঁটির গাত্রে ও খোসার ভিতরে যে পদার্থটি থাকে তাহাই আস্বাদন করিতে মিষ্ঠ লাগে। ইহার অর্থ এই যে, অদ্বৈত অব্যক্তাবস্থা যদিও মূল কারণ, কিন্তু আঁটির ন্যায় তাহা রস শূন্য শুষ্ক এবং কেবল উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ানও আমা ফলের খোলার ন্যায় তিক্ত ও কষায়, সুতরাং উচ্চতম ও নীচ দুইটি অবস্থাই পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাবস্থায় যে ভজনানন্দ তাহাতেই লাগিয়া থাকিতে হয়, অর্থাৎ লাগিয়া থাকা উচিত। যদি বল ভজনানন্দ রসে কি প্রকারে আমি ডুবিয়া থাকিব এবং সে পথের সন্ধান কি করিয়া পাইব তাহার উত্তরে আমি বলিতেছি, প্রকৃত সদ্‌গুরুই তোমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিবেন। যদি বল সদগুরুর সন্ধান কি করিয়া পাইব? তদুত্তরে আমি বলি তোমার প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই তোমাকে তাঁহার চরণ প্রান্তে পৌছাইয়া দিবে।

(দাদুর দ্বারা বিস্তৃতভাবে আলোচিত)

অহো কি বিড়ম্বনা! পর্ব্বতের উপর লাল টকটকে গুঞ্জাফল অর্থাৎ কুঁচফল দেখিয়া পার্ব্বতীয় বানর গণ অগ্নি বোধে দলে দলে তাহার নিকট গিয়া, পা মেলিয়া বসিয়া, দুরন্ত পার্ব্বত্য শীত নিবারণ করে। লাল টক্‌টকে কামিনী-কাঞ্চনের রাশি দেখিয়া অবোধ মনুষ্যও সুখ বোধে তাহার কাছে বসিয়া জাগতিক দুঃখ নিবারণ করেন। গুঞ্জাফলে যতটুকু শীত ভাঙ্গে, কামিনী-কাঞ্চন উপভোগেও ততটুকু দুঃখ দূর হয়।

মহাত্মাগণ অনেকেই বলেন ভক্তি পূর্ব্বক দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা কখনই বৃথা হয় না, এবং উহা সুখদায়ক, কিন্তু মুক্তিদায়ক নহে। "গঠনশূন্য গোটাস্বর্ণ কি হবে? উহা কামার বাড়ীই থাক।" নারীগণ গোটা স্বর্ণ পাইলে তখনই ছুটিয়া স্যাকড়া বাড়ী যায় নানারূপ মনোমত অলংকার প্রস্তুতের জন্য। সেইরূপ গঠনশূন্য গোটা ব্রহ্ম আমরাও চাহি না, উহা সাধু মহাত্মাদের নিকটই থাকুক। অল্প বুদ্ধি মানব আমরা গোটা ব্রহ্ম চাহি না, আমরা ঐ ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার ঠাকুর গড়াইয়া তাহার পূজা অর্চনা করিতে চাই। কিন্তু আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে গহনাগুলি সমস্তই স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেইরূপ ঐ ঠাকুর দেবতাগুলি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আজকাল যেরূপ পূজা অর্চনার প্রধান অঙ্গ হইল ম্যইক, সাজসজ্জা, আলোক প্রভৃতির বাহ্যাড়ম্বর ঐরূপ পূজাতে ঈশ্বরকে অচিরাৎ বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া চোঁচা পলায়ন করিতে হইবে, পূজার ফল পাওয়া ত সুদূর পরাহত। নচেৎ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া আন্তরিক ভক্তি সহকারে পূজাদি করার শুভ ফল কিছু ফলিবেই ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঈশ্বর সাধন একেবারে না করা অপেক্ষা কিছু করিলে যে তাহাতে কিছু শুভ ফললাভ হইবেই সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকা অপেক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্যে যাহা কিছুই করা হউক না কেন তাহাই মঙ্গল দায়ক। এ সম্বন্ধে আর বেশী লেখা বাহুল্য মনে করি।

গীতায় ভগবান কর্মের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন হে অর্জুন, এই পৃথিবীতে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছু নাই, অকর্ত্তব্যও কিছুই নাই, আমার ১। প্রাপ্তব্য অপ্রাপ্তব্যও কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ত্তব্য কর্মে রত রহিয়াছি ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ভগবান কর্মের পক্ষপাতী, অলসতাকে তিনি বা কর্ম বিমুখ ব্যক্তিদিগকে তিনি প্রশ্রয় দিতেছেন না।

২। যোগের প্রশংসা করিয়াও বলিতেছেন - তপস্বী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ, এমন কি কর্ম্মী অপেক্ষাও যোগী

শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। ইহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে তিনি যোগেরও পক্ষপাতী।

৩। জ্ঞানীরও প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন - জ্ঞানের তুল্য পবিত্র ইহসংসারে আর কিছুই নাই।

৪। ভক্তির প্রাধান্য দেখাইয়া বলিতেছেন - হে কৌন্তেয় তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার আমার ''ভক্ত'' কখন বিনষ্ট হয় না।

জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে গীতায় বহুল ভাবে বহু স্থানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, আমি অতি সংক্ষেপে সামান্য কিছু বর্ণনা করিলাম।

জীবনমুক্ত পুরুষগণ সংসার ব্যবহার রত থাকিয়াই ''শ্বাস-চৈতন্যে ও আকাশ-চৈতন্যে মনের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া থাকেন। জীবন্মুক্ত প্রহ্লাদ অমৃত জ্ঞান লাভ করিয়াও পাতালে দৈত্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রবুদ্ধ বৃহস্পতি দেবকার্য্য করিতেন। ব্রহ্মাও জীবন্মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া ব্রহ্মান্ড সৃজনে বিরত হন নাই। ভগবান স্বয়ং মুক্তি স্বরূপ হইয়াও চিরদিন অখিল পালনে আলস্য করেন না। চিদানন্দময় হরও প্রাণময়ী গৌরীকে অর্ধাঙ্গে ধারণ করিয়াছেন। মুক্তিরূপা পার্ব্বতীও ত্রিলোচনের প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন। জীবন্মুক্ত নারদও সতত কলহ প্রিয় হইয়া ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেছেন। মহামুনি বিশ্বামিত্র ব্রহ্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইয়াও যজ্ঞ তপস্যাদি কর্ম্মে বিরত হন নাই। মহাতেজস্বী সূর্য্য নিজ কর্ত্তব্যরূপ দিন-প্রকাশে ক্ষান্ত হন নাই। মৃত্যুরাজও তাঁহার ধ্বংস নীতি অদ্যপি পরিত্যাগ করেন না। তবে আমিই কেন কর্ম্মে বিরত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিব। কর্ম্মত্যাগী অলস ব্যক্তিকে ধিক্। (''সুধাকরকৃত অমৃত'')

গীতা-গৈধাতু + ত + আ।

গৈ ধাতু মানে গান করা, ত মানে (পার হওয়া + অ) তরণ এবং আ মানে শক্তি (কুলকুণ্ডলিনী)। তাই যে গীত (গান) গাইলে যোগী ভব পার হওয়ার শক্তি প্রাপ্ত হন তাহাই গীতা।
দ্বিতীয় অর্থ - "গী" এবং "তা" এই দুই শব্দ যোগে হইয়াছে গীতা। "গী" মানে গীত (গান) "তা" মানে সমতা এবং একতা এই দুই শব্দের নির্দেশক। যে গীত (গান) গাইলে, সুর করিয়া পাঠ করিলে যোগী "তা" (সমতা এবং একতা) প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যোগী শুদ্ধ চিত্ত হইয়া প্রথমে সমতা লাভ করিয়া ভগবান সহ মিলিত হন পরে ভগবান সহ একতা লাভ করিয়া ভগবানে মিশিয়া যান তাহাই "গী" এবং "তা" মিলিত গীতা।

গীতা শব্দে দুইটি অক্ষর "গী" আর "তা"। "গী" মানে সমতা, একতা। ঐ "গী" গাইলে পরে "তা" পাওয়া যায়, তাই ওর নাম গীতা — ব্যাসের দেওয়া।

গীতার ১৮টি অধ্যায় ইহা আমরা প্রত্যেকেই জানি এই ১৮ প্রকার অধ্যায় বা ধাপই গীতার ১৮ অধ্যায়। যথা ঃ-

১। গঙ্গা, ২। গীতা, ৩। সাবিত্রী, ৪। সীতা ৫। সত্যা, ৬। পতিব্রতা, ৭। ব্রহ্মাবলী, ৮। ব্রহ্মবিদ্যা, ৯। ত্রি-সন্ধ্যা, ১০। মুক্তি-গেহিনী, ১১। অর্ধমাত্রা, ১২। চিতা, ১৩। নন্দা, ১৪। ভবঘ্নী, ১৫। ভ্রান্তি-নাশিনী, ১৬। বেদত্রয়ী, ১৭। পরানন্দা এবং ১৮। তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জরী।

গীতা কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান নামক তিন ষটকেতে বিভক্ত। ১ম অধ্যায় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত কর্ম্মনামক প্রথম ষটক। ৭ম অধ্যায় হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত ভক্তি নামক দ্বিতীয় ষটক এবং ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত জ্ঞান নামক তৃতীয় ষটক। এই তিন ষটকের মিলিত শ্লোক সংখ্যা হইল ৭০০শত তাই গীতাকে সপ্তশতী বলা হয়।

(ইহার বিস্তৃত আলোচনা দাদু কর্ত্তৃক সার ও সংক্ষেপে বর্ণিত হইল)

" গীতা "

ভক্ত সাধক এইবার ভগবৎ পূজার আয়োজন করিতেছেন। এই পূজার প্রধান অঙ্গ হইল আত্ম সমর্পণ, আপনাকে ভগবৎ চরণে নমিত করা। কিন্তু আপনাকে বড় দীন, বড় অসমর্থ মনে হইতেছে। নিরুপায় সখা যেমন সখাকে, পত্নী যেমন পতিকে, পুত্র যেমন পিতাকে আত্ম সমর্পণ করিতে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করে না, সেইরূপ নিঃসঙ্কোচে সাধক ভক্ত আপনাকে উৎসর্গ করিতেছেন - পরমাত্মার নিকট। নিজের দৈন্যের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন। ভগবানকে প্রসন্ন করিতেছেন। ভগবানকে প্রসন্ন করা এবং আত্মাকে প্রসন্ন করা একই কথা। ভগবান প্রসন্ন হন কখন? যখন শ্রীগুরু প্রসন্ন হন। এই গুরুই আত্মা। গুরুর প্রসন্নতা যখন মানসতটে তরঙ্গায়িত হয়, তখন অন্তঃকরণও প্রসন্ন হয়। অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইলেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনের এই স্থির ভাব বা প্রসন্নতাই শ্রী বিষ্ণুর পরমপদ। এই বিষ্ণুর পরমপদ কাহারা সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করেন, যাঁহারা সুর ও বীর সাধক। এই বীর সাধকেরা কিভাবে প্রণাম করিয়া থাকেন দেখুন। "প্রণিধায় কায়ং" কায় = ক + অয়। ই ধাতু হইতে অয়, গমনার্থক। ক = ব্রহ্ম, যাহা ব্রহ্মা হইতে গমন করে অর্থাৎ শ্বাস মস্তকে স্থির করিয়া সমগ্র মেরুদন্ডটি ও তৎসংলগ্ন অবয়বটি নিম্নাভিমুখ করিয়া যোগীরা যে সাধনটি করিয়া থাকেন এখানে সেই সাধনার ইঙ্গিত করিলেন। এই সাধনটি দ্বারা মূলাধারস্থ কুন্ডলিনী চৈতন্যযুক্ত হন। কুন্ডলিনী চৈতন্য যুক্ত হইলেই উহা তদ্বিষ্ণুর পরমপদ আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারস্থিত শিবের সহিত যুক্ত হয়। তখন দেহ হইতে চিৎ পৃথক হইয়া পড়ে। তখনই জীব বন্ধন বিমুক্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ করেন। ইহাকেই মুক্তাবস্থা বলে। ইহাকেই ওঁকার ক্রিয়া বা কূটস্থের মধ্যে শ্বাস বন্ধ করিয়া যোগীরা যে ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাহারও ইঙ্গিত করা হইল। ইহাতেই কূটস্থের পূর্ণ প্রকাশ হয়। ইহাই গুরুর প্রসন্নতা অথবা গুরুকে প্রসন্ন করা। গুরুও যা আত্মাও

তাই। তখন সাধক আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া মায়া, মোহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির কবল হইতে চির শান্তি লাভ করেন। ইহারই অপর নাম "তুর্য্যাবস্থা।"

পূজ্যপাদ সান্যাল মহাশয়ের ব্যাখ্যা এবং দাদু কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। যাঁহারা উক্ত প্রকার স্থির বায়ুর ক্রিয়া করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, আশাকরি তাঁহাদের পক্ষে ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

"ভক্তের ভগবান"

"শ্রীকৃষ্ণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ"

একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির এবং দূর্য্যোধন উভয়েই খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তাঁদের ওখানে যেতে যেতে কৃষ্ণ পথে বিদুরের ঘরে চলে গেলেন। মহাপুরুষ বিদুর তখন বাড়ি ছিলেন না, বিদুর অত্যন্ত গরীব ছিলেন। বিদুর পত্নী কৃষ্ণাগমনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পাদ্যঅর্ঘ দ্বারা তাঁহার পাদ বন্দনা করলেন। কিন্তু ঘরে সামান্য দু চারিটি পাকা কলার ছড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনি কৃষ্ণকে আসনে উপবেশন করিয়ে কলা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খাওয়াতে লাগলেন, এবং মাঝে মাঝে তাঁর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লগিলেন। ইতিমধ্যে বিদুর বাড়ি ফিরে দেখলেন, কৃষ্ণ বসে আছেন আর তার স্ত্রী ভাবে বিভোর হয়ে ভগবানকে কলার পরিবর্ত্তে তার খোসাই খাচ্ছেন। ভগবানও খুব তৃপ্তির সহিত মহানন্দে সেই খোসাই খাচ্ছেন আর তাঁর মনে হচ্ছে এরূপ সুস্বাদু বস্তু তিনি আর কখনও খান নাই। পত্নীর এই বোকামি দেখে বিদুর অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং বল্লেন, তুমি কি করছ? কলার পরিবর্ত্তে ভগবানকে খোসা খাওয়াচ্ছ। বিদুর পত্নী চমকে উঠলেন এবং নিজের দোষের জন্য ক্ষমা চাইলেন। বিদুরও অনুনয় করে বলতে লাগলেন প্রভু খোসা তো অনেক খেলেন এইবার এক আধটা কলা খেয়ে আমাকে কৃতার্থ

করুন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন বিদুর আমার পেট তো ভরে গেছে আর খোসার এমন স্বাদ ছিল যে, তার চেয়ে উত্তম খাদ্য দ্রব্য দুর্লভ। তোমার স্ত্রী যতক্ষণ ভেদভাব ভুলে গিয়ে আমাকে খাওয়াচ্ছিলেন ততক্ষণ আমি ছিলাম, কিন্তু এখন তো খোসা আর কলার ভেদ এসে গেছে অতএব আর আমি নাই।

গল্পটি বেশ শিক্ষাপ্রদ, ভগবানের কাছে কোন ভেদ নাই। (ইহাতে ইহাই প্রমাণ হয়)

(১)

না চাহিতে তুমি সকলি দিয়েছ
হে দয়াল ভগবান,
করুণা তোমার অন্তরে মোর
গাঁথা নিশি দিনমান।
জনমের আগে জননীর বুকে
অমৃত দিয়েছ ঢালি,
গগন ভরিয়া রেখেছ দয়াল
কোটি কোটি দীপ জ্বালি।
এত যে দিয়েছ তবু তো মোদের
চাহিবার শেষ নাই,
যত আছে যার, সেই ততবার
শুধু চাই, শুধু চাই।

(২)

জয় শিব শংকর জগৎ বন্দিত হর জয় জয়
পশুপতি প্রণমি চরণে।
দেবের দেবতা তুমি ত্রিলোচন শূলপাণি, মহাদেব
নামে তুমি বিদিত ভুবনে।
সাগর মন্থনে যবে উঠিল গরল,
নীলকন্ঠ হলে তুমি পান করি হলাহল,
শিরে তব সুরধনী কন্ঠে শোভিছে ফণী,
শতপাপ দূরে যায় চরণ স্মরণে।

নাহি সূর্য্য; নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্কসুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি-বিশ্ব চরাচর।
অস্ফূট মন-আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে
ওঠে, ভাসে, ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর।
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র আমি আমি এই ধারা অনুক্ষণ।
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্য শূন্যে মিলাইল,
অবাঙ্‌মানসগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।
"কোথা ব্যথা? ব্যথাহারী সম্মুখে যাহার।
ব্যথা! ব্যথাহারী হৃদয়মাঝারে,
কোথা স্থান ব্যথার সেথায়?
মায়া - মায়া, তবু মায়া! না - না.
যাও, যাও দূরে মায়া,
নয়নের অশ্রু তুমি নির্ঝর ধারায়
ঝর আজ প্রেমময় নামে,
রুদ্ধ কন্ঠ মুক্ত হও তাঁর গুণগানে।"

******

পঞ্চম সঞ্চয়ন

পাদরী সাহেব

বেশ কিছুদিন আগেকার। কথা কোনও এক স্থানে এক পাদরি সাহেব উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। তিনি ধর্ম্মের বহুবিধ উপদেশ দিতে দিতে হিন্দুধর্ম্মের নানা প্রকার কুৎসা করিয়া বলিতে লাগিলেন হিন্দু ধর্ম্ম কিছুই নহে। উহা অতি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম উহারা যে সব মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া ও বীজ মন্ত্র জপ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে তপ জপ ইত্যাদি করে উহা অতীব নিকৃষ্ট, উহাতে কিছুই হয় না। আমাদের পাদরিদের যে ধর্ম্ম উহাই

সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্তরের সাধনা। আমার মতে সকলেরই পাদরি ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। এইভাবে নানা প্রকার লেকচার দিতে লাগিলেন। তাঁহার লেকচার শুনিয়া দলে দলে অজ্ঞ মূর্খ হিন্দুগণ পাদরি ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট সমবেত হইতে লাগিলেন।

ঠিক ঐ সময়ে একজন মহাপন্ডিত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘‘সাহেব আপনার কুকুরের কয়টি সংজ্ঞা জানা আছে?’’ তাহাতে উক্ত সাহেব উত্তর করিলেন - ‘‘পন্ডিত মহাশয় হামি হাপনাদের বহু শাস্ত্র পড়িয়াছে, কুকুরের বহু সংজ্ঞা হামার জানা আছে, যেমন ডগ্, কুকুর, কুত্তা, সারমেয় ইত্যাদি। হেইতো হামি কুকুরের বহু সংজ্ঞা কহিলাম।’’ নিকটেই একটি কুকুর শুইয়া লেজ নাড়িতেছিল।

তখন উক্ত পন্ডিত মহাশয় কুকুরটিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওকুকুর, ওডগ্, ও সারমেয়, ওকুত্তা। কিন্তু কুকুরের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। তখন উক্ত পন্ডিত মহাশয় পাদরি সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘‘কই সাহেব, তোমার কুকুরের এত সংজ্ঞা বলিলাম তবু তোমার কুকুরের তো কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। আমার বীজ মন্ত্রের গুণ দেখিবে?’’ এই কথা বলিয়া পন্ডিত মহাশয় তু,তু,তু বলিয়া সম্বোধন করা মাত্রই কুকুরটি ছুটিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া আসিল। তখন পন্ডিত মহাশয় বলিলেন ‘‘সাহেব আমার বীজ মন্ত্রের গুণ দেখিলে তো,’’ ধর্ম্ম জগৎ সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান নাই। তুমি নিজের ধর্ম্মকেও বুঝিবার চেষ্টা কর না, বা নিজের ধর্ম্মও নিজে বুঝ নাই। তাহা যদি পারিতে তাহা হইলে অপরের ধর্ম্মকে ছোট করিয়া দেখিতে পারিতে না। যে নিজের ধর্ম্মকে বোঝে এবং বিশ্বাস করে ও ভালবাসে সে অপর কোন ধর্ম্মকে ছোট করিয়া দেখিতে পারে না। মহাত্মাদের চক্ষে সমস্ত ধর্ম্মই এক এবং অভিন্ন। পন্ডিত মহাশয়ের উক্ত কথা শুনিয়া যাহারা পাদরি ধর্ম্মের উপদেশ লইবার জন্য উক্ত পাদরি সাহেবের নিকট গিয়াছিল, তাহারা দলে দলে ফিরিয়া আসিয়া প্রত্যেকেই পন্ডিত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইল।

ভারতের তপোবন

ভারতের তপোবন এ মর ধরায়,
স্বর্গের নন্দন বনে দিয়াছ ধিক্কার
হায় হায় আজ তুমি গিয়াছ কোথায়?
এভারতে বুঝি ফিরে আসিবে না আর।
দেখ আমি সর্ব্বস্বান্ত এ ভারত ভূমি,
ভারতের তপোবন ফিরে এস তুমি।

কাহারা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া পাবার অধিকারী।

প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটি উপায় দ্বারা শিষ্য গুরুর নিকট জ্ঞানোপদেশ প্রার্থনা করিলে গুরু শিষ্যকে প্রকৃত রহস্য কথা বুঝাইয়া দেন। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের কয়েকটি উপায় জানিতে পারিলাম। গুরুর নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, গুরুকে দীর্ঘদন্ডবৎ প্রণিপাত করিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের প্রপন্নাবস্থা তাঁহার নিকট জানাইতে হইবে। কিরূপে ভবসিন্ধু পার হইব। হে কৃপালো গুরো, কৃপা করিয়া তাহার উপদেশ দিন। আমি কে? কিরূপে এ বন্ধনদশায় পড়িলাম, এবং কিরূপেই বা ইহা হইতে মুক্তিলাভ করিব?

এই কথা বিনয় পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে। শুধু প্রশ্ন করিলে চলিবে না। গুরুর সেবা করিতে হইবে। সে সেবা, সে আত্মত্যাগই বা কি অদ্ভুত! সে গুরুর প্রতি প্রাণের আকর্ষণই বা কি চমৎকার! তবে তো গুরু প্রসন্ন হইবেন। শ্রীগুরু প্রসন্ন হইলে আর ভাবনা কি? সে গুরুও কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য পুরুষ, তিনি যেন এজগতের লোকই নহেন, আমার প্রাণের দরদ এমন করিয়া বুঝিতে আমার মনের পিপাসা এমন করিয়া মিটাইতে, আমার ঠিক রোগটি বুঝিয়া ঠিক ঔষধটি প্রয়োগ করিতে, আর কেহ তেমন

করিয়া পারে না। বুঝি আমিও ঠিক আপনাকে তেমন করিয়া বুঝিতে পারি না। তাই তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার কথা শুনিলে তাঁহার কথা বলিতে গেলে, আমার প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠে; এই গুরু একদিকে যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি ব্রহ্মনিষ্ঠ। যেমন সাধন সিদ্ধ, তেমনি শাস্ত্রজ্ঞানে সুপণ্ডিত, তেমনি তাঁর প্রাণ বুদ্ধি ভগবৎ সেবায় সমর্পিত।

যদি শিষ্য ভববন্ধনে তেমন কাতর না হইয়া থাকেন যদি তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণের জ্বালায় ব্যাকুল না হইয়া উঠেন, তবে শিষ্য হওয়াই বৃথা। যদি ভগবানকে জীবের সর্ব্বস্ব জ্ঞান না হইয়া থাকে, যদি তাঁহাকে পাইবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে এখন সঙ্কোচ বোধ হইতে থাকে, গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া তাহার বিনিময়ে যথা সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে প্রদান করিয়া যদি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতে না পার, তবে বুঝিতে হইবে এখনও তোমার সময় হয় নাই, এখনও তোমায় অপেক্ষা করিতে হইবে। এখনও কেবল মাত্র তোমাকে সেই অমৃত কথা বার বার শুনিতে হইবে তবে যদি তোমার চিত্তমল গলিত হয়; চিত্তমল গলিত না হইলে অর্থাৎ না গেলে তুমি অধিকারীই হইতে পারিবে না।

প্রত্যেক মানুষের জীবনই ইতিহাস

আমরা জ্ঞানী এবং বিদ্বান হইবার জন্য কত প্রকারের পুস্তক পাঠ করিয়া থাকি! সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যামিতি, গণিত ইত্যাদি নানা প্রকার পুস্তক পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী এবং পণ্ডিত হইতে হইলে নিজে কি, তাহা আগে জানা প্রয়োজন, কিন্তু তাহা জানিবার বা বুঝিবার আগ্রহ আমাদের একেবারে নাই বলিলেই অত্যুক্তি হয় না। মনুষ্য মাত্রেই একখানি গ্রন্থ বিশেষ। আপনি আপনাকে পাঠ করিলে জীবনের সমস্ত বিষয় জানা যায়। নিজের শরীরের চর্ম্ম, অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু, শিরা, রস, রক্ত ইত্যাদির গঠন পরিণাম, গতিবিধি যদি ভাল করিয়া বুঝিতে পার তবে দেখিতে পাইবে ভগবান তোমার শরীরকে সুচারুরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

কেমন সুরে তালে মিলাইয়া শরীরের প্রত্যেক ক্রিয়াগুলি স্পন্দিত হইতেছে, কেমন পঞ্চতত্ত্বে, পঞ্চতন্মাত্র গা ঢালিয়া নৃত্য করিতেছে, কেমন ইন্দ্রিয়গুলি যথা নিয়মে ক্রীড়া করিতেছে। ইহাদিগের একটি বৃত্তির কার্য্য যদি কখনও গোলমাল হয় তবে শরীরে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। গুরুর সাহায্যে যদি তোমার জীবনগ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিতে ও রচনা করিতে পার তাহা হইলে তোমারও বিশেষ উপকার হইবে, অপরেরও বিশেষ উপকার হইবে।

এক একটি মনুষ্য এক একখানি পুস্তক বিশেষ। গর্ভবাস এই পুস্তকের মলাট, কর্ম্মফল ইহার সূচীপত্র, দীক্ষা গ্রহণ ইহার বিজ্ঞাপন, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য ইহার এক একটি পরিচ্ছেদ। জীবনের ভাল মন্দ কার্য্য ইহার পাঠ্য বিষয়। যাহারা দরিদ্র ও সামান্য বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে তাহারা সাদা মলাট মোড়া সামান্য পুস্তক, যাহারা বড়লোক, জমিদার, রাজা বা মহারাজা তাঁহারা ভাল বাঁধাই করা, সোনার জলে কাজ করা মলাট মোড়া এক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। যাহারা অল্পদিন জীবিত থাকিয়া বিশেষ কোন কার্য্য না করিয়াই দেহত্যাগ করে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক; যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া মহৎ কার্য্যরাশি অনুষ্ঠান করিয়া যান তাঁহারাই বৃহৎ গ্রন্থ এবং জগতের সকল লোকের আদর্শ ও পাঠের উপযুক্ত।

যাঁহারা অন্যের জীবন ভাল গঠন করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন নিজে কিছু করেন না, তাঁহারা ব্যাকরণ। যাঁহারা রাজা মহারাজা ইত্যাদি বড় বড় লোকের গল্প করিয়া সভা ও সমাজ গরম করিয়া রাখেন তাঁহারা ইতিহাস। যাঁহারা জগতের লৌকিক লাভ লোকসান বিচার করিতে করিতে দিন কাটাইয়া থাকেন তাঁহারা গণিত শাস্ত্র। যাঁহারা জড় জগতের বিষয় চিন্তা করাই পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহারা ভূগোল। যাঁহারা কেবল রঙ্গরস, আমোদ প্রমোদ বিলাসই জীবনের সার করিয়াছেন, তাঁহারা নাটক। যাঁহারা পরোপকার, সত্য, দয়া, নিষ্ঠা, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মচর্চ্চা ইত্যাদির দ্বারা কালযাপন করেন, তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র। যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ভক্তি পূর্ব্বক

ভগবানের আরাধনা করাই জীবনের প্রধান কার্য্য মনে করেন, তাঁহারা যোগশাস্ত্র। এইরূপ মনুষ্য মাত্রেই প্রত্যেকে এক একখানি গ্রন্থ। যাহাতে আপনার জীবন গ্রন্থ পরিপাটীরূপে লিখিত হয়, যাহাতে তুমি সকলের পাঠ্য হও; তোমার মৃত্যু হইলেও তোমার জীবন চরিত অন্য জীবনে পুনঃমুদ্রিত হয়, তুমি সেইরূপ আপনার জীবন গ্রন্থ রচনা করিবে। সমস্ত পুস্তকের শেষে সমাপ্ত অর্থাৎ মৃত্যু লেখা থাকে, একথাটি যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

মনুষ্য মাত্রেরই ভাবিয়া দেখা উচিত, কোথায় ছিলাম, কোথায় বা আসিলাম, কি জন্যই বা আসিলাম, আসিয়াই বা তাহার করিলাম কি ? এখানে আমাকে কে আনিলেন, কেনই বা আনিলেন, কিরূপেই বা আনিলেন, যে জন্য আনিয়াছেন তাহারই বা কি করিতেছি? এখানে আসিয়া কত কি দেখিলাম, কত কি শুনিলাম, কত কি বলিলাম, কত কি ভাবিলাম, দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই তো ঠিক করিতে পারিলাম না। এখানে পিতা মাতা পাইলাম, স্ত্রীপুত্র পাইলাম, বন্ধু বান্ধব পাইলাম, সমস্তই পাইলাম, কিন্তু তৃপ্তি কিছুতেই পাইলাম না। অনেক ভাষা শিখিলাম, অনেক দেশ বেড়াইলাম, অনেক বস্তু দেখিলাম, অনেক লোকের সহিত বাস করিলাম কিন্তু প্রকৃত সুখ কিছুতেই পাইলাম না।

মন ও বুদ্ধির প্রণয় হইল না, সর্ব্বদাই তুমুল সংগ্রাম করিতেছে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বিবাদ লাগিয়াই আছে। সংসার সাগরে প্রলয় তুফান দিবারাত্র হইতেছে, যেদিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই সম্প্রদায় লইয়া মতভেদ। সকলেই আপনার মত বহাল করিতে ব্যস্ত। কেহ বলিতেছে, কেহ শুনিতেছে, কেহ বুঝাইতেছে, কেহ চুপ করিয়া তামাসা দেখিতেছে, কেহ আন্দোলন করিতেছে, কেহ শাসন করিতেছে, কেহ পালন করিতেছে, কেহ সিংহাসনে কেহ ধরাসনে বসিয়া আছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ বা অবাক হইয়া বসিয়া আছে, সংসারে সকলেই ঘুরিতেছে আর চিৎকার

করিতেছে, সকলেই গোলমাল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া (ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই তো বুঝিলাম না) কেবলমাত্র চিন্তাই বাড়িতেছে কিন্তু সুখ কিছুতেই পাইলাম না। যেন একটা কোন আসল বস্তুর অভাবে এত কষ্ট ও এত যন্ত্রণা দিবারাত্র ভোগ করিতে হইতেছে।

হে ভগবান আত্মনারায়ণ, হে প্রেমাবতার দয়ার সাগর, তুমি নিজ কৃপা বলে আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করিয়া দাও। যাহাতে আমি উপরোক্ত মূল্যবান উপদেশ গুলি আত্মজ্ঞান প্রভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই নশ্বর সংসারে প্রকৃত সুখ শান্তির মুখ দেখিতে পাইয়া জীবন কৃত কৃতার্থ করিতে পারি। তোমার শ্রীপাদপদ্মে এ দাসের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

অমৃতের সন্তান

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মায়ের নাড়ীর সঙ্গে যোগ থাকে। নাড়ী কাটিয়া লোকে মায়ে সন্তানে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আমাদেরও সেই আকাশময় অখন্ড চৈতন্যের সঙ্গে শ্বাসের পথে কেমন সুন্দর শ্বাস নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। অহো, আমাদের নাড়ী কাটা হয় নাই। অখন্ড চৈতন্যের সহিত এক নাড়ীতেই আমাদের শ্বাস চৈতন্যের পোষণ হইতেছে। আমরা বিশ্বময়ীর সেই অমৃত নাড়ী ধরিয়া নাক মুখ দিয়া চোষণ করিতেছি।

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"

হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর। অমৃতের সন্তান কেন ? ঐ যে জগন্ময়ীর অমৃত নাড়ীর সঙ্গে আমাদের নাড়ী এক হইয়া আছে। নাড়ী কাটা হয় না, হইবেও না। আমরা চিরদিন অমৃতের সন্তান। সকলে ঋষিবাক্য ধরিয়া অমৃত নাড়ীতে লক্ষ্য স্থির কর। "লক্ষ্য যদি স্থির হল মোক্ষ পথে পা প'ল।"

"এ সংসার মরুমাঝে ঋষিপদ ভরসা।
সত্যের ও অমৃতের অবিশ্রান্ত বরষা।।"

কুরু পান্ডবের যুদ্ধ।

প্রত্যেক দেহ এক একটি দেহ ক্ষেত্র। এই দেহরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্মরূপ পান্ডব ও অধর্ম্মরূপ কুরু নামে দুইটি পক্ষ আছে। 'স্বরাজ্য' অর্থাৎ আত্মরাজ্য লাভ করার জন্য ধর্ম্ম পক্ষের বিরোধ হেতু উভয় পক্ষের যুদ্ধ হওয়ার কারণ। এই যুদ্ধের পরিণাম অধর্ম্ম পক্ষের বিনাশ এবং ধর্ম্ম পক্ষের বিজয় লাভ। অতএব কাম ক্রোধাদি হিংসাত্মক রিপুগণের ক্ষেত্র (দেহ) হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে বেদব্যাস বর্ণিত ব্রহ্ম সরোবরে দেহপিন্ড দান করিলে তিনি সাত পুরুষসহ মুক্ত হইয়া থাকেন ইহাই কুরুক্ষেত্র তীর্থে পিন্ডদানের ভাবার্থ।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বর

আমার চারিদ্দিকে অন্তরে ও বাহিরে যিনি নিত্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন, যাঁহার ইঙ্গিত মাত্র ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু ও বরুণাদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিতে তৎপর হইতেছেন, যাঁহার সত্তা প্রভাবে আমরা জীবিত রহিয়াছি, যিনি চরণ শূন্য, অথচ সর্বত্র গমন করেন, নেত্র হীন, কিন্তু সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন, যিনি আমাকে দেখিতেছেন, অথচ আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। কাম, ক্রোধ, লোভ, দুরাশা, বিষয়, কামনা, বাসনা ইত্যাদি প্রতারকগণ যাহার সমাগম ভয়ে ভীত হইয়া দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছেন, জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে অক্ষম, কল্পনা যাঁহার পরিমাপ করিতে অক্ষম, মন যাঁহার নিকট গেলে আর ফিরিয়া আসে না, মায়া যাঁহাকে আবরণ করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর। যাঁহার আরতি করিবার জন্য চন্দ্র, সূর্য্য, দীপ জ্বালিতেছে, পবন চামর ব্যজন করিতেছে, বিহঙ্গ সকল কীর্ত্তন করিতেছে, বজ্র, শঙ্খ নিনাদ করিতেছে,

ভক্তি শ্রদ্ধা শান্তি করুণা মুক্তি যাহার পদ সেবা করিতেছে, বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ, ধর্ম্ম, যাঁহার দ্বারে প্রহরী রহিয়াছেন, যিনি জীবের কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিতেছেন, যাঁহাকে লোকে বিস্মৃত হইলেও তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন না, যিনি মায়ানিদ্রা ভঙ্গ করিয়া জাগ্রত করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিতেছেন, যিনি নিজে নির্গুণ হইয়া ত্রিগুণে ত্রিজগৎ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, অরূপ হইয়া আশ্চর্য্যরূপে ত্রিভুবন মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, চৈতন্য স্বরূপ হইয়া জীবকে মোহিনী মায়ায় অচেতন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্ম জগৎ হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই নাই, তবে যে ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ সকল দৃশ্য হইতেছে, সেই সমুদয় মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। যে কোন বস্তু দৃশ্য বা শ্রুত হয় তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন নহে। কারণ জ্ঞানোদয় হইলে সেই সমুদয় বস্তুকে অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বোধ হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী নিত্য ও জ্ঞানরূপ আত্মাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন। জ্ঞানচক্ষু বিহীন ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, যে প্রকার অন্ধ মনুষ্য সূর্য্যকে দেখিতে পায় না। যিনি সূক্ষ্ম নহেন, স্থূল নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, জন্ম বিনাশ বিহীন এবং রূপ, গুণ, বর্ণ ও নাম রহিত, নিত্য একই রূপে পার্শ্বে ঊর্দ্ধে, নিম্নে ও চতুর্দ্দিকে অবস্থান করেন, যিনি পূর্ণ, সত্য চৈতন্য, আদি অন্ত রহিত অদ্বিতীয় আনন্দময়, তিনিই ঈশ্বর।

যে লাভের পর আর লাভ নাই, যে সুখের পর আর সুখ নাই, যে জ্ঞানের পর আর জ্ঞান নাই, যাঁহাতে দৃষ্টি হইলে, আর কোন বস্তু দৃশ্য হয় না, যাহা হইলে আর তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না, এবং যাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে হয় না, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি কোন দীপ্যমান বস্তু যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, যাঁহার প্রকাশে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি প্রকাশ হয়, যাঁহার দ্বারা

এই ব্রহ্মান্ড প্রকাশ পায়, যে প্রকার অগ্নি লৌহপিন্ডে প্রবিষ্ট হইয়া প্রদীপ্ত করে, সেই প্রকার স্বয়ং ব্রহ্ম সমুদয় বস্তুর অন্তরে ও বাহ্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া সমুদয় জগৎকে প্রকাশ করেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যিনি মনুষ্য, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গৃহী, ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ এবং রাজা বা ভিক্ষুক নহেন কিন্তু সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্য্যামী, জ্যোতির্ম্ময়, জ্ঞানস্বরূপ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড় পদার্থ সকল যে অদ্বিতীয় নিশ্চল, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

যেমন সূর্য্যোদয় লোক সকলের ব্যবহারের কারণ হয়, সেই প্রকার যিনি মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার চিত্ত এই চারি অন্তরেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ের প্রবৃত্তির কারণ, আর সমস্ত উপাধি রহিত ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও মনোহর সৃষ্টি কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষভাবে রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

কি বেদ, কি শাস্ত্র, কি শৌচ, কি সন্ধ্যা, কি মন্ত্র, কি জপ, কি ধ্যান, কি ধ্যেয়, কি হোম, কি যজ্ঞ, যাঁহার এ সকল কর্ম্মের কিছুই নাই, যিনি ঊর্দ্ধে নহেন, অধঃ নহেন, শিব নহেন, শক্তি নহেন, পুরুষ নহেন, নারী নহেন, ব্রহ্ম নহেন, বিষ্ণু নহেন, কি গ্রহ, কি তারা, কি মেঘমালা কিছুই নহেন, যিনি চন্দ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, যাঁহার উদয় অস্ত কিছুই নাই, যিনি স্বর্গে, নরকে বা ক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন না, কি জাতিগত, কি অজাতিগত, যাঁহার কোন ভিন্নতা নাই, যিনি একমাত্র নির্ব্বাণরূপী পূণ্যময়, যিনি জগতের সার, যিনি পাপপুণ্য বিহীন, সর্ব্বময় চৈতন্য স্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর।

জানিবার কথা

(১)

কুমতি ঃ- কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, নির্দয়তা, খলতা, মিথ্যাচারিতা, হিংসা, চঞ্চলতা, অজ্ঞানতা, কৃপণতা, অশুদ্ধি, অসত্য, ভয়, অশান্তি, অক্ষমতা, অভিমান, অশুচিতা, নির্লজ্জতা, শঠতা....ইত্যাদি।

(২)

সুমতি ঃ- ক্ষমা, লজ্জা, জ্ঞান, ধৃতি, অহিংসা, শুদ্ধসত্ত্বতা, অভ্রম, উদারতা, সরলতা, অক্রোধ, অভয়, অচঞ্চলতা, অক্রূরতা, দান, তপ জপ, দৈন্য, শৌচ, স্বাধ্যায়, অখলতা, তেজ ..... ইত্যাদি।

(৩)

জন্ম জন্মান্তরের ক্রমাগত অনুশীলন দ্বারা রিপু সকল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যাও বলিলেই উহারা সহজে যায় না।

(৪)

জীব বহু সাধনায় প্রবৃত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পায়। প্রবৃত্তি এত ভীষণ যে ছাড়িয়াও একেবারে ছাড়িতে চাহে না।

(৫)

পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবতাদের মধ্যেও এমন জীব নাই, যে প্রকৃতি জাত তিন গুণ হইতে মুক্ত।

(৬)

অনুশোচনার দ্বারা পাপক্ষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত 'জগাই মাধাইয়ের' ইতিহাসে পাওয়া যায়। জগাই মাধাই ভুরি ভুরি পাপানুষ্ঠান করিয়াও নিত্যানন্দের কৃপায় আপন আপন অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া যেমন কাঁদিয়া আকুল হইল, অমনি ভগবানের অজস্র করুণা বর্ষিত হইয়া তাঁহাদিগকে পাপমুক্ত করিল। পাপ অবস্থা মাত্র, পাপের স্থায়ী সত্তা কিছুই নাই। মৃত্তিকাস্তূপের ন্যায় পুঞ্জীকৃত পাপ ভক্তি বন্যায় ভাসিয়া যায়।

(৭)

মহা বলবান হস্তী পর্ব্বতের প্রায়,
এক ক্ষুদ্র অঙ্কুশেতে বশ করে তায়।
এক সূর্য্য গগনে দেখিতে লাগে ক্ষুদ্র,
যার তেজে আলোকিত ত্রৈলোক্য সমুদ্র।

(৮)

ভক্ত প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ঘটিত, সেইজন্য তিনি পর্বত, জল ও অগ্নি হইতে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই এবং সেইজন্যই তিনি ভগবৎ কৃপায় সর্ব্বত্র জয়ী হইয়াছিলেন।

(৯)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আদি গুণ অবতার
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনে অধিকার।

(১০)

অন্যলোক আমাকে স্কন্ধে করিলে সে বুঝিতে পারে, আমার ভার এক মণ কি দুই মণ। কিন্তু সেই দুই মণ বা এক মণের ভার সর্ব্বদাই আমাতে বিদ্যমান, তথাপি আমার কত ভার আমি বুঝিতে পারি না।

(১১)

সদগুরুর কৃপায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা জীবন সফল করিতে পারি, অন্যথায় নহে।

(১২)

আপন ইচ্ছায় জীব শতবাঞ্ছা করে,
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা তার একটিও না স্ফুরে।

(১৩)

কর্ম্মকান্ড পরায়ণ ব্রাহ্মণ দিগের অগ্নিই দেবতা। মুনিদিগের হৃদয় সিংহাসনে বিরাজিত 'আত্মাই' দেবতা, স্থূল বুদ্ধি মনুষ্যদিগের মৃন্ময় পাষাণ নির্ম্মিত প্রতিমাই দেবতা, আর সর্ব্বত্র সমদর্শী মহাযোগী দিগের সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মাই দেবতা।

(১৪)

লৌকিক গুরু যে মন্ত্র বা বীজ কানে শুনাইয়া দেন, সদগুরু সেই মন্ত্রের বাচক পরমাত্মাকে দেখাইয়া দেন।

(১৫)

সেই শ্যাম বিন্দুরূপ সিন্ধুরূপাধার
জগতের রূপ যাতে করয়ে বিহার।
শ্যামচন্দ্র উদয়ে জগৎ আলো হয়
মুদিলে সংসার সব অন্ধকার ময়।
সপ্তাবরণের পাশে আছয়ে লুকায়ে
কেউ পাছে চিনে, আছে নিমিখ তাকিয়ে।

অর্থাৎ সেই শ্যামচন্দ্রের রূপেতেই জগৎ আলোকিত, সেরূপের তুলনা বুঝি এজগতে নাই, তাই তাহাকে অরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার রূপ নাই তাহাও নহে, তাহার রূপ আছে বলিয়াই জগতের রূপ পরিলক্ষিত হয়। জগতের রূপ তরঙ্গ সেই অনন্ত রূপ সিন্ধু হইতে উত্থিত হইতেছে; সেই অব্যক্ত অসীম অপরূপ সত্তা হইতে এই রূপময় জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই শ্যামচন্দ্রের রূপ জ্যোতিঃ হৃদয় কন্দর ব্যাপিয়া দিক্ দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে, বুঝি ইহাই অরূপের রূপ।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোষ বা আবরণের দ্বারা পরমতত্ত্ব আবৃতবৎ মনে হয়। ইহাতে পাঁচটি আবরণ বা কোষ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। তবে যদি দেহস্থ সপ্ত চক্রকে (অর্থাৎ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার এই সপ্ত চক্রকে) সপ্তাবরণ মনে করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত সপ্তাবরণ ঠিক ঠিক হয়, যোগীকে এই সপ্তাবরণ ভেদ করিতে হয়, তবে নিঃসঙ্গ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

(১৬)

এমত আনন্দ সিন্ধু তাঁহাকে না খুঁজে।

ক্ষণিক অনিত্য সুখে এ জগতে মজে।।
উটে যেন স্বাদু বলি কন্টক চিবায়।
তার সুখ সঙ্গে মুখে শোণিত বেরায়।।
সেই মত এ জগতে যত সুখ আছে।
সে সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ লাগি থাকে।।
সুখেতেও দুঃখ দেখি তবে সুখ কই?
এসুখে কে সুখ মানে বিনা পশু বই।।

ইহার দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রকৃত নির্ম্মল সুখ এক আত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ছাড়া নির্ম্মল সুখ, নির্ম্মল আনন্দ সংসারে কোথাও খুঁজিলে পাওয়া যায় না। আমরা যে বিষয় পাইয়া সাময়িক সুখ অনুভব করি তাহার মধ্যেও দুঃখ মিশ্রিত আছে।

(১৭)

আমরা সদা সর্ব্বদা এই সংসারে বারোটি জ্বালা লইয়া অহরহ ছট্‌ফট্‌ করিতেছি। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ-

কাম, ক্রোধ, আদিকরি ছয় রিপু হয়
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুভয়।
ছয় রিপু ছয় গুণ দ্বাদশ দুয়েতে
জগতের জন জ্বলে এ বারো জ্বালাতে।

ইহা হইতে একমাত্র পরিত্রাণ পাবার উপায় ভগবৎ উপাসনার দ্বারা তাঁহার শরণাগত হওয়া।

জয় বিজয়ের প্রতি দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপ

আমরা জন্ম হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, বিষ্ণুর জয় ও বিজয় নামে দুইটি দ্বারপাল ছিল। বিষ্ণু নির্জ্জনে বিশেষ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত

ছিলেন। তিনি দ্বারপালদের বলিয়াছিলেন ঐ সময়ে যেন কেহ তাঁহাকে বিরক্ত না করে। ইহার কিছুক্ষণ পরে জনৈক ঋষি (দুর্ব্বাসা) বিষ্ণুর সাক্ষাৎ করিবার জন্য দ্বারপাল দিগকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন কিন্তু দ্বারপালদ্বয় বিষ্ণুর আদেশ মত দ্বার ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হওয়ায় তাহারা ঋষির নিকট অভিশপ্ত হয় যে, তাহারা রাক্ষস যোনী প্রাপ্ত হইবে, অতঃপর বিষ্ণুর নিকট উভয়ে গমন করিয়া মিনতি করায় নারায়ণ তাহাদিগকে বলেন, "যাও তোমরা রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ কর, আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিব। যদি তোমরা শত্রুভাবে আমার সহিত ব্যবহার কর তাহা হইলে তিনজন্মে মুক্ত করিব, আর যদি মিত্রভাবে আমার সহিত ব্যবহার কর, তাহা হইলে সপ্ত জন্মে মুক্ত করিব।

তাহার পর সেই জয় ও বিজয় হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং কংস ও শিশুপালরূপে শত্রুভাবে জন্ম গ্রহণ করে ও তৃতীয় জন্মে উদ্ধার হয়। রাবণেরই অপর জন্ম কংস বস্তুতঃ ইহা সত্য হইলে যিনি সর্ব্বশক্তিমান ভগবান তাঁহার পক্ষে একথা বলাও ঠিক নহে।

কারণ ভগবৎ ভক্তের এত লাঞ্ছনা হওয়া ঠিক নহে। যদি জয় বিজয়ের উপর ঋষির কোপ পড়িয়াছিল বলা হয় তাহা হইলে ঋষির কোপ হওয়া অসম্ভব। যাঁহাকে ঋষিপদবাচ্য বলা যায় তিনি কি আমা-ন্যায় মানব যে; তিনি ক্রোধের বশীভূত হইয়া অভিশাপ দিবেন? এমন ব্যক্তিকে ঋষি পদবাচ্য বলিতে পারি না, আর যিনি স্থূল শরীরে শূন্যমার্গে গমন করিয়া গোলক ধাম পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম তিনি তো সাধারণ মানব নহেন, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। আমরাও যদি কোন বড় বা ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই এবং যাইয়া তাঁহার দ্বারপালের নিকট শ্রবণ করি যে, এখন তাহার সাক্ষাৎ হইবে না, এবং আমিও তাঁহাকে আপনার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে পারিব না, কারণ তিনি এখন কোনও বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এবং

এই কারণে দ্বারপাল যদি আমায় অপেক্ষা করিতে বলে এবং সময় হইলেই আমার আগমন বার্ত্তা নিজ প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিবে বলিয়া আমায় জানায়, আমার কি সেই কথায় দ্বারপালকে অভিশাপ দেওয়া বা কটু কাটব্য বলা উচিৎ ? তাহাতে কি নিজের ভদ্রতার হানি হয় না ? জয় বিজয়ও সম্ভবতঃ এই ভাবেই বলিয়াছিল। ইহাতে ঋষি চরিত্রকে কলঙ্কিত করা হইয়াছিল। কিন্তু ঋষির কোপ কতক্ষণ থাকিতে পারে ? ঋষি যদি আমার ন্যায় কোপ পরায়ণ, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। তাহা না হইলে ঋষি নিজের দোষ বুঝিয়া নিজেই বলিতেন, "বাপু, আমি না বুঝিয়া হঠাৎ একটা অভিশাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছি, আমি এখন বুঝিতেছি তোমাদের কোন দোষ নাই, তোমরা তোমাদের প্রভুর আজ্ঞানুযায়ীই কার্য্য করিয়াছ, তাহা ভালই করিয়াছ, এক্ষণে আমি বলিতেছি, আমার বাক্য কখনও লঙ্ঘন হইবে না, অতএব আমি পুনরায় তোমাদিগকে বর দিতেছি যে তোমরা রাক্ষস যোনি প্রাপ্ত হইয়া সামান্য দুদশ দিনের পর পুনরায় যথাস্থানে নিজ কার্য্যে আগমন করিবে।" তাহা হইলেও ঋষির ভদ্রতা বজায় থাকিত। ইহা কি ঋষি করিতে পারিতেন না ? না নারায়ণই ইহা করিতে পারিতেন না। আমার বিশ্বাস তাহারা নিশ্চয়ই করিতে পারিতেন। তবে ঘটনা ত এইরূপ হয় নাই, সুতরাং করিতে পারিবেন কোথা হইতে ? বস্তুতঃ এসব কাটানে কথা মাত্র, ইহা প্রকৃত কথা নহে। উপরোক্ত ঘটনাটি আলোচনার মাধ্যমে ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে কোন পন্ডিত রূপকছলে ইহা লিখিয়াছেন, ইহার নিগূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সাধনায় বেশ উন্নতি লাভ করা আবশ্যক, নচেৎ নহে। সাধনায় উন্নতি করিতে পারিলে ইহার নিগূঢ় অর্থ আপনা আপনি হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইবে, লেখনীতে ইহা ব্যক্ত করিবার উপায় নাই।

এই সকল কারণে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, লোকে যেমন কৃষ্ণযাত্রার পালা সাজাইয়া এবং অভিনয় করিয়া সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে তদ্রূপ কোন পন্ডিত কর্ত্তৃক গ্রন্থ রচিত হইয়া

সাধারণের নিকট বাহ্যিক ভাবে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি সত্যই তাই। তবে তাহা দেখায় বা কে? আর ইহার প্রকৃত মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিয়াই বা দেয় কে? সাধন সম্পন্ন আত্মজ্ঞানী পুরুষ ব্যতীত ইহার প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে। যাহা হউক এ সম্বন্ধে যাহা মোটামুটি তথ্য তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনার কোন প্রয়োজন দেখি না।

জীব যবন বা ম্লেচ্ছ পদবাচ্য নহে

যাহারা আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগী কদাচারী অভক্ষ্য ভক্ষণে প্রস্তুত, লোকের প্রতি হিংসা নিন্দা যাহাদের একমাত্র কর্ম্ম তাহাদিগকে শাস্ত্রে যবন বা ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। যে মানব আত্মকর্ম্ম পরিত্যাগী তাহাদিগকে যবন বা ম্লেচ্ছ বলা হইয়া থাকে। তাহারা নামে বা পরিচয়ে আর্য্য বর্ণিত হইলেও প্রকৃত আর্য্য পদবাচ্য নহে। কারণ আমি মুখে আত্মবাদী বা ঈশ্বরবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি অথচ আত্মা বা ঈশ্বর কি তাহা আদৌ অবগত নই, কার্য্যাকার্য্যের কোন বিচার নাই, আসক্তির সহিত আসুরিক ভাবের অনুমোদিত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেও গোপনে বা প্রকাশ্যে বিরত হই না, ইহাকে আর্য্যোচিত ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্মের লক্ষণ বলে না, এ কারণ আসুরিক ভাবাপন্ন মানবকে যবন পদবাচ্য বলিতেছি।

এইরূপ জীবও কখনো চন্ডাল পদবাচ্য নহে। ক্রোধ ভাবই চন্ডাল পদবাচ্য এবং হিংসা ভাবই চন্ডালিনী পদবাচ্য, জীব কখনো চন্ডাল পদবাচ্য নহে। প্রাচীন কালে কতকগুলি লোক আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কদাচারী এবং স্বেচ্ছাচারী হওয়ায় আর্য্যকুলতিলক সগররাজা তাহাদের মস্তক মুন্ডন করাইয়া আর্য্যভূমি হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। দেশ ও আলয় ত্যাগ করিবার পর উহাদিগকে যবন বলিয়া অভিহিত করা হইত। য-শব্দের অর্থ ত্যাগ, বন-শব্দের অর্থ আলয়, আলয় ত্যাগ করার দরুণ ইহাদিগকে যবন বলা হইত। এই

বাক্য শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যথা ঃ-

"সগররাজনে যায়াং সর্ব্বশিরোমুন্ডনম্
সর্ব্ব ধর্ম্ম রাহিত্যঞ্চ কৃতং তে
চাত্মধর্ম্ম পরিত্যাগাৎ ম্লেচ্ছত্বং যযুরিতি।"
ইতি বিষ্ণুপুরাণো তত্ত্বাৎ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জীব যবন, ম্লেচ্ছ বা চন্ডাল পদবাচ্য নহে। যাহারা আত্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসুরিক ভাবে বশ্যতাপন্ন হইয়া আত্মার অধোগতির সহিত ইন্দ্রিয় পরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করেন তাহারা আর্য্যবংশ সম্ভুত হইলেও যবন বা ম্লেচ্ছ পদবাচ্য। উপরি উক্ত লোকেরাও যদি নিজের কর্ম্মে অর্থাৎ আত্মকর্ম্মে উদ্যোগী মন এবং গুরু বাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রাণপণ যত্ন সহকারে সাধনাদি করেন তবে ভগবৎ কৃপায় তাঁহারা অচিরে শুভফল লাভ করিয়া আর্য্যবংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাই গীতোক্ত ভগবদবাক্য, কারণ ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, "আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য এমন কি নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিও পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

এই বাক্যে সন্দেহ করিলে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ "সংশয় আত্মা বিনশ্যতি।"

প্রমাণঃ- যেমন রত্নাকর দস্যু বাল্মিকী মুনিতে পরিণত হইয়াছিল।

জাবল ঋষি, মাতঙ্গ ঋষি, কবজ ঋষি, নমঃশূদ্র (চন্ডাল) হইয়াও নিজ সাধনার বলে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন।

মহাত্মা সুরদাস নীচবংশে (মুচিগৃহে) জন্ম গ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগৎবরেণ্য হইয়াছিলেন। যবন হরিদাস ও ভক্ত দাদু তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এইরূপ বহু প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়, আমি মোটামুটি দুচারিটি

উল্লেখ করিলাম।

অরুচি

রোগ হইলে কাহারো কাহারো বড় অরুচি হয়। আবার দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করিলে মনটাও খিট খিটে হইয়া পড়ে। খাওয়া পরা, দেখাশুনা, স্বজন বন্ধু, ছেলে মেয়ে এ সমস্তই যেন বিরস লাগে। কোন জিনিষই যখন এইরূপ আমাদের নিকট স্বাদু বোধ না হয় তখনই ঘোর অরুচির অবস্থা বুঝিতে হইবে। এ অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইলে রোগীর প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। আমাদেরও সেইরূপ প্রাণসঙ্কট অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। না জানি কত দীর্ঘদিন কত যুগযুগান্তর এই ভবরোগে ভুগিয়া ভুগিয়া জীর্ণ হইতে বসিয়াছি। কোন জিনিষই আর ভাল লাগে না। অমৃতেও যেমন লোকের অরুচি হয়, আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। তাই অমৃত স্বরূপ প্রিয়তম প্রাণসখা পরমাত্মাকে আর তো ভাল লাগে না। তাহাকে তো স্বাদু বোধ হয় না। পুরাতন রোগী যেমন কুপথ্য করিয়া আরও রোগকে বাড়াইয়া তোলে, আমরাও তেমনি আপাতমধুর পরিণামবিরস কত প্রকার বিষয় ভোগরূপ কুপথ্য দ্বারা এই রোগটিকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছি। আর তো এই লালসার বেগকে থামাইতে পারি না, এ যেন আমাকে প্রবল বেগে মৃত্যুর পানে লইয়া চলিয়াছে। পুরাতন রোগীর মধ্যে কেহ কেহ বহুদিন ভুগিয়াও আবার কিন্তু সারিয়া ওঠে। রোগী যখন একবার সারিতে আরম্ভ করে, তখন আবার তাহার ইন্দ্রিয়গুলি সবল ও সতেজ হইয়া উঠে, হৃদয়ের সব সত্তা ফিরিয়া আসে, অরুচি ধীরে ধীরে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। তাঁহার শরীর মন যেন নবকান্তি ধারণ করে এবং তাহাকে দেখিলেই বোঝা যায়, সে সারিয়া উঠিতেছে, কিন্তু একি অদৃষ্টের পরিহাস, একি রোগে আমাকে ধরিয়াছে নাথ! এ রোগ আর কিছুতেই সারিতে চায় না? কতদিন হইয়া গেল, তোমাকে প্রিয়বোধ হইল কই। তবে কি এ রোগ আর সারিবে না? প্রভু; তুমি যে সকল রসের নিলয়, সকল আনন্দের নিকেতন, তোমাকে সেরূপ ভাবে চাওয়া তো হইল না। তুমি যে সকল রসের নিলয়, সকল

আনন্দের নিকেতন, তবু তোমাকে স্বাদু বোধ করিতে পারিলাম না। এমনই আমার দুর্ভাগ্য প্রভু! জগতে কত শত রোগও যেমন, তার ঔষধও তো কত সৃষ্টি করিয়াছ। আর তোমাকে ভাল না লাগা এত বড় যে একটা কঠিন রোগ, তারই কোন ঔষধের ব্যবস্থা কর নাই? ইহাই কি সম্ভব? যাঁহার করুণা দৃষ্টিতে ভীষণ হিংস্র জন্তুর চিত্তও দয়ায় ভরিয়া উঠে, যাঁহার করুণা স্পর্শে মাতার শোণিত বিন্দু অমৃতধারায় পরিণত হয়, যাঁহার অপার করুণায় শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হইয়া উঠে, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের আবির্ভাব সম্ভব হয়, তাঁহার সে অসীম করুণার বিন্দু মাত্র লাভেও কি এই দীন শুধু বঞ্চিতই থাকিবে? আমার এ অরুচি কি কখনও সারিবে না? তুমিই বলিয়া দাও, তবে এ ভীষণ অরুচির পথ্য কি? এ ভব রোগের ঔষধ কি?

একটি শাস্ত্র বাক্য
(সমদর্শী কে?)

"পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন বুদ্ধিনা পশ্যন্তি পন্ডিতাঃ।
রাজা পশ্যতি কর্ণভ্যাং ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাং।।"

পন্ডিতেরা বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন, পশু গন্ধের দ্বারা দর্শন করে, রাজা কর্ণের দ্বারা দর্শন করেন, আর মূর্খ যাহারা তাহারা কর্ম্ম শেষ হইলে বুঝিতে পারে। সমদর্শী ব্যক্তি পন্ডিত, একথা বহুবার বলা হইয়াছে। তাঁহারা পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ মনে করেন এবং পরস্ত্রীকে তাঁহারা মায়ের মত মনে করেন আর সকল ভূতকে আপনার মত করিয়া দেখেন। কাহারও প্রতি তাঁহাদের রাগ বা হিংসা হয় না, কেউ তাঁহার কাছে শত্রুও নহে এবং মিত্রও নহেন, সবাই তাঁহার কাছে সমান। এইরূপ পন্ডিত, বেদ বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেহ হইতে পারে না। মনে কর, যদি কেউ আমাকে পন্ডিত মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করে তবে তাহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হই। কিন্তু হঠাৎ যদি কেউ আমাকে অর্বাচীন, গর্দ্ধভচন্ডী মূর্খ বলিয়া সম্বোধন করে

তাহা হইলে আমার চক্ষু আরক্তবর্ণ ক্রোধে অন্ধ হইয়া সামর্থ্য থাকিলে হাতাহাতি মারামারি করিতেও কুন্ঠিত হই না। ইহাকে অবশ্যই সমদর্শনের ফল বলা যায় না। ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণে চন্ডালে গাভীতে হস্তীতে কুকুরে জ্ঞানীগণে সমদর্শী (গীতা ৫ম অধ্যায় ১৮ শ্লোক)। ইহা দ্বারা আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, আমরা কত বড় পন্ডিত ও জ্ঞানী এবং সমদর্শী।

ব্রহ্ম বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা

পূর্ব্বেই বহুবার বলা হইয়াছে ব্রহ্মবিদ্যাই আসল বিদ্যা তারপর এইসব লৌকিক বিদ্যা। ইহাও বিদ্যা বটে, তবে এগুলি ব্রহ্মবিদ্যারূপ উপাদেয় ফলের গায়ের খোসা মাত্র। তাহাতে রসও নাই তাহা খাইতেও ভাল লাগে না। বেল পাকলে কাক তার ভিতরকার জিনিষের স্বাদ পায় না, মধ্যে মধ্যে কেবল ঠোকর মারে তাতে তার ঠোঁট দুখানি বেদনা ভারে পীড়িত হয়। সেইরূপ মানুষের মধ্যে যাহারা কাক জাতীয় তাহারা লোভে পড়ে ঠোকর মারে, কিন্তু সেটা খোসার উপর, আসল ভিতরকার শাঁসের কোন খবরই পায় না। ঠোকরাতে ঠোকরাতে শুধু তাহার প্রাণ তিক্ত হইয়া যায়, তাই মনে হয় যদি আসল ব্রহ্মবিদ পন্ডিত আমরা হতে চাই তবে উপর উপর ঠোকরালে চলবে না। খোলাটাকে ভেঙ্গে ফেলে তার ভিতরকার শাঁসটুকু আমাদের খেতে হবে। বেলের খোলাটা আমরা যদি দিনরাত চুষতে থাকি তাহা হইলে এক ফোঁটা রসও আমরা পাব না। কিন্তু ঐ খোলা সুদ্ধ বেল যদি কাহারও মাথায় আঘাত করি তবে সে ব্যক্তির মাথার অবস্থা সুস্থ থাকা কঠিন হবে।

আমাদের লৌকিক পান্ডিত্যের দশাও ঐরূপ। দিনরাত শাস্ত্র লইয়া যদি ঘাঁটা ঘাঁটি করি রস কিন্তু তাহাতে আমরা একবিন্দুও পাব না, কিন্তু কূট তর্কের খোলা ছুঁড়ে লোককে যথেষ্ট আঘাত করতে

পারি এর দৌড় এই পর্য্যন্ত।

ষোড়শ উপচারে পূজা

১। স্বাগত ২। আসন ৩। পাদ্য ৪। অর্ঘ্য ৫। আচমনীয় ৬। মধুপর্ক ৭। বসন ৮। আভরণ ৯। গন্ধ ১০। পুষ্প ১১। ধূপ ১২। দীপ ১৩। নৈবেদ্য ১৪। পুনরাচমনীয় ১৫। স্নান ১৬। চন্দন।

কালীপূজার ১৬ রকমের উপাচার

১। পাদ্য ২। অর্ঘ্য ৩। স্নান ৪। আচমনীয় ৫। বসন ৬। ভূষণ ৭। গন্ধ ৮। পুষ্প ৯। ধূপ ১০। দীপ ১১। নৈবেদ্য ১২। আচমন ১৩। মদ্য ১৪। তাম্বুল ১৫। তর্পণ ১৬। নতি।

জ্ঞানের কথা

(১)

"দেহাত্ম দৃষ্টয়ো মূঢ়াঃ নাস্তিকাঃ পশু বুদ্ধয়ঃ"
দেহাত্মদৃষ্টি করিতে করিতে জীব নাস্তিক হইয়া পশুবুদ্ধি হইয়া যায়।

(২)

"ধাতু প্রসাদাৎ" শরীরাদি ইন্দ্রিয় বর্গকে ধাতু বলে।

(৩)

মুখের জ্ঞান পুস্তক পড়িয়া হইতে পারে, কিন্তু তার মূল্য বড় বেশী নয়।

(৪)

"প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি"

প্রাপ্তি ইচ্ছা কা

(৫)

যাঁহারা আত্মমননশীল তাঁহারাই জ্ঞানী বা মনীষী।

(৬)

"জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মনঃ"

পাপ কর্ম্ম ক্ষয় পাইলেই মানুষের জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

(৭)

"ধর্ম্মেন পাপমপনোদন্তি"

ধর্ম্মের দ্বারা মনের পাপ দূর হয়।

(৮)

ঋষি শব্দটি ঋষ্ অথবা দৃশ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঋষ্ অর্থ গমন করা এবং দৃশ্ অর্থে দর্শন করা। তাই ঋষি শব্দেরও দুইটি অর্থ। ঋষি শব্দের যেমন দুইটি অর্থ, সেই রকম ঋষিগণ দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে

প্রথম ঃ- যাঁহারা ভোগ বাসনা উপেক্ষা করিয়া ভগবৎ প্রাপ্তির জ্ঞান পথে গমন করেন।

দ্বিতীয় ঃ- আর যাঁহারা ঐপথে গমন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

(৯)

শাস্ত্রে শরণাগতি ত্রিবিধ বলা হইয়াছে ঃ-

(১)তিনিই আমি; (২) তিনি আমার; (৩) তাঁহার আমি।

(১০)

"বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি প্রদা যা"
যাহা ব্রহ্মগতি প্রদান করে তাহাই আসল বিদ্যা।

(১১)

আমাদের এই অজ্ঞান নষ্ট হইতে পারিত না যদি আমাদের স্বরূপে অজ্ঞান থাকিত।

(১২)

বাসনারূপ ক্ষুধাই জীবের ভবরোগ, জ্ঞানই সেই ভবরোগের মহামহৌষধ।

(১৩)

"ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় কল্পতে"
ব্রাহ্মণের দেহ ক্লেশ ভোগের জন্য, কামোপভোগের জন্য নহে।

(১৪)

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"
ইন্দ্রিয় গণের বশে থাকায় দুঃখ, আত্মস্থ হইতে পারিলেই সুখ।

(১৫)

"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎতথা"-
যাহা আদিতে নাই, অন্তেও থাকে না, তাহার বর্ত্তমানে থাকা সিদ্ধ হয় না।

(১৬)

তিনি দৃশ্যের মধ্যে আসিলেও দৃশ্যমান রূপটি মাত্র তাঁহার স্বরূপ নহে। তাঁহার রূপ কোন আকৃতি নহে, কিন্তু সমস্ত আকৃতির মধ্যে যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভাসিত হয়. তাহাই তাঁহার রূপ।

(১৭)

(ক) "সংসার মূলং হি কিমস্তি চিন্তা"-
এই চিন্তাই মনকে সতত উৎক্ষিপ্ত করে।

(খ) "মনোহি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধাঞ্চাশুদ্ধমেবচ।
অশুদ্ধং কাম সঙ্কল্পং শুদ্ধং কাম বিবর্জিতং।।"

অর্থাৎ মন দুই প্রকার ঃ- শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। অশুদ্ধ মনে কাম সংকল্পের উদয় হয়, কিন্তু শুদ্ধ মনে কাম সংকল্প উদয় হয় না।

(১৮)

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদামিতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমিতি বৃথাভিমানঃ
স্বকর্ম্ম সূত্র গ্রথিতো হি লোকঃ।।"

নিজ কর্ম্মসূত্রে সকলেই বাঁধা পড়িয়াছে। সুখ দুঃখ যাহা পাই তাহা আপন আপন কর্ম্মফল, অন্যের তিলমাত্র দোষ নাই। এরূপ দৃষ্টি যাহার তিনি ভক্ত, তিনিই জ্ঞানী।

(১৯)

"হরিভজৈঃ আপাঁ মিটে তব পাওয়ে করতার।"
হরি ভজন করিতে করিতে "আমি" মিটিয়া গেলে তখন কর্ত্তাকে পাওয়া যায়। (কূটস্থ চৈতন্য)

(২০)

"যস্মিন্ সর্ব্বমিদং প্রোক্তং ব্রহ্ম স্থাবর জঙ্গমং।
তস্মিন্নেব লয়ং যান্তি বুদবুদাঃ সাগরে যথা।।"
ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মতেই এই স্থাবর জঙ্গম যেন সাগরের তরঙ্গের মত উত্থিত হইয়াছে এবং তাহাতেই আবার লয় হইয়া যাইতেছে।

(২১)

"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মনা ভবতি পাপঃ পাপেন"
পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্য দ্বারা পুণ্যময়ী বাসনাহেতু জীব উত্তরোত্তর পুণ্যবান ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে।

(২২)

"একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ"

যেহেতু পরমাত্মা একই সেইজন্য পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদগণ অপর কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না। মূলে তিনিই একমাত্র সত্তারূপে বিদ্যমান আর এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়া কল্পিত।

(২৩)

"যা শক্তি সর্ব্বভূতানাং দ্বিধাভবতি সা পুনঃ"

একমাত্র শক্তি তিনিই আবার সর্ব্বভূতে দ্বিধা হইলেন।

(২৪)

প্রহ্লাদও বলিয়াছেন, "দুর্লভং মনুষং জন্ম, তদপ্য ধ্রুব মদর্থং।" মানুষ হওয়াতো দুর্লভই যাহাতে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় সেইরূপ জন্মলাভ তদপেক্ষা দুর্লভ। এই মনুষ্য দেহরূপ নৌকার সাহায্যেই জীব ভব-সিন্ধু উত্তীর্ণ হয়। এই দেহতরীর কর্ণধার শ্রীগুরুদেব।

ক্রিয়ার নববিধ অন্তরায়

শাস্ত্র বলিয়াছেন প্রাণায়ামের তুল্য শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নাই। কিন্তু এই প্রাণায়ামাদি যোগ অভ্যাস করিতে গেলে আমরা নয়টী অন্তরায় দেখিতে পাই। সেই অন্তরায় নয়টি যোগ বিঘ্নকর। এই সকল অন্তরায় গুলি দূর করিবার জন্য আমাদের যথা সাধ্য চেষ্টিত হওয়া উচিত। সম্যক প্রকার চেষ্টা যত্ন থাকিলে আমরা গুরু কৃপায় কতকটা সফল কামও হইতে পারি। অন্তরায় কয়টী কি কি তাহা নিম্নে বলিতেছি।

১। ব্যাধি ঃ- শরীরগত ধাতুর বৈষম্য হেতু ইন্দ্রিয়াদির যে বিফলতা ও তৎসহ শারীরিক অস্বাস্থ্য। শরীরে পীড়া থাকিলে যোগলাভ সম্যক প্রযত্নে হইতে পারে না, আহারের সংযমও আমাদের নেই। ইন্দ্রিয়ের সংযম নেই, এই অসংযমের কারণই পীড়া উৎপন্ন করে। যিনি এ

বিষয়ে যত অবহিত তাঁহাকে অস্বাস্থ্যের কষ্ট তত কম ভোগ করিতে হয়।

২। স্ত্যান ঃ- চিত্তের অবসাদ্। মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি আছে কিন্তু তথাপি সাধনে চিত্ত বসিতে চায় না, এই রাক্ষসীই বহু সাধককে খাইয়া ফেলে। সাধন অপ্রীতিকর বোধ হইলেও চেষ্টা যাহার আছে সে একদিন না একদিন ইহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবেই।

৩। সংশয় ঃ- সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইবে কি না সন্দেহ, নিজের সামর্থ্যের প্রতি সন্দেহ, আমার দ্বারা ইহা শেষ পর্য্যন্ত হইবে কি না? ভগবানের করুণার প্রতি সন্দেহ। তিনি চেষ্টাশীলকে দয়া করেন কিনা। গুরুর প্রতি ও শাস্ত্রের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা থাকে তাঁহার মনে এই প্রকার সংশয় উপস্থিত হয় না।

৪। প্রমাদ ঃ- যিনি আত্ম বিস্মৃত, যিনি সাধন করিতে গিয়া কোনো একটী বিষয়ে আসক্তি বশতঃ সাধনায় শিথিল প্রযত্ন হন, আর তেমন উদ্যম থাকে না, বাহ্য বিষয় লইয়া তখন মগ্ন, ইহাই প্রমাদ। ভরত রাজা যেমন হরিণের প্রতি আসক্ত হইয়া তপস্যার শৈথিল্য দেখাইয়া ছিলেন, এই জন্য যাহাতে আত্মস্মৃতি জাগরুক হয় তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

৫। আলস্য ঃ- আহারাদির অনিয়ম বশতঃ শরীর ও মনের যে জাড্য, পরিশ্রম করিতে শরীরও চায় না, মনও চায় না, গুরু আহার ও নিদ্রাধিক্য আলস্যের জনক। অনেক বুদ্ধিমান ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তিও এই আলস্যের কবলে পড়িয়া আপনার জীবনে উন্নতি লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন।

৬। অবিরতি ঃ- বিষয় ভোগের আসক্তি দূর না হওয়া। মনকে সর্ব্বদা অনাবশ্যক চিন্তা করিতে না দিলে, বিষয়ের হেয়ত্ব বিচার করিলে এবং মনকে অন্ততঃ শ্বাসে শ্বাসে জপে অভ্যস্ত করাইতে পারিলে এই

ভাবটী কমিয়া যাইতে পারে।

৭। ভ্রান্তিদর্শন ঃ- যাহা সত্য বস্তু নহে তাহাকে সত্য মনে করা, সামান্যকে অসামান্য ভাবা, অথবা অবিবেক বশতঃ সাম্প্রদায়িক সংস্কার দ্বারা বুদ্ধিকে সংস্কারাবদ্ধ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা। চিত্তকে উদার করিলে এবং শাস্ত্রোজ্জ্বলা বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া সব বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিলে ভ্রান্তি দর্শন মিটিয়া যায়।

৮। অলব্ধভূমিকত্ব ঃ- ঠিকস্থানে পৌঁছিতে না পারা। যথেষ্ট সাধন করিয়া কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করিতে না পারা। ইহা পূর্ব্ব কর্ম্মজনিত অন্তরায়, ইহার জন্য ধৈর্য্য সহকারে সাধনায় স্থির- থাকিয়া চলিতে হইবে।

৯। অনবস্থিতত্ব ঃ- সাধনার দ্বারা কোনো ভূমি লাভ করিয়াও তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে না পারা। উপরোক্ত বিষয়গুলি যোগবিঘ্ন। এই সকল অন্তরায় দূর করিবার জন্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক পালনে বিঘ্নগুলি দূর হইয়া যাইতে পারে। যাঁহারা সম্যক চেষ্টাশীল ও উদ্যমযুক্ত পুরুষ তাঁহারা একদিন না একদিন কৃতকার্য্য হইবেনই, আর যাঁহারা চেষ্টা করিবেন না, তাঁহাদের এ সব পথে আসাই বিড়ম্বনা মাত্র।

এইস্থানে মহাত্মা কবীর সাহেব যে মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন তাহা আমাদের সর্বতোভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। কবীর বলিয়াছেন, ভগবানকে পাইবার জন্য এই শরীরকে জ্বালাইয়া কালি কর, অর্থাৎ খুব পরিশ্রম কর, আর কালির কলম দিয়া সেই কালিতে রামের নাম লিখিয়া পাঠাও। এইরূপ অষ্টপ্রহর যে লাগিয়া থাকে, সেই ভগবানের প্রেমাস্বাদের নেশায় বিভোর হইয়া যায়। কবীর আরও উৎসাহের সহিত বলিয়াছেন

"কবীর প্রেম পিয়ালা ভরি পিয়া রটী রহা গুরুজ্ঞান
দিয়া নাগারা শব্দকা লাল সাড়ে ময়দান।"

কবীর ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পরাবস্থারূপ প্রেম বাটী ভরিয়া পান কর; অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় মন প্রাণ সব প্রেমে ভরপুর হইয়া উঠুক, এইভাবে গুরুদত্ত সাধনা দিনরাত রটিতে থাক, তখন কত অপূর্ব্ব সুন্দর দৃশ্য, কত অদ্ভুত কান্ড সকল দেখিতে পাইবে। রাজা আসিলে যেমন আগমনের চিহ্ন স্বরূপ নানাবিধ সুস্বর সংযুক্ত বাজনা বাদিত হইতে থাকে, তদ্রূপ এই দেহের মধ্যেও ওঁকারের বিবিধ নাদ ঝঙ্কৃত হইতে থাকিবে এবং তখন দেখিবে তোমার যিনি সর্ব্বস্ব লালমণি, তিনি ময়দানে চিদাকাশের প্রান্তরে অপরূপ দিব্য সাজে সাজিয়া সাধকের চিরদিনের আশা সফল করিতেছেন।

তিন প্রকারের তপস্যা

সাত্ত্বিক তপস্যা ঃ- যখন চিত্ত ফলাকাঙ্খারহিত হয়, তখনই তাহা একাগ্র হইয়া নিরোধ মুখী হয়, তাই শিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা বলিয়া থাকেন! প্রাণায়ামই পরম তপস্যা। এই প্রাণায়াম করিতে করিতে সাধকের প্রাণধারা যখন সুষুম্নায় চালিত হয় তখনই চিত্ত একাগ্র হয় এবং বহিঃশ্বাস ক্ষীণ হইতে হইতে সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়; ইহাই ফলাকাঙ্খাশূন্য সাত্ত্বিক তপস্যার লক্ষণ।

রাজসিক তপস্যা ঃ- লোকে আমাকে তপস্বী বলিবে, নিরাহারী বলিবে, আমাকে দেখিলে সকলে অভিবাদন করিবে, কাহারো গৃহে যাইলে সম্মান করিবে, উত্তম ভোজন দিবে, বস্ত্রদান করিবে - এইসব আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া দম্ভের সহিত যে তপস্যার অনুষ্ঠান তাহা রাজস তপস্যা। এইসব তপস্যার ফল অনিয়ত অর্থাৎ চঞ্চল, কোন স্থায়ী ফললাভ হয় না এবং সেই অল্প ফল লাভও যে ধ্রুব তাহাও নহে, বিনা সাধনায় ফাঁকি দিয়া যে নাম কেনা হয়, তাহা আর কতকাল থাকে? অথচ এইরূপ লোক দেখানো তপস্যাতে লৌকিক

ও পরমার্থিক উভয় প্রকার ফল হইতেই শেষ পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইতে হয়।

তামসিক তপস্যা ঃ- যেমন পরজন্মে রাজা হইবার আশায় পঞ্চতপাদি ক্লেশ সাধ্য তপস্যার অনুষ্ঠান, অথবা কোন ব্যক্তির সর্বনাশ সাধন বা তাহার বিনাশের জন্য মারণ, উচাটন প্রভৃতি যে অনুষ্ঠান, তাহাই তামসিক তপস্যা। আমরা একজন তপস্বীর কথা শুনিয়াছিলাম যিনি কোন লোককে নির্ব্বংশ করিবার অভিপ্রায়ে শীতকালে সারা দিনরাত জলে পড়িয়া থাকিতেন, এবং গ্রীষ্মের সময় সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এরূপ মনোবৃত্তিই দূষণীয়। আমার কথা শুনিল না বা আমার মনের মত হইল না বলিয়া যে, একজনের সর্বনাশ করিতে হইবে তাহার মানে কি? আমি অন্যের নিকট হইতে কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি সেই কথা মনে রাখিয়া আমাকেও লোকের সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে। তবে কখনও কখনও লোককে দন্ড দেওয়া আবশ্যক হয়। কখনো কখনো ঋষিরা ক্রোধ করিয়া দুষ্ট লোককে সেইভাবে অভিশাপ দিতেন। তাহাতে কিন্তু দুষ্কর্ম্মকারীর পাপের দন্ড হইত এবং ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে এবং অন্যকে সচেতন করিয়া রাখিত। দক্ষের প্রতি, ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার অভিশাপ। ইহা তামসিকতা নহে। এরূপ ক্রোধ লোকস্থিতির জন্য প্রয়োজন।

তিনপ্রকারের কর্ত্তা

সাত্ত্বিক কর্ত্তা ঃ- কোন বিষয়েতেই আসক্ত রূপ যুক্ত নহেন। আমি করিতেছি এইরূপ অহং অভিমান নাই। সর্ব্বদাই স্থিরতারূপ ধৈর্যতা যুক্ত ও সকল কর্ম্মেতেই উদ্যমশীলরূপ উৎসাহযুক্ত, কোন বিষয় সফলই হউক আর নিষ্ফলই হউক তাহাতে মনের কোন বিকার নাই, অর্থাৎ মনের অবস্থা সর্ব্বদা একই প্রকার (ব্রহ্মেতেই সদা অবস্থিত) মনের কোন বিরূদ্ধভাব নাই। এইরূপ কর্ত্তার নাম সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

যোগীবর শ্রীশ্রী শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যোগীরাজ শ্রী শ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী
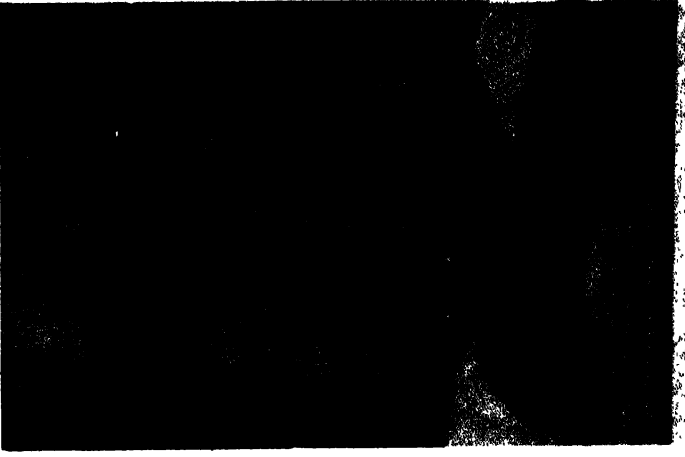
যোগীশ্বর শ্রী শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

রাজসিক ঃ- যাহাদের অত্যধিক বিষয়াদিতে প্রীতি, তাহারা সর্ব্বদাই পুত্র কন্যাদির লালন পালনে ব্যতিব্যস্ত এবং বিষয়লাভে সতৃষ্ণ থাকে, সুতরাং তাহারা নিয়মিত ভাবে ক্রিয়াদি সাধনে তৎপর নহে। যেটুকু ক্রিয়া করে, তাহাতে ফললাভের আকাঙ্খাই থাকে, একাজ করিলে শরীর ভাল থাকিবে, কিংবা সিদ্ধ গুরু, হয়তো তাঁহার আশীর্ব্বাদে অনেক বিপত্তির হাত হইতে ত্রাণ পাওয়া যাইবে, তাঁহার সুপারিশে বহু অর্থাগমও হইবে এইভাব লইয়া যাঁহারা সাধনা করিতে আসে, সেই সকল লোভী ফলাকাঙ্খীরা রাজস কর্ত্তা। এই সকল ব্যক্তিদের পরধন হরণে প্রবৃত্তি খুব প্রবল, নিজের সামান্য লাভের জন্য পরের অনিষ্ট করিতেও প্রস্তুত, ধন যথেষ্ট থাকিলেও ত্যাগ করিতে পারে না এজন্য কর্ত্তব্য পালনেও পরাঙ্মুখ, ইহাদের অন্তরে শৌচ অর্থাৎ মনের স্থিরতা নাই, এবং বাহিরেও ভোজনাদিতে অসংযম হেতু অনাচারী ও অত্যাচারী। ইহারা স্বকার্য্য সিদ্ধিতে হর্ষান্বিত এবং অসিদ্ধিতে শোকগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া ইহাদিগকে রাজস কর্ত্তা বলা হয়।

তামসিক কর্ত্তা ঃ- স্থিরেতে আটকিয়া না থাকিয়া অযুক্তরূপ ইন্দ্রিয়াসক্ত, আত্মভাবে না থাকিয়া যাহাতে তাহাতে রতরূপ প্রাকৃত (সাধারণ) ভাবযুক্ত; যাহাতে তাহাতে রত থাকিয়া জ্ঞানহারা হতভম্ববৎ, সকলের সঙ্গেই ঠকামিরূপে শঠ, কোন একটা কর্ম্ম করিতে পারগ নহে, আলস্যেই সর্ব্বদা থাকে, সর্ব্বদাই মন ভার, আজ থাকুক কাল করিব এইরূপ দীর্ঘসূত্রী; এমন যে কর্ত্তা সে তামস কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হয়।

তিন প্রকারের ধৃতি

সাত্ত্বিকী ধৃতি ঃ- সদ্‌গুরুর উপদেশে বিষয়ান্তরের ধারণাকে অতিক্রম করতঃ ১৪৪ উত্তম প্রাণায়ামে যে প্রকৃত ধারণা হয়, ঐ ধারণারূপ ধৃতি কর্ত্তৃকই মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া নিয়মিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐ ধৃতি দ্বারা বিনা অবলম্বনে মনের স্থিরাবস্থা,

বিনাবলোকনে দৃষ্টির স্থিরাবস্থা ও বিনা অবরোধে বায়ুর স্থিরাবস্থারূপ ভাব হইয়া ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সকল নিয়মিত হয়। সদগুরুর উপদেশে প্রকৃত ধারণা কর্ত্তৃক সাধকের যখন ঐরূপ ভাব হয়, ঐ ধারণাকেই সাত্ত্বিকী ধৃতি বলে।

রাজসিক ধৃতি ঃ- ফলাকাঙ্খাযুক্ত কর্ম্মরূপ ধর্ম্ম এবং সকল কর্ম্মেই ফল প্রত্যাশারূপ অর্থ ও কর্ম্মফলের কামনা রূপ কাম, এইগুলিকে যে ধৃতি দ্বারা প্রধান বলিয়া ধারণা হয় এবং ধারণার প্রসঙ্গে লোকে ফলাকাঙ্খী হয়, সেই ধারণাকে রাজসিক ধৃতি বলে।

তামসিক ধৃতি ঃ- তামসিক বুদ্ধিরূপ দুর্ম্মেধা বিশিষ্ট ব্যক্তি যে ধারণার বশীভূত হইয়া (অর্থাৎ সকল অর্থ বিপরীত বোধরূপ উল্টা ধারণাতেই রত হইয়া) নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও অহংকার ত্যাগ করে না, সেই ধারণাকে তামসিক ধৃতি বলে। অর্থাৎ নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ ও অহংকার এই সকলকে যে জয় করা উচিৎ; সে ধারণা একেবারেই নাই, বরং উল্টা ধারণার বশীভূত হইয়া ঐ সকলকে বৃদ্ধি করিতেই রত, এরকম ধারণাকে তামসিক ধৃতি বলে।

তিন প্রকারের সুখ

সাত্ত্বিক সুখ ঃ- অভ্যাস যোগের দ্বারা যে সুখে পরমানন্দ লাভ হয় ও দুঃখের অন্ত পাওয়া যায় তাহাই অনির্ব্বচনীয় সুখ। ঐ অনির্ব্বচনীয় সুখের অভ্যাস যোগে প্রথমে মন কিছুতেই প্রবৃত্ত হইতে চাহে না। প্রথমে যেন বিষের মতই বোধ হয়; কিন্তু গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক একবার উহাতে মনোনিবেশ করিয়া লাগিতে পারিলে উহার পরিণাম মোক্ষযোগরূপ অমৃত তুল্য অবস্থা (পরমানন্দময় সুখের অবস্থা) প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ প্রথমে বিষাদ যোগের ন্যায় বিষবৎ বোধ হইলেও পরিণামে ''নষ্ট মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত'' রূপ অবস্থা লাভে অমৃততুল্য মোক্ষযোগের অবস্থা লাভ হয়। অমৃত

বলিয়া কোন বস্তু আছে, ইহা কেবল কথায় মাত্র সকলে শুনিয়াছেন কিন্তু কেহ কখনও দেখেনও নাই এবং অনুভবও করেন নাই, উহা আত্মকর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ পরিণামে অনুভব হইয়া যথার্থ অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, ঐ অমৃততুল্য অবস্থা লাভ হইলেই অমর পদ পায় উহাই আত্মপ্রসাদ স্বরূপ বস্তু। ঐ অবস্থা সত্ত্বগুণরূপ সুষুম্নাতে স্থিতি দ্বারা (ইড়া, পিঙ্গলার গতি সুষুম্নাতে স্থির হইয়া) লাভ হইয়া থাকে, অতএব উহা সাত্ত্বিক সুখ বলিয়া কথিত হয়।

রাজসিক সুখ ঃ- বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে প্রথমে যেটা অমৃততুল্য মনে হয়, যেমন কাঁচালঙ্কা ভক্ষণ করা প্রথমে রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে ভোজন করিয়া পরিণামে উহা বিষতুল্য হইয়া শেষে তাহার জ্বালায় অস্থির ও রক্তদাস্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এইরকম যে সুখ তাহা রাজস সুখ নামে অভিহিত হয়।

তামসিক সুখ ঃ- নিদ্রা হইতে, আলস্য হইতে এবং নেশাভাং ইত্যাদিতে প্রমত্ততা হইতে যে সুখের উদয় হয়, এমন সুখ আগাগোড়াই চিত্তের মোহকর অর্থাৎ ইহার আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত মোহিত করিয়া রাখে, এই প্রকারের যে সুখ তাহা তামসিক সুখ নামে উক্ত হয়।

সমস্ত গীতা শাস্ত্র (ইহার সারমর্ম্ম)

গীতার ১৮টি অধ্যায়। তারমধ্যে ১৫শ অধ্যায় অত্যন্ত রহস্যময়, সমগ্র গীতা শাস্ত্রের যাহা অর্থ, তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

সমগ্র বেদের অর্থ, তাহাও এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে - "যস্তং বেদ স বেদবিৎ" "বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ।" সকলের মধ্যেই এই ভগবান আত্মনারায়ণ কূটস্থ চৈতন্য (পুরুষোত্তম) রহিয়াছেন; ইহাকে জানিলেই যে কোন বর্ণের লোকই হউন না কেন, তিনিই

কৃতকৃত্য হইতে পারেন। সেজন্য মন, প্রাণ ঐক্য করিয়া ভক্তি সহকারে সাধনা করিয়া যাইতে হইবে।

কেন করিতেছি? করিয়া আমার কি লাভ হইবে? এই তো এতদিন ক্রিয়া করিলাম, কিছুই তো বুঝিতে পারিলাম না, শরীরটাও তো বেশ মাঝে মাঝে খারাপ বোধ হয়, কাম ক্রোধের বেগ তো বিশেষ দমন হইয়াছে ইহা মনে হয় না; এই তো প্রায় দুবছর আগে আমার স্ত্রী বিয়োগ হইল - ইত্যাদি কোনরূপ চিন্তা, কোনরূপ ভাবনা মনের কোণে স্থান দিবে না।

গুরুদেব বলিয়াছেন - তুমি কেবল ক্রিয়া করিয়া যাও, কোন দিকে তাকাইও না প্রারব্ধবশে যাহা হইবার তাহা হউক। কেবল ক্রিয়া করিয়া চল। ইহাই তাঁহার শ্রীমুখের আদেশ। আমি তাঁহার আজ্ঞাবাহী দাস, তাঁহার আদেশ পালন করিয়া যাইতেছি, ইহাতে কি হইবে না হইবে তাহা তিনিই দেখিবেন, সে ভার তাঁহার, আমি কেন বৃথা কর্ত্তা সাজিয়া মরি, আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিয়া যাই। হে গুরুদেব! সব সময় তোমার আদেশ পালন করিয়া যাইতে পারি, তোমার শ্রীচরণে এ অধীনের একমাত্র প্রার্থনা।

হে শরণাগত বৎসল! আশাকরি আমার এ আবেদন তুমি কখনও উপেক্ষা করিতে পারিবে না, ইহাই আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস। কারণ, তুমিই আমার ভবপারের কান্ডারী, তুমিই আমার ইহকাল, তুমিই আমার পরকাল।

দেবতার পূজা, ব্রাহ্মণের পূজা ইত্যাদির রহস্য

দেবতার পূজা, ব্রাহ্মণের পূজা, গুরুর পূজা, তত্ত্বজ্ঞানীর পূজা -

দেবতা ঃ- অর্থাৎ দিব্ শব্দে আকাশ - শূন্যতত্ত্ব, "শূন্যধাতু র্ভবেৎপ্রাণঃ"- স্থান আজ্ঞাচক্র তথায় যাঁহার অবস্থিতি সেই প্রাণই দেবতা এবং প্রাণাদি বায়ু সকলই দেবগণ; বহির্লক্ষ্যে দেবতা অর্থে প্রতিমাদি অর্থাৎ

আজ্ঞাচক্রে যে সকল জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন হইয়া থাকে তাহার প্রতিমূর্ত্তির নাম প্রতিমা।

দ্বিজ ঃ- বহির্লক্ষ্যে উপবীতধারী, অন্তর্লক্ষ্যে যাঁহার কূটস্থ জ্ঞান হইয়াছে।

গুরু ঃ- বহির্লক্ষ্যে যিনি কানে মন্ত্র দেন, অন্তর্লক্ষ্যে যাহার বাহির ভিতর শুদ্ধি হইয়াছে এবং যিনি অখন্ড মন্ডলাকার রূপ দর্শন করাইয়া দিয়া থাকেন অর্থাৎ সবিতৃ মন্ডলের মধ্যবর্ত্তী যে নারায়ণের রূপ, ঐরূপ যিনি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন তিনিই গুরু।

তত্ত্বজ্ঞানী ঃ- অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া রূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে (আত্মাকে প্রকৃষ্টরূপে জানিয়া যিনি প্রাজ্ঞ পদবাচ্য) তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী।

এই সকলের পূজা এবং শৌচ ও সরলতা।

শৌচ ঃ- বাহির অর্থে বাহ্যিক শুদ্ধতা, অন্তর্লক্ষ্যে মনের শুদ্ধতা। অর্থাৎ শুচি অশুচি কেবল মনে, আমি যদি ব্রহ্মই হই (ব্রহ্ম ব্যতীত অপর পদার্থ যখন নাই) তবে আবার আমার শুচিতা অশুচিতা কি? অজ্ঞানতা বশতঃই আমি শুচি অশুচি বোধ করি মাত্র (বস্তুত আমি শুচিও নহি অশুচিও নহি) আমি যে ব্রহ্ম সে তত্ত্বের তত্ত্ব বিদিত হওয়া রূপ জ্ঞান লাভে মনের যখন শুদ্ধতা হয়, তখন আর শুচি অশুচি বোধ থাকে না, এ কারণ মনের শুদ্ধতাই প্রকৃত শুচি।

সরলতা ঃ- বহির্লক্ষ্যে অকপটতা, অন্তর্লক্ষ্যে যখন বাহিরে এক ভিতরে আর এক থাকে না, বার ভিতর এক হইয়া গিয়া যখন মন ও প্রাণ এক হয়।

এইরূপ সরলতা ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা।

ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ঃ- বহির্লক্ষ্যে নিষিদ্ধ মৈথুন নিবৃত্ত্যাদি, অন্তর্লক্ষ্যে যে অবস্থায় মন সর্ব্বদা ব্রহ্মে বিচরণ করে, সেই অবস্থার নাম ব্রহ্মচর্য্য। **অহিংসা** ঃ- অর্থাৎ অন্যের মঙ্গলে কাতর না হওয়া, এই সকল ব্রহ্মচর্য্যাদিকে শারীরিক তপস্যা বলে। অর্থাৎ কেবল শরীর শুষ্ক করতঃ উপবাসাদির দ্বারা ব্রতানুষ্ঠান করা ইত্যাদিকেই শারীরিক তপস্যা বলে না, উপরোক্ত রূপ শৌচ সরলতাদি কার্য্যকেই যথার্থ শারীরিক তপস্যা বলে।

ভগবানে আত্মসমর্পণ

ভক্ত সাধক এইবার ভগবৎ পূজার আয়োজন করিতেছেন। এই পূজার প্রধান অঙ্গ হইল আত্মসমর্পণ, আপনাকে ভগবৎ চরণে নমিত করা। কিন্তু আপনাকে বড় দীন বড় অসমর্থ মনে হইতেছে। নিরুপায় সখা যেমন সখাকে, পত্নী যেমন পতিকে, পুত্র যেমন পিতাকে আত্ম সমর্পণ করিতে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করে না, সেইরূপ নিঃসঙ্কোচে সাধক ভক্ত আপনাকে উৎসর্গ করিতেছেন, ভগবানকে প্রসন্ন করিতেছেন। ভগবানকে প্রসন্ন করা এবং আত্মাকে প্রসন্ন করা একই কথা। ভগবান প্রসন্ন হন কখন? যখন শ্রীগুরু প্রসন্ন হন। এই গুরুই আত্মা। গুরুর প্রসন্নতা যখন মানস পটে তরঙ্গায়িত হয়, তখন অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয়। অন্তকরণ প্রসন্ন হইলেই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। মনের এই স্থির ভাব বা প্রসন্নতাই শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ। এই পরমপদ কাহারা সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করেন? যাঁহারা সুর ও বীর সাধক। এই বীর সাধকেরা কিভাবে প্রণাম করেন দেখুন ঃ- "প্রণিধায় কায়ং।" কায় = ক + অয়। 'ই' ধাতু হইতে 'অয়' গমনার্থক। 'ক' = ব্রহ্ম। যাহা ব্রহ্ম হইতে গমন করে - অর্থাৎ শ্বাস মস্তকে স্থির করিয়া সমগ্র মেরুদন্ডটি ও তৎসংলগ্ন অবয়বটি নিম্নাভিমুখ করিয়া যোগীরা যে সাধনটি করিয়া থাকেন - এখানে তাহার ইঙ্গিত করিলেন এই সাধনটির দ্বারা মূলাধারস্থ কুন্ডলিনী চৈতন্যযুক্ত হন। কুন্ডলিনী চৈতন্যযুক্ত হইলেই উহা তদবিষ্ণুর পরমপদ আজ্ঞাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারস্থিত শিবের সহিত যুক্ত হয়। তখন

দেহ হইতে চিৎ পৃথক হইয়া পরমশান্তি লাভ করেন। ইহাকেই মুক্তাবস্থা বলে। ইহাকেই ওঁকার ক্রিয়া বা কূটস্থের মধ্যে শ্বাস বন্ধ করিয়া যোগীরা যে ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাহারও ইঙ্গিত করা হইল। ইহাতেই কূটস্থের পূর্ণ প্রকাশ হয়। ইহাই গুরুর প্রসন্নতা বা গুরুকে প্রসন্ন করা। গুরুও যা আত্মাও তাই। তখন সাধক আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া মায়া, মোহ, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হাত হইতে চিরশান্তি লাভ করেন। ইহারই অপর নাম 'তুর্য্যাবস্থা।'

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপায়

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে সাধককে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হইবে। যথা ঃ-

১। বিশুদ্ধবুদ্ধি ঃ- যাহার বুদ্ধি বিশুদ্ধ হয়, তাঁহার বুদ্ধিতে আত্মাতিরিক্ত কোন বস্তু ভাসে না এবং আত্মসম্বন্ধে কোন সংশয়ও থাকে না।

২। ধৃতি ঃ- প্রাণায়ামাদি দ্বারা যে স্থির অবস্থা আসে, তাহাতেই বৃত্তি রুদ্ধ হয়। প্রাণকে নিয়মিত না করিতে পারিলে শরীর ও ইন্দ্রিয় চঞ্চল থাকিবে, নিশ্চল হইবে না। প্রাণ স্থির হইলেই বুদ্ধি আত্মাতে আপনা আপনি স্থির হইয়া যাইবে, সেই অবস্থায় থাকার নামই ধৃতি।

৩। শব্দাদি বিষয় ত্যাগ ঃ- যোগাভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্মুখ হয়। সুতরাং তখন বাহ্য বিষয় আর গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না।

৪। রাগ দ্বেষ ত্যাগ ঃ- যাহার কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগও নাই বিরাগও নাই। মন থাকিতে এইভাব আসা কঠিন। ক্রিয়ার পর অবস্থায় মন নিশ্চল হয়, কোন সংকল্প বা বাসনাই থাকে না। তিনিই তখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন।

৫। বিবিক্ত সেবী হইতে হইবে। নির্জ্জন দেশে বসিয়া সাধনাভ্যাস না করিলে ধ্যান জমে না। এজন্য সাধকের অপেক্ষাকৃত কোলাহল শূন্য স্থানে থাকা আবশ্যক, কিন্তু বাহিরের গোলমাল হইতেও বেশী গোলমাল করে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়গুলি। তাহাদিগকে বশে রাখিতে হইলে প্রাণকে স্থির করিতে হইবে। প্রাণ স্থির হইয়া এমন স্থানে অবস্থান করেন যদ্দ্বারা "আমি আমার" সব মিটিয়া যায় - ইহার নামই আপনাতে আপনি থাকা। এইরূপ নিঃসঙ্গাবস্থা না হইলে কেবল জনশূন্য স্থানে থাকিলেও কাম, ক্রোধাদি দস্যুগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব।

৬। লঘু আহার সাধকের পক্ষে উপকারী। অতি ভোজনে আলস্য ও নিদ্রায় সাধককে ঘেরিয়া ফেলে। মন তমের দ্বারা অভিভূত হয়, এজন্য আহার ও নিদ্রায় সংযম রক্ষা করিতে হয়। সাধক প্রবর কবীর বলিয়াছেন ঃ- "নীদ নিশানী নীচ কি উঠো কবীরা জাগি ঔর রসায়ন ছোড় কি রাম রসায়ন লাগি।।" নিদ্রা নীচ লোকের চিহ্ন কারণ তমোগুণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট গুণ, যাঁহারা প্রাণকে উপরে উঠাইয়া রাখিতে পারেন তাঁহাদের আর নিদ্রা হয় না; হে কবীর তুমি জাগিয়া উঠ, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় উপরে উঠিয়া থাকিতে পারাই বাহাদুরী। তুমি সামান্য ধাতুর রসায়ন ছাড়িয়া দিয়া আত্মারামের রসায়ন কর। দুই বা বহু পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলে এক বস্তুতে পরিণত হয় বা গুণান্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা দ্বারা, তাহাই রসায়ন। আমরা সংসার বাসনা চেষ্টা দ্বারা অবিরত আমাদের অবস্থাকে পরিবর্ত্তন করাইতেছি। দরিদ্র ব্যক্তি বহু পরিশ্রম, চেষ্টা, ব্যবসা, বাণিজ্য দ্বারা খুব ধনী হইয়া নিজের অবস্থান্তর সম্পূর্ণ সাধন করিতে পারে, কিন্তু কবীর বলিতেছেন, এই সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তুমি রাম রসায়ন কর। যে রসায়ন দ্বারা এই মোহবদ্ধ জীব, জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়া যায়। ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেই, সেই রাম রসায়ন হইয়া থাকে। অতএব সেই রসায়ন ক্রিয়ায় তুমি লাগিয়া থাক।

৭। কায়মন ও বাক্যের সংযম ঃ- সুরূপ, বলবান ও ধনীরা নিজ

শরীরটাকেই খুব বড় করিয়া দেখে। নিজের মনে খুব দেমাক থাকে যে সে বড়লোক অথবা দেখিতে সুন্দর কিম্বা সে খুব বলিষ্ঠ, কিন্তু বাস্তবিক এই দেহটার মত ঘৃণিত ন্যাক্কারময় জিনিষ আর কিছুই নাই, জ্ঞানহীন পশুতুল্য ব্যক্তিরাই ইহার গর্ব্ব করে। এক দন্ডের মধ্যে ইহার কি পরিণাম হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আর ইহার জন্যে গর্ব্ব করিতে ইচ্ছা করে না। মনেতে এইরূপ বিচার রাখিয়া আসনাদি সাধনে চেষ্টা করিলে শরীরকে সংযত করা যাইতে পারে, মন সংযম হয়, মনকে অন্যদিকে যাইতে না দিয়া আপনাতে আপনি থাকিতে পারিলেই প্রকৃত মনের সংযম হয়।

বাক্য সংযম ঃ- বাক্য সংযমের জন্য জিহ্বাকে তালুমূলে রাখিয়া চক্রে চক্রে স্মরণ করিতে থাকিবে ও অনাবশ্যক কথা বলিবে না। এইরূপে বাক্য সংযম হয়। বাক্য সংযমে ইচ্ছার নাশ হয়। শক্তিক্ষয় না হওয়ায় কোন এক বিষয়ে মনকে অধিকক্ষণ সংযম করা যায় ও কার্য্যসিদ্ধি করা যায়।

৮। অভ্যাস ঃ- প্রত্যহ ধ্যানাভ্যাস ও যোগাভ্যাস করিবে। আমাদের মনে সর্ব্বদা বহু প্রত্যয়ের উদয় হইতেছে, সেই প্রত্যয়ের রোধ দ্বারায় যোগযুক্ত হওয়া যায়, প্রত্যয় রোধ হইতে পারে একাগ্রতার দ্বারা, একাগ্রতা আসিবে প্রাণ সংযম হইতে, সুতরাং প্রত্যহ বেশী করিয়া মন দিয়া প্রাণায়াম করিবে। যে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ১৭২৮টি করিয়া প্রাণায়াম করে এবং মধ্যে মধ্যে অবিরাম কয়েকদিন ধরিয়া ১৭২৮ বার করিয়া ২০৭৩৬ বার পূর্ত্তি করে সে ক্রিয়ার পরাবস্থার আস্বাদন পায় এবং যে এইরূপ ক্রিয়াতে লাগিয়া থাকে তাহার নিত্যই এই অবস্থা হয়।

৯। বৈরাগ্য ঃ- উক্তরূপ অভ্যাসের ফলে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন ইচ্ছাই থাকে না, ইহারই নাম বৈরাগ্য।

১০। অহংকার ঃ- দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের উপর যে আত্মজ্ঞান, তাহাই

অহংকার। এই অহংকারকে ত্যাগ করিতে হইবে।

১১। বল ঃ- যে সামর্থ্য কামরোগাদিযুক্ত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ আগ্রহরূপ বল, তাহাই পরিত্যজ্য।

১২। দর্প ঃ- ধর্ম্মকে অতিক্রম, যোগাভ্যাস হেতু বিভূতিলাভ হইয়া উন্মার্গগামী হওয়া, এই দর্প লব্ধভূমিক হইলেও যোগীকে ভ্রষ্ট করিতে পারে।

১৩।১৪। কাম, ক্রোধ ঃ- চিত্ত অশুদ্ধ থাকিলে পার্থিব বিষয় লাভে অভিলাষ হয় এবং বাসনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে।

১৫। পরিগ্রহ ঃ- অন্যপ্রকার পরিগ্রহ ত নয়ই, কেবল শরীর ধারণ জন্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করাও উচিৎ নহে (অবশ্য ইহা কেবল সন্ন্যাসীদের জন্য)।

১৬। নির্ম্মম ঃ- মমত্ববুদ্ধি পরিহার করিতে হইবে। কারণ মমত্ববুদ্ধি যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ হর্ষ বিষাদাদিতে চিত্তের বিক্ষেপ হইবেই।

১৭। শান্ত ঃ- উপরত, এই মনের স্থিরতা না আসিলে ব্রহ্মদর্শনে সমর্থ হয় না। ক্রিয়া করিতে করিতে যখন সাধকের আত্মা ব্যতীত আর কোন দিকেই লক্ষ্য থাকে না এবং ক্রিয়ার পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন বিষয়েই চিত্ত ধাবিত হয় না, তখন সাধক নির্ম্মম হইয়া যান, অর্থাৎ তাহার 'আমি আমার' থাকে না। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সাধক প্রশান্ত হইয়া যান, চিত্তে কোন উদ্বেগের তরঙ্গ উঠে না, ইহাই পরম নিবৃত্তিরূপ উপশান্তি। এই অবস্থা প্রাপ্ত যোগী ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যান। গীতায় এ সম্বন্ধে বহুলভাবে

আলোচিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে সার সংক্ষেপ কতকগুলি উল্লেখ করিলাম, অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র।

কিছু না করা থেকে ঈশ্বর সাধনা কিছু করা ভাল।

মহাত্মাগণ অনেকেই বলেন ভক্তি পূর্ব্বক দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা কখনই বৃথা হয় না এবং উহা সুখদায়ক কিন্তু মুক্তিদায়ক নহে। গঠনশূন্য গোটাস্বর্ণ কি হবে? উহা কামার বাড়ীই থাক। নারীগণ গোটা স্বর্ণ পাইলে তখনই ছুটিয়া স্যাকরা বাড়ী যায়, নানা মনোমত অলংকার প্রস্তুতের জন্য। সেইরূপ গঠন শূন্য গোটা ব্রহ্ম আমরা চাহি না, উহা সাধু মহাপুরুষগণের নিকট থাকুক। অল্পবুদ্ধি মানব আমরা গোটা ব্রহ্ম চাহিনা, আমরা ঐ ব্রহ্ম হইতে নানাপ্রকার ঠাকুর গড়াইয়া, তাহার পূজা অর্চ্চনা করিতে চাই। কিন্তু আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখা উচিৎ যে গহনা গুলি স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সেইরূপ ঐ ঠাকুর দেবতা গুলিও ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আজকাল যেরূপ পূজা অর্চ্চনার প্রধান অঙ্গ হইল মাইক, সাজসজ্জা, আলো প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বর, ঐরূপ পূজাতে ঈশ্বরকে অচিরাৎ বৈকুন্ঠ ছাড়িয়া চোঁচা পলায়ন করিতে হইবে। পূজার ফল পাওয়া তো সুদূর পরাহত। নচেৎ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হইয়া আন্তরিক ভক্তি সহকারে পূজাদির শুভফল কিছু ফলিবেই। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ঈশ্বর সাধনা কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা ভাল এবং তাহাতে কিছু শুভফল হইবেই। সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকা অপেক্ষা তাঁহার উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করা হউক না কেন তাহাই মঙ্গলদায়ক, এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা বাহুল্য মনে করি।

এতচ্ছুত্ত্বা বচনং কেশবস্য

"এতচ্ছুত্ত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলি র্বেপমানঃ কিরীটী।

নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং।
স গদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য।।"

দিব্যদৃষ্টি দ্বারা অনুভব হইতেছে কাহার? সাধকের। সাধক তো সাধনা ছাড়িয়া দিয়া ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছেন, অসিদ্ধ সাধন ভ্রষ্ট সাধকের দিব্যদৃষ্টি হয়? এই সাধক যদিও ব্রাহ্মীস্থিতি প্রাপ্ত, সিদ্ধ সাধক নহেন, কিন্তু কূটস্থের মধ্যে যে জ্ঞান প্রকাশ হয়, তাহা অনুভব করিবার মত সাধনা তাহার আছে। নচেৎ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা তাঁহার অনুভব হওয়া সম্ভব হইত না। এইজন্য কিরীটি (অর্থাৎ উচ্চ কোটীর সাধক) বলা হইল। যে সাধক নিম্নভূমিগুলি জয় করিয়াছেন, কিন্তু উচ্চভূমি আজ্ঞাচক্রে সর্ব্বাবস্থায় থাকার অধিকার এখনও প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার ভয় হয় পাছে এই অবস্থাটিও না থাকে, অন্তরস্থ বায়ুর বেগ ধারণে এখনও তিনি অসমর্থ তাই ভয়ে ভয়ে শ্বাস টানিতেছেন, কিন্তু কূটস্থে ঠিক লক্ষ্য রাখিয়াছেন; ইহাই ভীত ভীত প্রণম্যঃ হইয়া কৃষ্ণকে নিজ মনোবেদনা জানাইবার ইঙ্গিত। তিনি কিরূপে বলেন? বেপমান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নিজের অবস্থা ঠিক কি না এই আশঙ্কায় ক্রিয়ায় একটু কম্পন হয়। অথবা মনে দ্বিধা আসায় ক্রিয়া করিবার সময় (উৎকৃষ্ট প্রাণায়ামে) পুলক না আসিয়া কম্পন (স্বেদ, কম্প, পুলক, অশ্রু, এই চারি অবস্থার দ্বিতীয় অবস্থা) কম্পন মাত্র হইতেছে। সে অবস্থাতেও কূটস্থ জ্যোতির প্রকাশ অনুভব হইতেছে, নচেৎ মনের কথা কাহাকে জানাইবেন? এই প্রকাশের ভাবটীকে ঠিক রাখার নাম কৃতাঞ্জলি। অঞ্জলি অনজ্‌ ধাতু হইতে, ইহার অর্থ প্রকাশ পাওয়া। এই প্রকাশের অবস্থাটি আসিবার মত সাধন করাকেই কৃতাঞ্জলি বলে।

কতকগুলি সুধামাখা গান

না চাহিতে তুমি সকলি দিয়েছ
হে দয়াল ভগবান।
করুণা তোমার অন্তরে মোর

গাঁথা নিশি দিনমান।
জনমের আগে জননীর বুকে
অমৃত দিয়েছ ঢালি,
গগন ভরিয়া রেখেছ দয়াল
কোটি কোটি দীপ জ্বালি।
এত যে দিয়েছ তবু তো মোদের
চাহিবার শেষ নাই,
যত আছে যার, সেই ততবার
শুধু চাই, শুধু চাই।

জয়শিব শংকর জগৎ বন্দিত হর
জয় জয় পশুপতি প্রণমি চরণে।
দেবের দেবতা তুমি ত্রিলোচন শূলপাণি,
মহাদেব নামে তুমি বিদিত ভুবনে।
সাগর মন্থনে যবে উঠিল গরল,
নীলকন্ঠ হলে তুমি পান করি হলাহল
শিরে তব সুরধনী কন্ঠে শোভিছে ফণী,
শত পাপ দূরে যায় চরণ স্মরণে।

কোথা ব্যথা? ব্যথাহারী সম্মুখে যাহার।
ব্যথা! ব্যথাহারী হৃদয় মাঝারে,
কোথাস্থান ব্যথার সেথায়?
মায়া-মায়া, তবু মায়া।
না না
যাও যাও দূরে মায়া,
নয়নের অশ্রু আজি নির্ঝর ধারায়
ঝর আজ প্রেমময় নামে
রুদ্ধকন্ঠ মুক্ত কর তাঁর গুণগানে।

নয়নের ধারা দাও গো মুছায়ে ব্যথাহারী ভগবান।
সহিতে পারি না এ ঘোর যাতনা করগো করুণা দান।
জীবন তরণী যদি ডুবে যায়
ঠাঁই দিও প্রভু তব রাঙ্গা পায়;
মিনতি আমার ওগো দয়াময়
গাহি তব জয়গান।

কৃষ্ণ কালো তাই জগৎ আলো
দেখবি যদি মন অশ্রু ঢালো।
চকিত চাহনি ভরা বনভূমি,
আপনি যে নত হয় সে পদচুমি।
কংকণ কিনিকিনি নুপূর নিক্কণি,
তাই বুঝি লাগিছে ভাল।
তাই বুঝি ঐ বাঁশী বাজে
রাধা রাধা বলে সকাল সাঁঝে।
গাহে পাখী নাম, তাই অবিরাম
নাশিয়া সকল কালো।

সে মালা গাঁথিব মানস কুসুমে
পরাবো তোমার গলে।
পূজিব তোমার চরণ দেবতা
ধোয়ায়ে আঁখির জলে।
ছবিটি তোমার রেখেছি আঁকিয়া
আমার হৃদয় মাঝে।
সেরূপ দেখিয়া জীবন জুড়াবো
প্রতিটি সকাল সাঁঝে।
দুঃখের আঁধারে মূরতি তোমার
যেন মাণিক হইয়া জ্বলে।
তুলনা তাহার নাই

কি যেন আলোয় আলোকিত রূপ
আপনও ভুলিয়া যাই।
নব জলধর যেন সেই ঘনশ্যাম
পীত বসন শোভে অঙ্গ সুঠাম।
বনমালা গলে দোলে বনমালী সেজে
সেরূপ খুঁজিয়া না পাই।

আমার আঁধার জীবনের পথে তব দীপ শিখা জ্বালো।
তাহার আলোকে দূর কর প্রভু মনের যা কিছু কালো।
আমার জ্বালানো দীপ শিখা হায়,
বারে বারে শুধু নিভে নিভে যায়,
তুমি দয়া করে ওগো সুন্দর জ্বালো করুণার আলো।
মোর চলা পথে ঘোর অমানিশা,
ধ্রুবতারা হয়ে দাও মোরে দিশা,
তোমা ছাড়া আর কেহ নাই মোর তাই তোমা বাসি ভালো।

কোন পাপে হলো এ কঠিন সাজা হে নিঠুর ভগবান।
এত আঁখি জলে গলিল না হায় তোমার পাষাণ প্রাণ।।
যেজন তোমার ভজন পূজনে, করে নাই হেলা কখন জীবনে
কেন তার চোখে বহালে এমন অশ্রুজলের বান।।
বল বল বল ওগো দয়াময়, সুখশশী পুনঃ হবে কি উদয় ?
হবে কিগো কভু বুক ভাঙ্গা এই দুঃখের অবসান।

তবপূজা আরতির ছন্দে
পুলকিত বিশ্বের প্রাণ যেন নাচে কি আনন্দে।।
সে নাচের লীলাসনে দোলে দেহ আনমনে
নুপূরের নিক্কণ তারি সাথে তোমা আজি বন্দে।।
শঙ্খ ঘন্টা রবে মধুময় উৎসবে
মন্দির আমোদিত চন্দন-পুষ্পের গন্ধে।।

দয়া কর দয়াল হরি আমরা অভাজন।
আমরা পাপী আমরা তাপী আমাদের দাও শ্রীচরণ।
তোমার প্রেমের অমিয় ধারায়
হৃদয় যেন যায় ভেসে যায়,
তোমার নামে আত্মহারা হয় যেন মোদের মন।

(মাগো) আমার আঁধার ঘরের অন্তরে তুই জ্বালিয়ে দে না আলো
তোর, ঐ রাঙাপায়ের আলতা ছাড়া সবই দেখিমা কালো।
শিখিয়ে দেমা সেই সাধনা,
যেন ঘোচে মা সব যাতনা,
মরণ কালে পাই যেন মা সকল জ্ঞানের আলো।

কৃষ্ণতব নররূপী সাকার বিগ্রহ
পূজি নাই কোনদিন করিয়া আগ্রহ।
নিরাকার ভাবিয়াছি বুঝি নাই সব
মানবের মাঝে এসে সেজেছ মানব।
নিত্য সত্য মূৰ্ত্তি তব ভাবি নাই কভু
বেদান্তে দেখেছি মাত্র নির্ব্বিকার বিভু।
অমূর্ত্তির মাঝে মূর্ত্তি ভুলে ছিনু আমি
আমার সে বালকত্ব ক্ষমা কর তুমি।
অরূপের রূপরাশি তুলনা কি দিব,
মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভঃ।
সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহুক্লেশে পায়,
বহুকষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়।
কেহ ব্রহ্মভাবে রন নির্ব্বিকার নিরঞ্জন
সে ভাবের পরে কোন কথা নাহি আর।
কেহ বা প্রকৃতি সনে পর ব্রহ্ম সম্মিলনে।
উভয়েতে থাকি করে নিষ্কাম সংসার।
আগেই অবোধ যারা 'একব্রহ্ম' ভাবে তারা

জানে না অদ্বৈত ব্রহ্ম অচিন্ত্য এ ভবে।
জীব যদি নাহি রয় একব্রহ্ম তবে হয়,
কিছুতে হবার নয় কিছু যদি রবে।
যাঁর পাদপদ্মে দান করেছি এ মন প্রাণ
আত্মজ্ঞান দানে মুক্তি দিলেন যে জন।
গীতাই স্বরূপ যাঁর গুরুরূপে অবতার
মুক্তি দান তরে যাঁর ভবে আগমন।
গীতা গতি, গীতা মুক্তি শিখালেন যিনি
এ গীতার প্রাণরূপে বিদ্যমান তিনি
জয় জয় গুরুদেব জয় ভগবান
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মে দেয় গীতা শিক্ষাদান।

আহা মৃত্যুময় সংসার কি দুর্বিসহ। সহ্য হয় না বলিয়াই এক শোকাতুরা জননী বলিয়াছেন।

স্বপথে স্বস্থানে গেছ স্বধামে স্বপদে আছ
পার্থিব মাতার কথা কিছু মনে রাখিও।
জননী জঠরে ছিলে এ ভারতে এসেছিলে
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি জানিও।
কিন্তু রে হতেছে সাধ ধর মাতৃ আশীর্ব্বাদ
হরিপদ কমলের জ্ঞানমধু খাইও,
যেন সে স্মৃতির পথে বিস্মৃতি নাহিক ঘটে,
যেন হেন জীবদেহে আর নাহি আসিও।
জীবঘটে না আসাই মুক্তি। (তমালিনী)

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আকাশের গায়
সরসে সংকল্প প্রভা খেলিয়া বেড়ায়।
মগ্ন সে চৈতন্য রসে রস আছে যত,

ময়ূরের ডিম্বরসে পেখমের মত।

কুলবধূ খোঁজে শুধু ভাল অলঙ্কার,
হার বালা কন্ঠমালা দেখে চমৎকার।
কি দরের স্বর্ণ সেই দেখিতে না জানে,
পিতল গহনা কেহ গিল্টী করি আনে
সেইরূপ নির্বোধ লোকে সাজায় সংসার,
সে যে গিল্টী সোনা নাহি ভাবে একবার
বিবিধ মেঠাই মূলে শর্করা যেমন
পার্থিব সুখের মূলে কামিনী কাঞ্চন।
মূলে সে মাটীর রস যত দেখ ফুল,
যত সে চেতন রস চৈতন্যই মূল।

সুস্থির চৈতন্য অঙ্গে লীলাশক্তি ধায়
ছুটে যেন ভাগীরথী হিমগিরি গায়।
চিদঙ্গে সুন্দরী মায়া ছুটিছে সাদরে
যেমন ভাসন্ত স্রোত প্রশান্ত সাগরে।

সূর্য্যের নিকটতম কিরণের মত,
ব্রহ্মের নিকটতম ব্রহ্মাবিষ্ণু যত।
অখন্ড চৈতন্য জানি অশেষ বিশেষ,
আগে কর মায়ামোহ বিভ্রম নিঃশেষ।

যে যে প্রাণ মহাপ্রাণ সর্ব্বপ্রাণ সার
সর্ব্বপ্রাণ এক করি সর্ব্ব মূলাধার।
পূর্ণ শক্তি পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ সুখে ভরা;
সে সুখের বিন্দুস্পর্শে সুখে ভাসে ধরা।

সতীপ্রেম মাতৃস্নেহ সে সুখের বিন্দু
চিদাকাশ চৈতন্যই সে সুখের সিন্ধু।

সে চৈতন্য গেলে কিছু ছাড়িতে না হয়,
চিদাকাশ চৈতন্যই সর্ব্বদেবময়।
স্বপ্রকাশ আত্মবোধ সর্বসুখ সার,
চিদাকাশ অমৃতের স্থির পারাবার।
স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাদি সবে চৈতন্য নির্মল,
আদি মধ্য অন্তহীন অনন্ত কেবল।

যোগমায়া শক্তিযোগে শরীর বিহারী
পদ্মহস্ত পদ্মচক্ষু পাদপদ্মধারী,
এই জ্ঞান দৃঢ় করি ধ্যান যোগ সহ
সংসারে থাকিলে শান্তি পাবে অহরহ।

তুমি নির্মল মম সুন্দর তুমি
হৃদয় জড়ানো সখা।
বসে আছি তব আশে,
কত যুগ ধরি একা একা
জনম মরণ আসে ছুটিয়া
(তব) চরণে পড়ে লুটিয়া,
একি আনন্দ গগনে চন্দ্রকিরণে
হাসিছে দিবাভূতা।
ফুলপল্লব তরুশাখে
কত বিহগ বিহগী ডাকে,
তারা যাচে তারা নাচে
হেরিতে তব ঐ নয়ন বাঁকা।

তোমার ভুবনে নাহি পুরাতন,
সৃষ্টির ধারা নিত্য নূতন।
কে তুমি কে তুমি খোল আবরণ

কর্ণধার।

অনন্ত জীবন পথে চলিতেছি অবিরাম।
পাথেয় নাহিক কিছু সম্বল তোমারি নাম।।
বড় যে দুর্গমপথ একলা কিরূপে যাই।
এসে সাথে নিয়ে চলো, প্রাণপণে ডাকি তাই।।
দেখি ঘোর অন্ধকার পদে পদে শত বাধা।
চমকি বিজলী পুনঃ নয়নে লাগায় ধাঁধা।।
অধম পাতকী আমি, তুমি পতিতেরি নাথ।
দেখাও পথের আলো, নিয়ে চল ধরে হাত।।
দাঁড়াবার সাধ্য নাই চলিতেও নাহি পারি।
হয়েছি বড়ই ক্লান্ত, এস প্রভু ক্লান্তি হারী।।
সঙ্গী ছিল যারা সব ফেলে চলে গেল আগে।
কোন পথে কোথা যাই বড়ই বিষম লাগে।।
স্বজন বান্ধব কেহ রহিল না সাথে আর।
তুমি মম চিরসাথী গুরু ভব কর্ণধার।।

নয়নের ধারা দাও গো মুছায়ে,
ব্যথাহারী ভগবান।
এত আঁখি জলে গলিল না হায়
তোমার পাষাণ প্রাণ।
যে জন তোমার ভজন পূজনে
করে নাই হেলা কখন জীবনে।
কেন তার চোখে বহালে এমন
অশ্রু জলের বান।
বল বল বল ওগো দয়াময়
সুখ শশী পুনঃ হবে কি উদয়।

হবে কিগো প্রভু বুক ভাঙ্গা এই
দুঃখের অবসান।

অর্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশ।

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগদ্বাসীর মঙ্গলের জন্য বলিতেছেন - আকাশ শূন্য স্বভাব, কিন্তু শব্দ যখন এই আকাশের গুণ তখন আকাশ নিশ্চয় কোনো অদৃশ্য পদার্থ। এই আকাশ অদৃশ্য হইলেও শব্দ দ্বারা উহা অনুমিত হয়। এই আকাশের গুণ শব্দ। কিন্তু পরমাত্মা শব্দরহিত সর্ব্বব্যাপী। যদি বল পরমাত্মাকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না কেন? তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি আছেন কি নাই তাহাই বা কি করিয়া বুঝিব? তাহার উত্তরে আমি যদি বলি, তুমি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তোমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তাহলে বুঝা যাইতেছে যে, তুমি নিশ্চয় তোমার পিতাকে দেখ নাই, তাহা হইলে তুমি কি তাহার অদৃশ্যতা হেতু তাঁহাকে নাই বা ছিলেন না বলিয়া মনে করিতে পার, কখনই না। এই যে আকাশ আমরা দেখিতেছি, তাহার মধ্যে বায়ুর সহিত ফুলের যে সকল পরাগকণা প্রবাহিত হইতেছে, অথবা যে ধূলি পরমাণু সমীর-সঞ্চারিত হইতেছে, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ? কখনই না। তুমি দেখতে পাচ্ছ না বলে কি তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পার, কখনই না। এই যে পুষ্পের গন্ধের ঘ্রাণ পাইতেছ কেন উহাদের অস্তিত্ব স্বীকার কর? ঘ্রাণটা অনুভব কর বলিয়াই তো! এইরূপ পরব্রহ্ম যদিও দৃশ্য নহেন, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। মহা মহা যোগীশ্বর পুরুষেরা তাঁহাকে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানচক্ষে অনুভব করিয়া থাকেন। তোমার মন আছে, সেই মনের আকার কিরূপ তাহা কি তুমি দেখিয়াছ, তবে তুমি কেন তাহার অস্তিত্ব স্বীকার কর। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। মন ও প্রাণ যদি দৃশ্য না হইয়াও অনুভব বশে কার্য্যদ্বারা দৃশ্য হয় পরব্রহ্ম কেনই বা সেইরূপ দৃশ্য হইবে না। বিশেষতঃ সকল শাস্ত্র মতে তিনি নিত্য স্বরূপ বলিয়া অভিহিত

হইয়াছেন, এই বেদ স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ।
(দাদু কর্ত্তৃক সংক্ষেপিত।)

সপ্তানন

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মযুক্ত আদ্যাশক্তি হইতে নাদ বা মহত্তত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই নাদ হইতে বিন্দু বা অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই বিন্দু বা অহঙ্কার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার। তাই শিবেরও তিন অবস্থার কথা আমরা জানিতে পারি। আবার এই তিনে মিলিয়া যে এক, সেই একই পরম বিন্দু বা পরমশিব। সুতরাং এই পরমশিব কখনও সত্ত্বগুণযুক্ত ও চিন্ময় পুরুষরূপ, কখনও তমোগুণ যুক্ত বা প্রকৃতিময় এবং কখনও রজোগুণ যুক্ত বা উভয়াত্মক শিবশক্তিময় রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ইহাই জ্ঞানশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। এই তিনভাবে ভাবিত হইলেই এই শক্তিত্রয় গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী বলিয়া অভিহিত হন। এই তিন শক্তি হইতেই ত্রিগুণ এবং গুণত্রয়ের অধীশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব উৎপন্ন হইয়া থাকেন। গুণত্রয়ের সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একাত্মক ভাবে মিলিত যখন, তখনই তিনি "মহেশ্বর।" এই মহেশ্বরই মহাপ্রণব। প্রণবে যেমন অকার, উকার, মকার, নাদ, বিন্দু, কলা এবং কলাতীত এই সপ্তাঙ্গ আছে, তদ্রূপ শিবের প্রকাশিত পঞ্চমুখ এবং আরও দুই মুখ অপ্রকাশিত বা মুখ অকার, ইহাকে তৎপুরুষ বলে, দ্বিতীয় উকার বা অঘোর, তৃতীয় ম কার বা সদ্যজাত, চতুর্থ নাদ বা বামদেব, পঞ্চম বিন্দু বা ঈশ্বর, ষষ্ঠ কলা সপ্তম মুখই কলাতীত অব্যক্ত বা অনির্দ্দেশ্য স্বরূপ ব্রহ্মাই মহাপ্রণবরূপ শিবের প্রথম মুখ এই ব্রহ্মা হইতেই চতুর্ব্বেদ প্রকাশিত, বিষ্ণু দ্বিতীয় মুখ, রুদ্র তৃতীয় মুখ, ঈশ্বর চতুর্থ মুখ, মহেশ্বর পঞ্চম মুখ, পরাশিব ষষ্ঠ মুখ এবং সপ্তম কলাতীতা মাহেশ্বরী রূপ।

এ সম্বন্ধে আরও বহু বিস্তৃত বিবরণ আছে কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করিয়া এখানে সার সংক্ষেপ অংশটুকু উল্লেখ করা হইল।

অধিভূত, অধিদেব, অধিযজ্ঞ, অধ্যাত্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা।

ক্ষর ভাবই অর্থাৎ বিনশ্বর দেহাদি পদার্থই অধিভূত, প্রাণী মাত্রকেই অধিকৃত করিয়া আছে, এইজন্য ইহাকে অধিভূত বলে। পুরুষেই অধিদৈবত অর্থাৎ সূর্য্যমন্ডল মধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূত সর্ব্বদেবতার অধিপতি বৈরাজ-পুরুষকে অধিদৈবত বলে। অধিদৈবত অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রুতিতে আছে, যিনি প্রথম শরীরী তাঁহাকেই পুরুষ বলে; তিনিই সমস্ত ভূতের অগ্রে উৎপন্ন হন, তাঁহাকে আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা বলে। এই দেহে অন্তর্য্যামীরূপে স্থিত আমিই অধিযজ্ঞ; অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং তাহার ফলদাতা। কি প্রকারে তিনি এই দেহে অবস্থিত আছেন। তাহার উত্তরও ইহাতে দেওয়া হইল। আমি সত্ত্বাদিগুণশূন্য অন্তর্য্যামী, দেহান্তর্ব্বর্ত্তী জীব হইতে বিলক্ষণ। শ্রুতিতে আছে - দুইটি পরস্পর সংযুক্ত সখ্য ভাবাপন্ন পক্ষী একই বৃক্ষ (শরীর) আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মিষ্টফল ভক্ষণ করেন আর অন্যজন না খাইয়া কেবল দর্শন করেন।

এই দেহে অন্তর্য্যামীরূপে ও সর্ব্বকর্ম্মের প্রবর্ত্তক রূপে আমিই অধিযজ্ঞ। আমিই সর্ব্ব কর্ম্মের ফল দাতা। অসঙ্গাদি গুণ দ্বারা জীবাত্মা হইতেও পৃথক অর্থাৎ আমি সত্ত্বাদিগুণ শূন্য, জীব হইতে বিলক্ষণ, দেহান্তর্ব্বর্ত্তী অন্তর্য্যামী। জীব ফলভোক্তা অর্জুনকে দেহধারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্বোধন করায় এতদ্বারা ইঙ্গিত করা হইল যে, তুমিও এবম্ভূত অন্তর্য্যামীকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা অবগত হইতে পার (অর্থাৎ জীব স্বাধীন নহে জীব ফলভোক্তা হইলেও সে ফলদাতা অন্য কেহ)। কর্ম্মে নিজের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, আমি কাহারো ইচ্ছার অধীন হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকি। এতদ্বারা পৃথক অন্তর্য্যামী সত্তার অনুমান করা যাইতে পারে। এখন দেহ সেই অধীনতা পাশ হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ

করিবে? যাঁহার অধীনে থাকিয়া তুমি কর্ম্ম করিতেছ তিনিই অন্তর্যামী আর সেই তিনিই তুমি।

চার যুগের চার অবস্থা

বেদ চারি প্রকার ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। এইরূপ আমাদের জ্ঞানও চারি প্রকার - দেহোহং, সর্ব্বোহহং, শূন্যোঽহং, সর্ব্বাতীতোঽহং। চারি বেদের এই চারিটি প্রধান কথা। যখন ইড়ায় শ্বাস চলে তখন তমোগুণ, তখন দেহোঽহং যখন পিঙ্গলায় শ্বাস চলে তখন রজোগুণ, তখন সর্ব্বোঽহং, যখন সুষুম্নায় শ্বাস চলে তখন সত্ত্বগুণ তখন শূন্যোঽহং। তারপর যখন ইড়া; পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অতীত অবস্থা তখন সর্ব্বাতীতোঽহং।

১। **দেহোঽহং** ঃ- যখন নাভি হইতে পদতল পর্য্যন্ত মনের দৃষ্টি তখন কেবল দেহদৃষ্টি।

২। **সর্ব্বোঽহং** ঃ- তখন সমস্ত ভোগের জন্য সব আমার চাই, তখন আমি ধনী, আমি মানী, আমি জ্ঞানী আমার ভোগে চাই। তখন কেবল দেহি দেহি রব, পেট আর কিছুতেই ভরে না। তখন নাভি হইতে কন্ঠ পর্য্যন্ত মনের গতি।

৩। শূন্যোঽহং ঃ- যখন সুষুম্নায় শ্বাস চলে তখন শূন্যোঽহং। কন্ঠ হতে ভ্রূপর্য্যন্ত মনের স্থিতি হয়; ইহাই সত্ত্বগুণ। তখন জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে, কেবল আমিকে মনে পড়ে। আমার কোন কিছুর সঙ্গে যেন সম্বন্ধ নাই। সমস্ত বস্তুর প্রতি সংযোগ ছিন্ন হয়। জাগতিক বস্তু কিছু না থাকার মতই মনে হয়। ইহাই বৈষ্ণবগণের আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে। আমার জ্ঞান আছে, কিন্তু সেই আমির সহিত জাগতিক অন্য সম্বন্ধ মিশ্রিত থাকে না। যেন সব ভুল হইয়া যায়। যেমন ধ্যান অবস্থায় হইয়া থাকে।

৪। সর্ব্বাতীতোহং ঃ- তারপর ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার অতীত অবস্থা

ইহাই সর্ব্বাতীতোঽহং। এক অখন্ড সত্ত্বা মাত্রেরই স্ফূরণ, আর কোনো ভাব থাকে না "কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং দ্বন্দ্বাতীতং গগন সদৃশং।" যেখানে মন লয় হইয়া যায় তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। এ অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য সকলেরই মন প্রাণ ঐক্য করিয়া ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

ইহাকে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে "পুরুষোত্তম" বলা হইয়াছে। তাহার পরের অবস্থা যে কিরূপ তাহা বলিবার যো নাই। সবশেষে পুরুষোত্তম ভাবও অখন্ড আত্মসত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে সাধক প্রবর রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন।

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবিরে নিদেন কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।।"

১। কলিযুগ ২। দ্বাপরযুগ ৩। ত্রেতাযুগ ৪। সত্যযুগ।

ভগবতী গীতার উক্তি

ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন আমার রূপ অতি সূক্ষ্ম, সুনির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, বাক্যের অতীত, আমি ত্রিগুণাতীত, আমার অংশ নাই, আমি বিকল্প রহিত, আমার আদি নাই; আমি জ্ঞানানন্দ স্বরূপ বিগ্রহ, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আমাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া দেহবন্ধন হতে মুক্ত হন। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আমরা যে দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকি তাহা পুত্তলিকা পূজা নহে; তাহা সেই অব্যক্ত পরাশক্তিরই পূজা। কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে উহা এক্ষণে পুত্তলিকা পূজায় পরিণত হইয়াছে।

স্বকেন্দ্রে ফিরিয়া যাওয়ার উপায়।

গুরূপদেশ মত যে অকৈতবভাবে সাধনা করে, সাধনার উদ্দেশ্য কোন ফল প্রাপ্তি নহে, কেবল তাঁহাকে প্রাপ্তি এইরূপ মনে ধারণা করিয়া ভজনা করে, সে জগতের অন্য সব কথা ভুলিয়া যায়। তাঁহাকে ভিন্ন তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না - এইভাবে ভজনা করিতে করিতে সে উত্তমপুরুষকে ঠিক দেখিতে পায়। তখন সব বন্ধন তাহার মিটিয়া যায়, তখন সে সর্ব্ববিদ্ হয়। কারণ সকল বস্তুতেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাকে যে জানিল ব্রহ্মরূপই হইয়া গেল — "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি," সর্বত্রে ব্রহ্মদৃষ্টি না হইলে, সর্বের সহিত নিজেকে না মিলাইতে পারিলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মবিদ্ ব্যতীত কেহ সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। সর্বজ্ঞ পুরুষই সর্বভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারেন। চিত্ত একান্ত হইলে যখন তাঁহাতে অন্য কোন বৃত্তির উদয় নাই তখনই সর্বগত বাসুদেবের ভজনা হয়। সর্বভাবে ভজন করিতে করিতে "সর্ব" অর্থাৎ নামরূপ মিটিয়া যায়, তখন দ্বিতীয়ের কোন ভাণ নাই। এমন কি জ্ঞাতৃভাব পর্য্যন্ত থাকে না। প্রথমতঃ সর্বত্রই নিজেকে দেখিতে পান, পরে সর্ব বলিয়াও কিছু থাকে না, সর্বের অনুভবও মিটিয়া যায় ও "একমেবাদ্বিতীয়ং" মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সে ভাব বুঝিবার জন্যও দ্বিতীয় কেহ থাকে না। ক্রিয়া করিতে করিতে ক্রিয়ার পর অবস্থা অল্প অল্প উদয় হইতে থাকিলে একটা নেশার মত ভাব হয়, তাহাতে প্রথম প্রথম সব বস্তুই মনে পড়ে, কিন্তু কোন বস্তুর প্রতি মন জমে না, ক্রমে আর কোন বস্তুই মনে পড়ে না, তখন সব হইতে মন সংহৃত হইয়া মনের মধ্যেই মন জমিয়া বসে, তখন আর সংকল্প বিকল্পের কোন ঢেউ উঠে না।

মন যে আছে সঙ্কল্প বিকল্প না থাকায় তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। পরে সে ভাবও ডুবিয়া যায়, তখন এক অবিজ্ঞাত রাজ্যের পর্দা খুলিয়া যায়। যে জ্ঞান পূর্ব্বে কখনও শোনা যায় নাই - তাহাই বোধের বিষয় হয়। পরে সে অলৌকিক বোধও আর থাকে না। তখন সব বোধ একের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যায়, যেমন সব

নদী সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদ্রই হইয়া যায়, তাহাদের আর পৃথক নামরূপ থাকে না তদ্রূপ, উহাই গুণাতীত ব্রহ্মভাব। ভগবানের সেই যে রূপ তাহা কোন আকৃতি নহে, তাহাই অরূপের রূপ, মন যাহাকে দর্শন করিলেই পরম তৃপ্তি লাভ করে, যাহাতে সমস্ত শোক তাপ দূর করে। তাই ভগবানের কোন মায়িকরূপ দর্শনই সাধনার শেষ ফল নহে। তাঁহার স্বরূপে নিত্যস্থিতি ও সেই স্বরূপে নিজেকে ডুবাইয়া দেওয়াই ভক্তিভাবের পরাকাষ্ঠা এবং সেই ভাবই নিজ বোধরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, তাহাতে স্থিতিলাভ করিতে পারাই ভগবৎ ভজনার সর্ব্বোত্তম ফল। এই স্থিতির নামই ক্রিয়ার পরাবস্থা। তাঁহার অলৌকিক শক্তিই কার্য্যরূপে এই দৃশ্য জগৎ ভাসিত হইতেছে। মন এই প্রপঞ্চকে প্রকাশিত করে ও ভোগ করে। কিন্তু সমস্ত দৃশ্যের মূলে যে একটি বিন্দু রহিয়াছে, সেই বিন্দু বা কেন্দ্রমূলে ফিরিয়া যাওয়াই কার্য্যজগতের অতীত বা পরাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। সেখানে আর নানাত্ব নাই। কল্পনার বহুমুখী প্রকাশই বাহ্য জগৎ, মনের স্বরূপ মূর্ত্তি; সেই কল্পনার মূল মন স্বকেন্দ্রে ফিরিয়া গেলে তাহার বহুমুখী প্রকাশের অভাব হয়। ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান বা যোগ। এই যোগাভ্যাস সকলেরই কর্ত্তব্য; যোগাভ্যাস ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি কিছুই লাভ হয় না। যোগাভ্যাস আত্মদর্শনের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপায়। অন্য কোন বলই যোগবলের তুল্য নহে। যোগবলবিহীন ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয় জয়ে অসমর্থ হইয়া বিষয়ে নিমগ্ন হয়।

প্রমাণ ঃ-

প্রাণের স্থিরতা হলে মনস্থির হবে।
মনস্থিরে বুদ্ধিস্থির আপনিই হবে।।
প্রাণস্থিরে মনস্থির হইবে যখন।
দিব্যধাম প্রকাশিত হইবে তখন।।
মধ্যপথে বহিঃপ্রাণ হইলে নিশ্চল।
চরমে পরমবোধ হবে সুবিমল।।
প্রাণের বিচেষ্টা যাবে সঙ্কল্প মনের।
ভাতিবে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ জ্ঞান ভাস্করের।।

প্রাণস্থির মনস্থির হইলে তোমার।
বিন্দুস্থির, দেহস্থির হবে পর পর।।

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন।

আমাদিগকে জ্ঞানদানের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন - দেহাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, কারণ ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম এবং প্রকাশক। ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক ও সঙ্কল্পাত্মক বলিয়া ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ সঙ্কল্প হইতে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ। যিনি বুদ্ধির পর সাক্ষী-স্বরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্ব্বান্তরাবস্থিত আত্মা। কাম সেই ''দেহী'' শব্দোক্ত আত্মাকে বিমোহিত করে। (এই শ্লোকে নিজ বক্তব্য উপসংহার করিতেছেন) বিষয়েন্দ্রিয়াদির জন্য বুদ্ধিরই এই কামাদি বিকার ঘটে। আত্মা কিন্তু নির্ব্বিকার ও বুদ্ধির সাক্ষী এইরূপ আলোচনা করিয়া অর্থাৎ বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে আত্মা তাহাকে জানিয়া 'আত্মনা নিশ্চয়াত্মিকা' বুদ্ধির দ্বারা 'আত্মানং' মনকে 'সংস্তভ্য' নিশ্চল করিয়া, হে মহাবাহো, তুমি এই দুরাষদ কামকে বিনাশ কর।

অর্জ্জুনকে 'মহাবাহো' সম্বোধন করিতেছেন কেন? অর্জ্জুনরূপ তেজস্তত্ত্ব কর্ত্তৃক (তেজস্তত্ত্ব নাভিমন্ডলে অর্থাৎ মণিপুর চক্রে অবস্থিত, যাহাকে তৃতীয় চক্র বলা হয়) প্রাণ এবং অপানের কার্য্য সম্যক্ রূপে নিষ্পাদিত হইতেছে; এই জন্য মহাবাহো বলিতেছেন।

এখানে আমরা বুঝিতেছি যে, গীতার আশ্রয় বস্তু কে? 'মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।।' ইহাই গীতার আশ্রয়, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির পর যিনি তিনি সঃ অর্থাৎ আত্মা। ইনিই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর।

নবরত্ন

১। মুক্তা ২। মাণিক্য ৩। বৈদূর্য্য ৪। গোমেদ ৫। বজ্র ৬। বিদ্রুম ৭। পদ্মরাগ ৮। মরকত ৯। নীলকান্ত।

অষ্ট বজ্র

১। ব্রহ্মার অক্ষ ২। বিষ্ণুর চক্র ৩। শিবের ত্রিশূল ৫। যমের দন্ড ৬। ইন্দ্রের কুলিশ ৭। কার্ত্তিকের শক্তি ৮। কালীর খাঁড়া।

যোগ সঙ্গীত

১। নাতি পুতির থুঁথি ধরে সদা করিস আদর, ভাবিস না
তোর নিকটে যম ভাবলি না মন, কি হবে শেষ কারখানা।
পরের জিনিষ ফিকির করে নিতে আমোদ ধরে না
মার নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল এ ঘা আর শুকাবে না।
এটি খাব সেটি খাব, তা এখনও ঘুচলো না
দেখি, ক্রমে ক্রমে সকল খেলে, পরকালটা খেয়ো না।
থাক সর্ব্বদা ত পরের কথায়, কে আপনার কিছু শুন না।
তোর প্রাণটা আপন, পর ইন্দ্রিয়গণ, নাইত সে সব ধারণা।
দিবানিশি বড় অলস ঘুমিয়ে আশ আর মেটে না।
যাবে খাটে উঠে শ্মশানে ঘাটে, সেঘুম তো আর ভাঙ্গবে না।।

২।

আপনাকে আপনি ভুলে পড়েছি বাসনা জালে।
ঘটেছে এ দুরবস্থা পথ ছেড়ে বিপথে চলে।।
স্বভাবের অভাবে ভবে, আছি অহঙ্কারে ডুবে।
মেতেছি বিষয়াসবে, নেশার ঘোরে পড়ি ঢলে।।
ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ফিরি, সুখের আশায় ঘুরে মরি।
ঠকিলেও শিখিতে নারি, আশার আশায় মরি জ্বলে।
সদর রাস্তা হয় সুষুম্না, তার সঙ্গে নাই দেখাশুনা।

মিছে করি আনাগোনা, ইড়া পিঙ্গলারই গোলে।।

৩। ধূপের মতন আমারে জ্বালায়ে গন্ধে ভরাব ধরণী,
বক্ষশোণিত আলপনা দিয়ে রাঙাবো সবার সরণি।
পাখীর কন্ঠে দিয়ে যাব গান, তটিনীরে দেব সুর,
নামায়ে আনিব মর্ত্ত্যের বুকে মধুময় সুরপুর।
দুঃখ সাগর মথিয়া মথিয়া
অশ্রুর মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া
জনগণ মন আশীষে আমার ভরাব পারের তরণী।

অনাঘাত ও ঘাতোদ্ভূত শব্দ।

বাক্য ও অর্থ যেমন মিলিত থাকে পরা প্রকৃতি ও পরমেশ্বর সেই রূপ অভেদে মিলিত। তাই শব্দের মধ্যে অর্থ 'প্রকৃতি মধ্যে ঈশ্বর যেমন ফুটিয়া উঠেন সেইরূপ আপনিই ফুটিয়া উঠে ' এই জন্য ''আবৃত্তি ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'' ধর্ম্মশাস্ত্রের যতই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবে ততই তাহার গভীর ভাব ফুটিয়া উঠিবে। সাধন তত্ত্বের সরস সুন্দর কাহিনী মেহার মাহাত্ম্য গ্রন্থের অষ্টম সর্গে আছে ''শব্দ শক্তি কি মহাশক্তি''। অনাঘাত শব্দ বা ঘাতোদ্ভূত শব্দ - তন্মধ্যে ঘাতোদ্ভূত ''মা'' শব্দ উচ্চারণ করিলে অন্তরে, দেহযন্ত্রে, পরে বাত-ব্যোমে একটী প্রকম্প উদ্ভূত হয়; ইহাই ঘাতোদ্ভূত তরঙ্গ।

সাগর জলে বদর প্রমাণ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করুন, ঐ দেখুন চক্রাকারে চতুর্দ্দিকে প্রকম্প বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিল, একের পরে এক ক্রমে ক্ষীণ অথচ দূর প্রসারিত হইতে লাগিল। কতদূরে কোথায় উহাদের একান্ত বিরল? চক্ষুর অগোচর হইলেও মনের অগোচর নহে। ক্ষীণাৎ ক্ষীণঃ অনুক্ষীণ হইয়া গেলেও যাবৎ সাগর তাবৎ ঐ সকল হিল্লোলের প্রসার।

বিশ্ব সাগরেও সেইরূপ শব্দের তরঙ্গ টুপ টাপ, ঠুং ঠাং যেখানে যে শব্দটি হইতেছে, বিশ্বসাগরে অমনি এক একটী তরঙ্গোদয়, আর অসীম বিশ্বসীমায় উহাদের ক্রম বিলয় — যদি বিলয় সম্ভবে।

ওঃ শব্দ শক্তি তবে কি মহাশক্তি! আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত চরাচর ব্যাপী বলিলেও - অত্যুক্তি দূর আস্তাং - বোধহয় পর্য্যাপ্ত উক্তি হয় না। তবে কি বিশুদ্ধ অনাহত শব্দই মা শব্দের স্বরূপ? আদৌ নাদঃ (শব্দ) ততোঃ বেদঃ (জ্ঞান), অর্থাৎ আমাদের বস্তু জ্ঞানের পূর্বেও শব্দ স্বয়ম্ভূ। শব্দে বস্তু স্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান। তাই জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ (অজপা জপ) ইহাই শাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি মাত্র সার অংশটুকু গ্রহণ করিলাম।

নারায়ণের অষ্টাদশ প্রকার নাম।

১। লক্ষ্মী নারায়ণ ২। লক্ষ্মী জনার্দ্দন ৩। রঘুনাথ ৪। দধিবামন ৫। শ্রীধর ৬। দামোদর ৭। বলরাম ৮। রাজরাজেশ্বর ৯। অনন্ত ১০। মধুসূদন ১১। গদাধর ১২। হয়গ্রীব ১৩। নরসিংহ ১৪। লক্ষ্মী নরসিংহ ১৫। বাসুদেব ১৬। সুদর্শন ১৭। অনিরুদ্ধ ১৮। প্রদ্যুম্ন

প্রাণ কর্ম্ম দশ প্রকার

১। প্রাণ বায়ুর কর্ম্ম বহির্গমন
২। অপানের কর্ম্ম অধোগমন
৩। ব্যানের আকুঞ্চন প্রসারণ
৪। সমান বায়ুর কর্ম্ম ভুক্ত পীত দ্রব্যের সমোন্নয়ন
৫। উদানের কার্য্য উদ্ধোন্নিয়ন
৬। নাগের কর্ম্ম উদ্ধার
৭। কুর্ম্মের উন্মীলন
৮। কৃকরের ফুৎকার
৯। দেবদত্তের জৃম্ভন
১০। ধনঞ্জয়ের সমস্ত শরীরের সংস্থান সংরক্ষণ এইজন্য জীব মরিয়া যাইলেও ধনঞ্জয় বায়ু শরীরকে

ত্যাগ করেন না।

ক্ষত্রিয়ের দিগ্বিজয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ

প্রথমে যখন আমরা গুরূপদেশে ক্রিয়া আরম্ভ করি, তখন আমাদের ধীরে ধীরে প্রত্যেক চক্রগুলি স্মরণ করিয়া পুরক করিতে হয়, পরে আবার ঐ প্রকারে রেচক করিতে হয়। তাহার মধ্যে কোন তীব্রতা বা বল প্রয়োগ করিতে হয় না। এইভাবে কিছুকাল সাধন অভ্যাস করিবার পর শ্বাসের আকর্ষণ বিকর্ষণে যখন কোনপ্রকার কষ্ট অনুভূত হইবে না, টানা ফেলা দীর্ঘ হইয়া যাইবে এবং জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হইবে, তখন আমরা গুরুকৃপায় উন্নততর দীক্ষায় দীক্ষিত হইব। ক্রমে ক্রমে সাধনার কঠোরতা বাড়িবে উহাই ক্ষত্রিয়ভাব। এইখানে শ্বাসের উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। কুম্ভকের দ্বারা বলপূর্বক প্রাণবায়ুকে সুষুম্নার মুখে পরিচালিত করিতে হইবে। "বলাৎকারেন গৃহ্নীয়াৎ" ইহাই ক্ষত্রিয়ের দিগ্বিজয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ। এই প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে একদিকে যেমন শৌর্য, তেজ, যোগধারণা ও বুদ্ধির তীক্ষ্নতা আসিবে, তেমনি অন্যদিকে রিপুদের সহিত প্রবলভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে; মনে হইবে আর যেন পারিলাম না। তখনও যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে চলিবে না। যুদ্ধে অপলায়ন ভাবটি ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। তাহার পর যোগীর অনেক প্রকার শক্তি লাভ হয়; মেরুদন্ডের মধ্যে এক চক্রের পর আর এক চক্রে উত্থান হইতে থাকে তত্ত্বজয় হইতে থাকে। ইহার নামই পররাজ্য জয়। যোগী তখন অনাসক্ত হইয়া সমস্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করিবেন। ইহাই ঈশ্বরভাব এবং অন্যাকে সৎ পথ দেখাইয়া দেওয়া, উহাই শ্রেষ্ঠ দান। হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইলেই ক্ষত্রিয়ভাব শেষ হইয়া গেল - তখন যোগী সর্ব্ববিষয়ে স্থির, তখন তিনি শান্ত, দান্ত, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া সহস্রারে স্থিত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন। তখন মনের কোন সঙ্কল্প না থাকায় "যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ। সমসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে।" এই ত্যাগ কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক বা জোর করিয়া করিতে পারে না। উপযুক্ত সময়ে সাধকের আপনা আপনিই সমস্তই ত্যাগ হইয়া যায়,

ইহাই ব্রাহ্মণভাব। সর্ব্বশেষ বা সর্ব্বোচ্চ অধিকার।

অসক্ত অর্থাৎ সঙ্গ শূন্য যাঁহার বুদ্ধি। জিতাত্মা অর্থাৎ নিরহঙ্কার। যে ব্যক্তি হইতে ফল বিষয়ক স্পৃহা বিগত হইয়াছে তিনি বীতস্পৃহ। আসক্তি ও ফলত্যাগই সাত্ত্বিক ত্যাগ। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকোক্ত কর্মাসক্তি ও ফলত্যাগরূপ যে সন্ন্যাস, তদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি অর্থাৎ সর্ব কর্ম্মের নিবৃত্তিরূপ যে সত্ত্বশুদ্ধি তাহা প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি সঙ্গ ও ফলত্যাগ পূর্ব্বক যে কর্ম্মানুষ্ঠান তাহা নৈষ্কর্ম্মই। যেহেতু কর্ম্মানুষ্ঠানে (ঐরূপ) কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের অভাব হয়। আর তাহাই "নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি" তথাপি এই শ্লোকোক্ত সন্ন্যাসের দ্বারা পরমা নৈষ্কর্ম্মা সিদ্ধি যাহা পঞ্চম অধ্যায়ে 'সর্ব্বকর্ম্মানি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখংবশী' সেই পরমহংসচর্য্যারূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ইহাই বিশেষত্ব।

কূটস্থ ব্রহ্মই সকল চক্রের সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ

দেহ মধ্যেই রহিয়াছেন সেই ঈশ্বরকে বোঝা যায় কিরূপে? জগৎ যাঁহার কটাক্ষপাতে চলিতেছে, সেই জগতের শাসক বা ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে স্থিতিরূপ সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে জানিবার উপায় এই যে মূলাধারাদি পঞ্চচক্র ভেদ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে যে সুষুম্নানাড়ী প্রবাহিত হইয়াছে, এবং সেই সুষুম্নানাড়ী মধ্যস্থ যে ব্রহ্মনাড়ী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার অন্তর্গত যে শক্তি বা ব্রহ্মাকাশ রহিয়াছেন উহাই সর্বশক্তি সম্পন্ন ঈশ্বর। তাঁহারই শাসনে পঞ্চতত্ত্ব মন ইন্দ্রিয়াদি ভূত নিচয় স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। উহা না থাকিলে পঞ্চতত্ত্ব কর্ম্মক্ষম হইতে পারিত না, প্রাণশক্তিরূপে প্রকাশিত জগৎ কারণ ব্রহ্মের ভয়ে বা নিয়মে বাধ্য হইয়া অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে তপন উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে ধাবমান হইতেছে। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে দেখা যায় যে প্রাণশক্তির শাসনে এই ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম বা মেরুদন্ড মধ্যগত পঞ্চ চক্রস্থ শক্তি স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাপ্রাণ বা ব্রহ্মাকাশ সর্ব্বত্র অর্থাৎ মূলাধারাদি

পঞ্চভূতময় স্থানেই লক্ষিত হইতে পারেন। কিন্তু প্রধানতঃ ইনি আজ্ঞাচক্রেই বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত আছেন। এই চক্রগুলিই হৃদ্দেশে অর্থাৎ মধ্যস্থলেই কূটস্থ জ্যোতিঃ নির্ব্বাত স্থানে প্রদীপ শিখার মত প্রজ্বলিত রহিয়াছেন। আবার প্রত্যেক চক্রের কূটস্থ আজ্ঞাচক্রের কূটস্থের সহিত সমসূত্রভাবে মিলিত, যেন সকল চক্রে আজ্ঞাচক্রের জ্যোতিঃই দীপ্যমান রহিয়াছে। **এইজন্য এক আজ্ঞাচক্রে লক্ষ্য রাখিলেই সমস্ত চক্রস্থ কূটস্থের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়।** এই আজ্ঞাচক্রস্থ কূটস্থে লক্ষ্য করিতে পারিলেই সর্ব্ব ভূতস্থিত (সর্ব্ব চক্রের অন্তর্গত) ব্রহ্মনাড়ী দিয়া গমনাগমন হয় এবং তাহা হইলেই সর্বতোভাবে তাঁহার শরণ লওয়া হয়।

অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হও। পরে তাঁহারই প্রসাদে পরাশান্তি এবং শাশ্বত নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে।

গুটীপোকা লালার দ্বারা এবং মনুষ্য লালসার দ্বারা গুটী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বদ্ধ হয়। ঐ গুটীমধ্যস্থ পোকার পাখা বা দন্ত হইলেই সে গুটী কাটিয়া বিচিত্র প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যায়, ঠিক সেইরূপ দেহ মধ্যস্থ মনুষ্যের দিব্যজ্ঞান উদয় হইলেই সে চমৎকার সূক্ষ্ম দেহ লইয়া দেবতা হইয়া আকাশলোকে উড়িয়া যায়। কি কার্য্যদ্বারা এই দেহমুক্ত হওয়া যায়, তাহা অন্ধের ন্যায় না হাতড়াইয়া সদগুরু সন্নিধানে জানিবে।

যে যেমন বুঝিতে পারে, ভগবানও সেইরূপ দয়া করেন। মহাচৈতন্যের কিরণই জীব চৈতন্য, এই জ্ঞান দৃঢ় কর। মনকে ত্রাণ করে মন্ত্র। জপ কর "জড়দেহ আমি নয়, আমি শ্বাস চৈতন্য আকাশময়।" কিংবা "আকাশ চৈতন্য সিন্ধু, শ্বাসে মিশে আসে বিন্দু" সূর্য্যকিরণ গৃহে প্রবেশ করিয়া কেন কাঁদিবে? কেবল আত্মবিস্মরণই কারণ, বুঝিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তি, না বুঝিলে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃর

আবরণ। তবে শুদ্ধ সত্ত্বগুণটি নির্ম্মল কাঁচের আবরণ মাত্র।

সমুদ্র - মন্থন

অমৃত লাভার্থ দেবতারা সমুদ্র-মন্থন করিয়াছিলেন। তাহার খোঁটা বা দন্ড হইয়াছিল সুমেরু পর্ব্বত এবং নাগেন্দ্র বাসুকী মন্থন রজ্জুরূপে কল্পিত হইয়াছিল। সমুদ্র-মন্থনে উঠিয়াছিল অনেক বস্তু; তন্মধ্যে অমৃত, লক্ষ্মী, চন্দ্র, ধন্বন্তরী, কৌস্তুভ, শঙ্খ, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও ঐরাবত হস্তীই প্রধান। এগুলি কেবল বাহিরের কথা নহে, ইহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক রহস্য আছে তাহাই এখানে আমরা বলিব। অনন্ত প্রাণশক্তিই সমুদ্রপৃষ্ঠস্থ (মেরুপৃষ্ঠ দেখিতে কুর্ম্মের পৃষ্ঠের মত) মেরুদন্ডই সুমেরু পর্ব্বত, মেরুদন্ডের সর্ব্ব নিম্নে মূলাধার পদ্মে জীব-চৈতন্যময়ী কুল কুন্ডলিনী শক্তি বিরাজিতা; ইনি অবিরত শ্বাস উদ্গীরণ করিতেছেন। এই শ্বাসকে রজ্জুরূপে কল্পনা করিয়া মেরুদন্ডস্থ সুষুম্নাকে মন্থন দন্ডের সহিত যুক্ত করিয়া মন্থন করিতে পারিলে প্রাণসমুদ্র মথিত হইয়া জ্ঞানামৃতরূপ অমৃত ক্রিয়াবানেরা লাভ করেন। তখন বিবিধ যোগৈশ্বর্য্যরূপা কমলা তাহা হইতে সমুদ্ভূতা হইয়া থাকেন, সুমধুর গম্ভীর শঙ্খ নির্ঘোষ ও রক্তবর্ণ অশ্ব ও শ্বেত হস্তী সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়, কূটস্থের মধ্যে সমুজ্জ্বল নীলবর্ণ কৌস্তুভ মণির জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। বৃহৎ জ্যোতির অভ্যন্তরে বিশ্বের রাজা শ্যামসুন্দর মদনমোহন রূপে প্রকাশিত হইয়া জীবের সমস্ত সন্তাপ হরণ করেন।

প্রকৃত সন্ন্যাসী

ধ্যান, শরীর মনের শুদ্ধি, ভিক্ষান্ন ভোজন ও একান্ত বাস। চিত্তশুদ্ধি বা স্থির না হইলে বিষয় বৈরাগ্য আসে না। বিষয় বৈরাগ্য ব্যতীত যে সন্ন্যাস তাহা কেবল পন্ডশ্রম ও পাপজনক। উহার দ্বারা ইহকাল ও পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়। সেইজন্য সন্ন্যাসী হইতে হইবে, সন্ন্যাসী সাজিলে চলিবে না। চিত্তশুদ্ধ নহে বলিয়াই জ্ঞান জন্মে না। সেই জ্ঞান লাভার্থ সদগুরু প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগ দ্বারা সাধন অভ্যাস করিলে স্বতঃই মনকে সন্ন্যাসী করিয়া দিবে। সেখানে মনই থাকিবে

না তো কোলাহল হইবে কোথা হইতে? মন হইতে বাসনার দাগ সম্পূর্ণ মিটাইতে হইলে ধৈর্য্যের সহিত সাধনাভ্যাস করিতে হইবে। এই সাধনাভ্যাসের ফলে প্রাণস্পন্দন রহিত হইলেই চিত্তের স্পন্দন আর থাকিবে না। চিত্তস্পন্দন না থাকলেও বাসনার সংস্কার বীজরূপে জ্ঞানও সুষুপ্ত থাকে। যে অবস্থায় সমস্ত বাসনা বীজ সুপ্ত থাকে, মাথা তুলিতে পারে না, তাহাই মহৎ আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধির অতি সূক্ষ্মভাব। বুদ্ধির এই অতি সূক্ষ্ম অবস্থাতেই আত্মার স্পর্শ অনুভব হয়। তখনও সবিকল্প ভাব। পরে যখন সেই স্পর্শের আর বিরাম থাকে না, তখনই সংস্কারের বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। উহাই শান্ত আত্মা বা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিতি। "ধৃতি গৃহীতয়া" বুদ্ধিদ্বারা এই অবস্থাকে আয়ত্ত করিতে হইবে, অর্থাৎ সাধনের দ্বারা যখন মন বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থির বুদ্ধি বা একাগ্রতার দ্বারাই নিরোধ অবস্থা ধীরে ধীরে উপস্থিত হইতে পারে। ইহাই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতির শুদ্ধ চৈতন্যরূপ পরম পুরুষের মধ্যে আত্ম নিমজ্জন। এই "পুরুষান্নপরং কিঞ্চিৎ, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" এই পুরুষ অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তাহাই কাষ্ঠা অর্থাৎ পরিশেষ এবং উহাই পরমাগতি, এই পরমাগতিকে প্রাপ্ত হইতে সাধন করা আবশ্যক। গুরূপদেশ মত সাধন করিয়া যাওয়াই ঈশ্বর শরণাগতি। এই শরণাগতি যাঁহার থাকে তিনিই ভগবদ কৃপা অর্থাৎ পরম শান্তি লাভ করেন। ইহাই সর্ব্ব বিষয় নিবৃত্তিরূপ মনের কৈবল্য পদ বা অভয় পরমপদ লাভ।

"মৃত্যু রহস্য"

মা বিশ্বমোহিনী, তারিণী, মরণটা অতি সামান্য কাজ দেখলাম, আগে মনে করতাম, কি ভীষণ ব্যাপার। এখন দেখি কেবল কুসংস্কার মাত্র। একটা ছিটকে কলে শ্বাসটুকু বদ্ধ আছে। ফট্ করে ছিটকে কলটা ছট্কে গেলে, শ্বাসের সূতাটা সরে গেল, আর দেখি অনন্ত বাতাস, অনন্ত আকাশ, মুক্ত প্রাণ, অনন্ত প্রাণ! মৃত্যুভয় ছিল যেন জুজুর ভয়! ও কপাল! অজ্ঞানতা সেই জুজু। অজ্ঞানেই তিলকে তাল

করে তোলে।

একটা মরলে, ছেলেই বা বুড়োই হোক চিৎকার করে, যেন ভূতে ধরলে! মায়াই ভীষণ ভূত। মায়ার প্রশ্রয় মেয়েরাই দেয়, পুরুষ যদি মায়ার দ্বারা বদ্ধ হয়, তবে সে পুরুষ নয়, মেয়েরও অধম। বলে ঘর ছেড়ে থাকতে পারি না, ছেলে বৌ ছেড়ে থাকতে পারি না, চাকুরী ছেড়ে কি থাকা যায়। আঃ মরণ আর কি? কপাল পুড়েছে, ঐ তো যথার্থ মরণ, আর মরণ কোথাও নাই।

মা, ভীষণ মরণ দেখে মনে লাগছে খটকা,
শেষে দেখি কিছুই নয় ছেলে ফুটাছে পটকা।
মা, প্রাণের বারুদে একটু হাড়মাস জড়িয়ে,
আটকা করে পট্‌কা দেব কালীপূজায় পুড়িয়ে
আকাশ পানে আত্মজ্ঞানে কোনটা উঠছে হুস্‌
মাটির দিকে কোনটা ঝুঁকে ফেঁসে যাচ্ছে ফুস্‌।
সেই হল মা মৃত্যু বিজয় যেই দেখলাম আমি,
দুই আঙ্গুলে আটকা ধরে পটকা ফাটাও তুমি।

মা আকাশময়ী, তোমার আকাশ কেউ দেখতে পায় না, কেন বল দেখি? কেবল মাটির দিকে নজর। আকাশ তো দেখছি, এক হাত প্রাণ যদি দশ হাত হয়ে উঠে তবে জানি আকাশ দেখা হয়েছে। নইলে ওতো জড়াকাশ, মাটি দেখাও তাই। চিদাকাশের সন্ধান সাধারণ লোকে পায় না। কি আশ্চর্য্য তোমার মায়া। ও আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য তো কালই বিদায় লবে। তারপর? মা তোমার চিদাকাশে কেমন পূর্ণিমার চাঁদখানি ওঠে। আমিও তোমার চিদাকাশে ঐরূপ উঠেছি! মা, আমি তোমার ক্রোড়ে পূর্ণ চন্দ্র! ছিঃ জড়াকাশের চাঁদে কলঙ্ক! মা আমি তোমার চিদাকাশের নিষ্কলঙ্ক চাঁদ।

ধন্যোহহং ধন্যোহহং ধন্যঃ ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ।

"মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেব মহেশ্বরঃ।

বান্ধবাঃ শিব ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবন ত্রয়ম্।।
"তুমি আনন্দ নব ঘন শ্যাম
শ্রীমতীর মনচোর
নয়ন কিশোর
মুরলীধারী গুণধাম।
বৃন্দাবন ধন ব্রজের রাখাল
দেবকী নন্দন যশোদা দুলাল
গলে বনমালা ভুবন করেছে আলো
লহ প্রভু, লহগো প্রণাম।"

মুক্তির প্রকার ভেদ

১। সালোক্য ২। সারূপ্য ৩। সাষ্টি ৪। সাযুজ্য ৫। কৈবল্য মুক্তি

কেহ কেহ সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি মূলতঃ এক প্রকার বলিয়া মনে করেন সারূপ্যকে বাদ দিয়া সালোক্য ভাবেরই অন্তর্ভূক্ত সামীপ্য নামক আর একটী মুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবৎ লোক প্রাপ্তির নাম সালোক্য। তাঁহার সমীপে বাস করার নাম সাযুজ্য, ব্রহ্মের কোনো প্রকার মূর্ত্তি বিশেষে মনের লয় করার নাম সাষ্টি। এই চারি প্রকার মুক্তি ইহার পর প্রাণায়াম রূপ আত্মকর্ম্মের পর অবস্থার যে মুক্তি লাভ হয় তাহা কৈবলাবস্থা বলা হয়। যাঁহার পক্ষে ঐরূপ মুক্তি লাভ সম্ভব হয়, তিনি ব্যতীত আমাদের মত সাধারণ লোকের ধারণা করা বাতুলতা মাত্র। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা বাতুলতা মনে করি।

মিলন

তিনি কত যুগ যুগান্তর হইতে আমার সহিত মিলনের আশায় আমার গৃহদ্বারে প্রতিদিন আসিয়া, সকাল সন্ধ্যায় আমার জন্য চুপটি করিয়া নীরবে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কত বৎসর, কত মাস, কত

শীত, কত গ্রীষ্ম, কত শুক্লপক্ষ, কত মধুযামিনী, কত সরস বরষাধারা সিক্ত ঘোর নিশীথ সময়ে তিনি আসেন তাঁহার আসার কখনও বিরাম নাই, আসেন প্রতি দিনই কিন্তু প্রতিদিনই আমার দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সাশ্রুনেত্রে ফিরিয়া যান। তবু আমাকে ডাকেন না, পাছে আমি লজ্জিত হই, সঙ্কুচিত হই, এমনই গোপন তাঁহার ভালবাসা। এমনই নীরব গম্ভীর তাঁহার প্রেম মহিমা। এই যে প্রতিদিন ফিরিয়া যান তার জন্য কোনো বিরক্তি নাই, এত উপেক্ষাতেও কোনো অভিমান নাই। ওগো লোকে তাই তাকে পাথর কাঠ বলে উপহাস করে।

আমার প্রেম লাভ করিবার জন্য, তিনি যাচকের মত প্রতিদিনই একবার না একবার আমার এই গৃহদ্বারে উদগ্রীব হইয়া ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া থাকেন। শুধু আপনার মনে মনেই বলেন, প্রিয় সখা, আজও সময় করিয়া উঠিতে পার নাই। আচ্ছা যাক্, আবার কাল আসবো। যুগ যুগান্তর, জন্ম-জন্মান্তর যখন এইরূপে কাটিয়া যায়, আমার ঘুম ঘোর কাটে না, তখন আমার প্রভু, আমার চিরপ্রেমিক আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দেন। কিন্তু এই যে তাঁহার স্পর্শ তাহা প্রেমিকের হস্ত স্পর্শ হইলেও আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে ঘা দিয়া যায়। ইহাই যে তাহার জাগাইয়া দিবার প্রয়াস, ইহাই যে আমরা সময়ে সময়ে ব্যথার মত পীড়ার মত অনুভব করিয়া থাকি। বোধ হয় ব্যথা না পাইলে আমরা জাগিতে জানি না। সুতরাং এ ব্যবস্থা তুই অন্য কিছু মনে করিয়া বিহবল হইয়া পড়িস না। জানিস, যিনি অগাধ করুণাময় তিনি আমাকে পীড়া দিবার জন্য, দন্ড দিবার জন্য ব্যথা দিতে আসেন না। পরন্তু মিলনের আশায় এ আমাকে জাগাইবার চেষ্টা মাত্র।

যখনই তাঁহার আমার প্রতি অগাধ ভালবাসার কথা ভাবি তখনই তাঁর করুণ নেত্র দুটি আমার হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠে, আমি বেদনার কথা সব ভুলিয়া যাই, তখন আত্মহারা প্রাণ গাহিয়া উঠে।

নিভৃত হৃদয়ে মম কে তুমি নিয়ত জাগো?

বিরহ ব্যাকুল প্রাণে অধীর হইয়া ডাকো?
নানা কাজে নানা সাজে সংসারে রয়েছি মজে,
কে তুমি তাহারি মাঝে আমার সঙ্গ মাগ।।

অধিকারী ভেদে পূজার তারতম্য।

সামান্য রূপ ও অরূপের (আদ্যন্ত রহিত) চিন্ময় রূপ সম্বন্ধে পূজার বিধি বর্ণনা।

(১)

শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমার সামান্য ও পরম দুইটি রূপ আছে জানিবে। যেটি হস্ত পদাদি বিশিষ্ট শঙ্খ চক্র গদাধারী রূপ তাহাই আমার সামান্য রূপ, আর যেটি আমার পরমরূপ সেইটি আদি অন্তহীন ও অনাময়, উহা ব্রহ্ম, পরমাত্মা শব্দে অভিহিত।

(২)

আত্মজ্ঞানের অভাবহেতু যতদিন তুমি প্রবুদ্ধ না হও, ততদিন তুমি চতুর্ভূজাকার আমার সামান্য রূপের পূজাদি করিও। এইরূপ বাহ্য পূজাদি করিতে করিতে যখন তুমি প্রবুদ্ধ হইবে তখন তুমি আমার আদ্যন্ত রহিত পরমরূপটি জানিতে পারিবে, যাহা জানিলে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

(৩)

আমি সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিত, দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায় লোকে আমাতে জগৎ দর্শন করে। আমার মায়াদর্পণে প্রতিবিম্বিত জগৎ রূপের আমি সাক্ষী মাত্র, মায়াদর্পণ সঙ্কুচিত হইলেই আর প্রতিবিম্ব দর্শন হয় না, সুতরাং প্রতিবিম্ব নষ্ট হইলেও সাক্ষীস্বরূপ আত্মা চির বর্ত্তমান ইহা যিনি জানেন তিনিই ঠিক জানেন।

(৪)

অতএব দেহধারণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় সেইটুকু ভোগ ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই এবং ভোগের বিচিত্র রূপতার জন্যও চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। মনে সর্ব্বদা সমতা রক্ষা করিয়া যথা প্রাপ্ত বিষয়ের অনুবর্ত্তন করিবে।

(৫)

হে অর্জ্জুন, নানাত্ব মল ত্যাগ করিয়া পরমাত্মময়তা লাভ কর। (চিত্তকে ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিতে পারিলে পরমাত্মভাবে স্থিতি লাভ হয়) সেই অবস্থায় কার্য্যই হউক বা অকার্য্যই হউক, তুমি কর্ত্তা নহে।

(৬)

সমুদয় প্রাণীর শরীরে কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও শ্বাস এই পঞ্চদোষ রহিয়াছে। কামাদি প্রাকৃতিক গুণ সমূহকে জয় করিতে পারিলেই জীবাত্মা দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভে সমর্থ হন। যোগ বলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ এই পঞ্চদোষ ত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়।

(৭)

অনেকে মনে করেন যোগাভ্যাসাদির মধ্যে যে প্রাণায়াম রহিয়াছে উহা অস্বাভাবিক। প্রাণায়াম বাস্তবিক অস্বাভাবিক হইলে ভগবান গীতার মধ্যে উপদেশ দিতেন না। ভগবান যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা বলিতে গিয়া প্রাণ যজ্ঞের কথা বলিতেছেন।

(৮)

কেহ কেহ অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে এবং কেহ বা প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে হোম করেন। এইরূপে কেহ কেহ সংযতাহারী যোগী প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া প্রাণাপানের উর্দ্ধ ও অধোগতি রোধ পূর্ব্বক কুম্ভক দ্বারা প্রাণ সকলকে প্রাণেতেই হোম করেন।

এইসকল যজ্ঞকারীগণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষে অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন - "কুম্ভকেহি সর্ব্বে প্রাণাঃ একী ভবন্তি। তত্রৈব লীয়মানেষু ইন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তি।" কুম্ভকে সর্ব্বপ্রাণ একীভূত হয়, সেই স্তম্ভন রূপ কুম্ভক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণ বায়ুতে লয় করিয়া থাকেন।

ক্রিয়ার পরাবস্থায় সব জানা শেষ

(পরাৎপর কাশীর বাবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গীতা ১৫শ অধ্যায় ১৫শ শ্লোক)

সকলের হৃদয়েতে নিঃশেষরূপে স্থিতি যাহা যোনিমুদ্রায় (গুরুবক্তগম্য) তত্রাপি গলায় মাদুলি প'রে অন্যত্র ঢেঁড়রা পিটিয়ে বেড়াচ্ছেন, বকে বকে। ক্রিয়ার পর অবস্থায় যে স্থিতি তাহাও হৃদয়েতে - তাহারই নাম জ্ঞান - যদি স্যাৎ সব জানিতে ইচ্ছা কর তো ক্রিয়ার পর অবস্থায় (স্থিতি) থাক। কারণ তখন কোন বিশেষের ইচ্ছা থাকে না - জানিবারও ইচ্ছা থাকে না। তুমি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুও থাকে না, আর সব যখন এক হইয়া গেল, আর সেই এক তুমি হইলে, তখন সবই এক হইল। জানা জানা করে লোকে খুন, সেই জানা – যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা ক্রিয়ার পরাবস্থায় থাকিলে জানিতে পারিবে। জানাজানা দুই বস্তু না হইলে হয় না - একজন জানবে আর এক জিনিষকে, ক্রিয়ার পর অবস্থাতে থেকে সব এক হয়ে, দুই তখন থাকে না, সুতরাং দুই না থাকিলে জানার অন্ত করা হইল। অতএব বেদান্ত পড়ে শুনে যে অবস্থা প্রাপ্ত হতে হবে, তাহা এক পল ভরের মধ্যে সমুদয় জানার অন্ত করে দেন। ওঁ ওঁ ওঁ তাহা জানিবার যা জানা উচিত, তাহাও ক্রিয়ার পর অবস্থায় আপনা আপনি জানিতে পারিবে। বেদ-বিদ্ ধাতু জানা, সেই বেদ গুরুকৃপা করিলে অর্থাৎ তুমি নিজে কৃপা করিলে এক পল ভরের মধ্যে জানিতে পারে। ওঁ - এমত উত্তম বস্তু হইতে লোকে বিমুখ রহিয়াছে। তিনি

যে অন্তর্যামীরূপে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমরা (যোনিমুদ্রার সাহায্যে) বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারি।

যোগী কর্ম্মের অতীতাবস্থায় (ব্রহ্মে) স্থিতিলাভ করিয়া দান, যজ্ঞ, তপস্যার ফল ইত্যাদি অতিক্রম করেন।

শুক্লা ও কৃষ্ণা গতিরূপ যে মোক্ষ ও সংসার প্রাপক তত্ত্ব, এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া যোগী বেদাদির, যজ্ঞাদির, তপস্যাদির ও দানাদির যে সকল পূণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, সে সকলকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ "ন বেদং বেদ ইত্যাহুর্বেদ ব্রহ্ম সনাতনম্" সেই সনাতন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া যোগী ব্যক্তি বেদকে অতিক্রম করেন এবং ন হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তুভূয়তে, ব্রহ্মাগ্নৌ হুয়তে প্রাণং হোম কর্ম্ম তদুচ্যতে। সেই ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণকে আহুতি দিয়া (বর্ত্তমান প্রাণের লয় করিয়া) প্রকৃত হোম শেষ করতঃ যোগী হোমকে অতিক্রম করেন ও ন তপস্তপ ইত্যাহুঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ তপোত্তমম; সনাতন অব্যক্ত ভাবরূপ যে ব্রহ্ম সনাতন (কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ স্থিতি) সেই ব্রহ্মে বিচরণ রূপ প্রকৃত তপস্যা দ্বারা তপস্যাদির ফলকেও অতিক্রম করেন এবং যোগী আত্মবিদ্যা দানরূপ নিঃস্বার্থ দান দ্বারা দানাদির ফলকেও অতিক্রম করেন এবং যোগী ব্যক্তি প্রকৃত বেদরূপ (সনাতন) ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া (কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ প্রাপ্ত হইয়া) গুণাতীত অবস্থা লাভ করতঃ তিন গুণরূপ বেদাদির যা ফল তাহা অতিক্রম করেন ও প্রাণ কর্ম্মরূপ হোম শেষ করতঃ কর্ম্মের অতীতাবস্থারূপ ব্রহ্মে অবস্থিতি করিয়া তপোলোকে (আজ্ঞাচক্রে) মূলভূত পরমস্থান রূপ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিজ্ঞান পদরূপ পরমাত্মপদে স্থিতিপ্রাপ্ত হন।

মহাশক্তি স্বরূপিনী শ্রীরাধিকা

কুন্ডলিনী শক্তি (প্রাণশক্তি) শাস্ত্রে ইহাকে কাম কলা বলা হইয়া থাকে। "সাপি কুন্ডলিনী শক্তি কামকলা স্বরূপিনী" বৈষ্ণবদের শ্রীরাধাই

কুন্ডলিনী শক্তি ''রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার'' ইনিই গীতাতে ''অপরা প্রকৃতি'' তন্ত্রের ইনিই 'মহাপ্রকৃতি'। বৈষ্ণব গ্রন্থেও আছে 'কামবীজ গায়ত্রীর তাহার উপাসন' পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় কামবীজ বা কামগায়ত্রীর প্রয়োজন। এই কামবীজের অর্থ বোঝা বড় কঠিন, অতিশয় গুপ্ত রহস্য। এখানে কাম আছে বটে, কিন্তু সে কাম বাহ্যবস্তু প্রভৃতিতে আসক্তি জনিত কাম নহে; তাহা কৃষ্ণ কাম। সে আসক্তি বা কামের নামান্তর হইল ভক্তি, যাহাতে চিত্তকে আত্মমুখী করে। এই কৃষ্ণ বা পরমাত্মাকে পাইবার জন্যই শ্রীরাধিকার আশ্রয় লইতে বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন। এই রাধিকাই শক্তি সাধক দিগের মা ভগবতী যিনি সমুদয় জগতের মূল। এই ভগবতী বিশ্ব বা বিরাট রূপে তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ রূপে অব্যাকৃত ও- প্রজ্ঞারূপে এবং অব্যক্তরূপে সর্ব্বরূপা। তিনিই মূল প্রকৃতিরূপে সমুদয় জগতের জননী। ইনিই দেবতা দিগের অভীষ্ট ফলদানার্থ দিব্য দেহ ধারণ করিয়া দানব দিগকে সংহার করেন। তিনি অব্যক্ত স্বরূপা ও নিরাকার হইলেও ভক্তগণ তাঁহাকে দিব্য দেহ ধারিণী ভক্তবাঞ্ছা কল্পলতিকারূপে দেখিতে পান। এই পরমা দেবী (কুন্ডলিনী) পূজার দ্বারাই সর্ব্বদেবদেবী পূজিত হইয়া থাকেন। এই মূল প্রকৃতি হইতে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী, মহাকালী প্রাদুর্ভূতা হন। এই ত্রিবিধ শক্তি হইতে ত্রিবিধ নাদ (ত্রিবিধ মহাতত্ত্বরূপ), ত্রিবিধ নাদ হইতে ত্রিবিধ বিন্দু (সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক অহংকার রূপে) সমুদ্ভূত হয়। সাত্ত্বিক অহংকার হইতে অপঞ্চীকৃত শব্দ জ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান ও গন্ধজ্ঞানরূপে, রাজসিক অহংকার হইতে অপথীকৃত শব্দশক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি ও গন্ধশক্তিরূপে, তামস অহংকার হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত আকাশ, বায়ু, জল, তেজ, ক্ষিতিরূপে তিনি অব্যক্তা, নিরাকারা ও সূক্ষ্মা, আর পঞ্চীকৃত স্থূলভূতাদিরূপে তিনি ব্যক্তা, স্থূলা ও সাকারারূপে প্রকটিত হইয়াছেন। প্রলয়কালে একমাত্র তমোগুণ থাকে সত্ত্বরজ যথাক্রমে লয় হইয়া যায়। তমোগুণ মূল প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ হয়, তখন প্রথমতঃ তমোগুণের আবির্ভাব হয়। এই তমোগুণ হইতে রজোগুণ, রজোগুণ হইতে সত্ত্বগুণ আবির্ভূত হয়।

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুপ্রকারে আলোচিত হইয়াছে কিন্তু আমাদের ন্যায় মহাবিজ্ঞ ও পন্ডিতবর্গের উর্বর মস্তিষ্কে এ সকল বিষয় বোধগম্য হইবে না বলিয়া অধিক আর কিছু লিখিতে সাহসী হইলাম না এবং এইজন্যই এইখানে ইহার উপসংহার করিলাম। বৈষ্ণব গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বহুলভাবে মহাপুরুষগণ আলোচনা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ঈশ্বরের তিন নাম।
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনার বলে
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।

ভাবুক কবির উক্তি

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে
এ বিশ্ব নিখিল তোমারই প্রতিমা।
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো,
মন্দির যাহার অনন্ত নীলিমা;
প্রতিমা তোমার গ্রহ, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী।
নিকুঞ্জ ভবন, বসন্ত পবন,
তরুলতা, ফল ফুল, মধুরিমা,
সতীর পবিত্র প্রণয় মধুমা,
শিশুর হাসিটি জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা শকতি,
তোমারই মাধুরী, তোমারই মহিমা।
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি,
সব দিকে মাগো, বিরাজিত তুমি,
কি গ্রীষ্মে, কি শীতে, দিবসে নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা।

বিধাতার পুতুল খেলা

শুধু দু'দিনেরই খেলা
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় খেলা।
আশার ছলনে কত উঠি পড়ি
কত কাঁদি হাসি, কত ভাঙ্গি গড়ি,
না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা।
আমাদেরও এই দেহ প্রাণ মন,
সুখ দুঃখ এই জীবন মরণ,
এ তো বিধাতার পুতুল খেলা,
শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা।

তপোবন

(১)

সঙ্গোপনে শক্তি বাড়ে, মন্ত্র গোপন তাই,
বহুকাল সঙ্গোপনে রাখতে কিছু নাই।
গোপন হ'তে হ'তে হয় সঙ্গোপনে লয়,
এতই গুপ্ত যোগক্রিয়া নাই বললেই হয়।

(২)

দেখে সবে বাসনারে বিষয় বাজারে
ভুলে গেলে ধর্ম্মনিষ্ঠা সহধর্ম্মিণীরে।

(৩)

দুঃখের অন্ত আছে কিন্তু সুখের অন্ত নাই ভাই।

অনন্ত স্বরগ আছে অনন্ত নরক নাই
নিরোধ দ্বারা, ইন্দ্রিয় মারা সুখটি কেমন ধারা?
দুধটি মেরে ক্ষীরটি করা সুখটি বাটি ভরা।

(৪)

ভাবছ ম'লে 'যাব পুড়ে'।
আমি ভাবছি যাব উড়ে।
মরণ তরণ কঠিন নয়,
শীতের সিনান, ভাবলে ভয়।

(৫)

ভক্তিরস ব্যঞ্জনটি, ব্রহ্ম জ্ঞানটি নুন,
প্রেমটি সাঁচি পানের খিলি,
জ্ঞানটি তাতে চূন।

(৬)

যেখানটায় সূর্য্য ঢাকা, সেইখানটাই ছায়া,
যেখানটায় আত্মা ঢাকা, সেইখানটাই মায়া।
যেটি ছায়া সেইটিই তো মায়া।
সেইটিই তো 'আমি আমার' সেইটিই তো কায়া।
জড়তাই কায়া - মূর্খতাই মায়া।।
জড়তা মূর্খতা জুটল আর
উঠল শোকের হাহাকার।

(৭)

'মুষিক মৃদ্ধ' আমরা নয়,
দেখতে শূকর, 'গজক্ষয়'।

দুই ব্রাহ্মণ স্নাইতে যাইতে মাঠে একটি শূকর দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তর্ক করিতেছেন একজন বলিতেছেন, এটা ইঁদুর অত্যন্ত বড় হইয়াছে, অন্যজন বলিতেছেন না, না, জান না, হাতীটা না খেয়ে

খেয়ে অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ ক্ষুদ্র কীট বড় হইয়া মানুষ হয় নাই। অমর দেবতাগণ নীচ বাসনায় ছোট হইয়া ক্ষুদ্র মানুষ হইয়াছেন।

(৮)

মধু চেন না মধুব্রত?
বিষ দেখাচ্ছে মধুর মত।।

(৯)

মনের ঘরে বারে বারে,
যেতে দিওনা যারে তারে,
আসছে যাচ্ছে, যাচ্ছেতাই!
মনের দোরে কপাট নাই?

(১০)

যোগ সঙ্গীত তারাই গায়, সুরটি যাদের লাগে,
এ শরীর-তানপুরা বাঁধতে শেখ আগে।

(১১)

প্রণাম কর দিনরাত
মেয়ে মাত্রে মায়ের জাত।

(১২)

নিয়তই নেত্র পাতা তোল আর ফেল,
স্থির করো, চক্ষু দুটী ব্যথা হয়ে গেল।

(১৩)

রাত্রিদিন তোল ফেল শ্বাস অনিবার,
বিষম বিরক্ত বোধ হয় না তোমার?

(১৪)

কি আশ্চর্য্য এ জীবন! কে মারে কে রাখে?
থাক্ বল্লেই যায়, আর যাক্ বল্লেই থাকে।

(১৫)

কভু জ্ঞান কভু কাম জোর করে মোর
একই ঘরে বসত করে সাধু আর চোর।

(১৬)

মনরে সোনা, মাণিকধন, চুপ কর আজ ধ্যানে বসি,
কাল তোমারে করবো রাজা
এনে দেব রাজমহিষী।

(১৭)

যেমন বৈশাখী রৌদ্রে শীতল জলে স্নান,
ক্রিয়ার স্নানে পরাবস্থায়
তেমনি জুড়ায় প্রাণ।

(১৮)

তূষের ঘরে মেজের চাল, অবিদিত কার আছে
প্রকৃতির গর্ভে তেমন উত্তম পুরুষ আছে।

(১৯)

স্বার্থের কথা যতক্ষণ পাপ পুণ্য ততক্ষণ
স্বার্থ সব ঘুচে গেল পাপ পুণ্য মুছে গেল।

(২০)

পুলিস ম্যানের লাশ পাহারা বড়ই হুসিয়ার,
আমার জেম্বা মৃত দেহ এদেহ আমার।

(২১)

মায়ার ফাঁসে ভয়, নইলেও ত নয়।
গলায় ফাঁস দিলে দিলে, গেঁরো দিও ঢিলে ঢিলে।।

(২২)

অনন্ত স্থিরতা উপর বিমান,
ক্রমেই নিম্নে কর্ম্মের তুফান।

(২৩)

চন্দন পাষাণে ঘষি, ক্ষয় করে দেহ,
ভক্তের এ কৃষ্ণ সেবা দেখেছ কি কেহ্?

(২৪)

যাবে যদি নিত্যধাম, রেলের গাড়ী 'প্রাণায়াম।'
রেলে বিপদ টাকা ঢালা;
গোগাড়ি নেও - জপের মালা।

(২৫)

নাচেরে মায়ার কোলে কামনা কামিনী
কাদম্বিনী কোলে যেন, খেলে সৌদামিনী।

(২৬)

ঈশ্বর পুরুষকার - দুইটিই এক দিক,
তোমার চেষ্টাই তাঁর চেষ্টা চেষ্টা করাই ঠিক।

(২৭)

মানুষের কাছে চেয়ো না সাধু, গাছের কাছে চেয়ো
গাছের মত মানুষ আছে, তারই কাছে যেও।।

(২৮)

শুনতে এলাম তোমার কাছে,
আমাতেও কি ব্রহ্ম আছে?
ব্রহ্ম কি আর গাছে ফলে? তোমাতেই তো যাদু,
পঙ্কে যেমন পঙ্কজিনী, মাছির কাছে মধু!

(২৯)

প্রাণের সার পরব্রহ্ম দেহখানি তার খনি,
মরচে ঢাকা মণি যেমন, নষ্ট দুধে ননী।।

(৩০)

ঐ লুকিয়ে চলেন বিশ্বময়ী চর্ম ঢাকা গায়,
ঘোমটা দিয়ে বৌটী যেন আড় নয়নে চায়।

কূটস্থের জ্ঞান না হইলে স্ত্রীপুত্রাদির সম্পর্ক ইহলোকেই শেষ হইয়া যায়।

অবোধ বালক যেমন বিষধর সর্প ধরে খেলা করে, জানে না যে সে দংশন করবে, তেমনি আমরা মায়া মোহের সর্প ধরে সংসার ক্রীড়া আরম্ভ করেছি। জানি না যে, সে মায়া সাপিনী দংশন করে পালাবে। সংসারের বড় সুহৃদ, বড় আত্মীয়, বড় আপনজন সেও হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়ে চলে যাবে। অতএব যিনি যথার্থ সুহৃদ তাঁকে জানতে হবে, চিনতে হবে। তাই গীতায় ভগবান বলেছেন "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তি মৃচ্ছতি।" অতএব তাঁকে আগে জানো, প্রাণ দিয়ে জানো, তার পরে দেখবে সংসারের সকল আত্মীয়তা সার্থক হয়েছে। স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন ঐ ভগবৎ সম্বন্ধ পেয়ে সব মধুময় হয়ে উঠেছে। সকল সম্বন্ধের সঙ্গে যদি ভগবদ সম্বন্ধ জড়িয়ে দিতে পারি, তবে সকল আত্মীয়ের সঙ্গে আবার মিলন হবে, তা যে অবস্থাতেই হোক। কখনও দেখা হয় ঋষির কুটিরে, কখনও যোগভ্রষ্ট হয়ে দেখা

হয় রাজপ্রাসাদে, কখনও দেখা হয় চিন্ময় আকাশে, কখনও দেখা হয় মনে মনে, অন্তরে অন্তরে, কখনও ব্যোমে, কখনও ভূলোকে, কখনও তেজময় দেবলোকে, কখনও আরও ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মলোকে, গোলোকে, বৈকুন্ঠে, শিবলোকে, কৃষ্ণলোকে। আর যদি ঈশ্বর সম্বন্ধ না থাকে তবে ইহলোকেই স্ত্রী-পুত্রের সহিত বিচ্ছেদ হয়ে যাবে (আলাউদ্দিনের মুকুরের মধ্যে পদ্মিনী দর্শনের মত) পরলোকে তো পরের কথা। অতএব কূটস্থচৈতন্যের জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে যাহাতে হয় তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। উপরোক্ত যত লোকের কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা সমস্তই কূটস্থ চৈতন্যেই বিদ্যমান। ইহা ভগবদবাক্য, অতএব অভ্রান্ত। (দোহাই তোমার)।

হৃদয়গ্রন্থি ভেদ সম্পর্কে ভগবদ বাক্য

শ্রীভগবান কূটস্থচৈতন্য বলিতেছেন, অস্ত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্ররূপ অস্ত্র অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে সকল বায়ু অস্ত্র রহিয়াছে (যে অস্ত্রের দ্বারা সাধন সমর হইয়া থাকে) তাহার মধ্যে আমি বজ্ররূপ অস্ত্র অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রাস্ত্ররূপে তেজের সহিত গমন করে এবং হৃদয় বিদীর্ণ করে তাহাই বজ্ররূপ অস্ত্র। ওঁকার রূপ চক্র হইতেছে বজ্র এবং ওঁকারের ক্রিয়া দ্বারা হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হইয়া থাকে বলিয়া ইহা হৃদয় বিদারক। ওঁকার চক্ররূপ বজ্রাকৃতি চিহ্ন কূটস্থ মধ্যে দর্শন হইয়া থাকে, ঐ বজ্রই আমি। ধেনুগণের মধ্যে আমি কামধেনু; (কামধেনু অর্থে ভগবানই সকলের মনস্কামনা পূরণরূপ অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকেন এ কারণ তিনি কামধেনু।) তিনি প্রজা উৎপত্তির হেতুরূপ কন্দর্প (ইচ্ছারহিত কাম) অর্থাৎ তিনিই অনিচ্ছার ইচ্ছায় তৎপর হইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া চিদাভাষ ক্ষেপণরূপে প্রজা উৎপত্তি করিতেছেন। তাই তিনি কন্দর্প। তিনি সর্পগণের রাজা বাসুকী অর্থাৎ দেহমধ্যে যে সকল নাগাদি বায়ু আছে, উহাই সর্পগণ স্বরূপ, তন্মধ্যে মূলাধারস্থিত যে স্থির বায়ু, ঐ বায়ু হইতেছেন বাসুকী স্বরূপ সর্পরাজ, উক্ত বায়ু মূলাধার চক্রে আধার রূপে রহিয়াছে অর্থাৎ যাঁহার উপর স্থিতি, তিনিই আধার (ব্রহ্ম) এবং তিনিই মূল। সেই মূলে যে বায়ু

রহিয়াছেন তিনি জগৎকে ধারণ করিতেছেন। ঐখানে স্থিতির স্থান না থাকিলে নিঃশ্বাস বাহির হইবার পর পুনঃ প্রবেশ হইত না. দেহের ঊর্দ্ধ অধঃ উভয় স্থানেই স্থিতিরূপ আধার রহিয়াছেন তাই আধেয়রূপ চঞ্চল প্রাণও ঠিকভাবে চলিতেছে উক্ত মূলাধারস্থ স্থির বায়ুও তিনিই, একারণ তিনি বাসুকী।

ভগবানের উপাসনা ও মুক্তিলাভের উপায়

শাস্ত্রমতে আমরা তিনপ্রকারে ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকি। যথা ঃ- মানসিক, বাচিক ও কায়িক। কেহ দৃঢ়ব্রত হইয়া প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা অভেদ চিন্তনের দ্বারা (ইহা মানসিক), কেহ বা স্তব মন্ত্রাদি দ্বারা কীর্ত্তন করিয়া (ইহা বাচিক) কেহ বা ভক্তি সহকারে প্রণাম দ্বারা (ইহা কায়িক) আমার উপাসনা করেন। কেহ কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা অর্থাৎ সমস্তই বাসুদেব এইরূপ জ্ঞানদ্বারা (কেবল চিন্তা দ্বারাই কিন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয় না, ব্রহ্মদর্শন করিতে হইলে‌ চিন্তাশূন্য হইতে হইবে) আমার উপাসনা করেন। কেহ বা অভেদ ভাবনা দ্বারা, কেহ বা পৃথক ভাবনাদ্বারা, কেহ বা সর্ব্বাত্মিক ভাব দ্বারা উপাসনা. করেন।

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য শ্রীভগবান। তিনি আমাদের সকলের আত্মা ও প্রিয়তম। তিনিই চরাচর ব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বা ভগবৎ চরণ স্পর্শ না হইলে জীবের মুক্তি নাই। ভারতবর্ষে মুক্তি লাভের জন্য যে উপায় প্রচলিত আছে তাহা প্রধানতঃ তিনটি। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিনটি পথ ব্যতীত জীবের সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে না। সংসারকে আমরা কেন ভালবাসি, তাহা আমরা বিচার করিয়া বড় একটা দেখি না। সংসার ভাললাগে, সংসার সকলে করিতেছে, গতানুগতিকভাবে এই সংসার করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা শাস্ত্রানুকূল বুদ্ধি নহে। শাস্ত্র বলিয়াছেন সংসার করিতে হইবে, আত্ম তৃপ্তির জন্য নহে - ভগবৎ প্রীতির নিমিত্ত। সকলে আমরা যে সংসার করিতেছি, এই সংসার খেলা খেলিতে

খেলিতে একদিন বুঝিতে পারিবই যে আমরা সংসারের জন্যই সংসার করি না, আমরা তাঁহাকে পাইব, তাঁহাকে বুঝিব বলিয়াই সংসারে আসিয়াছি। আমাদের ব্যক্তিগত আসক্তি বা অজ্ঞান মোহই এই জ্ঞান দৃষ্টির বাধক। এই বাধা না থাকিলে আমরা বুঝিতে পারিতাম আমরা কাহাকে চাই এবং কেই বা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। তিনিই ভগবান নিখিল বস্তুর সত্তা বা আত্মা।

শাম্ভবী মুদ্রা

গোরক্ষ সংহিতায় শাম্ভবী মুদ্রার নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়াছেন ঃ-
"নেত্রাঞ্জনং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ।
সা ভবেৎ শাম্ভবী মুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।।"
নেত্রস্থ অঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত করিয়া (অর্দ্ধনিমীলিত ভাবে স্থির দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া) অভ্যন্তরে আত্মার প্রতি লক্ষ্য থাকিবে, ইহাকে শাম্ভবী মুদ্রা বলে, ইহা সমস্ততন্ত্রে অতি গোপনীয়।

শাম্ভবী মুদ্রার ফল

স এব আদিনাথশ্চ সচ নারায়ণঃ স্বয়ং।
স চ ব্রহ্মা সৃষ্টিকারী যো মুদ্রাং বেত্তি শাম্ভবীং।।

যিনি এই শাম্ভবী মুদ্রা অবগত হন, তিনি সাক্ষাৎ আদিনাথ স্বরূপ, তিনি নারায়ণ স্বরূপ এবং সৃষ্টি কর্ত্তার ন্যায় অচল ও অটল ভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারেন।

(২)

বালস্য মূর্খস্য যথৈব চেতঃ স্বপ্নেন
হীনোহপি করোতি নিদ্রাং।
ততোগতঃ পথো নিরাবলম্বঃ
সা এব বিদ্যা বিচরন্তি শাম্ভবী।।

যেরূপ বালকগণ ও মূর্খের চিত্ত শয্যাবিহীন হইলেও নিদ্রাভিভূত হয়, তদ্রূপ যিনি বিনা অবলম্বনে গমন করিতে সক্ষম হন, তাঁহার সেই বিদ্যার নাম শাম্ভবী মুদ্রা।

অশ্বিনী কুমারদ্বয়

'অশ্বিনী কুমারদ্বয়' শব্দের অর্থ 'প্রাণ' ও 'অপান' রূপ 'যুক্তবায়ু'। এই যুক্ত বায়ুস্থ অপানের স্থান নাভি হইতে পদতল পর্য্যন্ত। অপান বায়ুর স্থান মধ্যেই (অর্থাৎ মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান চক্রতেই) জলতত্ত্ব ও ক্ষিতিতত্ত্বের উৎপত্তি। এই হেতু নকুল ও সহদেবকে 'অশ্বিনীকুমার সূত' বলা হয়। অতএব প্রাণাপানরূপ যুক্তবায়ুই অশ্বিনীকুমার পদবাচ্য। ক্রিয়াযোগরূপ আত্মকার্য্যের দ্বারায় ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে সাধকরূপ অর্জুন এই অশ্বিনী দ্বয়কে দর্শন করিয়া ছিলেন।

যজ্ঞোপবীত ধারণ

যিনি ইড়া, পিঙ্গলা আদিত্য হৃদয়ে ক্রিয়ার অতীতাবস্থায় ধারণ করেন, তিনি প্রাণ, মন, হৃদয় এই তিন দন্ড ধারণ করেন। তখন তিনিই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হন। এই 'ব্রহ্মসূত্র ধারণ'ই পৈতা ধারণ। তখনই তিনি প্রকৃত পবিত্র হন অর্থাৎ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হন।

শিখা ধারণ

মস্তকের পশ্চাৎ ভাগে যে শিখা রাখা হয় - ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি ঠিক মস্তকের পশ্চাতে একটা Sensation (স্পন্দনানুভূতি) অনুভব করেন। ব্রাহ্মণের মস্তক মুন্ডন করিয়া শিখা ধারণের ব্যবস্থা আছে। সেই শিখাই গ্রন্থি বা গাঁট দিয়া ঝুলাইয়া রাখার ব্যবস্থা আছে। সেইগ্রন্থি বা গাঁটটি কূটস্থ বা আজ্ঞাচক্রে যেন

স্পর্শ করে, তাহা হইলে ঐ ব্রাহ্মণের সর্ব্বদা তথায় মন থাকে। এখন আর স্পর্শ হয় না, সমস্ত মাথায় চুল রাখার জন্য তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

রাধার মানভঞ্জন

রাধা 'পরা-প্রকৃতি' অর্থাৎ 'শ্বাসের বহির্ভাগে আগম নিগমের কার্য্য' - ইনিই রাধা পদবাচ্য। এই 'রাধা' (বহিঃ প্রাণায়াম রূপ চঞ্চল প্রাণ) স্থির প্রাণের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অধীন। এই রাধার সম্বর্ধনার দ্বারা অর্থাৎ প্রাণের (বহিঃ প্রাণায়ামের) বৃদ্ধিকরণ রূপ অন্তর্মুখীন প্রাণায়াম দ্বারা 'নির্ব্বাণ' প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ শরই (চঞ্চলপ্রাণ) বাণ; বাণলিঙ্গ আত্মা; চঞ্চল প্রাণবায়ু যাহা বাহিরে চলে, তাহা স্থির প্রাণে অর্থাৎ ব্রহ্মযোনিতে মিলিত হয়। ইহাই 'নির্ব্বাণ' অর্থাৎ বাণ থাকে না। বাহিরের প্রাণের আগম নিগম রহিত হয়, রাধিকার পদদ্বয় (অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা) স্থির প্রাণরূপী শ্রীকৃষ্ণই ধারণ করেন। ইহাই ''শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন'' কারণ রাধার পদদ্বয় ধারণ করা হইল।

চঞ্চল মন ও স্থির মনের পার্থক্য

ছোট ছোট ছেলে মেয়ে যেমন বাজারে সাজান জিনিস দেখিয়া সবই চাহিয়া বসে, সেইরূপ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া দেখিতে পাইয়া শিশুর মত চঞ্চলপ্রকৃতি মন সবই চাহিয়া বসে। যাঁহাদের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রিয়া করিয়া ক্রিয়ার পর অবস্থায় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের আমাদের মত এরূপ বিষয় লোলুপতা থাকে না। পাইলে উত্তম না পাইলেও উত্তম এরূপ ভাব। বাসনা বলিয়া দেয় ইহা তোমাকে ভোগ করিতে হইবে, ক্রিয়া দ্বারা পর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন সাধকের বাসনা কামনার লেশ মাত্র থাকে না তখন এই পাগল ''আমিটাও'' থাকে না। যাঁহার অহং জ্ঞান নাই তাঁহার প্রাপ্তব্য অপ্রাপ্তব্যও কিছু নাই। তখন সবই শান্তি, লাখ

টাকা লাভ হইলেও আনন্দ নাই, লাখ টাকা লোকসান হইলেও কোন দুঃখ নাই (সবই শান্ত)। চাওয়া পাওয়া সবই মনের কার্য্য। সুখ-দুঃখ বোধ মনের কার্য্য, মান অভিমান মনের কার্য্য, যাঁহার মন নাই (ক্রিয়ার দ্বারা আত্মস্থ হইয়াছেন) তিনি চাওয়া পাওয়ার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন অথচ মজা এমন, ভগবৎ কৃপায় তাঁহার যদি কোন ভূত প্রকৃতির দ্রব্যের প্রয়োজন থাকে ভগবৎ কৃপায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মিলিয়া যায়। অথচ তাহা তিনি নিজেই জানেন না কোথা হইতে আসিল। ইহাই যোগক্ষম অবস্থা। এরূপ সুদুর্লভ অবস্থা লাভ করা প্রত্যেকের উচিত নয় কি?

অনিত্য বিষয় সম্পর্কে শোক করা উচিত নয়।

শ্রী ভগবান অর্জ্জুনকে অনিত্য বিষয়ের জন্য শোক করিতে নিষেধ করিয়া যে উপদেশ দিতেছেন তাহার মধ্যে একটি মূল্যবান উপদেশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছেন। (শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে এসম্বন্ধে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন তন্মধ্যে একটির উল্লেখ এখানে করা হইল।)

হে ভারত! ভূত সকলের আদি এবং অন্ততে অব্যক্ত ভাব অর্থাৎ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে জীব অব্যক্ত আত্মভাবে অবস্থিত (যথা ঃ- "গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম মাটি"); এবং অন্ত অবস্থায়ও অব্যক্ত ভাবেতেই অবস্থিত, অর্থাৎ দেহ ত্যাগের পর জীবাত্মা ঐ অব্যক্ত পরমাত্মাতেই গিয়া লয় হয় (যথাঃ - "প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদেন কালে, যেমন জলের

বিশ্ব জলে উদয় জল হয়ে জল মিশায় জলে'') আদি অন্ত দুয়েতেই অব্যক্ত ভাব, কেবল মধ্যে দেহে অবস্থান কালে প্রাণের চঞ্চলতারূপ ব্যক্তভাব বা ভূত ভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে। জীবদেহে ও আদি অন্ততে অব্যক্ত ভাব রহিয়াছে। আদি অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র, সেখানে স্থিরাবস্থারূপ অব্যক্ত ভাব এবং অন্তে (মূলাধারেও) ঐ স্থির অব্যক্ত আত্মভাব। সে ভাব যে কিরূপ তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না এবং উহা ভূতভাব নয়, আত্মভাব; সুতরাং আদি ও অন্ততে ভূতভাবের প্রকাশ নাই, তাই আদি ও অন্তে অব্যক্ত। ঐ অব্যক্ত আত্ম উহা চক্ষুরাদির অগোচর, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহা উপলব্ধির বিষয় নহে। এই বর্তমান চক্ষে উহা লক্ষিত হয় না বলিয়া, বাহ্যদৃষ্টির অগোচর। কেবল মধ্যে চঞ্চল প্রাণরূপ ভূত ভাবের প্রকাশ বা ব্যক্ত অবস্থা দেখা যাইতেছে। যেখানে চঞ্চলতা সেইখানেই 'আমি আমার' এই 'আমি আমার' যে অবস্থায় থাকে তাহাই ভূত ভাব বা ব্যক্তভাব; তদ্ব্যতীত সবই অব্যক্ত। জীবদেহে শ্বাসের যে ঊর্দ্ধাধোগতি হইতেছে, তাহার ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ আসিবার মুখে মূলাধারে স্থিতি, এই উভয় স্থিতিতে জীবের লক্ষ্য পড়িতেছে না; এ কারণ ভ্রমজালে পড়িয়া মধ্যাবস্থায় চঞ্চল ভাব লক্ষিত হইতেছে (উক্ত আদি অন্তের স্থিতি যতক্ষণ উপলব্ধি না হইবে ততক্ষণ চঞ্চলতার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ নাই) নচেৎ জ্ঞান চক্ষুতে দেখিতে গেলে যাহার আদি অন্ত স্থির, তাহার মধ্যাবস্থাও স্থিতি। অতএব এই মরীচিকাবৎ মধ্যাবস্থার চঞ্চল স্রোতে পড়িয়া অহং জ্ঞানে মুগ্ধতাবশতঃ বৃথা শোক বিলাপ কি জন্য? বরং শোক ত্যাগ পূর্ব্বক আদি অন্তের ন্যায় মধ্যাবস্থাকেও ঐ অব্যক্ত স্থিরে পরিণত করিবার চেষ্টারূপ সাধন-সমরে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। যেমত মুক্ত পুরুষগণেরা সর্ব্বদা ঐ অব্যক্ত স্থির অবস্থার প্রকাশ করিয়া জীবন্মৃতরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

ষষ্ঠ সঞ্চয়ন

প্রকৃত সন্ন্যাসী

''ধ্যানং শৌচ তথা ভিক্ষা
নিত্যমেকান্ত শীলতা''

ধ্যান, শরীর মনের শুদ্ধি, ভিক্ষান্ন ভোজন ও একান্ত বাস। চিত্ত শুদ্ধ বা স্থির না হইলে বিষয় বৈরাগ্য আসে না। বিষয় বৈরাগ্য ব্যতীত যে সন্ন্যাস তাহা কেবল পন্ডশ্রম ও পাপ জনক। উহার দ্বারা ইহকাল ও পরকাল দুইই নষ্ট হয়। সেই জন্য সন্ন্যাসী হইতে হইবে। সন্ন্যাসী সাজিলে চলিবে না, চিত্ত শুদ্ধ নহে বলিয়াই জ্ঞানও জন্মে না। সে জ্ঞান লাভার্থ সদগুরু প্রদর্শিত ক্রিয়াযোগ দ্বারা সাধন অভ্যাস করিলে স্বতঃই মনকে সন্ন্যাসী করিয়া দিবে। প্রকৃত সন্ন্যাসীর ধ্যান ও একান্ত শীলতা প্রয়োজন। ক্রিয়া অভ্যাস দ্বারা মনে ধ্যান নিষ্ঠা উৎপন্ন করিয়া তাহাকে একাকী করিয়া দিবে। সেখানে মনই থাকিবে না তো কোলাহল হইবে কোথা হইতে। মন হইতে বাসনার দাগ সম্পূর্ণ মিটাইতে হইলে, ধৈর্য্যের সহিত সাধনাভ্যাস করিতে হইবে। এই সাধনাভ্যাসের ফলে প্রাণ স্পন্দন রহিত হইলেই চিত্তের স্পন্দন আর থাকিবে না। চিত্তে স্পন্দন না থাকিলেও বাসনার সংস্কার বীজরূপে তখনও সুষুপ্ত থাকে। যে অবস্থায় সমস্ত বাসনা বীজ সুপ্ত থাকে, মাথা তুলিতে পারে না, তাহাই মহৎ আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধির অতি সূক্ষ্মভাব। বুদ্ধির এই অতি সুক্ষ্মাবস্থাতেই আত্মার স্পর্শ অনুভব হয়, তখনও সবিকল্পভাব। পরে যখন সেই স্পর্শের আর বিরাম থাকে না, তখনই সংস্কারের বীজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। উহাই শান্ত আত্মা বা নির্ব্বিকল্প সমাধি স্থিতি। ''ধৃতি গৃহীতয়া'' বুদ্ধি দ্বারা এই অবস্থাকে আয়ত্ত করিতে হইবে অর্থাৎ সাধনের দ্বারা যখন মন ও বুদ্ধি স্থির হয়, সেই স্থির বুদ্ধি বা একাগ্রতা দ্বারাই নিরোধ অবস্থা ধীরে ধীরে উপস্থিত হইতে পারে। ইহাই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতির শুদ্ধ চৈতন্যরূপ পরম

পুরুষের মধ্যে আত্ম নিমজ্জন। এই "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ" এই পুরুষ অপেক্ষা পর বা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। তাহাই কাষ্ঠা অর্থাৎ পরিশেষ এবং উহাই পরমাগতি। এই পরমাগতি কে প্রাপ্ত হইতে হইলে সাধন করিয়া যাওয়াই ঈশ্বর শরণাগতি। এই শরণাগতি যাহার থাকে তিনিই ভগবৎ কৃপা অর্থাৎ পরমাশান্তি লাভ করেন। ইহাই নিবৃত্তিরূপ মনের কৈবল্য পদ বা অভয় পরম পদ লাভ।

গান

না চাহিতে তুমি সকলি দিয়েছ
হে দয়াল ভগবান,
করুণা তোমার অন্তরে মোর
গাঁথা নিশি দিন মান।
জনমের আগে জননীর বুকে
অমৃত দিয়েছ ঢালি,
গগন ভরিয়া রেখেছ দয়াল
কোটি কোটি দীপ জ্বালি।
এত যে দিয়েছ তবুও মোদের
চাহিবার শেষ নাই,
যত আছে যার, সেই তত বার
শুধু চাই শুধু চাই।

ভগবানের স্বধামে মায়া মোহ শোক তাপ মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই নাই।

এই পরম সত্যকে বুঝিতে হইবে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, যেখানে মায়ার কুহক লীলা নিরন্তর কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া আছে. ক্রিয়ার পরাবস্থায় এই স্বকীয় ধাম, অতএব এই পথযাত্রীদের

প্রতি এই অনুরোধ যে তাঁহারা যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া না থাকেন। যাহাতে এই কৈবল্যাবস্থা লাভ হয় তারজন্য এই প্রাণের খুঁটিটিকে সবলে যেন ধরিয়া থাকেন। এই খুঁটি বা স্থির ভাব এবং শ্বাস বা গতি সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, যে শ্বাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে পারে সেই সংসার গতি অতিক্রম করিতে পারে। নিরন্তর শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে এবং পলকে পলকে জীব মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সাধারণ স্রোতে আপনাকে বহিয়া যাইতে না দিয়া সেই অচল লক্ষ্যে পৌঁছাইবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। পরিশ্রম করিলেই ধরিতে পারা যায়। একবার সেই অচল লক্ষ্যকে ধরিতে পারিলেই "অবিচলরাম" কে প্রাপ্ত হইবে, যিনি সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন।

তত্ত্বতঃ শব্দের তাৎপর্য্য

অনেকেই "তত্ত্বতঃ" শব্দে রাম কৃষ্ণাদিরূপে বা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় এই রূপ বলিয়া থাকেন, ইহা প্রকৃত তাঁহাকে "তত্ত্বতঃ" জানা নহে। এরূপ দেখা তো অনেকেই পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের ভ্রম যায় নাই বা বিষয়াভিলাষ নষ্ট হয় নাই। ইহা তাঁহার নিত্য স্বরূপ নহে, মায়াতনু বা বিগ্রহ মাত্র। "মায়াতনুম্ লোক বিমহনিয়াম্। ধত্তে পরা পরানুগ্রহ এষ রামঃ।।" তবে ইহা উচ্চ স্তরের সিদ্ধি সন্দেহ নাই। দেহাতীত কৈবল্যভাব, ঐ রূপ সিদ্ধি সাধকদের মধ্যে অতি অল্প লোকই ধরিতে পারেন।

গান

জয় শিব শঙ্কর জগত বন্দিত হর জয় জয়
পশুপতি প্রণমি চরণে।
দেবের দেবতা তুমি, ত্রিলোচন শূলপাণি,
মহাদেব নামে তুমি বিদিত ভুবনে।
সাগর মন্থনে যবে উঠিল গরল,
নীলকন্ঠ হলে তুমি পান করি হলাহল,

শিরে তব সুরধনী কণ্ঠে শোভিছে ফণী,
শত পাপ দূরে যায় চরণ স্মরণে।

প্রাণহি ভূতানামায়ু

এই প্রাণই জীবের আয়ু "প্রাণহি ভূতানামায়ু" এই প্রাণের তিনটি পদ যথা ঃ- ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না - সত্ত্ব, রজ, তম - . ব্রহ্মা, বিষ্ণু, (মহেশ্বর) রুদ্র। এই তিন পদ সুষুম্নায় থাকিয়া স্থির হইলেই এক হইয়া যায়। তখনই ক্রিয়ার পরাবস্থা বা অক্ষর পরমপদ বা পরব্যোম। এই অবস্থাতেই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই জ্ঞান হয়। এই মহেশ্বরই আত্মারূপে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। ইনিই কূটস্থরূপে কুলকুণ্ডলিনী জীবশক্তি।

বন্ধন ও মুক্তি

"কিবা সে বন্ধন যার মুক্তিতেই দুখ?
কৃষ্ণ প্রেমের বন্ধন সে মুক্তি চেয়ে সুখ।"

এই ভালবাসার নিত্য সত্য ভালবাসার চির বন্ধনই ভব বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়।

"কত ভালবাসা বাসি
আত্মার আত্মীয় তুমি,
তুমি আমি অবিনাশী।
কুটুম্বিতে নয়ত সখী,
নয় দুদিনের দেখা দেখি
চির সুখে আমরা সুখী
অনন্ত আকাশ বাসী।"

ব্রহ্মালোক

প্রথমে কিছুই ছিলনা, তখন একমাত্র ব্রহ্মাই ছিলেন, কিন্তু অন্য জ্ঞাতার অভাবে ব্রহ্মও না থাকার মতই হইয়া রহিলেন। এই অগোচর অনির্দেশ্য বস্তু হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইলেন ইনিই প্রথম পুরুষ নারায়ণ, কারণার্ণবশায়ী। কূটস্থরূপ কারণ সলিলে প্রথম দৃষ্ট হয়। তাঁহাকে ওঁকার মধ্যস্থ বলা হয়। এই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরই ওঁকার এবং তাহার অতীত বিদেহ পুরুষের প্রকৃতি। তখনও প্রকৃতি পুরুষ সমরস ভাবাপন্ন। পরে তাহা পৃথক হইয়া বিচ্ছিন্ন বন্ধন হইয়া গেল। কিন্তু তখনও উভয়ের মধ্যে চেতনাত্মক শিব ও জড়াত্মক প্রকৃতি বর্তমান রহিলেন। তাহাই বিভক্ত হইয়া দুইটি রূপ গ্রহণ করিল একটি পুরুষ ও একটি কন্যা হইল। তখন তাহাদের সঙ্কল্পাত্মক মন ও মনের কার্য্য নির্ব্বাহিক ইন্দ্রিয়াদি রচিত হইল। পরে মন চঞ্চল হইয়া অভিমানাত্মক বৃত্তি বশতঃ পুরুষ আপনাকে ও কন্যাকে পৃথক রূপে দেখিতে লাগিল। পরে পুরুষের মন কন্যার প্রতি আসক্ত হইল এবং মনের চাঞ্চল্য দ্বারা নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ পুরুষ কন্যার গর্ভে আপনিই জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই রূপে সকল জীবের উৎপত্তি হইল। ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার ও প্রাণ এই সমস্তই চঞ্চল ভাব। গতিশীল হইলেই আত্মার ঐ সকল উপাধি হয়। এই উপাধি বা আবরণ জীবের জীবত্ব। উপরোক্ত (ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, ও প্রাণ) আবরণ চতুষ্টয়ই বন্ধনের কারণ। এই আবরণ চতুষ্টয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই জীবত্ব নাশ হয়।

কবিতা

মন করিস নে গন্ডগোল
ওরে পাঁচ হাওয়া পাঁচ ছাওয়া ঘরে
পাঁচ ভূতে তুলেছে রোল
যদি পাঁচে পাঁচে পঁচিশের মানুষ
দেখবি তবে দুয়ার খোল।

ছেড়ে খুঁটিনাটি ময়লা মাটি মনটা
খাঁটি করে তোলঃ-
দেখ পাঁচ পথের এক রঙ্গের মানুষ
করতেছে লীলা কেবল।
ওরে কালো ধলো যত বলো পুরুষ মেয়ে সেই সকল।
যেমন নানা বুলি বাজায় ঢুলি বাজে কিন্তু একই ঢোল।

"জাগো ভবানী! জাগো ভবানী!
ভক্তের শিরে রাখো মা বারেক রক্তকমল অভয়পাণি!
পুণ্য এ ভুমি (দেহ) দানব প্রতাপে (কাম, ক্রোধ, লোভ)
(ইত্যাদি) মুছে আঁখি নীর অন্তর তাপে,
এ দুখ নিশায় জ্বাল মা ধরায়,
ধর্ম্মের পূত প্রদীপ খানি।
(কুটস্থ জ্যোতি)
তাথৈ তাথৈ নেচে এসে মাগো,
করবাল করে ভীমারূপে জাগো,
দানবের রণে সন্তান গণে,
শুনাও সঘনে মাভৈঃ বাণী।"

করুণা তোমার আকাশে বাতাসে রয়েছে ভুবনে ছড়ায়ে
মহিমা তোমার মাটীতে ধুলায় রয়েছে জড়ায়ে জড়ায়ে
নয়নে তুমিই দিয়েছ আলোক দেখিতে তোমার ধরণী,
কুপথ ছাড়িয়া চলিতে ধরায় যে দিকেতে শুভ সরণী;
আমি, তবু ভুলে যাই, তবু চলে যাই,
কুহেলীর পথে আপনা হারাই,
বল দাও দিতে জীবনপ্রবাহ তোমার চরণে গড়ায়ে।

আধ্যাত্মিক মণিকণা

"আপনা চিনিলে ভ্রম যাবেক তোমার,
জগৎ দেখিতে পাবে আপন প্রকার।
আমাতে যে বস্তুরূপে দেহ মাঝে আছে
সর্ব্বজীবে তদাকারে বস্তু রহিয়াছে।
অক্ষয় অব্যয় বস্তু আছে সর্ব্ব ঠাঁই,
রামের রমণ ছাড়া কোন প্রাণী নাই।"

সদগুরু প্রসন্ন হইলে তিনি সৎশিষ্যকে ইহা দেখাইয়া দেনঃ-

"এ হেন সদ্গুরু যবে হন কৃপাবান
শব্দাতীত পরব্রহ্ম চক্ষুতে দেখান।"
"এক পয়সার মাছ কিনলাম্
পিঁড়েই বসে বাছি,
কোন চিল্টা নিয়ে গেল
ঠাং তুলে তুলে নাচি।"

"একপয়সার মাথা পুঁটি,
তাতেই ভুলে আছি।
চিল্ হয়ে মা নিয়ে যাও,
ঠ্যাং তুলে তুলে নাচি।"

"বল দেখি মা - আমি কোথা ?
কোথা থেকে কচ্ছি কথা ?
কর্ষণ করে আকাশ ভূমি,
প্রাণ লতায় বীজ পুঁতলে তুমি!
যে দু একটি কচ্ছি কথা,
বেরুল দুটি কচি পাতা,
বাড়লে লতা চারি ভিতে

অনন্তে স্থান পারবি দিতে ?
রাখিস তখন অঞ্চল ধনে,
পাদ পদ্মের রেণুর কোণে।''

''গ্রন্থ পাঠে হয় না জ্ঞান,
জ্ঞান চাও ত শেখ ধ্যান।
হাজার জ্ঞানে জ্ঞান হবে না,
ধ্যান বিনা জ্ঞান দাড়াবে না।''
''কে বা গৃহত্যাগী কেবা গৃহ নিবাসী।
সন্ন্যাসেও গৃহী আছে, গৃহে সন্ন্যাসী।।
মানুষ গরু পশুপাখী
এই জাতিভেদ উঠাও দেখি।''

''যেমন বৈশাখী রৌদ্রে শীতল জলে স্নান,
ক্রিয়ার স্নানে ''পরাবস্থায়''--
তেমনি জুড়ায় প্রাণ।''

ভক্তি রস ব্যঞ্জনটি
ব্রহ্ম জ্ঞানটি নুন
প্রেমটি ছাঁচি পানের খিলি
জ্ঞানটি তাতে চূন।
''সঙ্গোপনে শক্তি বাড়ে
মন্ত্র গোপন তাই
বহুকাল সংগোপনে
রাখতে কিছু নাই
গোপন হতে হতে হয়
সঙ্গোপনে লয়
এতই গুপ্ত যোগ ক্রিয়া
নাই বললেই হয়।''

''আত্ম দরশনে দূরে যায় রূপ রং
প্রাণ মাঝে বাজে শুধু সোহং সোহং।''

''মনরে সোনা মানিক ধন,
চুপ কর আজ ধ্যানে বসি,
কাল তোমারে করব রাজা
এনে দেব রাজ মহিষী।''
''দুঃখের অন্ত আছে কিন্তু সুখের অন্ত নাই ভাই
অনন্ত স্বর্গ আছে অনন্ত নরক নাই
নিরোধ দ্বারা ইন্দ্রিয় মারা সুখটি কেমন ধারা
দুধটি মেরে ক্ষীরটি করা - সুখটি বাটি ভরা।''
''ভাবছ মলে যাবে পুড়ে
আমি ভাবছি যাব উড়ে
মরণ তরণ কঠিন নয়
শীতের সিনান ভাবলে ভয়।''

''মনের ঘরে বারে বারে।
যেতে দিও না যারে তারে।।
আসছে যাচ্ছে যাচ্ছেতাই।
মনের ঘরে কপাট নাই।।

''যোগ সঙ্গীত তারাই গায়,
সুরটি যাদের লাগে।
এই শরীর তানপুরা
বাঁধতে শেখ আগে।।

''কুল বধূ খোঁজে শুধু ভাল অলঙ্কার,
হার বালা কন্ঠমালা দেখে চমৎকার।
কি দরের স্বর্ণ সেই দেখিতে না জানে
পিতল গহনা কেহ গিল্টী করি আনে।

সেইরূপ নির্বোধ লোকে সাজায় সংসার
সে যে গিল্টী সোনা নাহি ভাবে একবার।।"

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আকাশের গায়,
সরসে সংকল্প প্রভা খেলিয়া বেড়ায়।
মগ্ন সে চৈতন্য রসে রস আছে যত,
ময়ূরের ডিম্ব রসে পেখমের মত।।

বিবিধ মেঠাই মূলে শর্করা যেমন,
পার্থিব সুখের মূলে কামিনী কাঞ্চন।
মূলে যে মাটির রস যত দেখ ফুল,
যত সে চেতন রস চৈতন্যই মূল।

"সুস্থির চৈতন্য অঙ্গে লীলা শক্তি ধায়,
ছুটে যেন ভাগীরথী হিমগিরি গায়।
চিদঙ্গে সুন্দরী মায়া ছুটিছে সাদরে,
যেমন ভাসন্ত স্রোত প্রশান্ত সাগরে।"

সূর্যের নিকটতম কিরণের মত,
ব্রহ্মের নিকটতম ব্রহ্মা বিষ্ণু যত।
অখন্ড চৈতন্য জানি অশেষ বিশেষ,
আগে কর মায়া মোহ বিভ্রম নিঃশেষ।

তোমার ভুবনে নাহি পুরাতন,
সৃষ্টির ধারা নিত্য নূতন।
কে তুমি, কে তুমি খোল আবরণ,
হেরি রূপ প্রাণ ভরিয়া।

"চাই মা আমি, বড় হতে

আর পারি না থাকতে বাঁধা
অহং বুদ্ধির শৃঙ্খলেতে।।
এই যে অহংকার মা আমার,
বেঁধেছে যা ঘোর মায়াতে।
ও মায়ায় জড়িয়ে মরি,
ছাড়িয়ে দেমা
আমি ছড়িয়ে পড়ি সর্ব্বভূতে।।"

"ঐ অনন্ত চিদাকাশে,
সাধুর প্রাণ মিশল ভাল।
যেন স্বচ্ছ নীলাকাশে,
ছড়িয়ে পল চাঁদের আলো।।"

সুহৃদ সর্ব্বভূতানাম্

১। জ্ঞানের চক্ষে মহাত্মারা দেখেন, সর্ব্বজীবের সুহৃদ, মঙ্গলাকাঙ্খী দয়াময় ভগবান প্রাচীনও নহেন নবীনও নহেন, তিনি সদা একরূপ, তবে যে যেমন ভাবে তাঁহাকে ভজনা করে তিনি তাহার পক্ষে তাদৃশ, নচেৎ নিরুপাধি ভগবানের আর উপাধি কি? এবং পরিমাণ হীন অনন্তের আবার পরিমাণ কি?

২। জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই ভগবানের রূপ। তিনি সর্ব্বভূতাশ্রয়স্থিত ও সর্ব্ব ভূতাশ্রয়। 'সর্ব্ব' ভগবানের একটি নাম।

পরাৎপর কাশীর বাবার এই ক্রিয়াযোগ সাধনে এমন বিশেষ কিছু শুচি অশুচি নাই। সুতরাং সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় এ সাধন করিতে দোষ নাই। উচ্চ কোটির সাধক বৃন্দ (কাশীর বাবার পদাশ্রিত) এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অদ্বৈতাব্যক্তাবস্থা

যেখানে সমস্ত এক হইয়া যায়, এক বলিবারও কেহ থাকে না। সুতরাং সেখানে সৃষ্টি নাই। যখনই ইচ্ছা জন্মিল তখনই আবার সৃষ্টি ক্রিয়া চলিতে লাগিল। ব্রহ্মের এই বিকল শক্তির নাম প্রকৃতি, ঐ প্রকৃতি যখন ব্রহ্মে লীন হয় তখন সৃষ্টি থাকে না, যখন প্রবুদ্ধ হয় তখন আবার সৃষ্টি কার্য্য চলিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে অদ্বৈতাবস্থা সম্পূর্ণ অব্যক্ত, তৎ সম্বন্ধে যখন কিছু বলিতে চাই তখনই দ্বৈতভাব আসিয়া পড়ে। সুতরাং ব্রহ্মকে বুঝিতে বা বুঝাইতে দ্বৈতভাব ব্যতীত হইবার নহে; অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দ্বৈতভাব আসিয়া পড়ে। কারণ পৃথক ভাবকেই দ্বৈতভাব বলা হয়। যেমন সাধক ও সাধ্য, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাদি। ব্রহ্ম যে আনন্দ স্বরূপ তাহা জানিবার উপায় নাই। জানিতে হইলে আর একজনের দরকার এক্ষণে ব্রহ্মাতিরিক্ত যখন দ্বিতীয় কোন সত্তা থাকিতে পারে না তখন ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই ব্রহ্মেরই অন্য একরূপ। সুতরাং ব্রহ্মকে কেবল ব্রহ্মই জানিতে পারেন।

"অদ্বিতীয় নিত্যানন্দ সর্ব্বরসাশ্রয়
নিজাস্বাদ কেমন সে নিজে বেদ্য নয়।
অগ্নির তাপিত গুণ অনলে না জানে
স্নিগ্ধ গুণ জল নিজে জানিবে কেমনে।
মধুর গুণ যেন নাহি জানয়ে মধুতে
নিজ আস্বাদন কেহ না জানে নিজেতে।
যেন সে আনন্দ সিন্ধু অদ্বৈত নির্ম্মল
নিজানন্দ কেমন সে স্বাদ কি শীতল।

শাস্ত্রবাক্য

প্রণব (ওঁকার অ,উ,ম, ইতি) হইতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা, মন্ত্র, পূজা,

তপস্যা, ধ্যান, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই সমুদয় সমুদ্ভূত হইয়াছে।

চতুর্ব্বেদ ছয় বেদাঙ্গ- (১) শিক্ষা, (২) কল্প (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) ছন্দঃ, (৬) জ্যোতিষ। মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি সেই চতুর্দ্দশ বলিয়া অভিহিত।

বেদাদি শাস্ত্র সমূহ ও পুরাণাদি গ্রন্থ নিচয় সামান্য কুলটার ন্যায় সকল লেখকের নিকটে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যাহা শাম্ভবী বিদ্যা, তাহা কুল-কামিনীর ন্যায় গোপনীয়।

সমুদয় বিদ্যা, সকল দেবতা ও সমুদয় তীর্থই এই দেহে সদা অবস্থিত রহিয়াছে। একমাত্র গুরুর উপদেশ বাক্য দ্বারা ঐ সকল তীর্থাদির জ্ঞানলাভ করা যায়।

কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি, ফুলের মধ্যে গন্ধ, জলের মধ্যে যেমন অমৃত আছে, সেইরূপ দেহের মধ্যে পাপ, পুণ্য শূন্য দেবতা অবস্থান করেন।

ইড়া ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা নাড়ী যমুনা এবং ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী সরস্বতী বলিয়া কথিত হন।

সমস্ত বিশ্বই এই দেহের মধ্যে আছে। তন্মধ্যে সাকার বস্তু লয় হইয়া থাকে, কিন্তু নিরাকার পদার্থের কিছুতেই বিনাশ হয় না।

শক্তি পাতালে, শিব ব্রহ্মাণ্ডে, আর কাল (মৃত্যু) অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। সেই কাল হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সমস্ত শাস্ত্রই উচ্ছিষ্ট হইয়া গিয়াছে - সমুদয় বিদ্যাও লোকের মুখে মুখে রহিয়াছে। কিন্তু চৈতন্য স্বরূপ অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান কখনও

উচ্ছিষ্ট হইবার নহে।

যে জ্ঞান দ্বারা বাক্য, কর্ম্ম ও মন লয় প্রাপ্ত হয় এবং স্বপ্ন ব্যতীত নিদ্রার ন্যায় বিনা অবলম্বনে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে ব্রহ্ম জ্ঞান বলে।

যে জ্ঞানের সাহায্যে একাকী, নিস্পৃহ, শান্ত, চিন্তাশূন্য ও নিদ্রা বিবর্জিত এবং বালকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট হয় তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে।

আমি সৃষ্টি, আমি কাল, আমি ব্রহ্মা, আমি হরি, আমি রুদ্র, আমি শূন্য এবং আমি সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন ব্রহ্ম।

আমি সর্ব্বাত্মক, আমি নিষ্কাম ও আকাশের ন্যায় বিশুদ্ধ স্বভাব, নির্ম্মল মনুষ্যরূপ যে ব্রহ্ম তাহাও আমি। এতে কোন সন্দেহ নাই।

যাঁহার প্রসাদে পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে সেই গুরুদেবের তুল্য মিত্র কেহই নাই, কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র, কি বন্ধু, কি স্বামী, কেহই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারে না।

যে গুরু শিষ্যকে একাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন, পৃথিবী মধ্যে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা দ্বারা ওই গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করতঃ তাঁহার ঋণজাল হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

বিশেষরূপে গোপনীয় যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা একমাত্র ভক্ত মাত্রকেই প্রদান করা যাইতে পারে, সদগুরু অপর কাহাকেও উহা প্রদান করিবেন না।

যে গুরু কর্ত্তৃক পরমপদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কি বিদ্যা, কি তীর্থ,

কি দেবতা কিছুই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না।

দয়াভাবে ব্রহ্মা, শুদ্ধভাবে বিষ্ণু, অগ্নিভাবে রুদ্র, ইঁহারাই তিন গুণ, তিন দেবতা।

পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে বিলীন হইয়া থাকে।

বাহ্যিক ধ্যানকে ধ্যান বলা যায় না। মন শূন্যময় হইলেই তাকে প্রকৃত ধ্যান বলা হয়। সেই ধ্যান দ্বারা সুখ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

নির্ম্মলী বীজের শুদ্ধতা

বেদান্তাদি শাস্ত্রমতে একমাত্র জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে আর সমস্ত পদার্থই অবিদ্যা বা মায়ার কার্য্য বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এতাবৎ বিদ্যাও মায়ার কার্য্য, সুতরাং বিদ্যা দ্বারা যদিও অবিদ্যা নাশ হইতে পারে, কিন্তু মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। ইহার উত্তরে এইরূপ বলা যায় যেরূপ নির্ম্মলী বীজের রেণু জলের মলিনতা দূর করিয়া পরে আপনিও বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ জ্ঞানাভ্যাস বলে অজ্ঞান কলুষরূপ জীবত্ব ভ্রান্তিকে নিরাকৃত করিয়া আত্মতত্ত্বের নির্ম্মলতা সাধন পূর্ব্বক জ্ঞান স্বরূপ বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হয়।

শাস্ত্রবাক্য

শ্বাসজয় তথা মোক্ষলাভের উপায়
হবন ক্রিয়া

১। জ্ঞাননিষ্ঠ বিরক্ত পুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও যোগাভ্যাস ব্যতীত তিনি দেবতা হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।

ভাগবতে আছে তপস্যা, মন্ত্রাদিতে যে সিদ্ধি হয় সে সমস্তই যোগ দ্বারা।

২। যোগলাভ করিবার জন্য শ্বাসজয় করিতে হইবে ইহা একবাক্যে সকল শাস্ত্রই উপদেশ দিয়াছেন। শ্বাসজয় ব্যতীত মনস্থিরের আর উপায় নাই। এই শ্বাসজয় প্রাণায়াম ব্যতীত হয় না। প্রাণায়াম ব্যতীত প্রাণবায়ু সুষুম্নাগত হয় না। প্রাণায়ামের অর্থও তাই, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। শ্বাস নির্গত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে না, এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে নির্গত হইবে না। এই কুম্ভকের অবস্থাই প্রকৃত হবন ক্রিয়া।

এইরূপ বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা নাড়ীচক্র বিশোধিত হইলেই সুষুম্নামুখ ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু তন্মধ্যে প্রবেশ করে। সুষুম্নায় প্রাণ প্রবেশের ফল - প্রাণ সুষুম্নায় প্রবেশ করিলে মনও শূন্যেতে প্রবেশ করে, তখন যোগীর সমস্ত কর্ম্ম উন্মূলিত হইয়া যায় অর্থাৎ যোগী আর কোন কর্ম্মে বাঁধা পড়েন না। এই প্রাণ জীবিত থাকিতে (চঞ্চল) ও মন মৃত (স্থির) না হইলে মনের প্রকৃত জ্ঞানের উৎপত্তিই হইতে পারে না। পুঁথি পাঠ করিয়া আমরা যে জ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকি, তাহা জ্ঞানের চক্ষে মোটেই মূল্য নাই। এ সম্বন্ধে মহাত্মা গোরক্ষনাথ কি বলিয়াছেন দেখা যাউক ঃ-

যতদিন প্রাণবায়ু মধ্য মার্গ সুষুম্নায় প্রবেশ না করে এবং প্রাণবায়ু রুদ্ধ হইয়া যতদিন বিন্দু স্থির না হয় এবং যতদিন ধ্যান দ্বারা তত্ত্ব সমূহ সাক্ষাৎকার না হয় ততদিন জ্ঞানের কথা বলা দাম্ভিকতা এবং মিথ্যা প্রলাপ মাত্র।

তপস্যা, তীর্থযাত্রাদি, দান, ব্রত কোন কার্য্যই প্রাণায়ামের ষোড়শ ভাগের একভাগ ফল দান করিতে পারে না।

শাস্ত্র বাক্য

যিনি অমৃত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার দুগ্ধের প্রয়োজন হয় না, আর যে জ্ঞানালোক সহায়ে পরম জ্ঞেয়রূপী পরাৎপর ব্রহ্ম বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার বেদাদি শাস্ত্র কোন প্রয়োজন হয় না।

যেমন তিলের মধ্যে তেল, দুধের মধ্যে ঘৃত, ফুলের মধ্যে গন্ধ, ফলের মধ্যে রস, সেইরূপ দেহমধ্যে পরমাত্মা সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছেন। যোগীরা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ইঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন।

ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ পূর্ণ এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া কল্পিত, ইহার কিছুই সত্য নহে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এই প্রকার জ্ঞানের সঞ্চার হইলেই আত্মানন্দ রূপ প্রকৃত সুখ লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

আমি তুমি বিভিন্ন অলীক নাম রূপ ত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মকে একমাত্র যথার্থ বস্তু বলিয়া হৃদয়ের সহিত অবধারণ করিতে পারিলেই কর্ম্ম বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায়।

শত শত উপবাস, জপ বা হোমাদি করিলেও জীবের মুক্তি লাভ হয় না কিন্তু আমিই ব্রহ্ম এই মাত্র জ্ঞানযোগ হইলেই জীব পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়া মুক্ত হয়েন।

এই সংসারে ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নাই, যে যোগী এই প্রকার অবগত আছেন, তিনি অনায়াসেই পাপ ও পুণ্য এই উভয়কেই দহন করেন। তাঁহার নিকট মিত্রামিত্র, সুখ দুঃখ, ইষ্ট অনিষ্ট, শুভ অশুভ, মান অভিমান, নিন্দা অনিন্দা, সবই সমান বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

হায় আপনজনে চিনলি না
মহামণি বিকিয়ে গেল, কাঁচের দরেও কিন্‌লি না।
ধ্বংস তোরে ডাক দিয়েছে, যম ধরেছে চুলে,
তাইত ফেলে সুধার বাটী, বিষ খেলি তুই গুলে;
চোখ মেলে চা ও অভাগা
ঘা দিয়ে তোর মনকে জাগা,
সবারে তুই মারলি চাবুক, মন মাতঙ্গে জিনলি না।

জরা মরণ হইতে নিস্কৃতি ও অধ্যাত্ম কর্ম্ম রহস্য

আমরা দেহ লাভ করিয়া আমাদের পরম সঙ্কট অবস্থা হইতেছে জরা ও মরণ। সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ জরায় জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আজ যাহাকে পরম সুন্দর দেখাইতেছে, কাল তাহা শ্রীভ্রষ্ট কদর্য্য হইয়া যাইতেছে। কাল বশীভূত জীব কালদ্বারা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। ভোগ সুখাসক্ত জীব কালকৃত এই সকল পরিবর্ত্তন পছন্দ করে না, সে সর্ব্বদা রূপ, রসে ডুবিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু এ বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। ভোগ করিতে করিতে আশা মিটিতে না মিটিতেই জীবন ফুরাইয়া যায়। অবশ হইয়া কোন অজ্ঞাত আবাসে তাহাকে চলিয়া যাইতে হয়, যে স্থান হইতে আর তাহার কোন সংবাদ পর্য্যন্ত পাইবার সম্ভাবনা থাকে না, এই জরা মরণের দুর্দ্দম্য প্রতাপে জীব সতত সন্ত্রস্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইতেছে। এই জরা মরণের কবল হইতে সকলেই রক্ষা পাইতে চাহে বটে কিন্তু তাহা হইতে নিস্কৃতি লাভের উপায় কি তাহা জানে না। বিষয় বিমুখ চিত্তে অনন্যশরণ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিলে তবে কাল ভয় দূর হইতে পারে। অধ্যাত্ম কর্ম্ম দ্বারা যখন ক্রিয়ার পরাবস্থা লাভ হইতে পারে, তখনই জীব অনন্য শরণ হয়। ইহাই ভগবদ্ আশ্রয়। দেহের সহিতই জরা-মরণ নিত্য সংযুক্ত হইয়া আছে। যিনি ক্রিয়ার পরাবস্থায় আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকেন

তিনি ব্রহ্মে অচল স্থিতিলাভ করেন, জরা মরণের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। আত্মদেবের ভজনা বা আত্মোপাসনা করাই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করা। এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হইবে, মনস্থির হইবে, কূটস্থ জ্যোতির প্রকাশ গ্রহণ দেখিতে পাইবে। সেই সকল সাধকই পরে আবার বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহাদের মধ্যে যে অধ্যাত্ম বা কূটস্থ রহিয়াছে উহা পরব্রহ্মের সহিত এক বা অভিন্ন ইহা বুঝিলেই জরা মরণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এবং যে অধ্যাত্ম কর্ম্মের দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার হয়, সেই অধ্যাত্মকর্ম্মেরও রহস্য বুঝা যাইবে।

মৃত্যু বিজয়

মা দুর্গে, শক্তি, শক্তি, শক্তি। ওমা শক্তি দেবী কত সুরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র দেখলাম বড়ই শক্তিমান; সে তাদের ভোগাসক্তি সে শক্তি নয় তোমার রাজ্যের যে শক্তি সে শক্তি বহু দূরে। সংযমেই শক্তি, ত্যাগেই শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তি ঋষিদের শক্তি, সেই ত্যাগশক্তিতেই রাজমুকুট ঋষিপদতলে লুন্ঠিত। মা মৃত্যু বিজয় এই শক্তির কার্য্য।

মা ত্যাগশক্তি কোথা হতে হবে? কিসের লোভে, কি লোভে, লোক ত্যাগ স্বীকার করবে? ধন, জন, ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য অন্য বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, কিন্তু সে ত্যাগ সামান্য মা, তোমার জন্য, তোমাকে লাভ করবার জন্যই কেবল সর্ব্বত্যাগ করা যায়। তুমি প্রাণ স্বরূপ, তাই তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পত্তির জন্য লোকে ত্যাগ স্বীকার করে বটে, সে শক্তি কেবল মোহশক্তি, মায়ার শক্তি আর তোমার জন্য যে মহাত্যাগ সেটি মহামায়ার শক্তি; তোমারই মহাশক্তি।

মা এখন ইশারাতেই সব বুঝে লও; আর অনেক কথা বলতে পারি না। বলতে গেলেই জননী, তোমার ঐ বালিশের কোণে যে

অনন্ত'' গুজে রেখেছ, সেই দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়, অমনি বলা কওয়া সব স্থির হয়ে আসে, অবাক হয়ে থাকি।

মা একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখছিলাম যেন আমাকে কুকুরে কামড়েছে; আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি। দেখছি ''জলাতঙ্ক'' হল। এর মধ্যে ঘুম ভেঙ্গেছে, তখন দেখি বুকটা ধড়ফড় করছে, প্রাণটা কাঁপছে, কিন্তু দেখলাম ''জলাতঙ্ক'' কোথাও নেই; একটি স্বপ্ন দেখছি মাত্র। তখন বল্লাম রাম রাম বল। বাঁচলাম, সবই স্বপন্ দেখছি মাত্র, কিছুই সত্য নয়। অমনি দেখি তুমি এসে উপস্থিত। এসেই বল্লে- কিরে জলাতঙ্ক দেখছিস কেমন ? আমি বল্লাম - মা শ্মশান বাসিনী খুব দেখেছি, এমন বিভীষিকা দেখিও না।

মা তখন তুমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, আর বল্লে দেখলি, ঐরকম সব। ঐ তোর জলাতঙ্কও যেমন, ভাবাতঙ্কও তেমনি। আমার মায়ার বিচিত্র কান্ডই ঐরূপ। তোরা ভাবিস জগৎটা মাটির গড়া, তা নয় মাটি ফাটি কোথাও নাই, সবই মনের সংস্কার দ্বারা গঠিত মাত্র। এই সংসার ঘনীভূত কল্পনা, দৃষ্টিদোষ, সংস্কার দোষেই সত্য বলে বোধ হয়। ও সব স্বপন, এখনি ঘুম ভাঙ্গবে আর বলবি - রাম রাম বাঁচলাম। কিছু সত্য নয়, সব স্বপন। পার্থিব মনোবৃত্তি স্থির হলেই মায়া মোহের জলাতঙ্ক দূর হয়ে যাবে, তখনই আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাবি। সে আর এক প্রকার মনোবৃত্তি। তাকে মনোবৃত্তি বলে না, তাকে বলে ''আত্মবোধ।''

মা আমার ভগ্নি যোগবাসিনীর কন্যা কনকলতা যখন প্রথমে ক, খ, পড়ে তখন তার দিদিমা পড়াচ্ছেন খুকি বল তালব্য শ, অমনি কনক বলে সে কি দিদিমা ? সেটা কি ? দিদিমা একটা তাড়া দিয়ে বল্লেন - আরে গেল; বল্ তালব্য শ। খুকি বল্লে তালব্য শ মানে কি দিদিমা ? কাকে বলে তালব্য শ। আগে বলে দে তবে পড়ব। দিদিমা শুনে অবাক হলেন। মা, আমিও তোমার কলিকালের ছেলে। ছেলে

বেলায় বলেছিলাম - মা জগৎ কাকে বলে? জগৎ মানে কি? আগে বলে দাও তবে জগতে প্রবেশ করব।

মা তুমি বুঝিয়ে দিলে যে, কোটী কোটী জগৎ কেবল আকাশ কুসুম, আদৌ তার অস্তিত্ব নেই, কেবল স্রোতের ন্যায় একটা মনোভাব বা সংস্কারের একটা স্রোত মাত্র চলেছে। সেই সংস্কারের উপর সংস্কার চাপিয়ে একটা ঘনীভূত স্বপ্নরঙ্গ বা অভিনয় বা ছায়া ক্রীড়া মাত্র উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু মিথ্যা হলেও ওর মূলে একটা সত্য আছে, সার্থকতা আছে, জগৎ বৃথা নয়।

বাজীকরের বাজী মিথ্যা, বাজীকর সত্য তার অংশরূপ ঠোলামালাও সত্য, তাতেই বাজীর সার্থকতা।

এই যখন বুঝলাম তখন সংসারে কোমর বেঁধে নাচতে নাচতে এসে আসরে নামলাম। এসেই মা তোমার ''দেবাসুরের যুদ্ধ'' পালা আরম্ভ করেছি। মা তুমি এসো। এবার যেন রক্তবীজ বধ হয়। মা খড়্গেশ্বরী এইবার তোমার রক্তবীজকে নিও মা, এই প্রার্থনা করি।

(ইহার নিগূঢ় অর্থ সাধারণের বোধগম্য নহে। আশা করি ক্রিয়ান্বিত সাধক সাধিকারা ইহার মর্ম্ম সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ক্রিয়ায় যিনি যেমন যেমন অগ্রসর হইবেন, তিনি ইহার মর্ম্ম ততটাই অবগত হইবেন। কূটস্থই কুলকুন্ডলিনী রূপে জীবশক্তি। এই রচনায় যে যে স্থানে 'মা' শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা ভগবান আত্মনারায়ণ কূটস্থ চৈতন্যকেই উপলক্ষ করিয়া লেখা হইয়াছে। ইনিই কূটস্থই কুলকুন্ডলিনী রূপে সমগ্র জীব জগতের মাতৃস্থানীয়া।)

মৃত্যুরূপ পার্শ্বদ্বার দিয়া ফাকঁতালে,
গ্রীনরুমে যায় জীব পট অন্তরালে।

নৃত্যকারী পুত্তলিকা জুড়াইতে প্রাণ,
পট অন্তরালে গিয়া করে সুধাপান।
অমৃত সিঞ্চন করি গ্রীনরুমে একা
ত্রিদিব দুহিতা "শান্তি" ঢুলাইছে পাখা।

জগৎ রঙ্গমঞ্চ

'এ মায়া প্রপঞ্চময়' ভব রঙ্গমঞ্চ মাঝে
রঙ্গময়ী মহামায়া যারে যা সাজান, সে তাই সাজে।
কর্ম্মক্ষেত্রে জীবমাত্র মায়াসূত্রে সব গাঁথা,
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্য্যা, কেহ ভ্রাতা,
কেউ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী মাতা,
কত রঙ্গে অভিনেতা, আসছেন কত সাজ সেজে।
যার যখন হতেছে সাঙ্গ, রঙ্গভুমির অভিনয়,
কাকস্য পরিবেদনা, তখন সে আর কারো নয়,
কোথা পুত্রের কাতর বিনয়, কোথা প্রিয়তমার প্রণয়
মানে না কোন অনুনয়, চলে যায় সাজ সজ্জা ত্যজে।

দেহ গেলে হয় কি ?
দাঁত পড়লে ভয় কি ?
দেহ গেলে আমরা তুষ্ট,
ফুল ঝরলে ফল পুষ্ট।
শুকায় নারে ফুল ফল,
আনতে যায় সব নূতন বল।
এ সংসারে সই, মরণ দেখলি কই ?
ত্রিতাপ তাপে ঐ ধানটা ফুটে খই।

কয়েকটি কবিতা

(১)

আপনা চিনিলে ভ্রম যাবেক তোমার
জগৎ দেখিতে পাবে আপন প্রকার।
আমাতে যে বস্তু রূপে দেহ মাঝে আছে
সর্ব্ব জীবে তদাকারে বস্তু রহিয়াছে।
অক্ষয় অব্যয় বস্তু আছে সর্ব্ব ঠাঁই,
রামের রমণ ছাড়া কোন জীব নাই।

সদগুরু প্রসন্ন হইলে সৎশিষ্যকে ইহা দেখাইয়া দেনঃ-
এহেন সৎগুরু যবে হন কৃপাবান
শব্দাতীত পরব্রহ্ম চক্ষুতে দেখান।

(২)

এক পয়সার মাছ কিনলাম
পিঁড়েই বসে বাছি
কোন চিলটা নিয়ে গেল
ঠ্যাং তুলে তুলে নাচি।

(৩)

বলদেখি মা - আমি কোথা ?
কোথা থেকে কইছি কথা ?
কর্ষণ করে আকাশ ভূমি
প্রাণ লতায় বীজ পুঁতলে তুমি।
যে দু একটি কচ্ছি কথা
বেরুল দুটি কচি পাতা।
বাড়ল লতা চারি ভিতে
অনন্তে স্থান পারবি দিতে ?
রাখিস তখন অঞ্চল ধনে,

পাদ পদ্মের রেণুর কোণে।

(৪)

গ্রন্থ পাঠে হয় না জ্ঞান,
জ্ঞান চাও তো শেখ ধ্যান।
হাজার জ্ঞানে জ্ঞান হবে না,
ধ্যান বিনা জ্ঞান দাঁড়াবে না।

(৫)

যেখানটায় সূর্য্য ঢাকা, সেই খানটাই ছায়া
যেখানটায় আত্মা ঢাকা, সেই খানটায় মায়া।
যেটি ছায়া সেইটিই ত মায়া,
সেইটিই ত, আমি আমার সেইটিই তো কায়া
জড়তাই কায়া মূর্খতাই মায়া
জড়তা, মূর্খতা জুটল আর
উঠল শোকের হাহাকার।

(৬)

বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আকাশের গায়
সরসে সংকল্প প্রভা খেলিয়া বেড়ায়
মুগ্ধ সে চৈতন্য রসে রস আছে যত
ময়ূরের ডিম্বরসে পেখমের মত।

(৭)

বিবিধ মেঠাই মূলে শর্করা যেমন
পার্থিব সুখের মূলে কামিনী কাঞ্চন।
মূলে সে মাটির রস যত দেখ ফুল
যত সে চেতন রস চৈতন্যই মূল।

(৮)

সুস্থির চৈতন্য অঙ্গে লীলাশক্তি ধায়,
ছুটে যেন ভাগীরথী হিমগিরি গায়।
চিদঙ্গে সুন্দরী মায়া ছুটিছে সাদরে
যেমন ভাসন্ত স্রোত প্রশান্ত সাগরে।

(৯)

সূর্য্যের নিকটতম কিরণের মত,
ব্রহ্মের নিকটতম ব্রহ্মা বিষ্ণু যত।
অখন্ড চৈতন্য জানি অশেষ বিশেষ
আগে কর মায়া মোহ বিভ্রম নিঃশেষ।

(১০)

তোমার ভূবনে নাহি পুরাতন,
সৃষ্টির ধারা নিত্য নূতন।
কে তুমি? কে তুমি? খোল আবরণ,
হেরি রূপ প্রাণ ভরিয়া।

উচ্চ ক্রিয়ান্বিতদের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা

সৃষ্টির আদি অন্ত ও মধ্যভাগ সবই আমি। এক অখন্ড আত্মা ত্রিকালে বর্ত্তমান। আকাশে আদি, অন্ত, মধ্যরূপ খন্ডভাব নাই। ঘট পটাদিতে আকাশ খন্ডিত বলিয়া মনে হইলেও ঘটপটাদি ব্যবধান আকাশকে যেরূপ খন্ডিত করিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মার অসংখ্য শরীরাদি উপাধি থাকিলেও এক অখন্ড আত্মাই চির বিদ্যমান, তাহাকে কোন বেষ্টনের মধ্যে আনা যায় না। ক্রিয়ার পর অবস্থাতে যখন দেহবোধ থাকে না তখন আদ্যন্ত মধ্য বিহীন আত্মার অখন্ড স্বরূপের বোধ হইয়া থাকে। এই অধ্যাত্মবিদ্যাই আত্মবিদ্যা, যদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

"বিদ্যা হি কা, ব্রহ্মগতি প্রদা যা" দেহকে অধিকার করিয়া আছেন বলিয়া আত্মাই অধ্যাত্ম। এই দেহ সম্বন্ধে ও আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান আত্ম ক্রিয়ার দ্বারাই লভ্য, এইজন্য এই ক্রিয়াসাধনকেও অধ্যাত্ম বলা যায়। এই আত্মক্রিয়ার দ্বারাই দেহাত্মবোধ নষ্ট হয় এবং সত্যবোধ বা পরমার্থ বোধের উদয় হয়।

ওঁকাররূপ শরীরের মধ্যে সর্ব্বত্রই কূটস্থের অনুভব হইতে পারে, কিন্তু দুইস্থানে কূটস্থ স্থির অর্থাৎ নিত্য, ভ্রূমধ্যে ও মূলাধারে। কূটস্থ অব্যক্ত ও নিত্য, তিনিই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাকেই ব্রহ্ম বলে। মূলাধারে বায়ু গমন করিলে সকল সৃষ্টির ক্ষমতা হয় অর্থাৎ দূরের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের অনুভব এই ঘটেতেই হয়। এই ব্রহ্মের সকলদিকেই মুখ, ইহার-এতাদৃশ পরাক্রম যে যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। চক্ষুর দ্বারা অরূপের রূপ কূটস্থ, বিন্দু দেখেন। কর্ণ দ্বারা অশব্দের শব্দ ওঁকার ধ্বনি শুনেন। জিহ্বা দ্বারা অরসের রস আস্বাদন করেন, অর্থাৎ বায়ুরূপ অমৃত (মিষ্ট) গলায় বোধ হয়। নাসিকায় অগন্ধের গন্ধ নানা দ্রব্যের ও পুষ্পের গন্ধ পান। ত্বক অস্পর্শীয় ব্রহ্মবায়ুর দ্বারায় স্পর্শ করেন। সেই এক ব্রহ্ম বস্তুই আপনাকে বহুভাবে অনুভব করেন।

সপ্তম সঞ্চয়ন

"মহাত্মাদের উপদেশ"

আম ফলের নীরস আঁটিও খাইতে ভাল লাগে না। উপরের খোসাটি খাইতে ভাল নয়। আঁটির গাত্রে ও খোসার ভিতরে যে পদার্থটি থাকে তাহাই আস্বাদন করিতে মিষ্ট লাগে। ইহার অর্থ এই যে,অদ্বৈতাব্যক্তাবস্থা যদিও মূল কারণ, কিন্তু আঁটির ন্যায় তাহা রস শূন্য শুষ্ক, এবং কেবল উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়ান আম ফলের খোসার ন্যায় তিক্ত ও কষায়, সুতরাং উচ্চ ও নীচ দুটি অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাবস্থায় যে ভজনানন্দ তাহাতেই লাগিয়া থাকিতে

হয়।যদি বল ভজনানন্দের রসে আমি কি প্রকারে ডুবিয়া থাকিব এবং সে পথের সন্ধান কি করিয়া পাইব? তার উত্তরে আমি বলিতেছি, প্রকৃত সদ্‌গুরুই তোমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিবেন, যদি বল সদ্‌ গুরুর সন্ধান কি করিয়া পাইব? তদ্‌উত্তরে আমি বলি তোমার প্রাণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই তোমাকে তাঁর চরণ প্রান্তে পৌছাইয়া দিবে।

কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তির প্রাধান্য দেখাইতেছেন।

১। গীতায় ভগবান কর্মের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন- হে অর্জুন,এই পৃথিবীতে অমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছু নাই, অকর্ত্তব্যও কিছুই নাই। আমার প্রাপ্তব্য অপ্রাপ্তব্যও কিছুই নাই,আপনি ও আমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত রহিয়াছি - ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ভগবান কর্ম্মের পক্ষপাতী, অলসতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেছেন না।

২। যোগের প্রশংসা করিয়াও বলিতেছেন- তপস্বী হইতে যোগী শ্রেষ্ঠ,জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। এমন কি কর্ম্মী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ- অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যোগী হও । ইহাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে তিনি যোগেরও পক্ষপাতী।

৩। জ্ঞানীরও প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন- জ্ঞানের তুল্য পবিত্র ইহসংসারে কিছুই নাই।

৪। ভক্তির প্রাধান্য দেখাইয়া বলিতেছেন- হে কৌন্তেয় তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার আমার "ভক্ত" কখন বিনষ্ট হয় না। ৫।জ্ঞান কর্ম্ম , ভক্তি ও যোগ গীতায় বহুল ভাবে বহুস্থানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, আমি অতি সংক্ষেপে সামান্য বর্ণনা করিলাম।

শঙ্কর ভাষ্যের বর্ণনা।

১। "যাবৎ জনমং তাবৎ মরণম্।
তাবৎ জননী জঠরে শয়নং,
ইতি সংসারে স্ফুটতর দোষ;
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।"

২। দিনযামিনৌ সায়ং প্রাতঃ
শিশির বসন্তৌ পুনরায়তঃ।
কালক্রীড়তি গচ্ছতায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা বায়ুঃ।।

৩। অঙ্গং গলিতং পলিতং মুন্ডং
দন্ত বিহীনং যাতং তুন্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিত দন্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভান্ডম্।।

৪। সুরবর মন্দির তরুমূল নিবাস:
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বোপরিগ্রহ ভোগ ত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ।।

৫। অষ্ট কুলাচল সপ্ত সমুদ্রা.
ব্রহ্মাপুরন্দর দিনকর রুদ্রা:।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ।।

৬। বালকস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত
স্তরুণ স্তাবৎ তরুণী রক্ত।
বৃদ্ধ স্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরম ব্রহ্মাণি কোহপি ন লগ্নঃ।।

৭। অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রেষা কথিতা নীতিঃ।।

৮। যাবদ্বিত্তোপার্জ্জন শক্ত
স্তাবন্নিজো পরিবারে রক্তঃ।
তদনু চ জড়য়া জড় দেহে
বার্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।।

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তা নশ্বর বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণী নৌকা।।

দিনমনি রজনী সায়ং প্রাতঃ
শিশির বসন্তৌ পুনরায়াত।
কালক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ু।।
ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।।
যাবৎ বিত্তোপার্জ্জন শক্ত
স্তাবন্নিজপরিবারে রক্তঃ।
পশ্চাদ যাবতি জর্জ্জর দেহে
বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং

বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং।
ভজগোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।।

পুনরপি জনমং পুনরপি মরণং
পুনরপি জননী জঠরে শয়নং।
ইহ সংসারে খলুদুস্তরে
কৃপাপারাবারে পাহিমুরারে।।
ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দং
ভজগোবিন্দং মূঢ়মতে।।

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ
পুনরপি পক্ষপুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্।।
ভজগোবিন্দং ভজগোবিন্দম্
ভজগোবিন্দং মূঢ়মতে।।

প্রথম শ্লোক হইতে পরপর ব্যাখ্যাঃ-

১। জন্ম পরিগ্রহ করিলেই মৃত্যু লিখিত আছে এবং মৃত্যুহইলে পরিত্রাণ নাই।কারণ পুনরায় জননী জঠরে প্রবিষ্ট হইতে হয়। অতএব মায়া কল্পিত বিশ্বে কেবল দোষই লক্ষিত হইতেছে।হে মানব !ঈদৃশ অবস্থায় তুমি কিরূপে সুখের ও সন্তোষের আশা কর।

২। দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, প্রভাত, শিশির, বসন্ত ইহারা পর্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে। কাল ক্রীড়া করিতেছে। তথাপি আশাবায়ু দূরীভূত হইতেছে না।

৩। অঙ্গ গলিত হয়, কেশ পক্বতা ধারণ করে, দন্ত পতিত

হইয়া যায় এবং দন্ড ধারণ করে অতি কষ্টে গমন করিতে হয়, তথাপি মানব আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

৪। পুত্র, কলত্রাদি সুখভোগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দেবমন্দিরে বা তরুমূলে অবস্থান, ধরা শয্যায় শয়ন, মৃগচর্ম্ম পরিধান এই সমস্ত আচরণ পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিলে কোন ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ অনুভুত না হয়।

৫। অষ্ট কুলাচার কি সপ্তসাগর, কি ব্রহ্মা, কি পুরন্দর কি দিনকর, কি রুদ্র, কি তুমি, কি আমি কি এই জগৎ সকলই কাল বশে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অতএব এই মিথ্যা সংসারে কেন শোক প্রকাশ করিতেছ?

৬। হায় বালকেরা ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, যুবকগণ যুবতীসহ প্রমোদে মাতিয়া রহিয়াছে এবং বৃদ্ধগণ সদা সংসার চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে। অতএব জগতে কেহই পরম ব্রহ্ম পদে মনোনিবেশ করিতেছে না।

৭। যে অর্থের জন্য তুমি প্রতিদিন ভাবনা কর উহা কেবল মাত্র অনিষ্ট সম্পাদক সন্দেহ নাই, উহার দ্বারা কিছুমাত্র সুখের আশা নাই। কেননা পুত্র হইতেও ধনবান দিগের ভীতি সঞ্চার হইতে দেখা যায়, এই নীতি সর্ব্বত্রই পালিত রহিয়াছে।

৮। যাবৎ ধনোপার্জনে সমর্থ হইবে তাবৎকাল কি পুত্র, কি কলত্র সকলেই অনুরক্ত থাকিবে। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় জরাদ্বারা দেহ জর্জরিত হইলে তখন উহারা আর কেহই তোমার সংবাদ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিবে না।

অষ্টম সঞ্চয়ন

জ্ঞানের কথা

১) জ্ঞানের চক্ষে মহাত্মারা দেখেন, সর্বজীবের সুহৃদ, মঙ্গলাকাঙ্খী দয়াময় ভগবান প্রাচীনও নহেন নবীনও নহেন, তিনি সদা একরূপ, তবে যে যেমনভাবে তাঁহাকে ভজনা করে তিনি তাঁহার পক্ষে তাদৃশ। নচেৎ নিরুপাধি ভগবানের আর উপাধি কি! এবং পরিমাণহীন অনন্তের আবার পরিমাণ কি?

২) ভ্রু যুগলের মধ্যে যে স্থানটি থাকে তাহাকেই মনস্থান বলা হইয়া থাকে। সে স্থানে মনকে রক্ষা করিলে ক্রমে বিনাবলম্বনে মনস্থির হইয়া যায়, তখন আর মনের চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ থাকে না। মনস্থির হয় না বলিয়াই অবিরত নিমেষ পড়িতেছে। দৃষ্টি স্থির হইলে নিমেষ বর্জিত অবস্থা লাভ হয়।

৩) জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই ভগবানের রূপ। তিনি সর্বভূতস্থিত এবং সর্বভূতাশ্রয়। 'সর্ব' ভগবানের একটি নাম।

৪) পরাৎপর কাশীর বাবার এই ক্রিয়া যোগ সাধনে এমন বিশেষ কিছু শুচি অশুচি নাই। সুতরাং সর্বদা সর্বাবস্থায় এ সাধন করিতে দোষ নাই। উচ্চ কোটির সাধকবৃন্দ (কাশীর বাবার পদাশ্রিত) এরূপ বলিয়া থাকেন।

৫) বায়ুই জীবের আয়ু, বায়ুই জীবের বল, বায়ুই শরীরীগণের বিধান, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব এবং বায়ুই প্রত্যক্ষ দেবতা।

আপেক্ষিক মুক্তি

মুক্তি কাহাকে বলে? আমরা সর্ব্বদাই মুক্তি চাই অথচ

পাইনা। কেন পাই না, তবুও কেন চাই, আর যাহা পাই না তাহাই বা চাই কেন — ভক্তজনের এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য শ্রীমদ্ যুগবশিষ্ঠ দেব বলেছেন — " আমার মনে হয় ইহাই শেষ প্রশ্ন। মুক্তির পর আর কিছু থাকে না। সেখানে সংশয়ের বন্ধন নাই, আকাঙ্খার অপূরণজনিত বেদনা নাই, সন্দেহজনিত প্রদাহ সেখানে নিব্বাপিত হইয়া যায়, এইজন্যে মুক্তিকে নির্বাণ বলা হইয়া থাকে। যদিও আবার নিব্বাপিত অগ্নি মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া ওঠে, কিন্তু এমন মুক্তি আছে যাহাকে মহা নির্বাণ বলা হয়। তাহা আর কোনদিন জ্বলে না। মোটামুটি মুক্তি কথাটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম — আপেক্ষিক মুক্তি, দ্বিতীয় — জীবন্মুক্তি, তৃতীয় — পরামুক্তি। জীবন্মুক্তি আবার তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর — "তৎসৎ" দ্বিতীয় স্তর সোহহং, তৃতীয় — হংস। প্রথম স্তর — স্থূল উপাসনা, ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাসে দৃঢ় হওয়া। দ্বিতীয় স্তর সূক্ষ্ম জ্যোতির্ভূমিতে আরোহণ — জীব তাঁরই অংশ এই সত্যে উপনীত হওয়া, তৃতীয় স্তর — কারণ ক্ষেত্র, অংশই মূল, অংশই ব্রহ্ম, আত্মা ইত্যাদি, আর পরামুক্তি কারণাতীত — মহানির্বাণ, ইহা উপভোগ্য নহে। আকাশে বাতাসে বিশ্বের সর্বত্রই আপেক্ষিক মুক্তির লড়াই চলিতেছে। ঐ দেখ রোগ শয্যায় যন্ত্রণা কাতর রোগী চিৎকার করিতেছে — আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমায় মুক্তি দাও। কারাগারে অনুতপ্ত বন্দী কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিতেছে — মুক্তির আর কত দেরী? দারিদ্র্য নিপীড়িত অনাহার ক্লিষ্ট বহু সন্তানের জনকজননী কাতর কণ্ঠে বলিতেছে — হে ভগবান, আর সহ্য করিতে পারিতেছিনা, আমাদিগকে মুক্তি দাও। তুচ্ছ মেছুনীর মাছ বিক্রয় হইতেছে না'। সেও বলিতেছে — ঠাকুর অনেক বেলা হয়ে গেল, এই মাছ কয়টা বেচিয়া দাও আমি আজকের মত মুক্তি পাই' এই যে মুক্তির প্রার্থনা, ইহাই আপেক্ষিক মুক্তি। অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা। ইহার ভাব অর্থে ষ্ণিক = আপেক্ষিক। অপ অর্থে অন্য। ঈক্ষা অর্থে দর্শন করা। অন্যকে দেখিয়া যে ভাবের সৃষ্টি হয় তাহাই আপেক্ষিক ভাব। মনে কর এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তুমি একা উদ্ভূত হইলে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, আকাশ, বাতাস, জল, মাটি কিছুই নাই' তোমার আশে পাশে রূপ,

রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ কিছুই নাই। তোমার তখন দুঃখ, কষ্ট, দৈন্য কিছুই অনুভূত হয় না, অন্য আর একটিকে দেখিয়া তোমার মধ্যে তুলনাবোধ জাগিয়া উঠিল। ভালোমন্দ বিচার আসিল। ইহাই আপেক্ষিক কর্ম্ম। এই আপেক্ষিকতাবোধ আছে বলিয়াই বিশ্ব সচল অবস্থায় ছুটিতেছে।' — আচার্য্য শ্রীমদ্‌যুগবশিষ্ঠদেব

ক্ষ্যাপা সাধুর কথা

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে কাশীর ক্ষ্যাপা সাধুর উদ্ধৃতি ভক্তগণের জ্ঞাতার্থে পরিবেশিত হল —

সৃষ্টির মূলে আছে ইচ্ছা। ইচ্ছা ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না, এই ইচ্ছা কামও হইতে পারে অথবা প্রেম হইতে পারে, কাম হইতে সাধারণ সৃষ্টি হয়। উভয়ই সৃষ্টির অন্তর্গত। ভাবরাশির কম্পন বিশিষ্ট ইচ্ছাপ্রভাব ঘনীভূত হইয়া বিন্দুর আকার ধারণ করে। অবশ্য যে কোন ভাবই বিন্দুরূপে সংহত হইতে পারে — বিন্দু রচনা সম্পন্ন হইলে ঐ বিন্দুটি সঞ্চারিত হয় ত্রিকোণে, ইহারই নামান্তর যোনি। এই বিন্দু মস্তকে, বক্ষস্থলে, নাভিমূলে অথবা লিঙ্গ মূলে প্রস্ফুটিত হইতে পারে। তৎ-তৎস্থান হইতে উৎসর্গের ফলে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হয়। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদের ইহাই মূল কারণ, যখন বিন্দু রচনা হইল, তখন আর ভাব নাই— ভাব শূন্য হইয়াছে, কম্পন নিবৃত্ত হইয়াছে, ভাব ও বিন্দুর মধ্যে যে ব্যবধানটি আছে তাহার নাম শূন্য। এই শূন্যকে ভেদ করিতে পারিলে ভাবকম্পন বিন্দুরূপে পরিণতি লাভ করে। বিন্দুতে ঐ কম্পন নিরুদ্ধ গতি হইয়া বর্ত্তমান থাকে। পরে ঐ গতির বিকাশ হয়, ইহার নাম রেখা — ইহা সরল রেখা, এই গতি পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে আর তখন ইহা থাকিবে না, ইহা শূন্য হইয়া যাইবে। তখন অক্ষরের বিকাশ হইবে। বিন্দু এক, রেখা দুই, বৃত্ত তিন — ক্রুশ চারি ইত্যাদি এই প্রকার দশটি মাপ বা মান আছে, নয় এর পরেই শূন্য সহকারে দশ হয়, বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া রেখা হয়, যেমন প্রদীপের প্রগ রেখা সরল পথে চলিতে

চলিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বাঁকিয়া যায় ও বৃত্তের আকার ধারণ করে, বৃত্ত পূর্ণ ভাবে গঠিত হইবামাত্রই কেন্দ্র ফুটিয়া ওঠে, তখন কেন্দ্রের আকর্ষণে ব্যাস হয়। আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে দুটি ব্যাস হয় ও উহারা পরস্পর কাটাকাটি করে। উভয়ের পরস্পর যোগবিন্দু অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত কেন্দ্র গুরুত্বাকার ধারণ করে। এইরূপ ক্রমশঃ তখন উহা পাহাড়, পর্ব্বত ভেদ করিতে পারে।

মহাপুরুষগণ সকলেই কি বর্ণিত এই সকল মান ভেদ করিয়া থাকেন? ক্ষ্যাপা সাধুর উত্তর — সকলের অগ্রগতি সমান হয় না। বুদ্ধদেব ৮টি মান লঙ্ঘন করিয়া নবমে যাইয়া আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অনেকে আট পর্য্যন্তও যাইতে পারে না। ক্ষ্যাপা সাধু আরও বলেছেন — এই যে শূন্য কথা বলিলাম, ইহার সংখ্যা হয় না। তবে মোটামুটি ৩টি সংখ্যার কথা বলা চলে। প্রথমটি শূন্য বা জাগতিক শূন্য, দ্বিতীয়টি মহাশূন্য, তৃতীয়টি অনন্ত শূন্য। যেখানে একটা গতির অবসান হয় সেইখানেই শূন্য। সেইখানেই বিন্দু হইয়া থাকে। পুনরায় গতিপ্রাপ্ত হইয়া শূন্য ভেদ করিয়া চলে, সেটা শেষ করিলে আবার শূন্যপ্রাপ্ত হয়।

শ্রদ্ধা এলেই সাধনায় বীর্য্য আসে

শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে অভ্যাস করলে সবই সম্ভব হয়। জরায়ুর জীবাণু ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধিত হয়ে ভ্রূণে পরিণত হয়। ভ্রূণ অবয়ব বিশিষ্ট হয়, অবয়ব বিশ্বে প্রসূত হয়। ভূমিষ্ঠ শিশু অজ্ঞান, অসহায়, গতিহীন, স্তন্যপানে অসমর্থ। এই অসহায় শিশুই ক্রমবর্দ্ধমান অভ্যাস যোগেই একদিন পূর্ণাবয়ব দিগ্বিজয়ী বীররূপে পরিণত হয়, ইহা প্রকৃতির খেলা, বিশ্বজননীর ইচ্ছা, এই অভ্যাসের ফলে জীবের মধ্যে যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তার একটি সুন্দর উদাহরণ আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম, এক গৃহস্থের একটি দুরন্ত গাভী ছিল। সে দশ হাত দড়ি দিয়ে সেই গরুটিকে নির্দিষ্ট একটি স্থানে গোঁজে বাঁধিয়া

রাখিয়া আসিত, গরুটি সেই দশ হাত পরিধিতে বাইরে যাবার জন্যে টানাটানি করত। কিন্তু প্রতিবারই তার গলায় টান পড়ত। গরুটি ক্রমশঃ পরিধির বাইরে যাবার অভ্যাস ভুলে গেল। এখন সে স্থিরভাবে ঐ পরিধির মধ্যেই বেড়ায়। এক সময়ে একদিন চোর এসে দড়িটি গরুর গলা থেকে খুলে নিয়ে চলে যায়। অপরাহ্নে গৃহস্থ গরু আনতে গিয়ে দেখে যে গরুটি গলায় দড়ি বাঁধা না থাকলেও সেই দশ হাত পরিধির মধ্যেই চরে বেড়াচ্ছে। বৎস, তুমিও যদি তোমার ঐ দুরন্ত মনের গলায় দড়ি বেঁধে তাকে তোমার আরাধ্য দেবতার উপর বসিয়ে দাও, তাহলে দেখবে অভ্যাসের ফলে ছোট বড় যেমন পরিধির দড়িতে তুমি তাকে বেঁধে দেবে ঠিক সেইটুকুর মধ্যেই সে ঘুরে বেড়াবে , ছাড়া পেলেও সে আর তার বাইরে যাবে না, – আচার্য্য শ্রীমদযুগবশিষ্ঠদেব

শিব ও দশমহাবিদ্যা রহস্য।

শিব হল তিন রকম। প্রথম হলেন কৃষ্ণশিব। সৃষ্টির আদি কারণ যখন তার নিজের কাছেই অজ্ঞাত, তখন তিনি অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ধারণার অতীত বলে তিনি বর্ণহীন কৃষ্ণ। উৎসের সেই অহংকার শূন্য অবস্থাই পুরুষের কৃষ্ণরূপ। উপনিষদের তুরীয়াতীত পর্য্যায়ের।

অব্যক্ত কারণে সেই কৃষ্ণপুরুষের মধ্যে আত্মজ্ঞান হয় তখন তিনি জ্ঞানের প্রতীক শ্বেত বর্ণ হন। তখন তিনি শ্বেতশিব।

এই শ্বেত শিবের মধ্যে যখন ইচ্ছার তরঙ্গ জাগতে চায় তখন তিনি হন শিব লিঙ্গ অর্থাৎ সৃষ্টির সূক্ষ্মতম অবস্থা । লিঙ্গ অর্থই হল সূক্ষ্ম। শিব লিঙ্গে লিঙ্গ একা নয়, সঙ্গে আছে যোনী। যোনী আছে লিঙ্গকে ঘিরে অর্থাৎ ইচ্ছা কেন্দ্রকে আবরিত করে আছে। কেন্দ্র থেকে ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। লিঙ্গ পর্য্যায়ে এই ইচ্ছা এতই সূক্ষ্ম

যে পুরুষের সঙ্গে একান্ত হয়ে আছে। সেইজন্য যোনী যুক্ত লিঙ্গ হয়েছে। এর পরই ইচ্ছার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টি করেছে সৃষ্টির অপার লীলা। পুরুষের ইচ্ছাই হল তাঁর শক্তি। শক্তি হলো পুরুষের প্রকৃতি। প্রকৃতি হল নারী। সেই নারীর প্রতীক যোনি, তাই শিবলিঙ্গ কখনও একক নয়, যোনীর সঙ্গে যুক্ত। এ হল পুরুষের এমন এক পর্য্যায় যেখানে ইচ্ছা একাত্মভাবে তাঁকে জড়িয়ে রয়েছে। ইচ্ছা অবিদ্যা হয়ে প্রকাশিত হয়নি। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব অনুভব করতে হলে করতে হয় যোগসাধনা। যোগ সাধনায় কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠলে তবেই এই সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে বোধ জন্মে।

শক্তিতরঙ্গ নয়টি পর্য্যায়ে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূল উপাদান সৃষ্টি করেছে। এই নয়টি তরঙ্গ হল তারা, যোড়শী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, ছিন্নমস্তা, কমলা, ভুবনেশ্বরী, ধূমাবতী ও বগলা। শূন্য স্বরূপ পুরুষের মধ্যে অস্ফুট যে শক্তি, যে শক্তি প্রথম স্থিতির মধ্যে গতির আবেগ, তাই হলেন মহামায়া। মহামায়া হলেন কাল বা সময়ের প্রথম স্ফুরণ। সেই অব্যক্ত রহস্যময় কালের অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে তিনি ˚ কালী। তিনি অব্যক্ত বলে অন্ধকারাচ্ছন্না অর্থাৎ জানা যায় না। তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা, মহাকালী শক্তি থেকে দেশের (Space) সৃষ্টি। সেই দেশের শক্তি হচ্ছেন তারা নীলবর্ণা। চোখ বুজলে ভ্রূ মধ্যে প্রথমে দেখা যায় অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে ফুটে উঠে একটি বিন্দু। সেই বিন্দু ধারণ করে নীলবর্ণ। ˚ কালী থেকে ˚তারার এইভাবে উৎপত্তি। তারপর রঙের খেলা। এই রঙের তরঙ্গের মধ্যে আছে আটটি মূল তরঙ্গ, যারা ˚কালী ও ˚তারা এই দুই মহাবিদ্যার পরে অন্যান্য বিদ্যা নামে পরিচিতা ˚তারা থেকে ˚বগলা পর্য্যন্ত সংখ্যা হল নয়। আদি প্রকৃতিবীজ মহামায়া মহাকালী পুরুষের সঙ্গেই যুক্ত থাকেন। এই নয়টি মৌল তরঙ্গ সৃষ্টির যে পটভূমি তৈরী করে তার উপরই দেশের পাশে মহামায়া নিজে দাঁড়িয়ে অসংখ্যসৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে কাজ করেন। সংখ্যাতত্ত্বের উৎপত্তি এখান থেকেই।

মৌল সংখ্যা ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ তাঁরা থেকে বগলা। এদের সমন্বয়েই সমগ্র সংখ্যা গণনাতীত সংখ্যা। দেশের (Space) বুকে যখন সময়ের খেলা ধরা পড়ে, তখনই মৌল সংখ্যার ঊর্দ্ধে নূতন সংখ্যা, যেমন ১০। ১ হল তাঁরা। তার পিঠে শূন্যরূপা মহামায়া কালী দাঁড়িয়ে দেশ কাল মিলে প্রথম বস্তু জগতের সৃষ্টি। তারপর এই নয়টি শক্তি ও শূন্যরূপা মহামায়ার মিলনে অসংখ্য সংখ্যা অর্থাৎ সৃষ্টি। যেমন ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ইত্যাদি। দশ মহাবিদ্যাতত্ত্বের এই হল মূল রহস্য।

সৃষ্টি রহস্য

সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মণের মধ্যে যখন অহং বোধ হয় তখনই তাঁর মধ্যে ইচ্ছার একটি কেন্দ্র তৈরী হয় বিন্দুর আকারে। এই বিন্দুই শক্তি। এই বিন্দু তখন ছড়িয়ে পড়ে ব্রহ্মণেরই মধ্যে আলোর তরঙ্গে। এই তরঙ্গ ধাপে ধাপে ছড়াতে থাকে। আলো ছড়াতে ছড়াতে তারই মধ্যে সৃষ্টি হয় সৃষ্টির উপাদান, আমরা যাকে বলি বস্তু। বস্তুর অনির্বচনীয় উপাদান এই বিন্দুর মধ্যেই থাকে প্রথম। তরঙ্গের আকারে সেই বিন্দু ছড়াতে ছড়াতে ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়। জ্যোতি দেখা দেয় বস্তুকণা আকারে, তারপর সেই বস্তুকণার পারস্পরিক সংমিশ্রণে একের পর এক সৃষ্টি ফুটে উঠতে থাকে। প্রত্যেকটি বস্তুকণার মধ্যেই পরামাত্মন্ বা ব্রহ্মণ থাকেন। 'এক' ব্রহ্মণের মধ্যে বস্তুকণা সকল স্বতন্ত্র অস্তিত্বে আবরণের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। সেই ব্রহ্মণস্বরূপ বুঝতে গেলে বিপরীত গতিতে অগ্রসর হতে হয় অর্থাৎ যেখান থেকে উৎপত্তি সেই উৎসের দিকে চেতনাকে ঠেলে পাঠাতে হয়। যে স্তরে স্তরে বস্তুপুঞ্জের উদ্ভব, সেই স্তরে স্তরে ফিরে গেলে আবার যেখান থেকে উৎপত্তি তার সন্ধান পাওয়া যায়। সৃষ্টিবর্ণনায় এই গুহ্য তত্ত্ব রয়েছে মানুষের দেহের মধ্যেই। এই মানুষের মধ্যেই রয়েছে ব্রহ্মণের অহংবোধরূপ জ্ঞানকেন্দ্র 'বিন্দু'। যে বিন্দুই ইচ্ছার প্রথম সঞ্চার। সেই বিন্দু আছে

মানুষের ব্রহ্মরন্ধ্রে। সেখান থেকে তার তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে পড়তে বস্তুরূপে ঘনীভূত হয়ে আছে গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলের মাঝামাঝি কোন স্থানে। পরমা শক্তি সেখানে স্থির হয়ে আছে। তার অজ্ঞাত চৌম্বক ক্ষমতায় দেহ-মহাবিশ্ব গতি লাভ করছে সক্রিয় থাকছে। তার প্রতিচ্ছায়া নিম্নাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে সেই স্থির হয়ে যাওয়া ঘনীভূত শক্তিকে জাগ্রত করলে যে ভাবে সে স্তরে স্তরে উর্ধ্ব থেকে নিম্নে নেমে এসেছে, সেই ভাবে স্তরে স্তরে উর্দ্ধে উঠে যায়। সেই শক্তিই কুন্ডলিনী শক্তি। তাঁর উর্ধ্ব গতিতে ছটি প্রতিবন্ধক আছে। এই প্রতিবন্ধকই পরম অস্তিত্বরূপে কেন্দ্রে গিয়ে মিলতে পারে, তাহলেই সত্যের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায় — সত্য হওয়া যায়।

সত্য কি ?

সত্যকে কেউ জানে না, সত্য হতে হয়। যতক্ষণ কোন লোক বলে জানি, ততক্ষণ সে আংশিক সত্য জানে, ততক্ষণ সে নিজেও আংশিক সত্য। যখন যথার্থ সত্যকে জানে, তখন সে নিজেই সত্য হয়ে যায়, তখন আর সে জানে না।

'কিছুই না দেখা' হল সত্য হওয়া অর্থাৎ সত্য হল কিছুই না, অর্থাৎ শূন্য অর্থাৎ পূর্ণ। শূন্যকে এই জন্যই পূর্ণ বলে।

কোন জিনিসই বাইরে সত্য নয়, যতক্ষণ না তা ভেতরে সত্য হয়ে উঠে, জীবন্ত হয়ে উঠে। নিজের অন্তরে বিশেষ একধরণের ক্ষমতা লাভ করে। তখন নিজেই নিজেকে, মন যা চায় তাই দান করে। বিশ্বাসের মত বিশ্বাস থাকা চাই। বিশ্বাস করতে করতে অন্তর শুদ্ধ হয়, অন্তর শুদ্ধ হলে তাতে জ্ঞানের প্রতিফলন হয়। ঘোলা জলে প্রতিবিম্ব ফোটে না, পরিষ্কার জলে প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। অন্তর শুদ্ধ হয় একাগ্রতায়। নানা চিন্তাই হল ঘোলাজল, বেনো জল। এই সব চিন্তাকে সরিয়ে দিতে হবে মন থেকে। জমিতে আগাছা হলে

ফসলের জোর কমে যায়। আগাছা উপড়ে ফেললে ফসল জোরদার হয়। মনের একাগ্রতা হল আগাছা উপড়ে ফেলা। ভক্তি হল লাঙল যা আগাছা উপড়ে ফেলে।

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ

"পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ।"
পঞ্চাশের উপর বয়স হলে সংসারই অরণ্য হয়ে যায়।

মানুষের মন

পরিবর্তনশীল মানুষ, তার দেহে, মনে, প্রাণে। সেই জন্য মানুষ সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে অনিত্যের খেলা খেলে। মানুষের যদি পরিবর্তন না হত, তার স্মৃতি যদি এক ধ্রুব লক্ষ্যে স্থির থাকত চিরকাল, তাহলে সংসার টংসার থাকত না, অচল হয়ে পড়ত। পৃথিবী স্বর্গের মত হত। একই দেবতা, একই দেবী, একই ভালবাসা, একই ক্ষমতা, মানুষ দেবতা হত। কিন্তু মানুষ দেবতা নয়, মানুষ। সেইজন্য চিরকাল সে স্থির থাকে না। চিরকাল এক বিশ্বাস ধরে রাখে না। ঘাতে, প্রতিঘাতে নিত্য তার অগ্রগতি, অতীত ছাড়িয়ে বর্ত্তমানে তার প্রবেশ। বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে তার ইঙ্গিত। অতীতকে আঁকড়ে ধরলে বর্ত্তমানে সে আসতে পারত না। বর্তমানকে চিরন্তন বলে মেনে নিলে মানব সভ্যতার অগ্রগতি ঘটত না।

প্রেম

প্রেম মানুষের উন্নত আত্মারই একটি অভিব্যক্তি মাত্র। মানুষ মানুষের জৈব দেহে তার চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছে প্রেমে। জৈব প্রেম স্বর্গে পৌঁছে দিতে পারে না বটে, তবে স্বর্গ মর্ত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন

সৃষ্টি করে। যিনি এই ক্ষুদ্র প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন তিনি বৃহৎ প্রেমের বৃত্তে প্রবেশ করার ছাড়পত্রও পেয়েছেন। জৈবপ্রেম যদি মহৎ হয়, তবে তাহা দেহবৃত্ত ছাড়িয়ে উর্দ্ধে উঠে যায়। যথার্থ প্রেম মানুষকে মহান ত্যাগের ব্রতে উজ্জীবিত করে। প্রেম যেন চিত্তকে হাল্কা এক মেঘের মত করে দেয়। পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে, মাটীর আকর্ষণ এড়িয়ে আত্মাকে উর্দ্ধচারী করে তোলে। জীবনে সত্যিকার প্রেমসাধনা যদি কেহ করতে পারে তাহলে তা মানুষকে অধ্যাত্ম চেতনার স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। প্রেম যদি সত্যিকারের হয়, তবে তা মানব আকাঙ্খাকে স্থূল বাসনা কামনার উর্দ্ধে তুলে মহামহিম করে তুলতে পারে।

ব্রহ্মজ্যোতির্ময় মন্ডল জ্যোতিঃ স্বরূপ।

১) প্রথম বৃত্ত, যার ভিতর মায়া লেখা হরিদ্বার।
২) দ্বিতীয় বৃত্ত, মহত্তত্বের স্তর, সাদা।
৩) তৃতীয় বৃত্ত, অহংতত্ত্ব, লাল।
৪) চতুর্থবৃত্ত, শব্দ তন্মাত্র, লাল ও নীল ছিট ছিট।
৫) পঞ্চম বৃত্ত, স্পর্শ তন্মাত্র, নীল।
৬) ষষ্ঠ বৃত্ত, রূপ তন্মাত্র, লাল।
৭) সপ্তম বৃত্ত, রস তন্মাত্র ও সবুজ।
৮) ৮ম বৃত্ত, গন্ধ তন্মাত্র, ব্রহ্মাণ্ড কটাহ, ধূসর।
৯) নবম বৃত্ত,সমষ্টি অন্তঃকরণ, সাদা।
১০) দশম বৃত্ত, সমষ্টি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ, লাল।
১১) ১১শ বৃত্ত, সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর, ধূসর।
১২) ১২শ বৃত্ত, বায়ু নীল।
১৩) ১৩শ বৃত্ত, অগ্নি লাল।
১৪) ১৪শ বৃত্ত, জল, সবুজ।
১৫) ১৫শ বৃত্ত, মাটি ধূসর।
১৬) পিতৃযান, ধূসর।
১৭) দেবযান, হরিদ্বর্ণ

১৮) সহস্রার পদ্ম, লাল
১৯) দ্বারকা মন্ডল, মথুরা মন্ডল, গোকুল জ্যোতির্ময়।

ষটচক্রের এক একটা বৃত্তের মৌল উপাদান কি দেখি।

যেমন,

১) মূলাধার চক্রের জগৎ — মাটি।
২) স্বাধিষ্ঠান চক্রের জগৎ — জল।
৩) মণিপুর চক্রের জগৎ — অগ্নি।
৪) অনাহত চক্রের জগৎ — বায়ু।
৫) বিশুদ্ধ চক্রের জগৎ — সমষ্টি সূখ, শরীর সুখ।
৬) আজ্ঞা চক্রের জগৎ — সমষ্টি ইন্দ্রিয় ও প্রাণ।
৭) সত্যলোক চক্রের জগৎ — সমষ্টি অন্তঃকরণ।
৮) ব্রহ্মাণ্ড কটাহ ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে রয়েছে অব্যক্ত মায়া তার পরই ফুটেছে

১) মহৎতত্ত্ব।
২) অহংতত্ত্ব।
৩) শব্দ তন্মাত্র।
৪) স্পর্শ তন্মাত্র।
৫) রূপ তন্মাত্র।
৬) রস তন্মাত্র।
৭) গন্ধ তন্মাত্র
৮) ব্রহ্মজ্যোতির্মন্ডল নির্গুণ ব্রহ্মাণস্তব।

অধ্যাত্ম জগতে গ্রন্থপঠনের কোন মূল্য নেই, যদি না স্বয়ং এ জগতে প্রবেশ করা যায়।

'শূন্যে শূন্য মিলাইল।'

একটা পেঁয়াজকে যদি শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা যায় এবং তারপর একে একে তার খোলস বা আবরণ খুলে ফেলা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, শেষ আবরণ টুকু সরে গেলে ভেতরে আর কিছুই নেই। রয়েছে সেই Void (শূন্য) তখন বাইরেও Void ভেতরেও Void তখন দুই Void মিলে গিয়ে আবরণের সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে যায়। মানুষের এই দেহটাও একটা পেঁয়াজের খোলার মত। তার বাসনা কামনার তীব্রতার হেরফের হেতু খেলাগুলি পুরু এবং সূক্ষ্ম। যত অভ্যন্তর তত বাসনার স্তর সূক্ষ্ম, যত বর্হির্দেশাভিমুখী ততই তা স্থূল পেঁয়াজের খোলার মত এই আবরণ গুলি তাকে জড়িয়ে রেখেছে। পেঁয়াজের এক একটা স্তর খুললে স্তরে স্তরে রঙ পাল্টায় মানুষ যত তার ভেতরে ঢুকতে পারে ততই তার স্থূল আবরণ সরে গিয়ে সূক্ষ্ম আবরণ দেখা দেয়। পেঁয়াজের এক এক আবরণে যেমন বর্ণভেদ আছে তেমনই মানুষ যতই তার ভেতরে প্রবেশ করে ততই নিজের ভিতর বর্ণের তারতম্য দেখতে পায়। এই রহস্যময় অন্তর্জগৎ দেখতে পেয়েই অনেক যোগী বলে উঠেছেন মানুষের দেহ একটা 'রঙের বাক্স'। সেই রঙবেরঙের বিচিত্র জগতে যে মানুষ প্রবেশ করে, অনেক রহস্যময় জিনিস দেখে সে অবাক হয়ে যায়। তার রহস্যময় অনুভূতিকে তখন সে নানা প্রতীকময় ভাষাতে প্রকাশ করে, কারণ পরিচিত বাচনভঙ্গী দিয়ে তার অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যাখ্যা করতে পারে না। (''জ্যোতিতে জ্যোতি মেলাও। চাদের গায়ে চাঁদ লেগেছে আমরা ভেবে করব কি?'') তাছাড়া নানা অদ্ভুত প্রতীকের মাধ্যমেও দিব্য জগৎ তাঁকে বিভিন্ন ধরণের ইঙ্গিত দেয়। সেই প্রতীকের অর্থ সূক্ষ্মভাবে ধরা গেলে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা যায়। — নিগূঢ়ানন্দ

আমার আদি নাহি হায়, অন্ত বা কোথায় সকলই আঁধারে ধায়।
অনন্তেরই কোলে বাসনা হিল্লোলে অহং বহিয়া যায়।।

সৃষ্টি

জগতে সৃষ্টির চাইতে মহৎ সুন্দর ও আনন্দদায়ক কিছু নেই। যদি এই সৃষ্টির উৎস কেহ থেকে থাকেন তিনি নিশ্চয় আনন্দময়। আবার এই সৃষ্টির আবেগ ঘূর্ণায়মান হয়ে ভেতরে যদি যেতে থাকে, তার চাইতে যন্ত্রণারও বোধ হয় কিছু নেই। জীবনের চিহ্ন রিপ্রোডাকশন, আর সৃষ্টির চিহ্ন হল প্রকাশ। নিজেকে প্রকাশ করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে পারলেই যেন তার চরম সার্থকতা। -নিগূঢ়ানন্দ।

ভালবাসা

ভালবাসাটা আসলে কি জিনিস? ভাল বোধহয়, কেউ কাউকে বাসে না। ভালবাসে প্রত্যেকে তার নিজেকেই। ভালবাসার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই গভীরতর একটা যে সত্তা আছে, সে নিজেকে প্রকাশ করবার এ অদ্ভুত খেয়ালে ভালবাসার ধরণের একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভালবাসার গভীরতর অর্থের স্বরূপ যারা বুঝতে পারে তারা ব্যক্তিকে ত্যাগ করে ব্যষ্টির মধ্যে নিজেকে তুলে ধরতে চায়। প্রেম ভালবাসার অনুভব যেখানে প্রাথমিক পর্য্যায়ে, সেখানে সেক্সমুখী, বিপরীত সেক্সমুখী, যেখানে আরও একটু গভীর সেখানে বিপরীত সেক্সের বাইরেটা না দেখে ভেতরটা জয় করতে চায়, যেখানে আরও ব্যাপক সেখানে বহুর মধ্যে নানা ধরণের প্রকাশ প্রত্যাশী। রাজনীতি, সমাজসেবা, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সবই এই ধরণের একপ্রকার প্রেম — গভীরতর সত্তার এক অপরূপ অভিলাষ। -নিগূঢ়ানন্দ।

স মা প্ত